Cult-H05273-40-P36134
40
P 36,134

ধর্ম্মসাধনে সুশাস্ত্র।

ইংরাজী শিখিয়া একদিন আধুনিক ইউরোপীয় যুক্তিবাদের প্রভাবে শাস্ত্র গুরুবর্জ্জন করিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে চাহিয়াছিলাম। জীবনের সকল ব্যাপারে স্বাধীন হইয়া চলিব, ইহাই আমাদের চরম লক্ষ্য ছিল। না বুঝিয়া যুক্তির কষ্টিপাথরে না কষিয়া কিছুই সত্য বলিয়া জানিব না, এই স্বাধীনতার আদর্শে ইহাই প্রথম কথা ছিল। তখন আমরা মনে করিতাম যে সকল মানুষের ভিতরেই একটা স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্মবুদ্ধি আছে। এই ধর্ম্মবুদ্ধিকেই ইংরাজীতে conscience কহে। বাংলায় ইহাকে বিবেক কহিয়াছেন। বিবেকের যে একটা শাস্ত্রীয় অর্থ আছে, তখন একথা জানিতাম না। এই ধর্ম্মবুদ্ধি বা বিবেকই প্রত্যেক মানবের ধর্ম্মগুরু হইয়া তাহার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত আছে। নিজেদের বিচার-বুদ্ধি এবং বিবেকের স্বাধীনতা শাস্ত্রানুগত্য ও গুরু আনুগত্যের দ্বারা ব্যাঘাত প্রাপ্ত হয়। স্বাধীনতার উপরে এই আঘাত আমাদের সহ্য হয় নাই সুতরাং আমরা শাস্ত্রগুরুবর্জ্জন করিয়াই ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।

সে সময়ে দেশের লোকে যাঁহারা শাস্ত্রগুরু মানিয়া চলিতেন, তাঁহারাও শাস্ত্রের প্রামাণ্য বা গুরুর প্রয়োজনীয়তা বুঝিতেন না। তাঁহারা গতানুগতিক পথে চলিয়া না বুঝিয়া শুঝিয়াই শাস্ত্রের দোহাই দিতেন এবং কুলগুরুর নিকটে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিতেন। যাঁরা বুঝিয়া শুঝিয়া বিচার-যুক্তির দ্বারা পরখ করিয়া নিজেদের প্রত্যক্ষ অনুভবের সঙ্গে মিলাইয়া তত্ত্বজ্ঞানলাভ ও ধর্ম্মসাধন করিতে চাহিতেন, সে সময়ে তাঁহাদের পক্ষে প্রচলিত শাস্ত্রগুরু-অনুগত সাধন পন্থার অনুবর্ত্তন করা সম্ভব ছিল না।

সেকালে নূতন-শিক্ষিত সমাজে আমাদের দেশে সনাতন শাস্ত্রের চর্চ্চা আরম্ভ হয় নাই। এমন কি সংস্কৃত কলেজেও যথোপযুক্তরূপে বেদাদি শাস্ত্রের আলোচনা হইত না। আমরা আমাদের প্রাচীন মীমাংসা শাস্ত্রের কোনও খোঁজ-খবরই পাই নাই। রাজা রামমোহন যে ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেখানে বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা হইত। তখনকার ব্রাহ্মেরা বেদ মানিতেন। যবনিকার অন্তরালে ব্রাহ্মণ আচার্য্য বেদ পাঠ করিতেন।

নাম গান।

বংশীধারী বুঝতে নারি
কি বাঁশী তোমার কবে ;
কালিন্দী হায় উজান বহে
আনন্দে নয়ন ঝরে ;
বর্ণে আলোয়-গন্ধে হরি,
রেখেছ হায় কি
আজে আমার প্রাণের
মন
(২)
ভ্রমের হায় মধুর তৃষা
শুধু
রসিক আপন হতে
নামের সুধা
দাও
আমায় আ
বাঁশী
নূতন
বিমল হৃদয় চাঁদ
জানিয়ে কি
তো
পাওয়া
নামের
নামে,
পথের বা
যায় হাত

সকল জাতির সমক্ষে বেদ-পাঠ বিহিত ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়া ক্রমে এই বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া স্বানুভূতি বা আত্মজ্ঞানের উপরে ধর্ম্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। বেদে ব্রহ্মোপাসনাই বিহিত হইয়াছে, না দেববাদ এবং দেবোপাসনাও উপদিষ্ট হইয়াছে, মহর্ষির মনে এই সন্দেহ উঠিলে তিনি চারিজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে কাশীতে বেদ পড়িয়া এই কথা জানিয়া আসিবার জন্য পাঠাইলেন। ইঁহারা কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া বেদে কেবল ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মোপাসনাই বিহিত হয় নাই, দেববাদ এবং দেবোপাসনাও প্রচারিত হইয়াছে এই কথা কহেন। ইহার পরেই এই পণ্ডিতদিগের সাক্ষ্যের উপরে নির্ভর করিয়া দেবেন্দ্রনাথ বেদের প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়া স্বানুভূতি বা আত্ম-প্রত্যয় বা মানুষের সহজ জ্ঞানের উপরেই তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মকে গড়িয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হয়েন। দেবেন্দ্রনাথ যাঁহাদিগকে বেদ পড়িবার জন্য কাশী পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা বৈদিক মীমাংসা শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। মহর্ষির অন্তরে যে প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল, বেদান্তসূত্রে সেই প্রশ্ন তুলিয়া তাহার মীমাংসা করিয়াছেন। বেদান্ত সূত্র [illegible] করেন যে বেদে সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতেই এই জগত প্রপঞ্চের জন্মাদি হইয়াছে, এই তত্ত্বই প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। বেদান্ত সূত্রের "তত্তু সমন্বয়াৎ"—এই সূত্রের ভাষ্য করিতে যাইয়া ভগবান ভাষ্যকার এই সিদ্ধান্তকেই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বেদান্তের দ্বিতীয় সূত্র "জন্মাদ্যস্য যতঃ" জগতের জন্ম স্থিতি-লয় যাঁহা হইতে তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন। পূর্ব্বপক্ষ বলেন, এই সূত্রে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ না করিয়া সাংখ্যের অচেতন-প্রধানকেও ত নির্দ্দেশ করিতে পারে। সাংখ্যকার এই প্রধান হইতেই সৃষ্টির উৎপত্তি বলিয়াছেন, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তের প্রতিপক্ষে বেদান্ত "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এবং "আনন্দময়াভ্যাসাৎ" এই দুই সূত্র রচনা করিয়াছেন। বেদ জগতের আদি কারণকে সাবয়ব প্রধানের ন্যায় কেবল তাহার উৎপত্তি-স্থল বা প্রতিষ্ঠাতা কহিয়াছেন। যাহা জড় তাহা কখনই সচেতনের যোনি হইতে পারে না। ইহাই "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" সূত্রের মর্ম্ম। তারপর পুনঃ পুনঃ বিশ্ব-প্রপঞ্চের আদি [illegible] করিয়াছেন। অচেতনের আনন্দসম্ভোগ সম্ভব নহে। নিত্য চৈতন্যস্বরূপের পক্ষেই নিত্যানন্দময় হওয়া সম্ভব। "আনন্দ[illegible] ইহাই [illegible] তারপর বেদান্ত বলিলেন,

বেদের সমন্বয় করিয়াও [illegible] জগতের আদি কারণ যে অচেতন প্রধান নহেন, কিন্তু চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্ম এই [illegible] অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। "ভক্তু সমন্বয়াৎ" সূত্রের ইহাই মর্ম্ম। তাঁহার ভাষ্যকার এই মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিয়াই কহিয়াছেন যে সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্মই যে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয়-কারণ—"সর্ব্বেষু বেদান্তেষু বাক্যানি তাৎপর্য্যেন এতস্য অর্থস্য সমনুগতানি"—সকল বেদান্তে বাক্যসকল তাৎপর্য্যের দ্বারা এই অর্থেরই অনুসরণ করে। কিন্তু এখানেও সকল গোল মিটিয়া [illegible] ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসনা স্পষ্টতঃ বিহিত হইয়াছে। কৈষতকী [illegible] প্রতর্দন নামক অসুররাজ দেবরাজ ইন্দ্রের নিকটে শৌর্য্য-বীর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক উপস্থিত হইলে ইন্দ্র তাঁহার শৌর্য্য বীর্য্য দর্শনে প্রীত হইয়া বর [illegible] চাহিলেন। প্রতর্দন সেই বর প্রার্থনা করিলেন যাহার দ্বারা পরম জ্ঞান ও [illegible] লাভ করা যায়। ইন্দ্র কহিলেন, মামেব বিজানীহি—আমাকেই [illegible] মামুপাস্স্ব,—আমার উপাসনা কর। ইহা চরম জ্ঞান ও [illegible] সুতরাং [illegible] কেবল ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনাই বিহিত [illegible] কহিয়া কেন [illegible] ইহার উত্তরে বেদান্তসূত্রে [illegible] ইহার অর্থ এই যে [illegible] করিয়া নিজের সত্তাকে ব্রহ্মসত্তা [illegible] স্বতন্ত্র অস্তিত্বজ্ঞান হারাইয়া বিশ্বের [illegible] বলিয়াছি, আমি মত্ত হইয়াছিলাম; সেইজন্য এই ইন্দ্র [illegible] ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধি করিয়া আমাকেই জানা আমারই উপাসনা [illegible] কহিয়াছেন। এখানে "আমা" [illegible] নির্দ্দেশ করে না, কিন্তু ব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করে। [illegible] ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মোপাসনারই উপদেশ দিয়াছেন, [illegible] করিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি [illegible] ব্রাহ্মণকে [illegible] তাঁহারা কেবল বেদেরই [illegible] আসিতেছেন, [illegible] করিয়া ভারতের [illegible] বেদের [illegible] সেই সীমাংসা [illegible] বেদের [illegible]।

আমরা [illegible] পাই নাই। [illegible] ও উত্তর মীমাংসা [illegible] ন্যায়যন্ত্রে পড়িয়া [illegible] তাহা কিছুই [illegible]

পারি নাই। ভারতের প্রাচীন মীমাংসা শাস্ত্রে যে বিচারের সূক্ষ্মতা ও যুক্তির কৌশল দেখিয়া পরে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছি, তাহার সন্ধান তখনও পাই নাই। জৈমিনি এবং বাদরায়ণের যুক্তিবাদ আধুনিক যুগের ইউরোপীয় যুক্তিবাদকেও যে হারাইয়া দিয়াছে, এ কথা সেকালে আমাদের কল্পনাতে আসে নাই।

শাস্ত্র, সন্দেহ, বিচার প্রভৃতি এবং এমন এই সকল অবলম্বন করিয়াই আমাদের মীমাংসা-শাস্ত্রের সৃষ্টি। মীমাংসা অর্থই বিচারনিষ্পত্তি। মানুষের বুদ্ধি যাহা বলে, শাস্ত্র যখন [illegible] তখন কখনও কখনও শাস্ত্র বাক্যের সন্দেহ উপস্থিত হয়। [illegible] বাক্যের সঙ্গে সাধারণ জ্ঞানের। তখন কেহ কেহ [illegible] অসৎ বলিয়া বর্জ্জন করেন. আমাদের [illegible] প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়াছিলেন। [illegible] এইরূপে শাস্ত্রপ্রামাণ্য [illegible] করিবেন, তাঁহাদের নিকটে মী[illegible] মর্য্যাদা থাকিবে না। চার্ব্বাকেরা বেদ মানিতেন না, [illegible] তাঁহার [illegible] মীমাংসা [illegible] প্রত্যক্ষ বলিতে [illegible] গ্রাহ্য নহে, তাহা যে আছে বা থাকিতে পারে, চার্ব্বাকেরা [illegible] না। আধুনিক ইউরোপীয় [illegible] আমাদের প্রাচীন চার্ব্বাক বা [illegible] মতেরা যেমন কহিতেন, [illegible] খাও পিও, মজা কর, কারণ [illegible] ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। ইহাতে [illegible] তৃপ্তি [illegible] চার্ব্বাকদিগের অন্য কোনও বিষয় বা বস্তু সাধ্য ছিল না। [illegible] শাস্ত্র মানিতেন না, কাহা [illegible] গ্রহণ [illegible], তাহার সন্ধান দিবে, [illegible] করে। [illegible] যে শাস্ত্রে [illegible] কিছুই বিচিত্র বা অসম্ভাবিত [illegible]

কিন্তু যাহারা ইন্দ্রিয়াতীত [illegible] বিশ্বাস করেন, [illegible] সত্রাসারি ভাবে [illegible] উড়াইয়া দেওয়া সম্ভব নহে। তাঁহারা দেখেন যে, আমাদের [illegible] প্রকৃতি যে ওজনে [illegible] দেয়, [illegible] সকল তত্ত্বের [illegible] যাইতেছে। [illegible] নিজের অনুভবের [illegible] সঙ্গে শাস্ত্রের এই বি[illegible]

শাস্ত্রের প্রতি তাঁহাদের একটা সাধারণ শ্রদ্ধা জন্মিয়া যায়। কিন্তু ইহারই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা শাস্ত্রে এমন কথাও পান, যাহার সঙ্গে তাহাদের স্বানুভূতির বিরোধ বাধিয়া উঠে। শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তাঁহারা শাস্ত্রকে একেবারে উড়াইয়া দিতে পারেন না। অন্যদিকে নিজের প্রত্যক্ষ অনুভূতিকেও অগ্রাহ্য করিয়া শাস্ত্রবাক্য অবলম্বন করিতে পারেন না। অনুভূতি সত্য না শাস্ত্র সত্য, এই সন্দেহ তখন জাগিয়া উঠে। ইহা ছাড়া শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যেও প্রত্যক্ষ বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পরস্পরবিরোধী শাস্ত্রবাক্যের মধ্যে কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা অসত্য কোন্‌টা আদরণীয়, কোন্‌টা বর্জ্জনীয় এই সন্দেহও জাগিয়া উঠে। এই সন্দেহের নিরাকরণ জন্য বিচারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ইংরাজীতে এই বিচারকেই Criticism কহে। এই বিচারের সাধন যুক্তি—এই যুক্তি দ্বারা শাস্ত্রের অর্থের যে মীমাংসা হইল, তাহা সত্য কি মিথ্যা—এই প্রশ্নটাও উঠে। এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যাইয়া এই অর্থের সঙ্গে প্রত্যক্ষানুভূতির বিরোধ আছে না আছে, তাহাই ইহা দেখিতে হয়। যদি সঙ্গতি থাকে, তবেই সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারা যায়। অন্যথা এখনও শাস্ত্রের সত্য অর্থ নির্ণীত হইল না, অর্থাৎ মীমাংসা হইল না। কিন্তু এই সঙ্গতির পরেও আর একটা প্রশ্ন জাগিয়া উঠে। সে প্রশ্নটা এই যে সমগ্র শাস্ত্রের সঙ্গে এই অর্থের সমন্বয় আছে কি না। সমগ্র শাস্ত্র যাহা প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছে, এই মীমাংসার দ্বারা সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা পাইতেছে কি না হইয়াছে—ইহারও বিচার করিতে হয়। ইহাই শাস্ত্র বিচারের সোপান। এই সন্দেহ নিরাস, সঙ্গতি এবং সমন্বয়—এই ক্রম অনুসরণ করিয়া আমাদের দেশে মীমাংসার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এখানে যুক্তি ছাড়িয়া কোনও কথা ধরিয়া লইবার কোনও কথা নাই। যুক্তির আশ্রয় ব্যতিরেকে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণীয় নহে। শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থবোধ ব্যতীত শাস্ত্রের অনুশীলন করাও নিষ্ফল হয়। ধর্ম্মবস্তু জ্ঞানেতেই প্রকাশিত এবং জ্ঞানের মূলে আছে আত্মার জ্ঞান অর্থাৎ সেই আত্মার অনুভূতি। অনুভূতি অর্থাৎ সাক্ষাৎকার—ঋষিরা এই কথা বলিয়াছেন। অনুভূতি যে সেই আত্মার অপরোক্ষ। শাস্ত্রজ্ঞান আহরণে পরোক্ষ জ্ঞানমাত্র থাকে। যে যখন অপরোক্ষ অনুভবে যাইয়া পৌঁছিতে লাভ করে, তখনই সাধনের পূর্ণতা হয়। সেই অপরোক্ষ অনুভবের জন্যই শাস্ত্রে প্রয়াস পাইতে বলেন, এই

[illegible] প্রত্যক্ষের দ্বারা আপনার অনুভবের [illegible] ভাব সমর্থন করেন। এইরূপে শাস্ত্র ও স্বানুভূতির মধ্যে একটা অটল সমন্বয়ে [illegible] হয়। এই পথেই আমাদের প্রাচীনেরা মীমাংসা-শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বিচার-যুক্তি বর্জ্জন করিয়া তাঁহারা শাস্ত্রের দোহাই দিতেন না। বরঞ্চ—

যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।

যুক্তিহীন বিচারের দ্বারা ধর্ম্মের হানি হইয়া থাকে, এই কথাই কহিয়া গিয়াছেন। হিন্দুর সাধনায় শাস্ত্রের অর্থ কি, শাস্ত্রের প্রামাণ্য কোথায় এবং কোনখানে তখন আমরা [illegible] কোনোকালেও ইহার সন্ধান তখন জানিতেন না। সুতরাং সেকালে আমাদের পক্ষে [illegible] বর্জ্জন করিয়া শুদ্ধ স্বানুভূতির হাত ধরিয়া চলা ভিন্ন আর উপায়ান্তর ছিল না। তবে প্রাচীন চার্ব্বাকেরা কিম্বা আধুনিক ইউরোপের [illegible] যেভাবে শাস্ত্র বর্জ্জন করিয়াছিলেন, আমরা ঠিক সেভাবে তাহা করিতে পারি নাই। তথাপি অন্তপক্ষে আমরা কোনও অর্থেই শাস্ত্র মানিতেও পারি নাই।

মূল কথাটা এই যে আমরা [illegible] একটা ভাবের বা ঝোঁকের মুখেই চলিয়াছিলাম। যে যুক্তির বড়াই করিতাম, সেই যুক্তিবাদকেও ভাল করিয়া পরখ করিয়া দেখি নাই। আমরা নিজেদের বিচার-বুদ্ধির উপরেই একান্তভাবে নির্ভর করিয়া চলিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধির দ্বারা যে সত্যের সার্ব্বজনীন প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হয় না, এ কথাটা ভাল করিয়া ধরিতে পারি নাই। সেকালের ইউরোপের একেশ্বর-বাদীরা বাইবেলের প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়া মানবের সহজ বুদ্ধির উপরেই ঈশ্বর-তত্ত্ব, আত্ম-তত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের মূল তত্ত্বগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়াছিলেন। সকল মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর-বিশ্বাস পরলোক-বিশ্বাস তাঁহাদের প্রকৃতির সঙ্গেই জড়াইয়া আছে। এইজন্য মানুষ তার [illegible] নির্দ্দেশেই ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হয়। শাস্ত্র তাহার ধর্ম্মকে সৃষ্টি করে নাই। মানুষের সহজ-বুদ্ধি-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মবিশ্বাসই জগতের যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রকে গড়িয়া তুলিয়াছে। সুতরাং বিচার-তর্ক-বাদ সঙ্কুল শাস্ত্রের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া মানবের এই সহজ বুদ্ধির উপরে নির্ভর করিয়াই ধর্ম্মকে গড়িয়া তুলিতে পারা যায়। এই সহজ বুদ্ধিকেই ইংরাজীতে Intuition কহে। এই Intuition কেই মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ [illegible] কহিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের অনুবর্ত্তন করিয়া এই [illegible]

প্রত্যয়ের উপরেই আমাদের প্রথম যৌবনের ধর্ম্মসিদ্ধান্ত ও ধর্ম্মবিশ্বাস গড়িয়া তুলিতে গিয়াছিলাম ; এইজন্যই তখন শাস্ত্রশাস্ত্রের সন্ধানে প্রবৃত্ত হই নাই।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র উভয়েই কিন্তু একেবারে শাস্ত্রের হাত ছাড়িয়া দিতে পারিলেন না। মহর্ষি বেদাদি শাস্ত্রকে ভ্রম প্রমাদ-সঙ্কুল বলিয়া বর্জ্জন করিয়া নিজে ব্রাহ্মদিগের জন্য নূতন শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন। এই শাস্ত্রই তাঁহার প্রণীত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করিবার সময় মহর্ষি এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থখানি তাঁহার হাতে দিয়া কহিয়াছিলেন"—"এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ গ্রহণ কর। যদিও হিমালয় চূর্ণ হইয়া যায়, তথাপি ইহার একটী মাত্র কথা বিনষ্ট হইবে না। যদি দক্ষিণ সাগর শুষ্ক হইয়া যায়, তথাপি ইহার একটী সত্যেরও অন্যথা হইবে না। যে প্রকারে পূর্ব্বে অগ্নিহোত্রীরা অগ্নিকে রক্ষা করিতেন, তুমি এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে তদ্রূপ রক্ষা করিবে।" কেশবচন্দ্রও পরে নিজে "নবসংহিতা" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কেশবচন্দ্রের [illegible] নববিধান মণ্ডলীর মধ্যে [illegible] পাইয়া আছে।

ফলতঃ [illegible] ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থকে ঠিক উপনিষদের সঙ্কলন বলা যায় না। মহর্ষির আত্ম-জীবনী প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে আমরা তাঁহার [illegible] একখানি [illegible] ভাবিতাম। কিন্তু মহর্ষি উপনিষদাদি [illegible] তাঁর মনোমত [illegible] ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এ কথা সত্য নহে। তাঁর আত্মজীবনীতে মহর্ষি কহিয়াছেন যে তিনি কোনও উপনিষদের পাতা খুলিয়া [illegible] ভাবাবিষ্ট হইয়া যেমন ভাবাবিষ্ট হইয়া সমুদয় ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ [illegible] তেমন ইহা লিখিয়া রাখেন। এইরূপেই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের উৎপত্তি [illegible] এই গ্রন্থ মহর্ষি তাঁর নিজের প্রণীত বলিয়া কখনওই মনে করিতেন [illegible] ভাবাবেশেই এই গ্রন্থ রচিত হয়, এইরূপ এই বিশ্বাস ছিল। কেশবচন্দ্রও তাঁর [illegible] [illegible] প্রকাশিত [illegible] শাস্ত্রের প্রতি [illegible] শাস্ত্রাদীরা [illegible] করিতেন [illegible] হইতেই [illegible] এরূপ [illegible] সম্বন্ধেও [illegible] যায়। যোগ [illegible] যত্নে যে সব [illegible] হইয়াছিল, তাহার [illegible] আছে। [illegible] দিয়া স্বয়

পরমেশ্বরই এ সকল আদেশ প্রচার করিয়াছেন। এই জন্যই মুসলমানেরা কোরাণ-সরিফকে ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করেন।

কিন্তু আমাদের সাধনার ইতিহাসে শাস্ত্র-প্রামাণ্যের একটা বিশেষত্ব আছে প্রথমতঃ অতি প্রাচীন কাল হইতেই আমরা গোটা বেদকে প্রামাণ্যশাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করি নাই। বেদে নানা কথা আছে। সে সকল কথা কোনও কোনও স্থলে পরস্পর বিরোধীও বটে। মীমাংসা-শাস্ত্র এ সকল বিরোধ-নিষ্পত্তির চেষ্টা পাইয়াছেন, সত্য। কিন্তু সকল বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় নাই, হওয়া সম্ভব নহে। এই জন্য অতি প্রাচীনকাল হইতেই বেদের কোন অংশ প্রামাণ্য-মর্য্যাদা পাইবে,—এবং কোন অংশের সে মর্য্যাদা নাই ইহা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রাচীন মীমাংসকেরা শাস্ত্রের প্রথম সংজ্ঞা দিলেন, যাহা অদৃষ্টের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের অতীত বস্তুর বা বিষয়ের কথা কহে, তাহাই শাস্ত্র—অদৃষ্টাত্মকং শাস্ত্রং। বেদাদি শাস্ত্রে যেখানে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়ের কথা কহেন, সেখানে ইন্দ্রিয়াদিই সে সকল কথার প্রামাণ্য বা অপ্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করিবে,—এ সকল বিষয়ে বেদপ্রামাণ্যের অধিকার নাই। এ সকল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ব্যাপার সম্বন্ধে বেদাদি শাস্ত্রে যদি কোনও ভুলভ্রান্তি থাকে; তাহাতেও কিছু আসিয়া যাইবে না। ইন্দ্রিয়ই সে ভুল-ভ্রান্তির নিরসন করিতে পারে। বেদে আছে বলিয়াই যে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ে বেদের প্রামাণ্য মানিতে হইবে; এমন কোনও কথা নাই। বেদে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের যে সকল কথা আছে, তাহা আপ্তবাক্য নহে, অর্থবাদ মাত্র। কিন্তু শাস্ত্রকে অদৃষ্টাত্মক মানাতেই সকল গোল মিটিল না। ইন্দ্রিয়ের অতীত অনেক বস্তু বা বিষয় থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নাও থাকিতে পারে। সে সকলের দ্বারা আমাদের ইষ্টানিষ্ট কিছু না হইতেও বা পারে। আর সে সকলের উপরে আমাদের পরমার্থ বা মুক্তি নির্ভর না করিতেও বা পারে। সে সকল কথার আলোচনা লইয়া আমরা করিব কি? এইরূপ আলোচনার ফলেই বোধ হয় শাস্ত্রের দ্বিতীয় সংজ্ঞা হইল—মোক্ষপ্রতিপাদকং শাস্ত্রং। অর্থাৎ মুক্তি সম্বন্ধে যাহা উপদেশ দেয়, তাহাই শাস্ত্র। প্রথমে অদৃষ্টাত্মকং শাস্ত্রং—শাস্ত্রের এই সংজ্ঞা করিয়া বেদাদি শাস্ত্রে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের যে সকল বর্ণনা আছে, তাহাকে প্রামাণ্য শাস্ত্রের গণ্ডীর বাহির করিয়া দেওয়া হইল। তারপর মোক্ষপ্রতিপাদকং শাস্ত্রং—এই সংজ্ঞা দ্বারা বেদাদি শাস্ত্রের অদৃষ্টাত্মক অংশকেও আবার দুইভাগ করিয়া যাহাতে মোক্ষপথ দেখাইয়া দেয়, তাহাকেই প্রামাণ্যশাস্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত

করিলেন। আর বাকী যা কিছু তাহাকে [illegible] করিয়া দিলেন। তার পর স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে—মোক্ষকা[illegible] থাকে বলিব? কোন্ কষ্টিপাথরে কষিয়া [illegible] কোন্ [illegible], ইহা ঠিক করিব? শাস্ত্র স্বয়ংই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া[illegible] নির্দেশ করিয়াছেন যে জগতে বেদিতব্য দুই বিদ্যা আছে। [illegible] অপর বিদ্যা; আর এক পরা বিদ্যা। ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ ইত্যাদি [illegible] অপরা বিদ্যা। আর যাহা দ্বারা সেই অক্ষয় পুরুষকে জানা যায় [illegible] বিদ্যা বা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। বেদান্ত বারংবার কহিয়াছেন যে ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে [illegible] মুক্তি হইতে পারে না। এই ব্রহ্মজ্ঞানই [illegible] মুক্তির একমাত্র পন্থা। [illegible] [illegible] বেদান্তেই [illegible] পাওয়া যায়। [illegible] [illegible] পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে যে [illegible] এবং এই পরমতত্ত্ব বা [illegible] [illegible] [illegible] খৃষ্টীয় [illegible] [illegible] তন্ত্র চণ্ডী, [illegible] [illegible] এবং [illegible], তাহাই প্রাচীন [illegible] শাস্ত্র ঋগ্বেদাদিতে [illegible], বেদান্তেও আবদ্ধ নহে; পরন্তু [illegible] তাহাও আবদ্ধ নহে [illegible] অনাদি কাল হইতে অজ্ঞ [illegible] যিনি [illegible] [illegible] ব্রহ্মজ্ঞান [illegible] জন্য [illegible] লাভ করিয়া [illegible] করিয়া [illegible], তাহাই আমাদের শাস্ত্র। এইরূপে শাক্ত তন্ত্র, বৈষ্ণব [illegible], [illegible] মাতার [illegible] পদাবলী, কবীরের দোহাবলী, তুকারামের অভঙ্গ,— [illegible] সত্যের, [illegible] এবং মুক্তিপন্থার উপদেশ করিতেছে, [illegible] [illegible] মতন প্রমাণ সর্ব্বদা পাইবার উপযুক্ত; এবং এদেশে সাধক [illegible] [illegible] আসিয়াছে। এই উদার ভূমির [illegible], [illegible] [illegible] খৃষ্টি[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যেখা[illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] করিয়াছে, সে সব [illegible] [illegible] শাস্ত্ররূপে বরণ [illegible] [illegible] বা মুসলমানদিগের [illegible] শাস্ত্র বলিয়া [illegible] [illegible] নাই। [illegible] কোনও শাস্ত্রে [illegible] [illegible] কোনও কথাই উঠে নাই [illegible] [illegible] [illegible] সে কাল;

দর্শনের। মহাভারতের সর্ব্বজন পরিচিত শ্লোকে এই কথাটা অতি পরিষ্কাররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে,—

বেদাঃ বিভিন্নাঃ, স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসৌ মুনির্যস্ত মতং ন ভিন্নং
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ

ভিন্ন ভিন্ন বেদে নানা কথা কহে; ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতিতেও নানা বিধান দেয়। যে মুনির মত অন্য মুনির মত হইতে ভিন্ন নহে তিনি মুনিই নহেন। এ অবস্থায় কার কথা শুনি, কার পথে চলি? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে ধর্ম্মের তত্ত্ব প্রত্যেক মনুষ্যের অন্তরেতে নিগূঢ়ভাবে নিহিত রহিয়াছে। অর্থাৎ প্রত্যেক সাধককে তাঁর নিজের অন্তর্বৃত্তির মধ্যে এই তত্ত্বের অন্বেষণ করিতে হইবে। কোন পথে যাইয়া কোন সাধন অবলম্বনে এই তত্ত্ববস্তুর অন্বেষণ করিব এবং এই তত্ত্ববস্তুর সাক্ষাৎকারে মুক্তিলাভ করিব ইহার উত্তর—সেই সত্য পথ যে পথে মহাজনেরা গিয়াছেন। মহাজন তাঁহারাই যাঁহারা তত্ত্বের সাধন করিয়া তাহার সাক্ষাৎকারলাভে মুক্তি বা মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাই আমাদের দেশে শাস্ত্র প্রামাণ্যের মূল সূত্র হইয়া আছে। কিন্তু আমরা যখন ইংরাজী শিখিয়া ইউরোপীয় যুক্তিবাদের প্রভাবে একান্তভাবে শাস্ত্রগুরু বর্জ্জন করিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে গিয়াছিলাম, তখন এসকল খবর কিছুই জানিতাম না। জানিলে শাস্ত্র ও স্বানুভূতির মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করিয়া শাস্ত্রমর্য্যাদা এবং আত্মমর্য্যাদা উভয়ই রক্ষা করিতে পারিতাম।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

মিলন ও বিরহ।

মিলনে বিয়োগ ভয়
অহরহ প্রাণে জাগে;
বিরহে রঞ্জিত হিয়া
মিলনের আশারাগে।

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার বসু।

বিরহী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমি [illegible] পুনর্ব্বার চুম্বন করিয়া বলিলাম—না গো না,—তোমায় বিয়ে করা [illegible] কথা নয়। তুমি যে সত্যিকারের কমলার দান। তোমায় পেয়ে বরং আমি [illegible]

কমলা বলিল, "না গো না, ওরকম কথা বল না। [illegible] কর, তে[illegible] কষ্ট হচ্ছে তা কি বুঝতে পারি না।

"[illegible] বলেছি কমলা—আমার [illegible] ওয়ার কথা [illegible] ভাল। আমার [illegible] ওনলে বড় [illegible]

[illegible] সেখানে ত [illegible] না [illegible] আসিতে হইবে। বাবা [illegible] পারে—কিন্তু আমি [illegible] লেখে। কেন না হয় ত [illegible] সন্দেহ হইতে পারে।"

কমলা [illegible] তবে তুমি যখন বাড়ী যাবে সে সময় জানিয়ে যেও।

[illegible]

বিদায়ের [illegible] কথাটী এখনো মনে পড়ে। কমলা এই কয়দিনে [illegible] আমায় বিদায় দিতে তার চোখে জল আসিয়াছিল, তেমনি বিদায়ের কথা ভাবিয়া মনমরা [illegible] আমি—তুমি ওরকম চোখের জল ফেলো না। আমি [illegible]

কমলা [illegible] হাসিয়া বলিল,—কই আমি ত চোখের জল [illegible]

মুখে বলিল বটে কিন্তু চোখের জল মোটেই বাধা মানিল না। আমি বলিলাম তবে চল্লুম কমলা,—দেখো আমায় যেন ভুলো না।"

সে বলিল—"ওকি কথা তোমায় চল্লুম বল্‌তে নেই। আমি কি তোমায় ভুল্‌তে পারি? আবার কবে আস্‌বে বল। আর রোজ আমায় চিঠি দেবে। বাড়ীতে যখন যাবে অমন আমি চিঠি লিখ্‌ব না, তবে তুমি আমায় চিঠি লিখ্‌বে।"

আচ্ছা তা লিখ্‌ব। তবে রোজ তোমায় চিঠি দিতে পারব না দুই তিনদিন অন্তর অন্তর দেব।"

আবার কবে আস্‌বে।"

"কবে তা ঠিক করে বল্‌তে পারি না তবে খুব শীগিগির আসব।"

বাড়ী থেকে অনেকবার গিয়াছি, প্রথম প্রথম কষ্ট হইত বটে, কিন্তু পরে আর-কষ্ট হইত না। কিন্তু বিদেশে থাকা যে এতখানি কষ্টকর তা সেইদিন মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিলাম। আমি আগে বিবাহ করিবার পক্ষপাতী ছিলাম না. সেদিন কতকটা উত্তেজনায় বিবাহ করিয়াছিলাম, কিন্তু তারপর বুঝিলাম নারীর প্রেম সংসার তুচ্ছ বস্তু নয়। আমার প্রাণ ভরিয়া কি অপূর্ব্ব আনন্দ আনিয়া দিল। তারপর আর কখনো অবিবাহিত জীবনের প্রশংসা করিতে পারি নাই।

কলিকাতায় আসিয়া প্রথম ভাবনা হইল, তাহাদের সংসার চলিবার মতন খরচ পাঠান। বিবাহ করিয়া যদি বাড়ী লইয়া যাইতে পারিতাম তবে খুবই সুখে রাখিতে পারিতাম এ কথা ঠিক, কিন্তু তা যখন হইল না তখন সেখানে চলার মতন খরচ পাঠান দরকার। বিবাহ যখন করিয়াছি, তখন খুব সুখে না রাখি কষ্ট দেওয়া ত চলে না। তাই মাকে কোন কারণ দেখাইয়া টাকার জন্য লিখিলাম। আমি মায়ের একমাত্র ছেলে—কাজেই যখন যা চাহিয়াছি—কখনও বিমুখ হন নাই। তারপরে প্রত্যেক মাসে পাঁচশ টাকা অতিরিক্ত পাইতাম—সেই টাকা আমি কমলাকে মাসে মাসে পাঠাইতাম। তা ছাড়া আমি যে খরচ পাইতাম তারও কিছু কিছু জমাইতে চেষ্টা করিতাম। আগে প্রায়ই থিয়েটারে যাইতাম, তখন থেকে থিয়েটারে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলাম। এই টাকা থেকে যাইবার সময় কমলার জন্য কিছু কিছু জিনিষ লইয়া যাইতাম।

সেবার কলিকাতায় আসিয়া মন টিকিল না। সর্ব্বদাই কমলার মুখখানি মনে পড়িত। বই খুলিয়া পড়িতে বসিতাম—কিন্তু পড়া কিছুই হইত না। মন তখন বইয়ের হরফ ছাড়িয়া [illegible] সেই [illegible] কোণে

চলিয়া যাইত—যেখানে আমার কালার কমলারূপ বিরহ করিত। মনে হইত না জানি সে এতক্ষণ কি করিতেছে ও কি কেমন আছে ইত্যাদি কত কথাই মনে হইত। সেও কি আমার কথা মনে করে? এমনি করিয়া একদিন দুইদিন করিয়া পনের দিন কাটিয়া গেল, পড়াশুনা কিছুই হইল না। বইয়ের হরপ্ গুলার, আর মনের মাঝখানে কমলা এক বিরাট বাধা সৃজন করিল। অবশেষে একদিন সত্যই থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল।

সেদিন বিকাল হঠাৎ বাহির হইয়া পড়িলাম। কমলাকে কোন খবর দিই নাই। এমনি বিকাল বেলা আমার বাড়ীর কাছের ঘাটটীতে মাঝি আমায় নামাইয়া দিল। তখন পল্লীনারীগণ কেহ ঘাটে কাপড় কাচিতেছিল, কেহ বা জল লইয়া ঘরে ফিরিতেছিল। ঘাট ছাড়িয়া উপরে উঠিয়া দেখি, আমার প্রিয়াও কলসী কাঁখে জল লইয়া ঘরে ফিরিতেছে—সঙ্গে আর দুইটী নারী। কমলা আমায় দেখিয়া তাড়াতাড়ি মাথার ঘোমটা টানিয়া দিয়া রাস্তার পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। আমি যাইতে যাইতে শুনিলাম—একজন চাপা গলায় বলিতেছে—যাক্ আজ কমলার শরীর ভাল।"

আমি আসিয়া বাড়ী ঢুকিলাম খানিক পরে কমলা আসিয়া ঘরে ঢুকিল। জলের ঘটী নামাইয়া রাখিয়া-আমার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন আছ?"

—ভালই আছি।"

আসবার কথা এবার লেখনি কেন?"

কেন খবর-না দিয়া আসা কি কোন দোষের?"

"না অন্যায় আবার কি? তোমার ঘরে তুমি আসবে তাতে কি কোন দোষ হতে পারে। তা খবর দেওয়া হয় মনে করা যায় না জানিয়ে আসো।"

—আমি অপরাধ করেছি কমলা, তোমায় ভুলিবার ক্ষমতা আমার নেই। তুমি যেরকম ভাবে আমায় টানছ—কেমন করে পালাই। তুমতে পার? তাইত থাকতে না পেরে চলে এলুম।" তার জন্য গোটাকতক জিনিষ লইয়া গিয়াছিলাম—সেগুলি দিয়া বলিলাম—তোমার পছন্দ হয় ত?"

কমলা বলিল—"আমার আবার পছন্দ অপছন্দ কি? তুমি যা এনে দেবে তাই আমার যথেষ্ট। তোমার কাছে কখনো আমার কিছে কোন জিনিষ চায় নাই। আমি কতবার বলেছি—সেই এক ভাব চাইবার দরকার কি? তোমার যখন হবে দিবে।"

সেদিন আমি বলিলাম—"একটি ঝি রাখ না কেন? অত দূর থেকে জল আনা বাসন মাজা ইত্যাদি কাজ করতে কষ্ট হয়ত তোমার!"

কমলা বলিল—"তা আমার কিছু কষ্ট হয় না। আমার সংসারে কি এমন কাজ আছে যে এই সামান্য কাজ করতে পারব না। অনেক সময়, কাজের অভাবে সময় কাটতে চায় না। তুমি এলে বরং সময় কাটে।"

আমি তার গাল টিপিয়া দিয়া বলিলাম—"বড্ড কথা শিখেছ যে? যখন বিয়ে হয় নি তখন কি সময় কাটতো না নাকি?

"যাও—তুমি ভারি—

আমি তার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলাম—আমি কি? বলতে হবে তোমায়?"

"জানি না।"

এমনি করিয়া আরো কিছুদিন কাটাইয়া দিলাম। দিন কতক গিয়া কলিকাতা থাকিতাম, আবার দিন কতক ওখানে যাইতাম। প্রেমে মানুষকে কতখানি স্বার্থপর করিয়া ফেলে তা বেশ বুঝিয়াছি। মা বাড়ী যাইবার জন্য কতবার চিঠি লিখিতেছেন; কিন্তু একবারও যাওয়া হয় নাই। নানা অজুহাত দেখাইয়া যাওয়া বন্ধ রাখিয়াছিলাম। কিন্তু ক্রমে গ্রীষ্মের ছুটী আসিল—এবার না গিয়া কেমন করিয়া থাকি? স্থির করিলাম—দিন কতক বাড়ী যাইতেই হইবে, তারপর যা হয় করা যাইবে।

একদিন কমলাকে বলিলাম—'আমি গরমের ছুটীটা বাড়ীতে থাকব স্থির করেছি।'

সে জিজ্ঞাসা করিল—"কতদিন?

আমি বলিলাম—আড়াই মাস।"

এই হ্রস্বটী যেন কিসের মলিনতা আনিয়া দিল।' দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"বেশ।"

আমি তা লক্ষ্য করিয়া বলিলাম—"বেশ তোমার কষ্ট হবে না কি?"

—হলেও ত উপায় নেই। সে ভাগ্য ত করি নি যে তোমার বাড়ী গিয়ে থাকতে পারব?"

আমি তাকে লইয়া যাইতে পারি নাই বলিয়া তার যে [illegible] তা এতদিন অনুভব করিতে পারি নাই। [illegible] মনে ঠিক করিলাম—এবার তার কাছে সুবিধা মত কথা পাড়িব।

কমলা পুনরায় বলিল—"এটা তুমি কতদিনই বাড়ী থাকবে?"

আমি বলিলাম—"তোমার কি খুব কষ্ট হবে তাতে?"

সে বলিল—তা হবে যে কি? যদি একটীবার আসতে তবু দেখতুম।"

আমি হাসিয়া বলিলাম—যদি আড়াই মাসই থাকি!"

—"তা হলে ত ভালই হয়।"

—"তুমি বিরক্ত হবে না?"

—"বেশ যা হোক, তুমি এখানে বেশী দিন থাকলে বিরক্ত হব কেন?"

—বেশ তাই হবে। তবে ছুটির প্রথম দিন কতক বাড়ী যাব, তারপর এখানে আসব।"

—সে বলিল—"সে ত ভাল কথা। সেখানে মা বাপ রয়েছেন যাবে বৈকি।"

অনেকদিনের পর গ্রীষ্মের ছুটীতে বাড়ী গেলাম। মা বিবাহ করিবার কত অনুরোধ করিলেন—কিন্তু কিছুতেই রাজী হইলাম না। মা ত জানেন না আমি তার আগেই বিবাহ করিয়াছি, তিনি জানেন আমি ত তখনো অবিবাহিত। মার ধারণা হইল—আমি বোধ হয় চিরকুমার থাকিব।

এই সময় আমার মনে হইল মাকে আমার বিবাহের কথা বলিয়া ফেলি। মা বধূ বলিয়া কমলাকে গ্রহণ করেন। কিন্তু বলি বলি করিয়াও বলা হইল। একটা লজ্জা ও ভয় বাধা দিল। ভাবিলাম এবার যাক, এরপর বলিলেই হইবে।"

একমাস বাড়ীতে থাকিয়া পড়াশুনার অজুহাত দেখাইয়া চলিয়া আসিলাম। মার বাধা দিবার ইচ্ছা ছিলনা, পড়াশুনার ক্ষতি হইবে ভাবিয়া কিছু বলিলেন না। আমি চলিয়া আসিলাম। কিন্তু কোথায় আসিলাম-তা বোধ হয় বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না।

আমি দেড়মাস থাকিব শুনিয়া কমলা অত্যন্ত আনন্দিতা হইল। বিবাহের পর এতদিন দুজনে একসঙ্গে এতদিন থাকি নাই। কি সুখেরই দিন গিয়াছে। আমি এখনো সে সব কথা ভুলিতে পারি নাই। আমায় সদা সন্তুষ্ট রাখিতে কমলার কত না চেষ্টা। আমি কত অনুযোগ করিতাম সে কোন কথাই শুনিত না।

আমার পড়াশুনা কি [illegible]-ত এখন বলিতে লজ্জা করে। দিন রাত্রি প্রণয় চর্চ্চায় মত্ত [illegible] পড়া হইবে। হয়ত একদিন রাত্রে অনেক চেষ্টার পর [illegible] করিয়াছি কমলা আসিয়া চোখ টিপিয়া ধরিল। হাসিয়া বলিল, বলত আমি কে?"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"শালি—

"যাও তুমি ভারি—

আমি বলিলাম—"তুমি চোরের মতন ঢুকলে কেন? চোরের সাজা পেতে হবে।"

আমি তখন তাকে আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিয়া কত গল্পই করিলাম; কে তার সংখ্যা রাখে। এমনি করিয়া দুটি কাটাইলাম। কমলার মুখে মধু মিশিতে লাগিলাম—ততই ... নারীর প্রেম—কত মধুর, তাহে কি পরমানন্দ আনিয়া দেয়। স্বর্গবাসের কি সুখ জানি ... কিন্তু কমলার সঙ্গে থাকিয়া সে কথাটির স্বর্গবাসের মতনই ... বলিতে পারি।

ভালবাসার বিচ্ছেদ, সে অভাবধিক যন্ত্রণাময়। সে যন্ত্রণা দিতে গেলে বুক ফাটিয়া যায়। কমলাকে যত বেশী ভালবাসিতাম, তত ... বিচ্ছেদে কষ্ট পাইতাম।

এমনি করিয়া ... দুদিন কাটাইয়া দিলাম। তখন এম-এ পরীক্ষা দিয়ে বি-এল পড়িতেছি, যাঁ এই সময়ের মধ্যে আমার বিবাহ করিবার জন্য বহু অনুরোধ করিয়াছিলেন, শেষে বিরক্ত হইয়া আমার বিবাহ আশা একরূপ ত্যাগই করিয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই দুঃখ করিয়া বলিতেন আমার একমাত্র ছেলে, সে বিবাহ করিল না; আমি শুনিয়াও কিছু বলিলাম না। ... কি ... তা জানিতাম। সেই ভাবিয়া আর কোন ... করিতাম না।"

... কলার চুটীতে—প্রথমেই বাড়ী গিয়াছিলাম। পূজার কাপড় চোপড় সমস্ত পার্শেল করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। চুটীর দিন কয়েক বাকী থাকিতে ... ফেরিয়া ...

কি ... তাহা বলিতে ... লজ্জা বোধ। তার সোণার বরণ যেন ... হইয়াছে ... আর নাই। বলিলাম কমলা অসুখ ... করে নি বেন?

সে হাসিয়া বলিল—"তুমি ... চিঠি দিতে ... বলে, সেই ... বাড়ীতে চিঠি দেব?"

সে হাসিয়া বলিল—"কষ্ট আর কি? ম্যালেরিয়া ... দিন কতক পরে ... সেরে যাবে।"

আমি তার কথা শুনিলাম না—ভাল ডাক্তার আনাইলাম ...

ডাক্তারের মত শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। রোগ অত্যন্ত কঠিন, ভাল হওয়ার আশা খুব কম।"

কলিকাতা লইয়া গিয়া চিকিৎসা করিতে চাহিলে, তিনি বলিলেন—এঅবস্থায় স্থানান্তর করা উচিত নয়। হয় ত তাতে বিপদ হইতে পারে।

কি-করিব উপায় নাই, তাবে সেই ডাক্তারের চিকিৎসাধীনেই রাখিলাম। কমলাকে বলিলাম—"তোমার এই মনে ছিল। নিজকে এমনি করে ধ্বংস করলে?"

কমলা হাসিয়া বলিল—"তোমার কোন ভাবনা নেই।—তুমি এসেছে—এইবার আমি সেরে উঠ্‌ব।"

হায়রে আশা! যে প্রদীপ নিভিবার পথে অগ্রসর হইয়াছে—তাতে আর তৈল সংযোগ করিলে কি কোন লাভ হয়?

আমি ভাবিলাম কমলা এমন করিয়া আপনাকে ধ্বংস করিল কেন? আমি ত কখন তাকে আঘাত করি নাই, কখন তাকে মন্দ কথা বলি নাই, তবে সে কেন এমন করিল? আমি অনেক ভাবিলাম, কিন্তু কূল কিনারা করিতে পারি নাই।

ডাক্তার আসিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার কোন চিকিৎসা দিতে পারিল না। তবে একবারে নিরাশ করিল না।

আমি [illegible] হাসিয়া কথা [illegible]। তবে সে যে জেনে করিয়া [illegible] পারিতাম।

[illegible] ছাড়িয়া বাহিরে গিয়াছে, [illegible] তার বালিশটী তুলিয়া দেখিলাম [illegible] চিঠি। [illegible] লেখা [illegible] আমার কি কোতূহল [illegible] খোলা যায়। [illegible] সে লেখা তেমন নয়।

[illegible] না [illegible]

তুমি লিখেচ আমার এতদিন অসুখ হল, কিন্তু একথা স্বামীকে জানাই নি কেন? ঠিক কথা কিন্তু আমি ইচ্ছে করেই জানাই নি। তার কারণ তোমায় খুলে বল্‌ছি।

তুমি বোধ হয় জান, স্বামী আমায় কি অবস্থায় বিয়ে করেছিলেন। সেই জন্য এখন তাঁর অবস্থা কি রকম হয়েচে জান! মা বাবার কাছে এক রকম মিথ্যাবাদী হয়েছেন। তুমি হয়ত বল্‌তে পার, তিনি মা বাপকে জানাননি কেন, সব শুন্‌লে হয়ত তাঁরা আমায় গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তাঁর জন্য চেষ্টা করতে ত্রুটী করেন নি। কেন না এ কথা তাঁর মুখেই শুনেছি। তিনিও আমার কাছে কোন কথা গোপন করেন না! এতে তিনি মনে কত ব্যথা পাবেন তা আমি বুঝতে পারি। কেন না পরস্পরের কথা আমি বেশ বুঝতে পারি।

আমি এখন বুঝতে পারচি, আমি বেঁচে থাক্‌তে তিনি সুখী হতে পারবেন না। কেন না আমার জন্য কতদিন তিনি মা বাপের কাছে ছেলে ছাড়া থাক্‌বেন! সমস্ত কথা তাঁদের কাছে লুকিয়ে রাখবেন? তা ছাড়া তিনি আমার জন্য নিজের ছেলেকে এমন করে হারাতে বসেছেন। তাঁরা ছেলের বিয়ে দিয়ে বউ নিয়ে সুখী হন, কিন্তু তিনি তা হতে পারেন কখন রাজী হ'তে পারেন? জানত তুমি, তিনি আমার কত ভালবাসেন তাই আমি [illegible] তিনি আবার মা বাপের কাছে ফিরে গিয়ে সংসার করুন। আমি পথের কাঁটা হব না।

তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না কিন্তু আমি সত্য বলছি মরণে আমার [illegible] এই ভেবে যে তাঁকে মুক্ত করতে পারব। [illegible] আমার কোন দুঃখ নেই। স্বামীর এমন ভালবাসা পেয়েছি যাতে আমার [illegible] এ বিশ্বাস আছে যে, কিছুদিনের জন্য বিচ্ছেদ বিচ্ছেদ থাকবে না। জন্মে জন্মে তিনি আমার স্বামী! নিশ্চয় আমি এমন কোন পাপ করেছিলুম যার জন্য এ জন্মে আমায় [illegible] কাটাতে হল।

জানিনা তুমি আমায় ভাল বল্‌বে কি মন্দ বল্‌বে। কিন্তু আমি ত মনে মনে এই ভেবেছি এবং আমার অন্তর্যামীও [illegible] সায় দিয়াছেন।

তোমায় আজ অতি কষ্টে চিঠি লিখচি। তোমায় আর বোধ হয় চিঠি লিখতে পারব না—এই আমার শেষ চিঠি। কেননা আমি বুঝতে পারচি, ভগবান আমার কথা শুনেছেন। আমার দিন শেষ হয়ে আসছে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, যেন আমার মনোবাসনা পূর্ণ হয়। যদি মরণের আগে জ্ঞান থাকে ও কথা কইবার শক্তি থাকে তবে শেষ সময়ে তাকে বিয়ে করবার অনুরোধ করে যাব। আমার চরিম অনুরোধ তিনি কখনই ঠেলতে পারবেন না।

আজ তবে আসি, তোমায় সঙ্গে জীবনে অনেক ঘনিষ্ঠ ব্যবহার করেছি—আমায় ক্ষমা করো, তোমরা কেমন আছ খবর দিও।

তোমার—কমলা।

চিঠিখানা পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া যায়। তখনি চিঠিখানা লুকাইয়া ফেলিলাম। এ চিঠিখানা অমূল্য জিনিস। আমি আজ তাঁর অন্তরের কথা বুঝিলাম। হায়রে যদি কিছুদিন আগে জানিতে পারিতাম।

খানিক পরে কমলা জিজ্ঞাসা করিল—"এখানে একখানা চিঠি লিখে রেখেছিলুম, কি হল জান?

আমি বলিলাম—"না জানি না।" জীবনে তার কাছে এই প্রথম মিথ্যা কথা বলিলাম।

কিন্তু কমলার চিঠিখানাই যে আমার মনে যথেষ্ট বেদনা দিতে লাগিল। মনে হইল, বোধহয় মার কাছে এতদিন প্রকাশ করিলে ভাল হইত। এমন গুণের বধূকে তিনি কখনই ত্যাগ করিতেন না। তাহা হইলে কমলা আপনাকে এমন করিয়া ধ্বংস করিত না। একদিন তাহাকে বলিলাম—"কমলা তুমি ভাল হলে মার কাছে নিয়ে যাব।

সে বলিল—"অনুমতি দেব, নিও।"

একবার মনে হইল বলিয়া ফেলি অনুমতি পাইয়াছি। কিন্তু এতদিন ত বলি নাই এখন বলিলে বিশ্বাস করিবে না। তাই বলিলাম—এবার গিয়ে তাকে বলব। আমার বোধ হয় মা তোমায় না নিয়ে থাকতে পারবেন না।

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"বেশ।" তার এ দীর্ঘশ্বাসের কারণ কি তাও বুঝিলাম। কিন্তু কি করি!

যতই দিন যাইতে লাগিল—ততই কমলার অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল। সহর থেকে বড় ডাক্তার আনিলাম—কিন্তু কোন ফলই হইল না। যতই দিন

নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই সে আমায় বেশী কাছে পাইতে চাহিত। যদি ক্ষণিক বাহিরে যাইতাম, তাহা হইলে, তার অশান্তির সীমা থাকিত না। মৃত্যুশয্যায় পড়িয়াও তার চোখ দুটী সদা আমার পানে থাকিত। আমার সুবিধার অসুবিধার খোঁজ করিত।

মৃত্যুর পূর্ব্বে তার কথা কহিবার শক্তি ছিল না। কিন্তু সে সময় যে কি তার জীবন ছিল—কেননা আমার সঙ্গে কথা কহিবার জন্য তার কতখানি চেষ্টা ছিল তা বুঝিয়াছি।

সে যখন সত্যই আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল—তখন আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। কতক্ষণ পরে জানি না,—মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। শাশুড়ী আমায় হাওয়া করিতেছিলেন। আমার জ্ঞান হইলে বলিল,—বাবা তুমি শুদ্ধ যদি এ রকম অভিভূত হও, তা হলে কি করে চলবে। যা গেছে তা'ত আর ফিরে পাবার নয়?

সত্যই ত! যা গিয়াছে সে আর ফিরিবে না! যে খানিক আগে আমারই ছিল, আমারই ভাবনায় বিভোর হইয়া থাকিত, আমার কথা উৎকর্ণ হইয়া শুনিত, সে'ত আর নাই! আর'ত তার বাক্যে আমার কর্ণে সুধা বরিষণ করিবে না! আর'ত তার সেই মুখখানি দেখিতে পাইব না? প্রাণে শত কথাই আসিল যে আর কাকে জানাইব; মনে হইল এ মূর্চ্ছা না ভাঙ্গিলেই ভাল হইত! তার সঙ্গে সঙ্গে আমিও চলিয়া যাইতাম।

তার পর আর কি? সেই দেহ অহস্তে চিতায় তুলিয়া দিলাম। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে, দেহের শান্তি, মনের শান্তি, উৎসাহ, উদ্যম, আশা, আকাঙ্ক্ষা, সবই গিয়াছে। কমলা তার সঙ্গে সঙ্গে সবশুদ্ধই লইয়া গিয়াছে।

সেই যে [illegible] করিয়াছি, আর কখনো সে গ্রামে ঢুকি নাই। [illegible] আমায় [illegible] করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, তা করি নাই। অবশেষে তাঁরা [illegible] তোমরাও জান আমি অবিবাহিত, কিন্তু [illegible] কারণ কেহ জানে না।

P 36134

[illegible] বিবাহ [illegible] করিয়া লইয়া গিয়াছে। মৃত প্রাণে বিবাহ করিয়া—কিসের সুখী হইব না—আর [illegible] কষ্ট দিব। পাছে [illegible] করিতে [illegible] ওকালতী করিবার মনের অবস্থা [illegible] করিয়াছিলাম যে, ওকালতী [illegible] সময় করিতে [illegible] ।

মা বাবা আমার এই পরিবর্ত্তনে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছেন। আমার কোন গুরুতর অসুখ হইয়াছে ভাবিয়া চিকিৎসা করান। কিন্তু রোগ ত দেহে নয় মনে, সুতরাং সে রোগ কেমন করিয়া সারিবে!

আমার আর বাঁচিতে ইচ্ছা নাই। কিন্তু মৃত্যু ত আর মানুষের হাত নয়। তাই বেলা বসিয়া দিন গনিতেছি—কবে তার কাছে যাইব।"

তারপর সে সুরেনের দিকে চাহিয়া বলিল—"ভাই আবার গান গাও।"

সে তখন গাহিতে আরম্ভ করি—

"পাখি—তরী হেথা বাঁধবে নাক আজকে সাঁঝে।"

শ্রীরমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সৃষ্টি ও প্রেম।

স্বরটি থামিলে মূর্চ্ছনা তার ভুবনে নিত্যরাজে।
যূথিকা শুকালে গন্ধ তাহার বক্ষ সদা মাঝে।
গোলাপ পড়িলে ঝরে—
গোপনে হাসিল কবে
প্রিয় প্রস্থনের পাপড়ির পরে বিপুল বেদনা ভরে।
তুমি চলে যাবে বলে,
প্রেম তোর শুয়ে রবে—
নিরাশার শুধু নিশ্বাস ফেলি তব স্মৃতিতল পরে।

শ্রীকুমার বসু।

ভারতে দেবোপাসনা ও রাখীবন্ধন।

মা আসিয়াছিলেন। মা দুর্গা আমাদের বৎসরান্তে সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া আসিলেন, সঙ্গে বলশক্তি কার্ত্তিক, জ্ঞানশক্তি গণেশ, ধনশক্তি লক্ষ্মী, হৃদয়শক্তি সরস্বতীও আসিলেন। আচ্ছা, অন্য শক্তির [illegible] ব্যষ্টিদেবতা [illegible] উৎপত্তি, ইহাতে তাহাই পরিষ্কার দিতেছে। এই শক্তিই মহাশক্তি, মহাশক্তি হইলে আমরা ব্যষ্টিভাবে ডাকিতে পারি আবার সমষ্টিভাবেও ডাকিতে পারি। [illegible] হইয়া সমষ্টিকে ডাকা অসাধ্য না হইলেও দুঃসাধ্য। [illegible] ব্যষ্টিগত গণেশাদির পৃথক পৃথক পূজারও বিধান আছে। এই ব্যষ্টিদেবতাদি সম্বন্ধেই কয়েকটী কথা বলিতে হইবে, তাই আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

যে ভাবেই হৌক শক্তি লাভের জন্য শক্তি পূজার তথা মহাশক্তির আরাধনা দরকার, কেননা—সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমের ভাষায় যার কথা বলিতে বলিতে হয় যে—

"তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম, তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম;
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি;
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে॥

আবার স্বর্গে ও অমর্ত্যে অসুরের সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। তাহাতে [illegible] মানব-দেবতারা পরাজিত নাহিত। তাই বলিতে হয়, আমার মহাশক্তি আবির্ভাব হউক।

অসতো মা সদ্গময়।
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মা হিমৃতংগময়।

ছাঁদ সেই মধ্য আলোকের মধ্যে Light from Light অর্থাৎ [illegible] বাষ্পীয় কণা। যেখানে ইহার উৎপত্তি সেখানেই তার নিবৃত্তি। [illegible] হইতে ইহার আগমন হইয়াছে, বুঝিয়া ফিরিয়া আবার তাহাকে সেই

প্রত্যাগমন করিতে হইবে। যেহেতু মানব "অমৃতস্য পুত্রাঃ"। গন্তব্য স্থান একই বটে, কিন্তু গন্তব্য পথ নহে। তাহার প্রধান পথ তিনটী; কিন্তু সকলের পক্ষে সকল পথ সুগম নহে। শক্তি, সংযম, সহিষ্ণুতাদি ভেদে এক এক জনের এক এক পথ অবলম্বনীয়। এই অধিকারিভেদ [illegible] বিষয়েই অনুভব হয়। সহজ হইতে কঠিনে, সুখ হইতে দুঃখে, প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তিতে (নিবৃত্তিমার্গে) যাইতে হয়। ইহাই সরল, স্বাভাবিক। ইহা ক্রমবিকাশের বা ক্রমোন্নতির পথ। পাশ্চাত্যেরা যাহাকে ক্রমবিকাশের পথ বলে, আমাদের শাস্ত্রে তাহাকে আত্মোন্নতির ১৭ বলে, আত্মোন্নতির শেষ কথা হচ্ছে মুক্তি। মুক্তিলাভে [illegible] সকলেই চাহে কিন্তু ইহা সহজলভ্য বা অনায়াসসাধ্য নহে, কিন্তু সাধনসাপেক্ষ। আচার্য্য-গণের মতে সংসারীলোক [illegible] বিভক্ত। [illegible] আবার ইহা [illegible] ক্রমোন্নতির [illegible] বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে [illegible] মধ্যমাধিকারী

[illegible] শ্রেণীতে বিভক্ত, [illegible] উত্তম [illegible] [illegible] উপরে কথিত [illegible] [illegible], জ্ঞান ও [illegible] আত্মোন্নতির প্রথম [illegible] [illegible] বিধি [illegible]

[illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] ত্যাগী। [illegible] [illegible] [illegible]

আসিয়াছি। সাধক বা উপাসকের সাধন-সামর্থ্যেই মহাশক্তি অসংখ্য নামে অসংখ্য ভাবে পরিচিত ও পরিকীর্ত্তিত। এইরূপে বহুদেবতার সৃষ্টি, তাঁহাদের দেববাদের ভিত্তি পত্তন, এই দেবোপাসনা মোটমুটি তিনভাগে বিভক্ত। যথা—দেবপূজা, যজ্ঞানুষ্ঠান ও ব্রতানুষ্ঠান। দেবতাদিগকেও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা—(১) বৈদিক (২) পৌরাণিক (৩) লৌকিক।

বৈদিক দেবতা—

ইন্দ্র, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, বরুণ, সূর্য্য, অনন্ত, আকাশ ইত্যাদি।

পৌরাণিক দেবতা—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কালী, দুর্গা, শিব, সরস্বতী প্রভৃতি।

লৌকিক দেবতা—

মনসা, মঙ্গলচণ্ডী, শীতলা, ওলা, বনদুর্গা ইত্যাদি।

এই দেববাদের মূলে রহিয়াছে কি? মূলের দিক দিয়া দেখিলে দেখা যায় যে ইহার মূলে রহিয়াছে শক্তির প্রভাব বোধ এবং তাহাতে একটা প্রবল বিশ্বাস। তাই দেখা যায় যে আর্য্য সভ্যতার প্রথম যুগে তাহারা যাহা শক্তিশালী বা মহান বলিয়া ভাবিতেন, তাহারই পূজা করিতেন। "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর"। নাগা প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতির পূজায় ইহার জাজ্বল্যমান পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাদের পূজার [illegible] নাচিয়া আনেন। কিন্তু যে শ্রদ্ধা ভক্তিটা আমাদের বিশিষ্ট সমাজ হইতে এক প্রকার লোপ পাইতেছে, যেমন ধর্ম্মাচরণে তেমন লৌকিকতায়। ইহা বোধ হয় বর্ত্তমান শিক্ষারই ফল। আগে শুনিতাম বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্" এখন শুনি "বিদ্যা দদাতি অবিনয়ম্" ইহার ফলেই বোধ করি বর্ত্তমান বেদান্তবাদ বা মধ্যপথের আবিষ্কার। যে সব দুর্দ্দান্ত বালক যেমন পুস্তক মুখস্থ রাখিবার সুবিধার জন্য পুস্তকের দু'দিক হইতে পাতা ছিঁড়িয়া পুস্তকটিকে ছোট করে, একদল সুবিধা ও সংক্ষিপ্তবাদী বৈদান্তিক ও বেদের আদি ভাগ (কর্ম্মকাণ্ড) ও শেষ ভাগ (ভক্তি) বাদ দিয়া যেন সহজ ও ছোট করিতেছেন, ইহাকেই বলিতে পারি বেদের মধ্য পথ। [illegible] 'রাজনৈতিক' ও 'সোহংসোঽহমিত্যেষ' মধ্যে যাহা কিছু সামাজিক [illegible] তাহা শুধু বৈদান্তিকদের 'মধ্যপথ' বলিয়া কেন না 'অবাক্ত বাদীর' [illegible] মজারেটদের মোক্ষ বিষয়ে, তাহা বলিতে হইবে মধ্যপথের [illegible]

নতুবা কার্য্য নিয়া বিরোধ নহে। উভয়েই 'অধিকার বাদটাকে বিসর্জ্জন দিয়া বেদান্ত বা উপনিষদের ব্রহ্মসাযিধ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ক্রম-অধিকার বা ক্রমবিকাশ মানেন না। তাঁহারা একবারেই মুক্তি পথের পথিক। "দিনে তারা দেখা "আর কাহাকে বলে জানি না। সব বিষয়েই সিদ্ধিলাভ করিতে শক্তির দরকার, শক্তিপূজার দরকার। ব্যষ্টিশক্তির আরাধনাকেই দেবারাধনা বলিতে পারি। কেননা 'দেবতা' 'শক্তি' উভয়েই স্ত্রীলিঙ্গ বোধক। জ্ঞানলাভও শক্তি সাপেক্ষ। তাই শাস্ত্রে জ্ঞানশক্তি বা জ্ঞানদেবতা গণেশের পূজার কথা বিহিত আছে। আবার ব্রহ্ম বা ভগবানজ্ঞান মন (বেদ মতে) এবং লক্ষিত ভাবেই হোক আর অলক্ষিত ভাবেই হোক সকলেরই গতি জ্ঞানসমুদ্র বা ব্রহ্ম-সমুদ্রের দিকে, তাই সকলদেবতার পূজার আগে ব্যষ্টি জ্ঞানদেবতা বা গণেশ-দেবতার পূজার ব্যবস্থার রহিয়াছে আবার গণেশদেবতাই কি না গণশক্তি। যে গণতন্ত্রের প্রচারের জন্য বিশ্বে চক্র ব্যগ্র, সেই গণদেবতাই গণশক্তির পরিচায়ক। এই রূপেই সমাজতন্ত্রের দিক দিয়া দেখা যায় যে, সংসাররূপ কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া কর্ম্ম করাই যেমন ধর্ম্ম বা Labour is life, তেমনি কর্ম্ম করিবার জন্য শক্তি অর্জ্জন ও আমাদের ধর্ম্ম, কেননা কর্ম্ম শক্তি সাপেক্ষ। নির্জ্জীব শক্তি হীনের কর্ম্মে অধিকার নাই। সুতরাং মনুষ্যত্ব লইয়া সমাজে টিকিয়া থাকিতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির বা অভিন্ন মহাশক্তির পূজার দরকার।

বিজ্ঞানের দিক দিয়া দেখিলেও দেবপূজার প্রয়োজন উপলব্ধি হয়, দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যাইতে পারে সূর্য্যোপাসনার কথা যিনি রস, রক্ত, বায়ু, উত্তাপাদির নিয়ামক, তিনি (সূর্য্য) ভিন্ন আরোগ্য বিধান করিবে কে? শাস্ত্রে বৃষ্টির জন্য আদিত্য যজ্ঞের কথা লিখিত আছে ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে অভীষ্ট প্রদায়ক দেববাদের কথা বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা কেবল বেদান্ত মানের, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক, তাঁহারাও কি প্রকারান্তরে গায়ত্রীর ধ্যান দ্বারা সাকার সূর্য্যের উপাসনা করেন না? এই পঞ্চভূতাত্মক সাকার দেহ মন লইয়া নিরাকারের উপাসনা কি সম্ভবপর? যাহা বলি কথার বলে "আমাদের ধর্ম্ম বেদের ধর্ম্ম" এর মানে কি? না প্রথম বয়সানে যাগযজ্ঞ ব্রত উপাসনাদি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি পরে ক্রমশঃ জ্ঞান মার্গে (প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তিতে, সকাম হতে নিষ্কামে) পৌঁছিবে। তখন, তত্ত্ব জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের উদয়। কিন্তু চিনিকে শুধু চিনলেই ত হল না! চিনির স্বাদ পাওয়া চাই। কাজেই ভগবানে স্বাদ কি, ভক্তি বা

প্রেম ইহাই বেদের ধর্ম্ম। আর কথায় ইহাও আছে যে "ভক্ত যখন স্মরণ করে দেবতার তখন আসন টলে"। আবার বেদের সার গীতায়ও আছে চারি প্রকার, আর্ত্ত, অর্থার্থ, জিজ্ঞাসু (সকামভক্ত) আর জ্ঞানী (নিষ্কামভক্ত) সুতরাং সকামভক্ত বা দেবভক্তও ত ঈশ্বরের ভক্ত বলিয়া গীতায় কীর্ত্তিত। মুক্তি বা জ্ঞান লাভই আমাদের চরম উদ্দেশ্য নহে। আমরা কর্ম্মী হইব, জ্ঞানী হইব, আমরা ভক্ত হইব। আর ভগবান গীতায় ত ইহাও বলিয়াছেন যে, আগে দেবতাদের সন্তোষ সাধন কর। সুতরাং দেববাদে আমাদের আস্থা হবে না কেন? হওয়াই যে বাঞ্ছনীয়। আর নারং আত্মা বলহীনেন লভ্য। সুতরাং হীনবল অনধিকারীর জন্যই দেবপূজার বিধান। আর গীতার বিভূতি বাদদ্বারা ও দেব যজ্ঞাদিরই ইঙ্গিত করিতেছে। বৈজ্ঞানিক হিসাবে মানব ও উদ্ভিদ যেমন পরস্পরকে জৈবনিক ক্রিয়ায় সাহায্য করিতেছে মানব ও দেবতার মধ্যেও এমনিতর সম্বন্ধ রহিয়াছে। তাহা হইলে ও দেবারাধনার দরকার। আর পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, দেবোপাসকও ঈশ্বরভক্ত মধ্যে পরিগণিত। কেননা দেবতা সন্তুষ্ট হইলে ভগবান ও সন্তুষ্ট থাকেন, ইহা গীতারই কথা। ভক্তিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—(১) পরা ও অপরাভক্তি। বৈষ্ণব শাস্ত্রে ইহার নাম দিয়াছেন বৈধী ও রাগানুগাভক্তি, এই রাগানুগা বা পরাভক্তি (ঈশ্বরভক্তি) পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি ফলেই হইয়া থাকে, যেমন ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নাচিকেতার এবং এই যুগের রামকৃষ্ণেরা এই ভক্তি বা প্রেম লাভের জন্যই বৈষ্ণব মতে বৈধী ভক্তির অর্থাৎ (১) সাধুসঙ্গ (২) নামকীর্ত্তন (৩) ভাগবৎ শ্রবন (৪) মথুরাবাস অর্থাৎ ভগবানকে সমীপস্থ জ্ঞান করা এবং শ্রীমূর্ত্তির পূজা এই ৫ টীর সাধনা করিতে হয়, আর বেদ বা গীতা মতে এই বৈধী বা অপরা ভক্তির অর্থাৎ যাগ যজ্ঞ (পঞ্চ যজ্ঞাদি) দেবকর্ম্ম সাধন করিতে করিতে সত্ত্বশুদ্ধি হলে পর মানব মন মুমুক্ষুগামী হয়ে ক্রমে পরাভক্তির উদয় হয়। সুতরাং দেবব্রতাদির অনুষ্ঠানই ধর্ম্মলাভের প্রথম সোপান বুঝিতে হইবে। গীতায়ই ভগবান বলেছেন ঃ—

হীন হলে তার দুইদিক যাবে।
দীনাদি কামনা লাভে বঞ্চিত হবে॥
নষ্কাম কর্ম্মেতে তার নাহি আছে স্থান।
আত্মজ্ঞান লাভ হেতু না পাবে নির্ব্বান॥

(গীতায় বঙ্গানুবাদ)।

রাজনীতিক জয়ই হউক, আর সমাজনীতিক জয়ই হউক, বাসনানুযায়ী তাহা অবশ্যই পূরণ হইবে। নতুবা পাশ্চাত্যভাবে বিভোর হ'য়ে যে যজ্ঞে, যে আন্দোলনেই যাই না কেন, তাহা পণ্ড হবে, নিষ্ফল হবে, আন্দোলন শুধু দোলনে পরিণত হবে, ধর্ম্মের ডাকে ভারতের প্রাণে শক্তি আসে। তাই বর্ত্তমান আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধির সত্যাগ্রহ মন্ত্রে এবং স্বদেশী আন্দোলনে ডাক্তার রবীন্দ্রনাথের রাখিবন্ধন ব্রতে দেশপ্রাণ যেমন উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, মহাত্মার পাশ্চাত্যের অনুসৃত অসহযোগ মন্ত্রে তেমন উদ্বুদ্ধ হয় নাই। কেন না শেষটায় যজ্ঞ হইয়া দাঁড়াইল শিবহীন। সুতরাং এ যজ্ঞে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে, সূক্ষ্মবুদ্ধি দার্শনিক বিপিনচন্দ্রের ভাষায় যাহাকে বলে "সত্যাগ্রহ" ধর্ম্ম সেই ধর্ম্মকেই ধ্রুব, প্রহ্লাদ বা যীশুর ন্যায় আঁকড়িয়ে ধরতে হবে, আর সে যজ্ঞ যাহাতে পণ্ড না হয় সে জন্য তিথি বার বা তারিখ বিশেষে রাখি বা রক্ষা কবচ ধরিতে হবে। কেন না সেখানে 'সত্যম্ শিবম্' আবার শিবমদ্বৈতং-অথচ মঙ্গল স্বরূপ; তখন সত্যকে নিতেই হবে আর শিব যখন অদ্বৈতম্, তখন ঐক্য বা একতার বীজ মন্ত্র 'রাখি' অর্থাৎ রক্ষা মন্ত্র দিয়া সকলকে এক করিতে হইবে। এই একতার জন্য প্রথম প্রাণ কেঁদেছিল বুদ্ধদেবের। তাই তিনিই প্রথম প্রকৃতপক্ষে অসহযোগ মন্ত্রের প্রচার করেন। একপক্ষে যেমন তিনি প্রকৃত শত্রু হিংসার সঙ্গে নন্‌কোপারেশন করিলেন অন্যপক্ষে সর্ব্বজীবে দয়া, একস্বরূপ আত্মারভেদভাব রহিত করিবার জন্য "সর্ব্বজীবে দয়া" এই সহযোগ বা সত্যাগ্রহ মন্ত্রের প্রচার করেন। তারপর হিন্দু মুসলমানের রাখিবন্ধন মিলনের জন্য সম্রাট হইয়াছিলেন বঙ্গের নবাব হোসেন শাহ। তিনি হিন্দু মুসলমানের মিলনের জন্য সত্যপীরের পূজা ও সিন্নী দিবার প্রথা প্রচলন করেন। তাঁহার এই ধর্ম্মের বন্ধন, হিন্দু মুসলমানের মিলনের ইতিহাসে অক্ষয় অটল থাকিবে। তারপর গুরু নানক, কবির প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ ও বিখ্যাতনামা আকবরও হিন্দু মুসলমানের মিলনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। ধর্ম্মোদার আকবর হিন্দুদের রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ পারস্য ভাষায় অনুবাদ করান। যে দিন মুসলমানেরা আকবরের ধর্ম্ম বিষয়ে উদার হবেন, সেদিনই হিন্দু মুসলমানের মিলন-বাদ প্রকৃতপক্ষে স্বার্থক হইবে। এ মিলনকে স্বার্থক করিয়া তুলিবার জন্য বঙ্গরবি রবীন্দ্রনাথের "অরন্ধন নারিকেল" প্রথার পুনঃ প্রচলনই প্রকৃষ্ট পন্থা। ইহা হিন্দুদিগের পুরাণ প্রসিদ্ধ ধর্ম্মানুষ্ঠান। হিন্দুস্থানীদের মধ্যে এখনো ইহা প্রচলিত আছে। ঝুলন পূর্ণিমার দিন ইহা অনুষ্ঠিত হয়। যশোদা

বা সুকৃতিমাতা শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলের জন্য হস্ত অর্থাৎ রাখী বন্ধন করিয়াছিলেন। রাখী পাঠাইয়া সাহায্য চাহিলে রক্ষা করিতে হয়, মাতৃপুত্রের মধ্যে এরূপ প্রচলিত আছে। তাই ইতিহাসে দেখা যায় যে, বাহাদুর সাহের (গুজরাটের অধিপতি) হস্ত হইতে চিতোর রক্ষার নিমিত্ত সংগ্রাম-সিংহের পত্নী রাণী কর্ণাবতী হুমায়ুনের নিকট রাখী পাঠাইয়াছিলেন। হিন্দুস্থানে বিজয়াদশমীতে কিংবা রাখী বন্ধন প্রথা প্রচলিত আছে। কার্য্যকারণে সেই টাকে আরো পাকা করিয়া তুলিতে হবে। রাখীবন্ধনই বিজয়দাস্য হবে, মা বিদ্যার নিকট সেই বরই প্রার্থনা করিতে হবে। আবার সেই ৩০শে আশ্বিন নিকটবর্ত্তী। সেই বিজয় মন্ত্র গ্রহণের দিন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পূজাপার্ব্বনই দেবব্রতাদিই দেবানুষ্ঠান আর এগুলিই আমাদের মঙ্গলের নিদান। কেননা ইহাদ্বারা যেমন ব্যক্তিগত ভাবে উন্নতি দেখা যায়, অন্তপক্ষে, সমষ্টিগত ভাবে সমাজ সেবাও (দুঃখী কাঙ্গালীদের ধনদানাদি দ্বারা) হইয়া থাকে।

উপসংহারে ও আমার বক্তব্য এই যে বেদের ধর্ম্মই আমাদের অনুকরণীয়। সেই বেদের ধর্ম্ম কি? না—এক কথায় বলিতে গেলে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় সাধন। কিন্তু এ সাধনার বড়ই অভাব দৃষ্ট হয়; যেমন ব্যষ্টিতে, তেমন সমষ্টি-জীবনে। সুতরাং চাই সে সাধনা। কবির ভাষায় সেই প্রার্থনা গাহিয়া বিদায় হই।

এস শিব-শক্তি,
কর্ম্ম, জ্ঞান ভক্তি।
এস ব্রহ্ম ব্রহ্মময়ী,
হৃদয়ে পুরিয়ে রাখি।
প্রাণে দাও পূর্ণভক্তি,
দেহে দাও পূর্ণশক্তি,
দাও ষোড়শোপচার,
যাহা প্রয়োজন॥
ওঁ তৎ সৎ।

শ্রীকিরণচন্দ্র পাণ্ডিত।

লুৎফুল।

সুন্দর শুভ্র নির্ম্মল কান্তি,
ফেটে পড়ে সুষমারাশি, চোখে লাগে ভ্রান্তি।
জ্যোস্নার অ লোমাখা অপরূপ বর্ণ
সারাদেহে ঢ'লা যেন টলমল স্বর্ণ।
বুলবুল পাপিয়ার কেড়েনেওয়া কণ্ঠে,
প্রাণকাড়া সঙ্গীতে সুধাধারা ওঠে।
চঞ্চল ভঙ্গীতে নেচে চলে ব্যথে,
মঞ্জীর নিক্কনে সুরবাজে আগে।
হাস্তের সফরে ধুন দোলে ওড়না,
বলয়ের ধুনধুনি কিছুতাব যোড়না।
কণ্ঠ বিনোদিয়া দোলে হেম কণ্ঠি,
গোলাপের নাভাফোটে যেন যে বনটী।
সরু কটী সাপটিয়া অচেতন যেন,
চঞ্চল অঞ্চল ঘরে খেলা একলা!
চন্দ্র বিনিন্দিত সুধামাখা আস্য,
উথালিয়া পড়িতেছে সদা তাহে হাস্য।
উন্মুখ যৌবনা আর ফোটো সৃষ্টি,
বিজড়িত লাবণ্যময় চঞ্চল দৃষ্টি।
সুন্দরী সঙ্গিনী কবিতার ভক্তি,
বাক্যের মধুধারা ও ভোগে অনুরক্তি।
যে যে মম যেয়েন লুৎফুল বোনটী,
তারি তরে উপহার কবিতার কণ্ঠি।

মোহম্মদ গোলাম জিলানী।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

(জীবনী প্রসঙ্গ)

(৫)

কলিকাতার আদি ছাত্রনিবাস।

তারকনাথ মেডিক্যাল কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া অধিক দিন ভবানীপুরের বাটীতে থাকিতে পারেন নাই। ভবানীপুর হইতে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে প্রত্যহ পদব্রজে যাতায়াত অতি কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আর ষাট বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় ট্রাম বা ঘোড়ার গাড়ীর এত প্রাচুর্য্য ছিল না। কিছুদিন যাতায়াতের পর কলিকাতার আদি ছাত্র-নিবাস হিন্দু হোষ্টেলে আসিয়া উপস্থিত হন। তারকনাথ শৈশব হইতেই স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়, তিনি দেখিলেন মাসিক বৃত্তির ১৫৲ টাকা হইতে কলিকাতায় অবস্থান করা কিছুমাত্র কষ্টকর [illegible] এবং যৎসামান্য অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিবে; সেই টাকা হইতে ইচ্ছামত খরচ করিতে পারিবেন। ইহা স্থির করিয়া তিনি কলিকাতার হোষ্টেলে আসিয়া উপস্থিত হন। কলিকাতা লালবাজারে প্রাচীন পুলিসকোর্ট যে বাটীতে ছিল, সেই বাটীতেই এই হোষ্টেল অবস্থিত ছিল। ইহাই কলিকাতার আদি ছাত্রনিবাস। এই ছাত্রনিবাসে মফস্বল বা কলিকাতার উপকণ্ঠনিবাসী আইনশিক্ষার্থী, চিকিৎসাবিদ্যাশিক্ষার্থী ছাত্রগণ থাকিত। আইন শিক্ষার্থী ছাত্রগণ অপেক্ষা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র সংখ্যাই অধিক বাস করিত। স্যর বাসবিহারী, আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার, হাস্যরসের অবতার ইন্দ্রনাথ প্রভৃতি আইনশিক্ষার্থী; বিহারীলাল-ভাদুড়ী, জগবন্ধু বসু, মহেন্দ্রলাল সরকার, ডাক্তার গোপালচন্দ্র গোস্বামী, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাচরণ কাব্যেগিরি, প্রিয়নাথ বসু, কেদারগোপাল চট্টোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা ভেলাপাজ, তারকনাথ প্রভৃতি মেডিক্যাল কলেজের ইংরাজী বিভাগের প্রসিদ্ধ ছাত্র ও খ্যাতনামা ডাক্তারগণ এই ছাত্র নিবাসে থাকিয়া মেডিক্যাল কলেজে পাঠ করিতেন। খ্যাতনামা পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও

এই হোষ্টেলে থাকিতেন। এই স্থানেই তাঁহার ভবিষ্যৎ মেডিক্যাল লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়।

পরীক্ষোত্তীর্ণ সংবাদ ও তারকনাথের পিতা।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তারকনাথ সম্মানের সহিত এল, এম, এস, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সাফল্যের পুরস্কারস্বরূপ অনেকগুলি স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অম্বিকাচরণ পিতৃব্যকে তারকনাথের পরীক্ষোত্তীর্ণ সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। এতদিন পরে তারকনাথের পিতার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। পুত্রকে ডাক্তারী পড়ান তাঁহার সার্থক হইল। তারকনাথকে সত্বর পাঠাইবার জন্য অম্বিকাচরণকে পত্র প্রেরণ করিয়া পিতা পুত্রের আশাপথ চাহিয়া রহিলেন। যথাসময়ে তারকনাথ বাটী প্রত্যাগমন করিলে প্রতিবেশীরা দলে দলে আসিয়া তারকনাথের পরীক্ষোত্তীর্ণ সংবাদে সাতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন। গ্রামবাসীরা গাঙ্গুলীদের মেজ কর্ত্তার ছেলে ডাক্তার হইল বলিয়া গ্রামগ্রামান্তরে তারকনাথের কথা আলোচনায় মুখরিত করিতে লাগিল।

এক দিবস তারকনাথের পিতা মহানন্দ তারকনাথকে বলিলেন, বাবা, ছেলেবেলায় তোমার ধূলার ঔষধ ও বড়ি প্রস্তুত করা কবিরাজী-ক্রীড়া দেখিতাম আর হাসিতাম, আমার বড় সাধ ছিল তোমাকে ডাক্তারি পড়াব। আমার সে সাধ পূর্ণ হইয়াছে। তোমার রোগীদিগকে সত্যকার ঔষধ দাও, এইবার তোমার সত্যকার ডাক্তার মূর্ত্তি দেখি। তোমার ছেলেবেলাকার কবিরাজী মূর্ত্তি মনে হলে আজও আমার হাসি পায়।"

পিতার কথা ও সাংসারিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া এম-বি পড়িবার ইচ্ছা সত্ত্বেও তারকনাথ তাহা স্থগিত রাখেন। পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি তারকনাথ কলেজের অন্যান্য অধ্যাপক বিশেষতঃ গার্জ্জন ফেরার, ডাঃ গুডিভ চক্রবর্ত্তী ও প্রিন্সিপাল নরম্যান চিভার্সের অতিশয় স্নেহপাত্র ছিলেন। স্বর্গীয় রায় প্রিয়নাথ বসু মহাশয় বলিয়াছিলেন, মেডিক্যাল কলেজের যে সমস্ত ছাত্র প্রশংসা ও সম্মানের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইত, তাহারাই হাঁসপাতালে চাকুরীলাভ করিত।" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর স্বগ্রাম বা দূরান্তর গ্রামে ডাক্তারের অভাব থাকাতে তারকনাথ নিজ গ্রামে ব্যবসা করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। পরে এ সঙ্কল্প ত্যাগ করেন। প্রিন্সিপাল পূর্ব্ব হইতে তারকনাথের জন্য হাঁসপাতালের একটী কর্ম্ম ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি

উপস্থিত না হওয়াতে অন্যকে দেন। তারকনাথ কলিকাতা আসিয়া প্রিন্সিপ্যাল ডাক্তার চিভার্সের সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রিন্সিপ্যাল অবশেষে তাঁহাকে অতিরিক্ত এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন রূপে (Supernumery Asst. Surgeon) গ্রহণ করিয়া হাঁসপাতালে কর্ম্ম দেন।

আনন্দবাদী সম্প্রদায় ও তারকনাথ।

বাঙ্গালায় যখন ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রবল তরঙ্গ প্রবাহিত হয়, ঐ তরঙ্গের মুখে অনেকে নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। কেশবচন্দ্র, শিশিরকুমার প্রভৃতি যুবকগণ এই ভাবেই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় ব্রাহ্ম সম্প্রদায় দুই দলে বিভক্ত—ভিন্ন গোঁড়া ব্রাহ্ম ও উদার ব্রাহ্ম;—শেষোক্ত ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের কর্ম্মীগণ আর একটী নূতন দল গঠন করেন, এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মগণ "আনন্দবাদী" দল নামে অভিহিত ছিলেন। স্বর্গীয় রায় বাহাদুর ডাক্তার প্রিয়নাথ বসু মহাশয় বলিয়াছেন, আমাদের কিশোর বয়সের সময় হইতেই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ও সমাজের আন্দোলন উপস্থিত হয়, এবং এই বয়স হইতেই আমরা ইহার অনুরাগী ও এই দলের মধ্যে যাতায়াত করিতাম। আমার মেডিক্যাল কলেজের বন্ধুদের মধ্যে স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত, স্বর্গীয় ডাক্তার বিহারীলাল ভাদুড়ী, তারকনাথ, বন্ধুবিহারী গুপ্ত (Major B. Gupta. I. M. S.) ও শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস বসু (Lt. Col. D. Bosu) প্রভৃতি ব্রাহ্ম ধর্ম্মে অনুরাগী ছিলেন—এবং আমরা সকলেই আনন্দবাদী সম্প্রদায়ের দলভুক্ত ছিলাম। শিশিরবাবু ও তাঁহার দুই ভ্রাতাই এই সম্প্রদায়ের প্রাণ বা আনন্দস্বরূপ ছিলেন। ঘোষ ভ্রাতৃযুগলের সহিত তারকনাথের পূর্ব্ব হইতে বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহারাই তারকনাথকে এই দলভুক্ত করিয়াছিলেন। কি কারণে তাহা স্মরণ নাই, আমাদের মধ্যে অনেকেই দল হইতে অপসৃত হন, আমরা যখন ক্রমে ক্রমে দল হইতে সরিয়া পড়িতেছি, তখনও তারকনাথ এ দলভুক্ত ছিলেন; পরে তিনি হাঁসপাতালের চাকুরী পাওয়ায় সময়ের অভাবেই হউক বা যে কারণেই হউক ঐ দল ত্যাগ করিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই আনন্দবাদী সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন, "কলিকাতাতে সকল দলের ব্রাহ্মগণই আমাকে বন্ধুভাবে ডাকিতেন। তখন উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলের মধ্যে 'আনন্দবাদী' দল নামে একটী দল হইয়াছিল। অমৃত বাজারের শিশিরকুমার ঘোষ ও

তাহার ভ্রাতৃগণ এইদলের নেতা বলিয়া গণ্য ছিলেন। ইহার একটু ইতিবৃত্ত আছে। ১৮৬৬ সালে কেশব বাবু "Jesus Christ Asia and Europe" নামে সুপ্রসিদ্ধ বক্তৃতা করেন। তাহাতে গবর্ণর জেনারেল লর্ড লরেন্স তাঁহার প্রতি প্রীত হন এবং তাঁহার সঙ্গে কেশব বাবুর বন্ধুতা সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তদবধি কেশব বাবুর দলের লোকদিগের যীশুখ্রীষ্টের প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক হইয়া পড়ে। বড় দিনের সময় যীশুর ধ্যানে দিনযাপন করা, বাইবেল পড়া, বাইবেলের ব্যাখ্যা করা, খ্রীষ্টীয় মিশনরীদিগের সহিত মিশা মিশি করা ইত্যাদি হইতে থাকে। একথা এখানে বলা আবশ্যক যে, বাইবেল পাঠ ও খ্রীষ্টীয় মিশনরীদিগের সহিত মিশামেশি কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই চলিতেছিল; এখন ভাবটা কিছু প্রবল হয়, ইহার ফলস্বরূপ খৃষ্টীয় ধর্ম্মভাব, অনুতাপ ও প্রার্থনা, তাহা উন্নতিশীলদলকে প্রবলরূপে অধিকার করে; পাপ বোধ নব্য ব্রাহ্মদের সকলের মস্তকে প্রবল হইয়া উঠে, অনুতাপব্যঞ্জক সংগীতাদি রচিত হইতে থাকে। ইহার উপরে বোধ হয় ১৮৬৭ সালে, গোঁসাইজী উদ্যোগী হইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠকে ডাকিয়া আনিয়া উন্নতিশীলদলকে বৈষ্ণব সংকীর্ত্তন শুনান। তদবধি সংকীর্ত্তন ব্রাহ্মদের মধ্যে প্রবেশ করে। এই সকল উপকরণের সমবেতরূপ ১৮৬৮ সালের পূজায় হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। এই প্রাপ্ত বোধ ও ব্যাকুলতার ভাব সহিত, ব্রাহ্মরা কেশব বাবুর চরণে [illegible] দিতেন। এক দিকে অনুতাপ, ব্যাকুলতা ও প্রার্থনার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, অন্য দিকে ব্রাহ্মদের মধ্যে একদল লোক বলিতে লাগিলেন, "এত অনুতাপ কেন? প্রেমময়ের মুখে এত ক্রন্দনের রোল কেন? আনন্দময়ের প্রেমমুখ দেখিয়া আনন্দিত হও।" এই দলকে ব্রাহ্মরা তখন "আনন্দবাদী দল" বলিতেন। শিশির বাবু ইঁহাদের অগ্রণী ছিলেন। নবপূজার হাঙ্গামা দেখিয়া ইঁহারা আমাদের ভিতর হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। ১৮৬৯ সালের মাঘোৎসবে একজন মুখের হইতে সমাগত ব্রাহ্ম, উপাসনান্তে কেশব বাবুর চরণে ধরিয়া কি প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন। তাহাতে শিশির বাবুর দাদা হেমন্ত বাবু বিরক্ত হইয়া উঠিয়া এইরূপ ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়া রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। * * * ইহার পর অমৃত বাজারের দফতরে, আর আমাদের উপাসনাতে বড় আসিতে দেখিতাম না।" এ সময়াভাবের জন্যই যে তারকনাথ ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করেন তাহা নহে, আমাদের মনে হয় যে কারণে

* স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত।

শিশিরবাবু প্রভৃতি এই দল ত্যাগ করেন, সেই কারণে তারকনাথও ঐ দল ত্যাগ করেন। এ নরপূজার জন্য তারকনাথ কেশববাবুকে অনেক সময় উপহাস করিতেন। বলা বাহুল্য এ উপহাস রহস্য করিয়াই হইত; তারকনাথ ও কেশবচন্দ্রের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেই প্রগাঢ় বন্ধুত্বের দোহাই দিয়া তিনি বন্ধু কেশবচন্দ্রকে বিদ্রূপ করিতেন।

সার্জ্জন ফেরার ও তারকনাথ।

মতানৈক্য, তর্কযুদ্ধ, তেজস্বিতা ও বলিষ্ঠ হৃদয়ের পরিচয়।

পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে, তারকনাথ স্কুলের ন্যায় মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপকগণেরও স্নেহপাত্র ছিলেন। তন্মধ্যে সার্জ্জন ফেরার, ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্ত্তী ও প্রিন্সিপ্যাল চিভার্স তাঁহাকে সমধিক স্নেহ-দৃষ্টিতে দেখিতেন। যে সার্জ্জন ফেরার তারকনাথের প্রতিভায় আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে তাঁহার সহকারী (class assistant) রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন; দুর্ভাগ্যক্রমে যে তারকনাথ সেই ডাক্তার ফেরারের কোপদৃষ্টিতে পতিত হন। যে ঘটনায় সার্জ্জন ফেরারের সহিত তারকনাথের মতানৈক্য হয়, সেই ঘটনাটী স্বর্গীয় ডাক্তার প্রিয়নাথ বসু মহাশয়ের নিকট ও তাঁহার আত্মীয়গণের নিকট যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাই নিম্নে লিখিত হইল। এই ঘটনায় তারকনাথের তেজস্বিতা, চিকিৎসা-শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তারকনাথ মেডিক্যাল কলেজের Resident House Surgeon ও Physician রূপে সার্জ্জন ফেরার ও প্রিন্সিপ্যাল চিভার্সের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। এই সার্জ্জন ফেরার সাহেব অতিশয় বদরাগী ছিলেন। তৎকালে কলিকাতায় তাঁহার নামে অনেক ছড়া রচিত হইয়াছিল। বাঙ্গালীদের মধ্যে তিনি "নাড়ী টেপা ফেরার" নামে পরিচিত ছিলেন। তারকনাথ চিরদিনই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় ও স্বাধীন প্রকৃতির লোক ছিলেন। কলেজের হাঁসপাতালে একটী মধুমেহ রুগী ভর্ত্তি হয়। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মতে বহুমূত্র রুগীর চিনি খাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই রুগী বহুদিন যাবৎ রোগযন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছিল। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে সে হাঁসপাতালে ভর্ত্তি হয়। ডাক্তার ফেরার রুগীকে পরীক্ষা করিয়া রুগীর কি খাইতে ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসা করিলে রুগী অত্যন্ত কাতরতার সহিত কিঞ্চিৎ চিনির প্রার্থনা করে। চিনির কথা শুনিয়া সার্জ্জন সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন ও রুগীকে চিনি পাইবে না বলিয়া চলিয়া যান। তারকনাথ এই

রক্ষাবাসের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। ডাক্তার সাহেব তারকনাথকে রুগীর পথ্য সম্বন্ধে পরামর্শ দিয়া চলিয়া যান। সাহেব চলিয়া গেলে রুগী চিনি খাইতে পাইবে না বলিয়া ক্রন্দন করিতে থাকে। কোমল হৃদয় তারকনাথ শীঘ্র রোগমুক্ত হইবে বলিয়া রুগীকে আশ্বাস দান করেন। রুগীর কাতর ক্রন্দনে তারকনাথের কোমল হৃদয় বিগলিত হয় তিনি তৎক্ষণাৎ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, বহুমূত্র রুগীকে চিনি খাইতে দিলে কি এমন ক্ষতি হয়।

এইরূপ চিন্তা করিয়া তারকনাথ জেনেজ লাইব্রেরী হইতে চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রধান প্রধান পণ্ডিতের গ্রন্থরাজী অনুসন্ধান করিতে থাকেন। ক্রমান্বয়ে দুইদিন এইরূপ অনুসন্ধানের পর একখানি পুস্তকে বহুমূত্র রুগীকে চিনি খাইতে দেওয়ার অনুকূলে মতামত দেখিয়া আনন্দিত হন। তৎপরদিবস ফেরার সাহেব আসিলে রুগী পুনরায় অন্যান্য আহার্য্যের সহিত কিঞ্চিৎ চিনি প্রার্থনা করিল, সাহেব পূর্ব্ব দিনের মত তাহাকে ধমকাইলেন। তারকনাথ ফেরার সাহেবকে বহুমূত্র রুগীকে চিনি খাইতে দেওয়ার অনুকূলে দু'একটী কথা বলেন, ইহাতে সার্জ্জন ফেরার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। ইহার ফলে বণিষ্ঠ হৃদয় তারকনাথের সহিত সার্জ্জন ফেরারের তর্ক-যুদ্ধ উপস্থিত হয়। তারকনাথ বহুমূত্র রুগীকে চিনি দেওয়ার অনুকূলে মত প্রাপ্ত হইয়া সার্জ্জন ফেরারের নিষেধ বাক্য গ্রাহ্য না করিয়া রুগী মুমূর্ষু, দু'এক দিনের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হইবে, কিঞ্চিৎ চিনি খাইয়া মরে, ইহাই তাহার প্রার্থনা। রুগীর মরণ যখন নিশ্চিত তখন মিষ্টান্ন মুখে ইহার জীবনের শেষ হউক। এইরূপ চিন্তা করিয়া পথ্যপত্রে (Diet card) চিনির ব্যবস্থা লিখিয়া দেন। পরদিবস সার্জ্জন ফেরার রুগীর পথ্য-পত্রে চিনির ব্যবস্থা দেখিয়া সার্জ্জন ফেরার তারকনাথকে অত্যন্ত তিরস্কার করেন ও ক্রুদ্ধ হন। তারকনাথ এই তিরস্কারে কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। তেজস্বী পুরুষের মত ধীর ভাবে চিনি দেওয়ার অনুকূল মত সম্বন্ধে ভিষগাচার্য্যগণের অভিমত বলেন। তারকনাথের তেজস্বীতা পূর্ণ প্রতিবাদ উত্তর শুনিয়া সার্জ্জন ফেরার আরও অধিকতর ক্রুদ্ধ হন; ফেরার সাহেব তৎক্ষণাৎ বিনা হুকুমে চিনি দেওয়ার জন্য তারকনাথের কৈফিয়ৎ গ্রহণ করেন। তারকনাথের কৈফিয়ৎ মনঃপুত না হওয়ায় তাহার নামে প্রিন্সিপালের মারফত মেডিক্যাল বোর্ডে অভিযোগ করেন। ফেরার সাহেব এই সময় হইতে তারকনাথের প্রতিকূলতাচারণ করিতে থাকেন। তারকনাথ স্বীয় মত সমর্থনের জন্য প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ভিষগাচার্য্যগণের অভিমত উদ্ধৃত

করিয়া নিজ কৈফিয়ৎ মেডিক্যাল বোর্ডে প্রেরণ করেন। বোর্ডের সিদ্ধান্তে তারকনাথের জয় হয়; তিনি নিষ্কৃতি পাইলেন বটে, কিন্তু সমস্ত জীবনে কলেজের মধ্যে তাঁহার শত্রু হইয়া রহিলেন। তারকনাথের হিতৈষী অধ্যক্ষ নবম্যান চিভার্স ভবিষ্যৎ গোলযোগের আশঙ্কা করিয়া তারকনাথকে নূতন কর্ম্মে নিযুক্ত করেন।

কর্ম্মজীবন।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও তারকনাথ।

মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রগণের ধর্ম্মঘট।

তারকনাথ মেডিক্যাল কলেজে প্রিন্সিপ্যাল চিভার্সের সহকারী পদ (Assistant to Principal) প্রাপ্ত হন। এই সময়ে কলেজে ছাত্র-ধর্ম্মঘট (Student's Strike) হয়। ধর্ম্মঘটের ইতিহাসে এই ধর্ম্মঘটই সর্ব্ব-প্রথম ধর্ম্মঘট। ধর্ম্মঘটের কারণ সম্বন্ধে স্বর্গীয় রায় ডাক্তার শ্রীনাথ বসু বাহাদুর যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আমরা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম—

প্রিন্সিপ্যাল চিভার্স বাঙ্গালা বিভাগের ছাত্রগণের প্রতি সদয় ছিলেন না—বরং ঘৃণা করিতেন বলিলেও বলা হয়। মধ্যে মধ্যে হাঁসপাতালের ডাক্তারী যন্ত্র, ষ্টেথিস্কোপ বান্ধিবার কাপড় প্রভৃতি অনেক দ্রব্যাদি চুরি যাইত। যে চুরি করিত, তাহা কেহই ধরিতে পারিত না। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বাঙ্গালা বিভাগের ছাত্রগণকেই স্পষ্টরূপে চোর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ইহাতে ছাত্রগণ অপমান বোধ করেন। দু'একজন তেজস্বী ছাত্র—ইহাদের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় মেডিক্যাল কলেজে বাঙ্গালা বিভাগের ছাত্র ছিলেন, তেজস্বী ছাত্রগণ অপমান উক্তি প্রত্যাহার করাইবার জন্য প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের নিকট উপস্থিত হন। প্রিন্সিপ্যাল বড়ই খামখেয়ালী প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি বাঙ্গালী বিভাগের ছাত্রগণকে দেখিবামাত্র খেপিয়া উঠেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে এই দলের নেতা স্থির করিয়া তাহাকেই চোর সাব্যস্ত করিয়া গোস্বামীর নামে নালিশ অভিযোগ উপস্থিত করেন। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব অপমান উক্তি প্রত্যাহার করিল না দেখিয়া ছাত্রগণ ধর্ম্মঘট করে। এই ধর্ম্মঘট চিভার্স সাহেবের ক্রোধানলে আহুতি প্রদান করিল। তিনি ধর্ম্মঘটকারী ছাত্রগণকে ডেকে

হইতে বিতাড়িত করেন। ওদিকে গোস্বামীকে ধরিবার জন্য পুলিশের লোক অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এই ধর্ম্মঘট ও কলেজ হইতে বিতাড়িত হইবার পর গোস্বামী দিন কতকের জন্য কোথায় ছিলেন, কেহই তাহার সন্ধান জানিত না, হঠাৎ একদিন ঠনঠনিয়ার মোড়ে তারকনাথের সহিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সাক্ষাৎ হয়। তারকনাথ ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। গোস্বামী মহাশয় তারকনাথকে ডাক্তার হিসাবে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। অনেকদিন পরে তাহার সাক্ষাৎ পাইয়া তারকনাথ গোস্বামী মহাশয়কে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করেন ও কোন নিভৃত স্থানে লুকাইয়া থাকিবার জন্য পরামর্শ দেন।

এই সময়ে তারকনাথ গোস্বামী মহাশয়ের মহোপকার করেন। প্রিন্সিপ্যাল চিভার্সের ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে তারকনাথ সাহেবকে বুঝান যে ঔষধ চুরির ব্যাপারে চোর ধরা অতিশয় কঠিন ও গোঁসাইজি চোর নহে, সে এ বিষয়ে বিন্দু-বিসর্গ কিছুই জানে না, উপরন্তু গোঁসাই সত্যবাদী। ভুল করিয়া গোঁসাইকে চোর সাব্যস্ত করিয়া পুলিশের হস্তে সমর্পণ করা যুক্তি যুক্ত নহে। চিভার্স সাহেব তারকনাথের অনুরোধে গোস্বামীর বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ প্রত্যাহার করেন। কিন্তু সাহেব তাহাকে কলেজ হইতে বিতাড়িত করিলেন। গোস্বামী মহাশয় বাঙ্গালা বিভাগে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পাঠ করিতেন। সেই বৎসরই তাঁহার শেষ বৎসর। পুনরায় তারকনাথ গোস্বামী মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন ও আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বলেন। বিদ্যাসাগর ছাত্রগণের প্রতি চিভার্সের দুর্ব্যবহারের কথা শুনিবামাত্র তদানীন্তন ছোট লাট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ছোট লাট বাহাদুর তৎক্ষণাৎ বিতাড়িত ছাত্রগণকে কলেজে পুনঃপ্রবিষ্ট করিবার আদেশ পত্র প্রেরণ করেন। ইহার পর ছাত্রগণ কলেজে পুনঃ প্রবেশ করেন ও সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যায়। গোস্বামী মহাশয় কিন্তু কলেজে আর প্রবেশ করেন নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী।

দেশের অত্যুন্নত পর্ব্বতশৃঙ্গ, হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল গিরিগহ্বর, ভীষণ অরণ্যানী, প্রতি ঘাট, মাঠ, গৃহপ্রাঙ্গন, আবাস বাটীর, সর্ব্বত্রই বিধাতার দান সন্তফলপ্রদ সতেজ ও টাট্‌কা ঔষধাবলী বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহার ব্যবহার পদ্ধতি (প্রয়োগ-রূপ) পাশ্চত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানানুরূপ বহু ব্যয় সাধ্য নহে কেবল কুড়াইয়া ব্যবহার করিলেই চলিতে পারে, সে দেশের লোক সামান্য ঔষধ পথ্যাদির জন্য ও প্রচুর অর্থব্যয় করিবে, পরমুখাপেক্ষী হইবে, ইহা হইতে ঘৃণা, পরিতাপ এবং অবমাননার বিষয় আর কি হইতে পারে? এমন অনায়াস লভ্য চিকিৎসা পদ্ধতি অবহেলা করিয়া আজ আবালবৃদ্ধ-বনিতা ভারতবাসী আমরা বুদ্ধি বিপর্য্যয় করিয়া সংপন্থা হারাইয়াছি, অকাল বার্দ্ধক্য জীর্ণ ও অবসন্ন দেহ লইয়া কক্ষচ্যুত গ্রহের ন্যায় অনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে ছুটিয়াছি, এমতাবস্থায় প্রাচীন ও খাঁটি আয়ুর্ব্বেদের পুনঃ প্রচলন সাধন প্রচেষ্টাই ভারতের ধন প্রাণ রক্ষা ও জাতীয় শক্তির পুষ্টি সাধনের প্রধান উপায়।

কিন্তু আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধার করিতে যাইয়া যে আমরা এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথির বহুল প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি ইহাও কি আমাদের বুদ্ধি বিপর্য্যয় নহে? ইহা আমাদের প্রকৃত সাধনার বিশেষ পরিপন্থী বলিয়া আমরা মনে করি। ঢাকা, কলিকাতা এবং অন্যান্য স্থানের জাতীয় মেডিকেল স্কুল ও কলেজগুলিতে এলোপ্যাথিক এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি শিক্ষার জন্য যত ছাত্র প্রবেশ করিয়াছে, আয়ুর্ব্বেদীয় বিভাগে বোধ হয় তাহার পঞ্চাশ ভাগের একভাগ ছাত্রও প্রবেশ করে নাই। ডাক্তারি চিকিৎসার ঔষধ ও পথ্যাদির প্রায় ষোল আনাই বর্ত্তমানে বিদেশী পেটেন্টের উপর নির্ভর করিতেছে; কাজেই ডাক্তারের সংখ্যা এভাবে বৃদ্ধি পাইলে কিংবা আমরা এত অধিক ডাক্তার সৃষ্টি করিলে বর্ত্তমানে ডাক্তারি ঔষধ ও পথ্যাদির জন্য যে পরিমাণ টাকা বিদেশে চলিয়া যায় ক্রমে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক টাকা বিদেশী বণিকগণ এদেশ হইতে নিয়া যাইবে। যদিও কতকগুলি ডাক্তারী ঔষধ এদেশে প্রস্তুত হইতেছে এবং আরও অধিক মাত্রায় প্রস্তুতের বিশেষ বন্দোবস্ত হইতেছে তথাপি তাহা সংখ্যা এবং পরিমাণে নিশ্চয়ই যথেষ্ট হইবে না। যদি আমরা দেশীয় ঔষধই সেবন করিলাম, তবে আর দেশীয় ঔষধ সমূহ এবং গাছ গাছড়াগুলির আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগ প্রণালী, যাহাতে আমাদের অতি সামান্য খরচ, এমন কি বহু ঔষধের কোনও খরচই নাই—কুড়াইয়া সেবন করিলেই চলিতে পারে—তাহা পরিত্যাগ করিয়া, বৈদেশীক

প্রয়োগ প্রণালী অনুসারে দেশীয় ঔষধের আরক প্রভৃতি (যাহা প্রস্তুত করিতে বড় বড় ক্যামিকাল ওয়ার্কস এবং লক্ষ লক্ষ টাকা মূলধনের প্রয়োজন) বাহির করিয়া সেবন করিতে যাইয়া দেশের ও দরিদ্র দেশবাসীর দৈন্য বৃদ্ধি করিব কেন? আয়ুর্ব্বেদে শ্বেত পুনর্ণবা শোথ, বায়ু, বাতদোষ, কফ, পাণ্ডুরোগ ব্রণ ও উদর রোগ নাশক বলিয়া উক্ত আছে। ইহার আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগ, ডাটা ও পাতা ছেচিয়া তাহার রস বা শুষ্ক ডাটা ও পাতার কাথ সেবন করা। ইহাতে আমাদের একটী পয়সাও ব্যয় নাই—পক্ষান্তরে "পুনর্ণবা সিলুইড কিনিয়া খাইতে বার আনা ব্যয়। এরূপভাবে দেখিতে গেলে দেশে ডাক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বেঙ্গল ক্যামিকেল ওয়ার্কসের ন্যায় আরও বহু এবং বৃহত্তর ঔষধের কারখানা সৃষ্টি দ্বারা আমরা দেশীয় দরিদ্র জনসাধারণের কোনও উপকারত হইবেই না বরং অপকার যথেষ্ট। একশ্রেণীর স্বার্থ লোলুপ ধনী যাহারা ঐরূপ কলকারখানা করিবেন, তাহারাই আরও বড় হইবেন ও আমাদিগকে এক পয়সার স্থানে একটাকা ব্যয় করিতে হইবে। ভারতবর্ষের স্বাস্থ্যনীতি ও অবার্থ মুষ্টিযোগ চিকিৎসা যাহা ভারতীয় নরনারী মাত্রেরই পক্ষে অবশ্য জ্ঞাতব্য ছিল যাহার প্রভাবে অকালমৃত্যু জরাজীর্ণ মহামারী প্রভৃতি সর্ব্বদাই ভারত সীমার বাহির থাকিত পাশ্চাত্য সুশিক্ষার মহিমাবলে আমরা দেশের উজ্জ্বলতম রত্ন রাজী হেলায় হারাইয়া দেশকে ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া দিতেছি। বাসকের রস, ক্ষেতপাপড়া, তুলসী এবং আদার রসের গুণ জানিয়া যাহারা আজও তাহা বিশ্বাস করেন, কবিরাজী পদ্ধতি অনুসারে ঔষধের প্রয়োগে আজও যাহারা আস্থাবান, ডাক্তারী প্রযোগ রূপানুসারে দেশীয় ঔষধ বটীর আরকাদি প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে সে আস্থা একেবারে লোপ হইতে তিরোহিত হইবে—এমনকি আমরা তুলসী গাছের পরিচয় ও ভুলিয়া যাইব। কবিরাজ মহাশয়ের উপদেশ মতে বাগানের বাসকের পাতা ও ছাল থেতো করিয়া আগুণে ঝলসাইয়া ঘুষরা করিয়া-মধু সহ সেবন করিলে কাশ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি—কিন্তু ইহারই পরিবর্ত্তে বেঙ্গল ক্যামিকেলের বাসক সিরাপ আমাকে বার আনা দিয়া কিনিতে হইবে। অথচ গুণের তারতম্য বিবেচনায় কবিরাজী প্রয়োগ রূপ ঘুষরাই উৎকৃষ্টতর মনে করি। মোট কথা, দেশে পুনরায় কবিরাজী চিকিৎসার প্রচলন করিতে হইলে এলোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি প্রভৃতি ডাক্তারী চিকিৎসা শিক্ষা বিদ্যালয় স্থাপন না করিয়া খাঁটি ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়—আতুরালয় ও ঔষধালয় স্থাপন করিতে হইবে

একবার আমিও প্রতিবাদসভার প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইয়াছি যা হউক "রাখে কৃষ্ণ মারে কে" ভগবানের কৃপায় আয়ুর্ব্বেদ আজও তাহার জীর্ণদেহ লইয়া অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিয়াছে। খাঁটিভাবে আয়ুর্ব্বেদীয় বিদ্যালয় স্থাপন এবং কেবলমাত্র আয়ুর্ব্বেদীয় প্রণালীর চিকিৎসা ও পথ্যাদির উপরে নির্ভর করিলে কি আমাদের চিকিৎসা কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না? আয়ুর্ব্বেদীয় স্কুলে শরীর তত্ত্ব Anatomy and Physiology শল্যতন্ত্র Surgery ধাত্রীবিদ্যা Midwifery প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদের যে সকল অংশের বর্ত্তমান প্রচলন বন্ধ হইয়া গিয়াছে অস্মদ্দেশীয় পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দ্বারা সেই সকল বিষয়ের যথা সম্ভব উদ্ধার চেষ্টা ইহাই আমরা আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধার ও প্রচলন কল্পে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

দেশ হইতে দেশীয় শিল্প বাণিজ্য আচার ব্যবহার রীতিনীতি বেদ, আয়ুর্ব্বেদ বহুর্ব্বেদ জ্যোতিষ প্রভৃতি সমুদয়ই একে একে অন্তর্দ্ধান প্রায়। প্রকৃত শিক্ষার অভাবে সহানুভূতির অভাবে প্রবল বিজাতীয় প্রতিযোগীতায় দারিদ্র্যের কঠোর কষাঘাতে চিন্তাশীলতার অভাবে দেশীয় জনগণ আর দেশীয় জ্ঞান বিজ্ঞানাদি চিন্তনে সমর্থ নহে। বিজাতীয় আচারব্যবহার রীতিনীতি ধর্ম্মশাস্ত্র এবং চিকিৎসা প্রভৃতির অনুকূল একঘেয়ে তর্ক ও যুক্তি শ্রবণ করিয়া বিজাতীয় মাহাত্ম্যে আমরা এতদূর মুগ্ধ হইয়াছি যে, দেশীয় একটী যৎসামান্য বিষয়ও আমাদের হৃদয়ে আর প্রবেশ করিতে অবসর পায় না। প্রকৃত শিক্ষার অভাবে আমাদের দেশে যাহা কিছুদিন বা আছে তাহার কিছুই বিজ্ঞানানুমোদিত নহে, সকলই অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার মূলক বলিয়া দেশীয় কোনও ব্যাপারের সত্যাসত্য পরীক্ষা না করিয়াই অবিচারিত চিত্তে দূর হইতেই আমরা তাহাকে দোষারোপ করিয়া থাকি। এই যে আমরা আমাদের দেশীয় অশন বসন ও ঔষধ পথ্যাদির দোষ উদ্ঘাটন করিয়া তাহা বর্জ্জন করিতেছি আমরা যে দেশীয় কোনও আচার ব্যবহারাদিতে তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছিনা উপযুক্ত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকেও হাতুড়িয়া মূর্খ ও জ্ঞানহীন বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছি ইহাকি আমাদের গভীর গবেষণার ফল না দেশীয় ব্যাপারে চিন্তাশূন্যতার পরিচায়ক? আমরা বাল্যকাল হইতে গোপাদপ নামে বৃক্ষের কথা, চীনের প্রাচীরের অতীত কাহিনী, লর্ড ক্লাইবের জন্মতিথি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেছি কিন্তু রামনবমী যে শ্রীরামচন্দ্রের জন্মতিথি তাহা আমরা কয়জনে জানি? পিতা, পিতামহাদির জন্ম তারিখ হয়ত আমরা কেহই বলিতে পারি

না। ডিমের ভিতরে কত ইঞ্চি আছে এবং কড্‌লিভার কোন্ রোগে প্রযোজ্য তাহার বিচার করি কিন্তু আমাদের মধ্যে কয়জন ক্ষেতপাপড়ার আকার প্রকার ও রোগনিবারণী শক্তির বিষয় এবং বিড়ঙ্গ ও পলাস পাপড়া যে অত্যাশ্চর্য্য ক্রিমিনাশক তাহা অবগত আছে? মাষকলাইয়ের ডাইল শ্লেষ্মাবর্দ্ধক এবং মুগের ডাইল যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও উপকারী তাহা আমরা কোনও পুস্তকে পড়িয়াছি কি? আমরা দেশীয় কোনও ব্যাপারে শিক্ষা লাভ করিলাম না দেশীয় কোনও বিষয়ে চিন্তা করিলাম না, পরীক্ষা করিলাম না, দেখিলাম না, শুনিলাম না, অথচ দেশীয় সকলই মিথ্যা এই সংস্কার আমাদের মনে যে বদ্ধ মূল রহিয়াছে ইহা কি দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক নহে? যে সকল সত্যের উপরে নির্ভর করিয়া যে আলোকে বিচরণ করিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যুগ যুগান্তরকাল সুস্থ শরীরে নিরোগ দেহে দীর্ঘজীবী হইয়া আনন্দচিত্তে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, বলিতে কি এক্ষণে আমরা সে সকল সত্য বিশ্বাস করিতে ও ভয় পাইতেছি এক নূতন আলোক আসিয়া আমাদিগকে এমন এক ছায়ায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে যে আমরা দিশাহারা হইয়া সেই পাশ্চাত্য আলোকের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমাভিমুখী হইয়া অন্ধে যাইতেছি। যে সামাজিক সুশৃঙ্খলা ও বন্ধনাবলীর সদ্‌গুণ প্রভাবে ভারত জগতবরেণ্য বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইত। ভারতবাসী আজ আর সেই সামাজিক রীতি নীতি ও দ্রব্যাদির নিকটে উপকারের প্রত্যাশা রাখেন। ভারতবাসী এখনে বিল্বপত্র ও তুলসীপত্রে সন্দিগ্ধ ঘৃত-দুগ্ধের পরিবর্ত্তে মাংস ভক্ষণ অধিকতর উপযোগী মনে করে, সদ্য গাভীদুগ্ধ অপেক্ষা বিদেশী বাসী ভেজাল জমাটদুগ্ধে বেশী আদর নারিকেলোদকের পরিবর্ত্তে সোডা ওয়াটারে অধিকতর রুচী হস্তে মৃত্তিকার পরিবর্ত্তে সাবান পছন্দসই, গোময় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া ফিনাইলের আদর. ফলতঃ যাহা কিছু দেশীয় সকলই বিষবৎ প্রতীত হইতেছে।

যে সমুদয় কারণে জনপদ ধ্বংসকারী ওলাউঠা প্লেগ বিষাক্ত জ্বর প্রভৃতি মহামারী সফল উপস্থিত হইয়া সুশোভন নগরীকেও বিজন শ্মশানে পরিণতকরে বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ আছে ভারতের পক্ষে এক্ষণে ঠিক সেই সমুদয় কারণই সমাগত হইয়াছে—এই যে জটিল হইতে জটীলতর রোগের আক্রমণে দিনের দিন ভারত ক্ষীণ ও হীন প্রাণ হইতেছে ইহার কারণ নির্ণয়ের চিন্তা কখনও আমাদের মনে আসিয়াছে কি? একটুকু ধীর ও নিরপেক্ষ ভাবে চিন্তা করিলেই আমরা দেখিতে পাইব পাশ্চাত্য ঔষধ পথ্য ও অশন বসনাদিতে অনুরক্তিই

ইহার প্রধানতম কারণ, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির গূঢ় সম্বন্ধ জ্ঞানশালী সূক্ষ্মদর্শী আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে, যে যে দেশীয় লোক তাহার পক্ষে একমাত্র তদ্দেশজাত ঔষধ পথ্যাদি ও অশন বসনই প্রকৃত হিতকর। নাগা, গারো, কুকী, টিপ্‌রা, প্রভৃতি পাহাড়ীগণ এবং অনুন্নত কৃষক সম্প্রদায় যাহারা দেশীয় চিকিৎসা ব্যতীত পাশ্চাত্য ঔষধ পথ্য ও অশন বসনাদির পক্ষপাতী নহে তাহাদের সুস্থ বলিষ্ঠ এবং কার্য্যক্ষম দেহই ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। ইউরোপবাসী লোকের পক্ষে যে সকল অন্ন বস্ত্র ও ঔষধ পথ্যাদি বিশেষ উপযোগী, প্রায়-প্রধান ভারতবাসীর পক্ষে তাহা সম্যক অনুপযোগী। একমাত্র দেশীয় অশন, বসন এবং আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও পথ্যাদিই ভারতবাসীর রোগাপনয়ন শরীর সুস্থ সবল ও কার্য্যক্ষম করিতে সম্পূর্ণ উপযোগী।

জনৈক কবিরাজ।

প্রেমের স্বরূপ।

হাসিটী ফুটিল কার আমি খুঁজিয়া বেড়াই,
ফুলটী ফুটিল কোথা সদা চারিদিকে চাই;
সৌরভ ফুটিল কার প্রাণের ভিতর হ'তে,
বুঝিয়া বেড়াই তারে হরষ অধীর চিতে;
সুনীল আকাশ তলে কেমনে ফুটিছে তারা
ইন্দু বিলায় বিলায় কিসে ফিনিক জোছনা ধারা;
বনের করুণ তানে সদা কিসে গান বাজে
নদীর লহরীগুলি চলিছে কাহার খোঁজে।
আমি দেখি ওগো সদা অতুল রূপের ধারা।
আমি বুঝিনা কি প্রেম মাখিয়া রয়েছে ওরা।
একি প্রেম! সুষমায় মিশি করে সদা খেলা
বিশ্ব তাহারি সনে রচে নব নব লীলা।

---

৯. ছোটলোকের অত্যাচার।

(রঙ্গচিত্র)

সেদিন শুক্লপক্ষের নবমী। রাত্রি প্রায় নয়টা। সমস্তদিন বৈশাখমাসের উৎকট গরম গিয়াছে। বাহিরে খুব বেশী থাকলেও পৃথিবী তখনও ঠাণ্ডা হয় নাই। তখন আমি, নীলুবাবু ও ভুলুবাবু, এবং আরও দুইজন বন্ধু, একটা খুব বড়গোছের জমকাল বাজারের পাশে, ছোটখাটো একটি সুন্দর বাড়ীতে, খুব বড়বড় দরজাওয়ালা ছোটখাটো একটি ঘরে, ছোটখাটো বিছানার উপর বসে ছোটখাটো গোছের গল্প করছিলাম। গল্প ছোট বটে, কিন্তু হাসিগুলি খুব বড় রকমের;—এমন কি, ছোট দরজা পার হয়ে ছোট বাড়ীটির সামনে বড়রাস্তাতে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল।

নীলুবাবুর পয়সা অনেক, স্ত্রীপুত্র নাই; সংসারে একা বলিলেই হয়। কেবল এক বৃদ্ধা মাতা আছেন। খরচ অল্প। এত পয়সা নিয়ে কি করবে স্থির করতে পারে না। কিছু খরচ করবে করবে মনে করে, আবার কার জন্যেইবা খরচ করবো মনে করে খরচ করতে ভুলে যায়। তবে তার যাহে খরচ আছে:—মোটর আছে, গাড়ী আছে, চাকর আছে, বামুন আছে। এমনও দুএকটা জিনিস আছে যা না থাকলে কোনও ক্ষতি ছিল না, বরং খরচ কমতে পারত। যাহোক, এ সমস্ত তার আছে।

ভুলুবাবু সংসারী; আয়ও অনেক, খরচও অনেক। সংসারে স্ত্রী আছেন, দুই পুত্র, এক কন্যা, গাড়ী, ঘোড়া চাকরবাকর, ঝী, বামুন, লোকজন, চারিদিকে জমজমাট।

আমাদের তিনজনের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব, খুব ভালবাসা। কেবল রাজে কথা নিয়ে মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে খুব তর্ক হয়। তর্কের সময় প্রায় উহারা দুজনে একপক্ষ অবলম্বন করে; আমি একা হয়ে পড়ি, তবে বেশী হটে যাই বলে মনে হয় না। সেদিন কথা উঠলো, জিনিসপত্র বড় দুর্মূল্য হয়েছে, তার উপর আবার চাকরবাকরের বড়ই অত্যাচার হয়েছে। নীলু ও ভুলু উভয়েরই এ বিষয়ে মত মিলে গেল। কেবল গোল বাধালাম আমি।

আমি বল্‌লাম, "আচ্ছা, জিনিসপত্র যেমন দুর্ম্মূল্য হয়েছে বুঝতে পারছি, চাকরবাকরের অত্যাচারটা কিসে হলো? অমনি দুজনে আমার উপর খাপ্পা হয়ে বলে উঠলো তোমার কথা ছেড়ে দাও, তুমিত হিসেবি নও, হিসেব করেও সংসার কর না, যা খুসি তাই করে যাও। তোমার কি? আজ পয়সা হাতে এলো, গাড়ি কর্‌লে, বাড়ী কর্‌লে;—কাল পয়সা ফুরিয়ে গেল, গাড়ী বেচ্‌লে, বাড়ী বেচ্‌লে; হাতে পয়সা নাই, ধার কর্‌লে; তোমার পক্ষে সংসারটা যেন কিছুই নয়। আমাদের অনেকদিক ভেবেচিন্তে দেখতে হয়, মান সম্ভ্রম বজায় রেখে চল্‌তে হয়।" আমি বল্‌লাম, "চটো কেন ভাই, আমাকে বুঝিয়ে বলনা ব্যাপারটা কি?"

নীলু বাবু বল্‌লে ব্যাপার আর বুঝতে পারলে না, দশ টাকা করে চালের মণ হয়েছে, এমনি সমস্ত জিনিস চড়ে গেছে; তার উপর যদি আবার চাকর বাকর 'মাইনে বাড়াও মাইনে বাড়াও' করে ঘ্যান ঘ্যান করে, তা'হলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় ভেবে দেখ দেখি?" আমি বল্‌লাম "ওঃ এতক্ষণে বুঝতে পার্‌লাম। বাস্তবিকই চাকর বাকরের ভয়ানক অন্যায়; তারা আধপেটা খেয়ে অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় আমাদের কাজ কর্‌লেই ন্যাটা চুকে যায়!" ভজু বাবু চটে উঠে বল্‌লে, দেখলে নীলু কি কথার কি জবাব হলো? বাবু, ওসব কথা ছেড়ে দাও; এখন একটা যুক্তি করা যাক্, এস দেখি, কিসে এর একটা উপায় হয়।"

নীলু বল্‌লে,—"দেখলে ভাই, সাধে ওর সঙ্গে তর্ক করি না, ওর সমস্তই ছেলে মানুষি; ধর যদি লড়াইয়ের সময় মিলের সেয়ারের দর বেড়ে না যেত তাহ'লে দু'পয়সা যা হয়েছে তা কি করতে পারতাম?" আমি বল্‌লাম, তাত ঠিক, কটা মিলে প্রায় দু'লক্ষ কুলি যদি আধ পেটা খেয়ে আট-আনার জায়গায় চারি আনা হিসাবে রোজগার করত তা'হলে সেয়ারের দর আরও বেড়ে আরও দু'পয়সা হতে পারত। ব্যাটারা কুলি কি না, বিদ্যে বুদ্ধি তেমন ত নাই; তোরা আধপেটা খেলেই কি? আর সিকি পেটা খেলেই বা কি? তোব্যাটারা বেশী পয়সা পেলেও খেয়ে ফেলবি, আর কম পয়সা পেলেও খেয়ে ফেল্‌বি; পয়সা জমান তোদের কুষ্ঠিতে লেখে নি। তার চেয়ে নীলু বাবুর মত দু' চার জনের কাছে থাক্‌লে জমাতে পারবি।" তখন উভয়েই বলে উঠলো, "ভাই, তুমি একটু থাম ত আমরা দু'একটা কাজের কথা কই। নয়ত বল, আমরা অন্য জায়গায় উঠে যাই।"

আমি তাড়াতাড়ি বল্লাম "না ভাই, তোমাদের উঠে গিয়ে কাজ নাই। আমি দিব্যি করছি আমি আর এবিষয়ে কথা কব না। এই কথা বলে আমি পাশ ফিরে শুলাম।

তখন নীলু বাবু ও ভুলুবাবু উভয়ে নানাপ্রকার তর্ক বিতর্কের পর সিদ্ধান্ত করলে যে চাকর বাকরকে বিশেষরূপ একটু শিক্ষা দিতে হবে। কিরূপে শিক্ষা দিতে হবে তা পাছে আমি টের পাই, তাই জন্যে উভয়ে ফিশ ফিশ করে পরামর্শ করতে লাগলো। সেই পরামর্শের মধ্যে দু'একবার মহাত্মা গান্ধীর নামও শুনতে পেলাম। সেদিন আমার সঙ্গে ও বিষয়ে আর কোন কথা বার্ত্তা হলো না। আমরা যে যার বাড়ী চলে গেলাম।

ভুলু বাবুর বাড়া আমার বাড়ীর খুব নিকটে। পরদিন বেলা নটার সময় ভুলু বাবু কি করছে খবর নিতে গেলাম। গিয়ে দেখি সদরে জনপ্রাণী নাই। সদরের সামনে ফাঁকা জায়গাটাতে দুটো ঘোড়া বাঁধা আছে, আর তাদের সামনে স্তূপাকার বিচালির তড়পা গোলা অবস্থায় পড়ে আছে। ঘোড়া দুটো অনিচ্ছা সত্ত্বে মাঝে মাঝে তাই এক একবার চিবুচ্ছে। সদর থেকে 'ভুলু বাবু, ভুলু বাবু' বলে অনেক ডাকাডাকি করলাম; কোন সাড়া শব্দ নাই। কাজেই সদর হতে অন্দর বাড়ীতে যাবার যে দরজা আছে সেই দরজা ঠেলাঠেলি করতে লাগলাম। তখন ভিতরে এইরূপ কথাবার্ত্তা হচ্চে শুনতে পেলামঃ—"যাওনা, ঠাকুর, দেখ না কে দরজা ঠেলচে।" "আপনি কি বলেন, বাবু; আমি কাটি দেবো, না সদরে গিয়ে দেখবো কে ডাকাডাকি করচে; আপনিই না হয় একবার যান না।" "তোমার বেশ আক্কেল যা হ'ক! আমি কেমন করে যাই বল দেখি?—কড়ামেজে—হাতময় ফাগী লেগেচে, সকাল থেকে বাসন মাজছি, এখনও অর্দ্ধেক শেষ করতে পারি নি। "তা বাবু, আমি যেতে পার্বো না, আপনি যা হয় করুন। ডালটাত আর আমি ধরিয়ে ফেলতে পারি নি।"

তখন স্বর বিকৃত করে ভুলু উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলো, "ভুলু বাবু বাড়ীতে নেই, মশাই।—বাড়ীতে কেবল মেয়ে ছেলে আছে; আপনি দিন পাঁচ ছয় পরে আসবেন।" আমি সমস্তই বুঝতে পারলাম; বল্লাম, "ভুলু বাবু, লজ্জার কোন কারণ নাই, আমি সনাতন।" তখন ভুলু বাবু তাড়াতাড়ি এসে দরজা খুলে দিলে।

বাড়ীর মধ্যে ঢুকে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে আমার চক্ষুঃ স্থির হয়ে গেল।

দেখলাম, ভায়া একখানি ছোট কাপড় পরেছে, তার উপর একখানি গামছা জড়িয়েছে। তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় সুন্দর স্থূলদেহ ঘর্ম্মাক্ত হয়েছে। এই গরমের দিনে যতই গাত্র কণ্ডুয়ণ করেচে ততই সর্ব্বাঙ্গে কালী লেগেচে। সমস্ত উঠানটি পরিষ্কৃত—ও অর্দ্ধপরিষ্কৃত—ঘটবাটী প্রভৃতি তৈজস পত্রে পরিপূর্ণ। কড়াখানি এখনও মাজা শেষ হয় নাই।—সাধের কন্যা "দেববাণী" সেই নবমবর্ষীয়া বালিকা, গলদবর্ম্ম অবস্থায় শীলে বাটনা বাট্‌চে। প্রকাণ্ড, দুগ্ধবতী, ভাগলপুরে গাভীটী উঠানের একপাশে দাঁড়িয়ে দাননেত্রে চেয়ে আছে, আর সম্মুখে কতকগুলি স্তূপাকার আস্ত বিচালি পড়ে আছে, সে তা স্পর্শও করচে না। বাছুরটা দুধ খেয়ে পেটটা ঢাকের মত করেচে। তাতেও দুধের শেষ হয় নাই। গাইএর বাট হতে অবিরাম ধারে দুগ্ধ নির্গত হয়ে মাটি ভিজে যাচ্চে। একদিকে কতকগুলি আনাজ কাটা এবং অর্দ্ধকাটা অবস্থায় পড়ে আছে। আমি স্তম্ভিত হলাম! কিছুক্ষণ আমার মুখে কথা বাহির হল না। খানিক পরে বল্‌লাম, "ভায়া, ব্যাপার কি বল দেখি।" তখন ভুলুবাবু রুদ্ধস্বরে বলে উঠ্‌লো "ব্যাপার আর কি? পাঁধি ব্যাটার পিণ্ডি চট্‌কাচ্চি।—কাল রাত্রে এসে দেখি; গিন্নীর জ্বর। তার উপর সইস, কোচম্যান, ঝী, চাকর, সকলেই এক-জোট হয়ে বল্লে 'আমরা আর থাকবো না' বাড়ীতে থাক্‌বো না'। গিন্নী বল্‌লেন, 'হাঁ গা, ওরা গরিব লোক, জিনিস পত্তরের সমস্ত দাম বেড়েচে, তোমার মত ওদেরও বাড়ীতে ছেলেপুলে আছে, তারা খাবে কি? তোমার অভাব কিসের? দিলেই না হয় কিছু বাড়িয়ে।" নীলুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয়ে অবধি আমার মেজাজটা ভাল ছিল না। রেগে দু'কথা গিন্নীকে শুনিয়ে দিলাম। তাঁকে কখনো একটা বড় কড়া কথা বলি নাই, তখন কিন্তু আর সহ্য হলো না। গিন্নী কিছু না বলে চুপ করে শুয়ে রইলেন। ভোরে উঠেই সইস, কোচম্যান, ঝী, চাকর সমস্ত জবাব দিলাম। গিন্নী উঠে জ্বর অবস্থায় বাসন মাজ্‌তে এসে আছাড় খেলেন; তাঁকে ধরে উপরের ঘরে শুইয়ে রেখে এলাম। দুই ছেলে মণি স্কুলে চলে গেছে; আর আমি যা করচি তাত দেখ্‌তেই পাচ্চ।"

আগে লক্ষ্য করি নাই, তখন দেখ্‌লাম ভায়ার ডান পায়ের হাঁটুর নীচে তুলোর উপর ব্যাণ্ডেজ জড়ান আছে; বল্লাম, 'ভুলুবাবু পায়ে ব্যাণ্ডেজ জড়ান কেন?' ভুলুবাবু বল্‌লে, "ও কথা আর বলো না ভায়া; গাইটা দুইতে গিয়ে —এমনি বেধ হলো—কি যে হলো, এমনি একটা চাট্ চুড়লে, যে একেবারে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেলাম, আর আধ কেঁড়ে দুধ সমস্ত গায়ের উপর

গাড়ী হয়ে গেল পায়ে তখনকার চোট লাগলো;—হাড় ভেঙ্গে গেছে না কি বলতে পারি না।" আমি একটু ঠাণ্ডা ভাবে বললাম, "ভুলুবাবু, একটু বেশ বুঝে ঘাঁটা দেখি....."ঠিক সেই সময়ে একজন অফিস পিয়ন সদর হতে 'বাবু, বাবু' বলে ডাকতে ডাকতে বাড়ীর ভিতরের দিকে আসতে লাগলো। দূর থেকে তাকে দেখতে পেয়ে ভায়া গাউ যাচার নীচে লুকিয়ে পড়ে আমায় বললে 'সর্ব্বনাশ, তুমি বুঝি দরজা খুলে রেখে এসেছ। সর্ব্বনাশ করলে। যাও, যাও, শীগগির যাও; চিঠিখানা নাওগে।" আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে চিঠিখানা পিয়নের হাত থেকে নিয়ে পিয়নবুকে সই করে দিলাম। ভায়া কালীঘাথা হতে চিঠিখানা খুলে বলে উঠলো, "সর্ব্বনাশ! এযে দেখ্‌চি পোর্ট কমিশনারের বড় সাহেবের চিঠি—ডেকে পাঠিয়াছেন, এখুনি যেতে হবে। মস্ত একটা অর্ডার আছে, প্রায় একদিনে পঁচিশ টাকা লাভের কাজ; কাল দোকানের মুটেকারের অজুহাত দিয়ে দোকান বন্ধ রেখে ভাল কাজ করি নি।" আমি বললাম, "ভায়াও বেশি মাইনে চেয়েছিল বুঝি?" তুলু বাবু বললে, হাঁ ভাই, বল কেন? গাঁধি ব্যাটা চারিদিক থেকে পেছনে লেগেচে। এখন কি করি বল দেখি, একবার আফিসে গিয়ে সাহেবের সঙ্গে দেখা করব নাকি?" আমি বললাম, সেই ভাল, একবার সাহেবের সঙ্গে দেখা করে দুতিন দিনের ছুটি নাওগে।" তুলু বাবু তখন মাথা চুলকুতে চুলকুতে বললে, "তাই বা যোঁড়াতে যোঁড়াতে কেমন করে যাই বল দেখি? সহিস কোচম্যান ব্যাটারা সকলেই চলে গেছে, ঠিকে গাড়িইবা কাকে আনতে পাঠাই।" তখন ঠাকুরের দিকে চেয়ে বললে, "ঠাকুর, তুমি একখানা গাড়ী এনে দিতে পারবে?" ঠাকুর তুচ্ছভাবে বলে উঠলো, "বাবু এই অম্বলটা চাপিয়েচি, এখন গাড়ী আনতে গেলে এর কি আর কিছু থাকবে।" তখন আমি বললাম, "ভুলু বাবু, আমি না হয় আমার গাড়ীটা পাঠিয়ে দিচ্চি, আমি বরং ট্রামে করে আফিস যাব।" ঠাকুর তখন বলে উঠলো "তা বাবু, আপনি চলে গেলে, আমি একা সব ঝক্কি পোয়াতে পারবো না, ছেলেদের স্কুল থেকে আসবার সময় হলো; আমিও চলে যাবো।"

তখন তুলু বাবু বললে, "না ভাই, তোমাকে আর গাড়ী পাঠাতে হবে না। সর্দ্দি কর্দ্দি ছেড়ে দিয়ে, গাঁধি ব্যাটার শ্রাদ্ধ ভাল করেই করবো মনে করেচি।"

এর উপর কোন কথা বললে ফল হবে না মনে করে আমি বললাম, "তবে তাই আমি এখন আসি, আমার আবার আফিসের বেলা হয়ে যাচ্চে।" তখন

ভুলু বাবু একটু কোমল স্বরে বল্‌লে, "আচ্ছা ভাই, এস।" এই কথা বলে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আমাকে বের করে দিয়ে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলে।—আমি রাস্তায় বেরিয়ে হাস্‌বো কি কাঁদ্‌বো কিছুই ঠিক করতে পার্‌লাম না।

সেদিন আফিস থেকে ফির্‌তে আমার বেশি রাত্তির হয়ে গেল, সেই জন্য সেদিন আর আমি ভুলু বাবুর বাড়ী গেলাম না। পরদিন রবিবার আফিস বন্ধ ছিল। আমি সকালে ৮৷৷০ টার সময় ভুলু বাবুর বাড়ীতে গেলাম। গিয়েই দেখি বাড়ীর ভিতর হ'তে ভুলু বাবুর ছোট ছেলে 'ঘটক' একখানি পাঁওরুটি খেতে খেতে বেরিয়ে আস্‌চে। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "ঘটক, তোর বাবা কি কর্‌চে রে?" ঘটক হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, "বাবা, রাঁধচে।" আমি অবাক হয়ে বল্‌লাম, "রাঁধচে কিরে, ঠাকুর কোথা গেল?" ঘটক বল্‌লে 'সে মাইনে বেশি চেয়েছিল বলে বাবা তাকে কাল তাড়িয়ে দিয়েচে; মা কত বারণ কর্‌লে, বাবা কিছুতেই শুন্‌লেন না। খুব ভোরে উঠে, বাবা, বড়দা, দিদি, সকলে মিলে বাসন মাজ্‌ছিল, এখন বাবা রাঁধচেন।" আমি ভুলু বাবুর চিত্তের দৃঢ়তা দেখে অবাক্ হয়ে গেলাম। তার পর বাড়ী ভিতরের দিকে যেতে যেতে 'হটর, হটর; খটর, খটর' এই অবিরাম শব্দ শুন্‌তে পেলাম। বাড়ী ভিতরের দরজা খোলাই ছিল, উঁকি মেরে দেখি, ভায়ার গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, কোমরে সিল্কের চাদর জড়ান, বাঁ হাতে সোনার রিষ্ট ওয়াচ আর একখানি বই;—একবার করে ঘড়ির দিকে দেখ্‌চে, একবার করে বইখানির দিকে তাকাচ্চে, আর ডান হাতে করে হাঁড়িতে অবিরাম গতিতে কাটি দিচ্চে; সামনে একটি বড় গোছের হাণ্ডাবিল খোলা অবস্থায় পড়ে আছে, তাতে আলু, পটল, পেঁয়াজ, হাঁসের ডিম প্রভৃতি নানা রকম দ্রব্যে ভরা আছে। দুএকটা হাঁসের ডিম ভেঙ্গে গিয়ে তরিতরকারিতে মাখামাখি হয়ে গেছে।

আমি উপস্থিত হবা মাত্র ভায়া বল্‌লে, "একটু চুপ করে বসতো ভাই, আমি গিন্নীর জন্যে সাবুর খিচুরিটা চট করে তৈয়ারি করে নিই; অধিক দেরী হলে খারাপ হয়ে যাবে।" আমি বল্‌লাম "ঠাকুর কোথা গেল?" তখন পূর্ব্বের ন্যায় হাঁড়ির উপর নজর রেখে একটু রুক্ষস্বরে বলে উঠ্‌লো, "সে ব্যাটাকে কাল বৈকালে মাইনে বাড়াবার কথা বলে মানা দিয়েচে। কাল রাত্রে নিজেই গিন্নীর জন্যে সাবু রেঁধেছিলাম। অভ্যাস নাই ত; গিন্নী সাবু মুখে দিয়ে ছেড়ে খুন ত খাবেন কি? কারণ জিজ্ঞাসায় অনেক কষ্টে হাসি সম্বরণ করে বল্‌লেন,

কেমন দুধ তার মিছরি দেওয়া হচ্ছে। ওতে সাবু দিতেই ভুলে গিইচি, তাও খাবার এমনি ধরে গেছে যে কে মোটেই খেতে পারলে না। তাই ভাই, আজ খুব ভোরে উঠে, পাট ঘাট সেরে, বাসন কোসন মেজে, বড় ছেলেটা একখানা গাড়ী এনে দিলে, গাড়ী করে নতুন বাজারে গিয়ে বাজার করলাম। লোকে চেনে পারবে বলে তরি তরকারি সব হাও ব্যাগের মধ্যে পুরলাম, ছেলেদের জলখাবারের জন্যে পাঁওরুটি কিনলাম, তারপর একখানা 'পাক প্রণালী' কিনে নিয়ে, গিন্নীর জন্যে সাবুর খিচুড়ী রাধচি। এখনও কাপড় ছাড়বার ফুরসত পাই নি। বই এ যা লিখচে তাতে প্রায় এখনও পোনের মিনিট কাটী দিতে হবে। পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে; ধরে যাবার ভয়ে একটু জল পর্য্যন্ত খেতে পাই নি।" আমি বল্লাম, "ভুলুবাবু, তুমি ভাই জল খেয়ে নাও আমি ততক্ষণ কাটী দিচ্চি।" ভুলুবাবু বল্লে, "দেখো ভাই, সাবধান, যে রোগা লোক, কাল সমস্তদিন তার খাওয়া হয় নি, আজ আবার যেন বেরিয়ে না যায়।" এই কথা বলে হাঁড়িতে কাটি দিবার জন্য তোয়ালে আমার উপর ভার দিয়ে এক গ্লাস জল গড়িয়ে নিয়ে খেতে লাগ্‌লো, কিন্তু তার মনটা হাঁড়ির উপর পড়ে রইল। আমি ও ভয়ে ভয়ে দুহাতে করে কাটিটি ধরে নাড়তে লাগলাম। জল খাওয়া হলে পর যেন করে বইখানি দেখে নিয়ে ভায়া আমায় বল্লে, 'ঠিক সময় হয়েচে তুমি একবার সব দেখি, আমি হাঁড়িটা নামিয়ে নিই।' আমি একটু সরে দাঁড়ালাম। তখন ভায়া হাঁড়ির কানায় ন্যাকড়ার মুটি দিয়ে জোর করে ধরে যেমন নাবাতে যাবে অমনি হাঁড়িটা ভস করে ভেঙ্গে গিয়ে সমস্ত সাবুর খিচুড়ি ভায়ার হাতে আর পায়ে পড়ে গেল। ভায়া অমনি "বাবারে গেলাম, নীলু শালা আমায় মেরে ফেল্‌লে" এই কথা বলে চীৎকার করে উঠ্‌লো। আমি তাড়াতাড়ি ভায়াকে ধরে বসিয়ে খানিক নারিকেল তেল নিয়ে আস্তে আস্তে হাতে পায়ে লাগিয়ে দিলাম। দেখ্‌লাম, বিশেষ কিছু হয় নাই, সামান্য সামান্য ফোস্‌কা হয়েছে মাত্র। ভায়া সেই অবস্থায় রাণীকে বল্‌লে, "তোর মা যে নীচে আসে না, আজ দু'দিন যে জ্বরে ভুগ্‌চে।" রাণী উপরে তার মাকে বারণ কর্‌তে গেল। এমন সময় ভুলুবাবুর ও ছেলে প্রায় ১১।১২ বছরের বালক, মস্ত একটা রুই মাছ হাতে করে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে রসুই ঘরের দাওয়ায় এসে বসে পড়লো। আমি বল্লাম, "ভুলুবাবু, তোমরাত এই তিন চারজন, খেতে পাঁচ সের একটা মাছ কি হবে?" ভায়া বল্লে, "কে জানে, নতুন পাকপ্রণালী খানা কিনে মনে কর্‌লাম ওবেলা তোমাকে আর

নীলুকে পোলাও টোলাও করে খাইয়ে অবাক্ করে দেবো, আর দেখিয়ে দেবো যে আমি চাকর বাকরের অধীন নই।" আমি বললাম, "না আমাদের অবাক্ করে কাজ নাই, আমরা অমনিই অবাক্ হয়ে রয়েছি। এখন উনুনে জল দিয়ে নিবিয়ে দাও, আর এ বেলা আমার ওখানে ছেলেকে নিয়ে চল। তোমার গিন্নির জন্যে আমার বামুনকে দিয়ে সাবু পাঠিয়ে দিচ্চি।" তখন ভুলুবাবু অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার কথায় এক রকম স্বীকার হলো। ঠিক সেই সময়ে উপরে চেয়ে দেখলাম তাঁর গৃহিণী উপরের বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসচেন।

আমার বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া করে উভয়ে মতলব করলাম দু'দিন নীলুর কোন খবর নিতে পারা যায় নাই, সে কি করচে দেখতে হ'বে। আমরা দোঁহে জোটা হ'লে ভায়া রোঁড়াতে খোঁড়াতে গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। প্রথম আমরা নীলু বাবুর বাড়ীতে গেলাম। গিয়ে দেখি 'কাকস্য পরিবেদনা' জন প্রাণী নাই। অনেক ডাকাডাকির পর নীলুর বৃদ্ধ মাতা ওপর থেকে বললেন, "বাবা, নীলু যে কি হয়েচে কিছুই বুঝতে পারি নি। চাকর বামুন সকলকে জবাব দিয়েচে, দিয়ে পরশু থেকে বাড়ীতে নেই; বাবা, তোমরা তাকে একবার খুঁজে দেখ।" আমরা তাঁকে সান্ত্বনা করে বললাম, "আপনি ভাববেন না, আমরা এখনি তাকে খুঁজে নিয়ে আসচি।" এই কথা বলে, নীলুর একজন বন্ধুর বাটী গেলাম। সেখানে এই পর্য্যন্ত খবর পাওয়া গেল যে নীলুবাবু ড্রাইভারকে জবাব দিয়ে নিজে মোটরে হাঁকাতে গিয়ে মোটরের ধাক্কা লাগিয়েচে। কিন্তু খানায় না কি আড়াই হাজার টাকা মেরামত খরচা চেয়েছে। তাহার বন্ধুর কোচম্যান জবাব দিয়ে নিজে গাড়ী হাঁকিয়ে তার বাগানে গিয়ে রয়েছে। আমরা সেখান থেকে একবারে তার বাগানে গেলাম। গিয়ে দেখি চারিদিক ভোঁ ভাঁ; বাগানের মালীকেও দেখতে পেলাম না, আর নীলুকেও না। নীচের ঘরে একটা কামরার মধ্যে একটা ইক্‌মিক্ কুকার পড়ে আছে, আর কলাপাতায় কতকগুলো উচ্ছিষ্ট ভাত আর খানিকটা আলুভাতে পড়ে আছে। তখন আমরা বুঝলাম নীলু কোন দরকারে নিকটের দোকানে গিয়ে থাকবে। বাগানের মধ্যে দু'জনে গিয়ে এধারে ওধারে খুঁজচি, এমন সময়ে দেখি নীলুবাবুর সেই প্রকাণ্ড মদ্দা ঘোঁড়াটা তার পা তুলে চারিদিকে ছুটাছুটি করচে, আর মাঝে মাঝে 'চিঁ হিঁ হিঁ' শব্দ করচে। আমরা ভয়ে ভয়ে সরে হবে একবারে সরে গেলাম। অথচ ব্যাপারটা কি কিছুই বুঝতে পারলাম

না। 'কি করা যাবে' দু'জনে ইতস্ততঃ করচি, এমন সময়ে বাগানের প্রাচীরের বাইরে কতকগুলো কুলি "জয় গান্ধি মহারাজকি জয়" বলে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে উঠ্‌লো। ঠিক সেই সময়ে নিকটবর্ত্তী একটা নারিকেল গাছের উপর থেকে কে বলে উঠ্‌লো, 'চোপ্ বাদরা, সেই শালাইত দেশ মজিয়ে দিলে; তার পিণ্ডির ব্যবস্থা করে তবে ছাড়্‌বো'।

তাড়াতাড়ি নারিকেল গাছের দিকে চেয়ে দেখি, সর্ব্বনাশ! নীলু বাবু গাছের মাঝখানে গিয়ে গাছটাকে প্রাণপণে আকড়ে ধরে আছে; গায়ে কতুয়া, মাথায় গামছা বাঁধা, পরণের কাপড় শ্লথ। আমি এই দৃশ্য দেখে হেসে গড়াতে লাগলাম। ভুলু বাবু হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, "ব্যাপার কি বল দেখি নীলু, গাছে উঠ্‌লে কেন?" নীলু গাছ হতে অতি করুণ স্বরে বলে উঠ্‌লো, 'ভাই ভুলু বাবু, ঘোড়াটাকে ঘাসের লোভ দেখিয়ে বাগানের ওপাশে সরিয়ে নিয়ে যেতে পার; আমি নেবে গিয়ে সব তোমাদের খুলে বল্‌চি।" ভুলু বাবু তাড়াতাড়ি ওপাশে গিয়ে দেখ্‌লে বাগানের এক কোনে ঘোড়াটা শান্তমূর্ত্তি ধারণ করে চরে বেড়াচ্চে। নীলুকে এসে ঐ সংবাদ দেওয়ায় নীলু গাছ থেকে নাববার চেষ্টা করলে। কিন্তু ওঠবার সময় প্রাণভয়ে একরকম করে উঠে পড়েছিল, নাব্‌বার সময় আর তত শীঘ্র নাব্‌বার সাহস হলো না। তখন ভুলুবাবু বল্‌লে, "তুমি একটু হাত পা আল্‌গা দাও না, তা হলে আপনিইত গড়িয়ে এসে পড়্‌বে।" পাছে আবার ঘোড়াটা এসে পড়ে নীলু সেই ভয়ে কোনরূপ দ্বিধা না করে যেমনি হাত পা আল্‌গা করে দিলে, অমনি 'সর্‌, সর্‌' করে একবারে নীচে এসে পড়লো। কিন্তু নীচে পড়ে নীলুর আর মুখে কথা নাই। আমরা তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে দেখি, কতুয়া ছিঁড়ে বুকের চামড়া একবারে কেটে গিয়ে রক্তে সর্ব্বাঙ্গ ভেসে যাচ্চে, কিন্তু গামছাটি তখনও মাথায় বাঁধা আছে। আমরা তখনি পুষ্করিণী থেকে গামছা ভিজিয়ে জল এনে তার চোখে মুখে দিতে লাগ্‌লাম। চোখ খুলেই ভায়া বলে উঠ্‌লো, "গান্ধি চলে গ্যাছে ত!" আমরা হেসে বল্‌লাম "তুমি পাগলা হলে না কি; গান্ধি কোথায় এখানে?" তখন তার সম্পূর্ণ জ্ঞান হলো; আমার তার কতুয়াটি ছিঁড়ে জলে ভিজিয়ে বুকে বেঁধে দিলাম। তারপর ধরাধরি করে এনে নীচের হলে শুইয়ে দিলাম। যখন একটু সুস্থ হলো, তখন আস্তে আস্তে বল্‌তে লাগলো, "আমার দুঃখের কথা বলো না ভাই; দু'দিন যে কি কষ্ট পেয়েচি সে আর বলবার নয়। সেই রাত্রে তোমাদের সঙ্গে কথা হবার পর, চাকর বাক

ড্রাইভার কী বামুন সমস্তই জবাব দিলাম। প্রথমতঃ ঘোটর চালাতে গিয়ে ধাক্কা লাগিয়ে দু আড়াই হাজার টাকা লোকসান করে ফেলেছিলাম; প্রাণটা কোনমতে বেঁচে গেল। তারপর নিজেই গাড়ী হাঁকিয়ে বাগানে এলাম। এসে দেখি মালি ব্যাটা জবাব দেবার অপেক্ষা না করে নিজেই চলে গেছে! ঘোড়াটাকে খুলে আস্তাবলে বাঁধলাম। তারপর ইক্‌মিক্ কুকারে আলুচাল ভাত চড়িয়ে দিলাম; তারপর স্নান করে নাকে মুখে চারটি দিয়ে একটু গড়িয়ে নিলাম। তখন মনে হলো, আজ দু'দিন ঘোড়াটাকে ডলাই মলাই হয় নাই, ভালো ঘোড়া পাছে খারাপ হয়ে যায়, সেই ভয়ে আস্তে আস্তে ডলাই মলাই করবার ইচ্ছে হলো। রোদ লাগবার ভয়ে গামছাটি বেশ করে মাথায় জড়ালাম, তারপর আস্তাবল থেকে ঘোড়াটিকে খুলে, ওই নারিকেল গাছটার কাছে যে দুটো আমগাছ দেখ্‌চো তাতে নিয়ে গিয়ে বাঁধলাম। তারপর আস্তে আস্তে ডলাই মলাই আরম্ভ করলাম। তখন পর্য্যন্ত ঘোড়াটা বেশ ঠাণ্ডা। তারপর হঠাৎ একদিককার বাগ্‌ডোর ছিঁড়ে গেল; আর যেমন ছেঁড়া অমনি উগ্রমূর্ত্তি হয়ে সামনের দুপা তুলে আমাকে আক্রমণ করলে। আমি প্রাণভয়ে নারিকেল গাছের দিকে ছুটে এলাম। তখন ঘোড়াটা একলাফে বাগ্‌ডোর ছিঁড়ে আমার দিকে ছুটলো; আমি তাড়াতাড়ি প্রাণভয়ে গাছে উঠে পড়লাম। তারপর যা ঘটেচে সবইত তোমরা জান।" তখন ভুলুবাবু নিজের ব্যাণ্ডেজ করা পা খানি দেখিয়ে বল্‌লে, "আমি কোন্ সুখে আছি, ভায়া।"

একটু পরে আমরা নীলুবাবুকে ধরাধরি করে আমাদের গাড়িতে এনে তুল্‌লাম। ফটক পার হয়েই নীলু তুলু বাবুকে বল্‌লে, 'তা হলে এখন কি করবে স্থির কর্‌লে, ভায়া!' ভুলু বাবু অবাক্ হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে, "এখনও কি করবো জিজ্ঞাসা করতে তোমার লজ্জা হচ্চে না?" ঠিক সেই সময়ে বাগানের বাহিরে কতকগুলো কুলি পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠ্‌লো, 'জয়, গাঁধি মহারাজকি জয়!' তখন দুজনেরই মুখে আর কথা নাই।

শুনেচি সে রাত্রে নাকি ভুলু বাবুর গৃহিণী হাসির চোটে পাড়ায় লোক জড় করেছিল। কিন্তু তাঁর জ্বরটা প্রকৃত হয়েছিল কিনা সে সংবাদ সঠিক এখনও পাওয়া যায় নাই। তবে এ সংবাদ পাওয়া গিয়েচে যে ঝী চাকরের মাহিনা বেড়েও গেছেই, তা ছাড়া ভুলু বাবু নাকি গোপনে বামুনকে আর নীলু বাবু নাকি সহিসকে মাহিনার উপর আরও কিছু কিছু দিয়া থাকেন।

(কস্যচিৎ উদাসস্য)

একখানি চিঠি।

স্নেহের সু.....

তোমার নিকট চিঠি লেখবার এই আমার প্রথম সুযোগ হয়েছে, কিন্তু নিজের কথা গুছিয়ে বলবার মতো বিদ্যেবুদ্ধি তো নেই। ভাবি মানুষের আশা ও নৈরাশ্যের অনুরূপ ভাষা আজও সৃষ্টি হয়নি কেন? তা' নাইবা হ'লো, কিন্তু মনের ভাষা প্রকাশের যদি আবশ্যক হয় তবে প্রাণ ভেঙ্গে এমন মুষড়ে পড়ে যে সহজ কথা বলাও তখন লোকের পক্ষে অসাধ্য হয়ে উঠে। আর জীবনের সমস্ত যুক্তিপূর্ণ বিষয়গুলি নিতান্ত ফাঁকা বলিয়া মনে হয়। মনের ভিতর এমন জোয়ার আসে যে ভাল মন্দ কিছুরই বোধ থাকে না। সংশয়ের বেড়া কাটাইয়া হাঁ না সমস্তই এক সঙ্গে মনের পরীক্ষা কেন্দ্র উত্তীর্ণ হইয়া যায়। তোমাদের রথের চেহারা নাকি ঠিক এই রকমের।

মন যে আমার কোন এক জায়গায় জড়িয়েগেছে, তা' আজ এই প্রথম টের পেলাম তোমার কাছে। রাত দিন সঙ্গে সঙ্গে ছিলে ছায়ার মতন—তারপর এই প্রথম বিচ্ছেদ। কোন দিন তো এই অভাব বোধ করিনি। দূরে সরে এসেছি বলে প্রাণের শিকলে টান পড়ে বুঝিয়ে দিয়েছে; তুমি কতখানি আপনার। তুমি যে আমার এ কথা মনে হলেও প্রাণ শিউরে উঠে, প্রাণের শিরায় শিরায় রক্তের ঢেউ খেলে, কপালের দুইদিকে একটা স্পন্দন আরম্ভ হয়, আর কি একটা অজানিত ব্যথা বুক ঠেলে উঠে কণ্ঠরোধ করে। তুমি আমার, একথা বলবার অধিকার তো কোন দিন পাইনি'। তুমি আমার ভাই নও, আত্মীয় পরিজনও নও, রক্তের হিসেবেও তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই, সংসারের অন্য দশ জনে যা বলে পরিচয় দেয়, তার কোনটার দাবী করবার অধিকারও আমার নেই, কাজেই তুমি আমার একথা মুখফুটে বলি কোন সাহসে? বন্ধু বলে তুমি আমার সব এ কথা তো কেউ কখনো স্বীকার করেনি'। কাজেই মনটাকে এমন ভাবে সঁপে দিয়েও বলবার মতো যদি কিছু না থাকে, তবে তার মতো হতদরিদ্র আর কে? ধরে রাখবার কিছু নেই বলেই তো এত স্নেহ ভালবাসা ও প্রাণের টানের এক কাণাকড়িও

মূল্য দেওয়া চলে না! ভিখারীর যাচ্ঞার সামগ্রী নিজের কাছে অমূল্য হলেও দাতার নিকট যে তুচ্ছ অবজ্ঞার জিনিষ।

সত্যি কি বন্ধুর দানের কোন মূল্য নেই? আছে, মূল্য তার একমাত্র প্রতিদান। প্রতিদান পেলেই এই বন্ধুত্বের পরিধি হয়, আকাশের ন্যায় বিস্তৃত, সাগরের ন্যায় গভীর, আর জ্যোৎস্নাপ্রমোদিত-লীলাচঞ্চল-তটিনীর ন্যায় মধুর! বসন্তের সমস্ত লীলা-সম্ভারের মধ্যেও এতখানি তৃপ্তি—এমন প্রাণভরা পুলক, এত সৃষ্টিহীন মাদকতা এমন পরিপূর্ণ সন্তোষ আছে কিনা সন্দেহ।

তোমাকে কেন যে এত কথা লিখে পাঠাচ্ছি—তা' নিজেই বুঝে উঠতে পাচ্ছি না। কখনো তো তোমাকে কোন কথা বল্‌বার দরকার হয়নি'! সংসারের অন্য প্রয়োজনীয় জিনিষের মতো যখন তোমাকে চেয়েছি, তখনি পেয়েছি। তার মূল্য তো কখনো ভাবিনি। কিন্তু আজ জীবনের সকল দিকেও দেবার আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই নিবৃত্তি হচ্ছে না—একটা অপরিতৃপ্তির ক্ষুধা প্রাণের ভিতর ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে—তাই আজ এত কথা লেখা। এত দিন মূল্যহীন ছিলে বলেই তো আজ যে অমূল্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতকাল চেনবার সুযোগ হয়নি বলেই তো স্মৃতির সমস্ত ঘটনা পুলক-বেদনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তাই আজ সমস্ত প্রাণ দিয়ে ধরেও তৃপ্তির অধিকারে বঞ্চিত। এতকাল কেন পাইনি' সেই বেদনাই অধিক হয়ে মনকে চঞ্চল করে তুলছে।

জানিনা কবে আবার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে। কিন্তু পূর্ব্বের দেখায় আর এখনকার দেখায় কত আকাশ পাতাল প্রভেদ।

পূর্ব্বের স্মৃতিগুলি এতমধুর—এতপ্রাণপূর্ণ অগাধ তৃপ্তির আধার—কিন্তু সেগুলি ভোগ করেছি কত হেলায়। কাজেই ভাবি পূর্ব্বের দিনগুলি যদি আবার কেউ ফিরিয়ে এনে দিতে পারতো।

তখন মনে হয় তুমি ব্যতিরেকে আমার জীবন এমন করে গড়ে উঠতো কিনা সন্দেহ। হয় তো পথহারা নদীর মত মরুভূমির কোন দুর্ভেদ্য স্থানে এসে শীর্ণহয়ে শুকিয়ে যেতো। এখন ভাবি, আমার জীবন এমন সুন্দর হলো কিসে? সে এক মাত্র তোমার ভালবাসার জোরে। তোমার এমন প্রেম ছিল বলেই তো আকাশের খোলা হাওয়ার মত নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলাম। নয়তো রুদ্ধ গহ্বরের মত মলিনতায় করে প্রাণ ভরে উঠতো। তুমি যে আমার কত খানি' তাহা ভাষায় বলে বোঝান শক্ত—যদি তুমি তাহা কখনো মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করে না থাক।

তুমি এই চিঠি পড়ে কি ভাববে বল দেখি?—পাগল! তা' ভাব, তোমার ভাবনার ভিতর আছি জানলেই সুখী হবো। তবে তোমার অন্য বন্ধু বান্ধবের মধ্যে—যদি ইতিমধ্যে কেউ জুটে চিঠিখানি পড়ে লজ্জা দিও না। তোমার ভালবাসি এটা কেমন বিশ্রী শোনায়। তবে তুমি ছাড়া আমার জীবনে আর কোন সুখ নেই—আমার সকল তৃপ্তির মূল তুমি—একথা তোমায় না জানিয়ে থাকতে পাচ্ছি না।

নূতন জায়গা। এখানে এসে কিছুই আমার ভাল লাগছে না। সঙ্গী তো ঢের' তবু মন যেন অহরহঃ একটা শূন্যতার মধ্যে বিচরণ করে।

ভোর হোলে ভাবি দেশে থাকলে এতক্ষণে তোমার আসবার সময় হতো দু'জনে একসঙ্গে মিলে কত গল্পগুজবই না করেছি। আবার বিকেলে জানালায় গরাদে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছি—পথের দিকে চেয়ে, ছুটি হোলেই তুমি এখানে ছুটে আসবে।

এখন ভাবি, কতবার তোমার সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করেছি, কিন্তু ঝগড়ার পরই ভাব করবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়েছি। তুমি একদিন না এলে দশবার তোমাদের বাড়ীর পাশদিয়ে ঘুরেছি, আবার দেখা হোলে দৈবাৎ যেন সেই পথ দিয়ে যাচ্ছি এই রকম ভাণ করেছি। তোমাকে খুঁজতে গিয়ে না পেলে ভাবছি, তোমায় সঙ্গে আর কথা কইব না—একদিনও না। কত শক্ত শক্ত প্রতিজ্ঞার কথা ভেবেছি, কিন্তু দেখা হোলে সেই সব প্রতিজ্ঞার একবর্ণও আর আমার মনে থাকতো না। তুমি আর কারু সঙ্গে বেড়াতে গেছ শুনলে ভারি ঈর্ষা হতো; ভাবতেম আমায় যদি তোমার সঙ্গে দেখা হয় তবে এমন শক্ত শক্ত কথা শুনিয়ে তোমায় বিব্রত করবো আর যেন তুমি আমাদের বাড়ীতে কখনো পদার্পণ না কর। কিন্তু এত করেও কোন দিন শক্ত কথা শোনবার অবসর হয়নি'। বোধ হয় তোমার হাসিমাখা মুখখানি দেখলেই আমি সব ভুলে যেতাম।

সেবার যখন তুমি মামার বাড়ীতে আম খেতে গিয়েছিলে আমার এমন রাগ হয়েছিল যে সমস্ত আমগাছগুলো শুদ্ধ তোমার মামাকে আন্দামানে পাঠাতে পারিলে আমার আক্রোশ মিটতো। তোমার প্রতি আমার কতখানি রাগ হয়েছিল ত' আর বলে কাজ নেই। কিন্তু যখনি শুনলেম, সেখানে গিয়ে তোমার অসুখ হয়েছে তখন রাতদিন কেবলি ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছি যাতে শীঘ্র তুমি আরাম হয়ে উঠ। তারপর শুনলাম, অসুখ

অতি সামান্য—একটু সর্দ্দিগরমির ভাব। তবু আমার চিন্তা সেদিন বাড়াই ছিল। সর্দ্দিকাশি মারাত্মক ব্যাধিতে পরিণত হ'তে কতক্ষণ! চিন্তায় এই কয়দিন আমার রাত্রে ঘুম হয়নি'। ভাবলাম, একবার লুকিয়ে তোমার মামার বাড়ী গিয়ে তোমায় দেখে আসি। তোমার মামার নামটি মাত্র জানা ছিল; সেও তোমার কাছে শুনে। কিন্তু কোন গ্রাম—কতদূর কিছুই আমার জানা ছিল না। তুমি ভালয় ভালয় ফিরে এলে আমার সকল ভাবনা দূর হ'লো।

আজ কাল ভাবি তুমি কোথা বেড়াতে যাও। কে কে তোমার সঙ্গে থাকে? নদীর ওপারের সরু পথ ধরে বেড়ানোই তো আমার অভ্যাস। আজ কাল সেই স্থানটীতে রোজ যাও তো? সেখানে একলা বেড়াতে নিশ্চই আমার কথা মনে পড়ে। এখানে আমি সঙ্গীদের নিয়ে বেড়াতে গিয়ে অন্য মনস্ক হয়ে পড়ি। সঙ্গীরা নাকি ডেকেও আমার সাড়া পায় না। সেই জন্য সঙ্গীরা আমার বদনাম দিতে আরম্ভ করেছে, আমি একজন কবি, ভাবের ঘোরে সর্ব্বদা বিভোর থাকি। কোথাও একলা বসে থাকলে এখন তারা এসে আর গোলমাল করে না। একদিন পাহাড়ের ভিতর সঙ্গীদের লইয়া ঝরণার ঝরণা দেখতে গিয়েছিলুম। হু হু করে পাহাড় থেকে জল নীচে গড়িয়ে পড়ছে; ভারি সুন্দর দৃশ্য! ঝরনার ঠিক উপরে—পাহাড়ের গা বেয়ে যেতে হয়, আশ্রমের মতএকটা জায়গা আছে, কয়েকটা গাছের দরুণ স্থানটী বেশ মনোরম সেখান থেকে ঝরণা নীচে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে গড়িয়ে পড়ছে; আর জলগুলি ফেনিয়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে নানা রঙ্গের ভঙ্গি দেখা যাচ্ছে। তোমাকে না দেখলে এ দেখায় যেন কিছুতেই তৃপ্তি হয় না—এই ভাবতে গিয়ে ঝরণা দেখাটা কি ছাই! কেবল তোমার কথাই মনে হতে লাগলো। সেই হ্রদের ধারে বসে আছি; স্বচ্ছ নীল জলে তোমার ও আমার ছায়া কেঁপে কেঁপে উঠছে আলোর শিহরণের মত চঞ্চল বিস্ময় যেন চার চোখে একত্র উপভোগ করছি। তুমি ছোট বাঁশীটী নিয়ে "সাগর বেলায় বসিয়া বিরলে" গানটী বাজাবার চেষ্টা করছো। তাই দেখছি। সঙ্গীরা ভেবেছে, আমি মস্ত বড় কল্পনার ভূত নিয়ে কাব্যি সাহিত্যে পাড়ি দিচ্ছি কাজেই অনেকক্ষণ তারা আমার এ চিন্তায় বাধা জন্মায়নি'। তারপর সন্ধ্যা হলো, ফেরবার জন্য সকলেই ব্যস্ত হয়ে উঠলো কেন না পাহাড়ের ঐ রাস্তায় সন্ধ্যার পর বাঘ বেরুবার সম্ভবনা। আগন্তা একজন চুপি চুপি এসে পিছন থেকে আমার গায়ে ধাক্কা দিলেই বলে ফেলেছি

মণি। তার পত্র থেকে ওদের ধারণা হয়েছে মণি নামে নিশ্চয়ই আমার কোন প্রণয়িনী আছে। তোমার সেই অভ্যাসটী যে এখানে আর কেউ নকল করবে তাতো ভাবিনি'। মনে হয়েছিল, সেই পরীতলায় বসে আছি, তুমি পিছন থেকে চুপি চুপি এসে গায় ধাক্কা দিয়েছ। আমি এখানে বেড়াতে গিয়ে মাঝে মাঝে যেমন অন্য মনস্ক হয়ে পড়ি'—তোমার কি কখন হয় না? সেই রাত্রে ফেরবার সময় গাছের ফাঁকের টুক্‌রো আকাশ বেয়ে জ্যোৎস্না ধারা এসে পথটীকে স্বপ্ন করে দিত, তুমি আর আমি দুইজনে হাত ধরাধরি করে বাড়ী ফিরে আসতাম; সেই সব দৃশ্য। এখানেও জ্যোৎস্না রাতে পথের মাঝে চল্‌তে গিয়ে ক্ষণেক চম্‌কে উঠি, দেখি হাতের সঙ্গে আর একটী হাত নেই। আমি একলা। বলতো মনে তখন কি একটা বেদনা জন্মে। কাজেই রাত্রে উশ্রীর ওপারের খোলা মাঠ দিয়ে বেড়াতে যাই। দূরে মাঠের কোণে একখা ছোট পাহাড়, আর তার পায়ের তল য় উশ্রীর বাঁকা ফলক অস্তগামী সূর্য্যকিরণে লোহিত রাঙা হয়ে উঠেছে। দূর থেকে পাহাড়টীকে মিশরের পিরামিড বলেই মনে হয়। সেই পাহাড়ের নীচটায় অনেক গাছ পালা—সেখানে লাখ পাখীর মেলা। রাত্রিবেলাও সেখানে পাখীর কলরবে কানে তালা লেগে যায়। মানুষের মত ইহাদের সংসার যাত্রায় নানা গোলমাল, বিপ্লব ও চেঁচামেচি—এই জ্যোৎস্না রাত্রেও ইহারা চুপ করে বসে থাকতে রাজী নয়। জয়পুরেও দেখেছি, সারা রাত্রি ভরে ময়ূর ময়ূরীর অসম্ভব কেকারব—সেই তীব্র ডাকের ক্ষণমাত্র বিরাম নেই! কেবল মানুষ এই রাত্রির বিশ্রাম যা সম্পূর্ণ উপভোগ করে। কিন্তু অনাদি বিশ্বলোকের সৌন্দর্য্য তা রাত্রি বেলাই অধিক প্রস্ফুটিত হয়। দিনের বেলা তো এই ক্ষুদ্র পৃথিবী ও ঘর কন্না কাজ-কর্ম্ম নিয়েই মানুষ ব্যস্ত থাকে। কিন্তু অনাদি বিশ্বলোকের সৌন্দর্য্য যখন সহস্র ধারায় এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর উপর বর্ষিত হয়, তখন অধিকাংশ মানুষই ঘুমে অচেতন। এরা বাস্তবিক সংসারী,—সংসারের ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়েই ইহাদের সমস্ত জীবন যাত্রা কিন্তু যোগীরা নাকি গভীর রাত্রেই সাধনার উপযুক্ত সময় বলে মনে করে। কবির পক্ষেও তাই। এই অলৌকিক গ্রহ নক্ষত্রের গতি যারা রাত্রি ধরে যাঁরা পর্য্যবেক্ষণ করেন—সেই জ্যোতি পিপাসু মুনিঋষিবর্গ এই ক্ষুদ্র জগতের বাইরে বহুক্ষণ অবস্থান করেন বলে এই সংসার পরমায়ুর কাল ও ইহার সুখ ভোগের ইচ্ছা তাঁহাদের নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হয়।

এই বন্ধুত্বের স্থান ও কাল ক্ষুদ্র মনে হলেও বিশ্বসৌন্দর্য্যের উদার ক্ষেত্রে ইহাকে বরণ করে নিলে কাল প্রসারিত বিশ্ব-আত্মার সঙ্গে ইহার মিলন সংঘটিত হয়। তখন ক্ষুদ্র একের স্পন্দন বহু আত্মার তান শুদ্ধ তন্ত্রীতে সমসুরে বেজে উঠে। ইহাই আত্মার শুদ্ধ যোগযুক্ত অবস্থা। ঐখানে যেতে সাংসারিক মলিনতা ধুয়ে মুছে স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হতে হয়। তখনি আত্মার একান্ত আশ্রয়টীর [illegible] মূর্ত্তি সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ইহাই তোমার ও আমার একমাত্র পথ। ঐ যে নক্ষত্র লোকের রশ্মি অনাদি কাল থেকে ছুটে আসছে তোমাকে স্পর্শ করবার জন্য—সেই স্পর্শের যোগ্য হয়েছ কি? সকলের যে সেই রশ্মি ধরবার অধিকার নেই। সেই স্পর্শ বুকের ভিতর ধরে রাখতে হয়, নয়নাসারের অমৃতবারি দিয়ে তাঁকে চিরসিক্ত রাখতে হয়, আনন্দ সুরভির পবিত্র হিল্লোলে তাঁকে চির নবীন করে রাখে তবেই প্রেমের দিব্য মূর্ত্তি দেহ মনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। নীচ স্বার্থ লালসা চরণে দলিয়া সে পথে যাত্রা করতে হবে। এই বন্ধুত্বের পিপাসার ভিতর যে একটা আত্মবলিদানের আকাঙ্ক্ষা আছে, সেই আকাঙ্ক্ষার বলেই তুমি সংসারে জয়ী হয়ে চলতে পারবে। ইহারি নাম বন্ধুর দান—এক কথায় ত্যাগ মন্ত্র। এই ত্যাগ মন্ত্র তোমার মাথায় করে চলতে হবে—সংসারের ধূলিকনায় ইহাকে মলিন হতে দিও না! এই পবিত্রতা যতদিন বজায় থাকবে ততদিনই নিরাপদ। নয়তো পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়বার মত তুমি অনেক খানি নীচে গড়িয়ে পড়বে, আর সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুত্বের স্বর্ণসূত্রখানি ছিঁড়ে কুটি কুটি হবে। জেনো একটু নীচ কাজের প্রলোভনেই বন্ধুত্বের স্বর্ণসূত্র খসে পড়ে। কাজেই তোমার যাত্রার পথে পবিত্রতাই একমাত্র সম্বল। এই সম্বল হারালে তোমাকে পিছিল পথে গড়িয়ে পড়তে হবে।

এস এই আদর্শ ধরে যাত্রা করি। তোমার আমার একপথ। তুমি আমি দুইজন এই নব যুগের সাথী। যে মহত্ত্বের সংকল্প নিয়ে দেশে এই নব যুগের বন্যা এসেছে, তাকে বিফল হতে দিও না।

বহুকাল পরে নবযুগের এই শঙ্খধ্বনির সঙ্গে স্বর্গে থেকে জীবন গঙ্গা নেবে এসেছে। এতে স্নান করে জীবনের সমস্ত ক্লেশ ক্লান্তি ধুয়ে মুছে সার্থক কর। এই পবিত্র গঙ্গায় বাধা জন্মালে তুমি বিচূর্ণ হবে—তোমার উর্দ্ধতন [illegible] পিতৃপুরুষগণের অভিশাপের ফল ভাগী হবে। আজ এই পিতৃতর্পণের দিনে পূতগঙ্গা বারির নাম করে দাসত্বের অস্থিখণ্ডের অংশ দিও।

এস সাহসী! এস বীর! এস নবযুগের নায়িক! এস বন্ধুর [illegible] জীবনে

পরিহার করে লক্ষ্য পথে যাত্রা করি। যাত্রা সফল হবেই হবে। আর এই ক্ষুদ্র সংসার, পরমায়ু—দু'দিনের মধ্যস্থায়ী,—এই ক্ষুদ্র স্বার্থে বশীভূত হবে মহান আত্মাকে হেলায় বিসর্জ্জন দিবে—এ হতেই পারে না। এস হাত ধরাধরি করে দু'জনে একই লক্ষ্য পথে যাত্রা করি।

একই সাধনা—এক মহাসিদ্ধি জগতের সাথে এক সাথে উপভোগ করি।

"বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো,
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।"

তোমার একান্ত—ভালবাসার * * *

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।

শারদা।

আকাশে ভাসায়ে কিরণ-তরণী, উড়ায়ে পতাকা বারিদ-চূর্ণে,
শেফালি বিছানো আঙ্গিনায় আজি একি রূপে এলি অন্নপূর্ণে!
চরণে লুটায় দুর্গ-দানব, শিরোপরি তা'র গরজে সর্প,
দক্ষিণ-পদ-পরশ-দৃপ্ত সিংহ নাশিছে অসুর দর্প;
শরত প্রকৃতি শারদা সেজেছে আলোকে পুলকে প্লাবিয়া বঙ্গ,
পরবাসী যত ধন্য রে আজি লভিয়া স্বরাসে জননী-সঙ্গ।
রক্তবসন অঙ্গের রাগে সাজি' গজাস্য যোগেশ কৃষ্ণ;
ময়ূর-আসনে দেবসেনাপতি, হস্তে শক্তি শোণিত-তৃষ্ণ;
মেঘ-লোকে শিব বাজায় ডমরু, হাসিছে দু'পাশে বাণী ও লক্ষ্মী,
অসুর-শোভন দশ ভুজে মাগো জাগে দশদিকে সজাগ রক্ষী;
শরত প্রকৃতি শারদা সেজেছে আলোকে পুলকে প্লাবিয়া বঙ্গ,
পরবাসী যত ধন্য রে আজি লভিয়া স্বরাসে জননী-সঙ্গ!
চামর দুলায় কাশের গুচ্ছ, সোণা ঢালে পায় ধানের ক্ষেত্র,
কূলে-কূলে ভরা নদী গেয়ে চলে হরষ বাপে ভরিয়া নেত্র;
নীলিমায় সেজে আধঘুম-ঘোরে জ্যোৎস্না ছড়ায়ে শারদ-চন্দ্র,
পূজাপ্রাঙ্গণে পঞ্চাস্যননে 'মিশিছে বাণীর মধুর মন্ত্র;
শরত প্রকৃতি শারদা সেজেছে আলোকে পুলকে প্লাবিয়া বঙ্গ,
পরবাসী যত ধন্য রে আজি লভিয়া স্বরাসে জননী-সঙ্গ।
বরণে ভূষণে সাজি নরনারী চলে ঘাটে পথে পরমহর্ষে,
চিরবাঞ্ছিত আত্মীয় যে এ-দিবসগুলি সারাটী বর্ষে;
প্রীতিভরা মুখ মধুভরা বুক শিশুরা হাসিয়া চপল হাস্য,
পথে পথে লুটি' পরমানন্দে ভাসিছে গড়িছে দেবীর ভাষ্য;
শরত প্রকৃতি শারদা সেজেছে আলোকে পুলকে বঙ্গ,
পরবাসী যত ধন্য রে আজি লভিয়া স্বরাসে জননী-সঙ্গ।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

প্রহরী।

তুমি কোন্ পথ দিয়ে যাবে ; আমি সকলি জেনে যে গিয়েছি,
হৃদয় রুধিরে আলিপনা আঁকি সকল পথেতে দিয়েছি ।
আকাশে বাতাসে রেখেছি শ্রবণ,
তপন কিরণে ঝলসে নয়ন
মেঘের আড়ালে গোপন গমন রূপের বিভায় পেয়েছি
তুমি কোন্ পথ দিয়ে যাবে আমি সকলি জেনে যে গিয়েছি।
ফুলেতে রয়েছে ঘ্রাণ
সুরেতে বাঁধা যে প্রাণ
আকুল কল্পনা ভারকা জোছনা
সকলে গিয়ানো কামনা বাসনা
ওই স্বচ্ছ সরসী জলে
ওই সিন্ধু তরঙ্গ তলে
নয়ন প্রহরী সদাই জাগ্রত পলক ফেলেনা আর
শতি মৃদুতর শবদেহে চিত চমকিত বারেবার
চাহিনা স্বরগ চাহিনা গোলক
সেথানে পাব কি এ হেন পুলক
তোমারি আশায় রোমাঞ্চিত দেহ :—
কি যেন কি সুখে রয়েছি
(ওগো) তুমি কোন পথ দিয়ে যাবে আমি
সকলি জেনে যে গিয়েছি ।

শ্রীহৃষিকেশ মল্লিক ।

দেবতার আবির্ভাব।

শ্রুতি ব্রহ্মের দুইটি অবস্থার বর্ণন করিয়াছেন—অপ্রকাশাবস্থা ও প্রকাশাবস্থা।

"এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মান প্রকাশতে।"

ইনি সর্ব্বভূতের মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া আছেন, প্রকাশিত হন না।

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।"

সেই অদ্বিতীয় দেবতা সর্ব্বভূতে গূঢ়রূপে বিদ্যমান তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষ, সর্ব্বভূতে অবস্থিত, সাক্ষী চেতয়িতা এবং নির্গুণ।

"অঙ্গুষ্ঠ মাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।"

সেই পুরুষ অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত, তিনি আমাদের আত্মার মধ্যে অবস্থান করেন।

"ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমাস্য।"

তাঁহার রূপ আমাদের দৃষ্টি গোচর হয় না। এইরূপ বহুশ্রুতিতে ব্রহ্মের অপ্রকট অবস্থা কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই অপ্রকট অবস্থাই তাঁহার স্বরূপাবস্থা। এই অবস্থা সম্বন্ধেই শ্রুতি বলিয়াছেন, যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে মনসা সহ"—অর্থাৎ আমাদের বাক্য ও মন যাঁহাকে ধরিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসে, বাহা অবাঙমনসাগোচর। পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে spinoza ইহাকে "absolutly indeterminate substance" বলিয়াছেন। Kant ও Herbert Spencer ইহাকে "Unknowable" বলিয়াছেন। Kantএর মতে আমাদের জ্ঞান ও নাম্নিক জগতে (phenomenal world) সীমাবদ্ধ, বস্তুর প্রকৃত সত্তা আমাদের জ্ঞানের অগোচর।* "(Things in themselve are unknowable) Hegel যাহাকে "absolute sprit" বলেন, তাহাও নামরূপবিহীন বিশুদ্ধ সত্তা।

* "To know is to synthetise ; you cannot synthetise synthesis"—Wallaces Logic of Hegel cf. "বিজ্ঞাতার মরে কেন বিজ্ঞানীয়াৎ"—শ্রুতি।

কিন্তু ব্রহ্ম এই স্বরূপাবস্থায় অপ্রকট থাকিতে চাহেন না। তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, ("তৎ-সৃষ্টা তদেবানু প্রাবিশৎ" —শ্রুতি)।

"যো দেবোঽগ্নৌ সোঽপ্সু যোবিশং ভুবন মাবিবেশ।
স ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈদেবায় নমোনমঃ॥"

যে দেবতা অগ্নিতে ও জলে, ওষধিলতা ও বৃক্ষে, প্রবিষ্ট হইয়া আছেন তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

"অগ্নি র্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরূপনা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।"

যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া দাহ্যবস্তুর আকারভেদে সেই সেই আকার প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থিত একই আত্মা বস্তু ভেদে সেই সেই বস্তুর আকার প্রাপ্ত হন, আবার তিনি তাহাদের বাহিরেও আছেন। তিনি এই জগতে ওতপ্রোতভাবে আছেন, কিন্তু এই জগৎ তাঁহার একাংশে অবস্থিত।

"ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্র তারকম্
নেমাবিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥"

যেখানে সূর্য্য কিরণ দেয় না, অর্থাৎ ব্রহ্মকে সূর্য্য প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্রতারকা তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, সেখানে বিদ্যুতেরাও প্রকাশ পায় না, অগ্নিই বা সেখানে কোথা হইতে আসিবে? চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র বিদ্যুৎ বা কি ইহারা সকলেই তাঁহার প্রকাশে প্রকাশমান তাঁহার দীপ্তি দ্বারাই ইহারা স্ব স্ব তেজ বা আলোক পাইতেছে। একমাত্র তিনিই ইহাদের মধ্যে প্রকাশমান হইয়া আছেন।

"ব্রহ্মৈবেদ মমৃতং পুরস্তাদ্
ব্রহ্মপশ্চাদ্ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্দ্ধশ্চ প্রসৃতং
ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম॥"

এই অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মই অগ্রে, ব্রহ্মপশ্চাতে, ব্রহ্ম দক্ষিণে, এবং উত্তরে, ব্রহ্ম অধোদেশে এবং ঊর্দ্ধদেশে বিস্তৃত হইয়া আছেন—সেই শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মই এই জগৎ-রূপে ব্যক্ত হইয়া আছেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ব্রহ্মের এই জগদ্ব্যাপী অবস্থাকে Innocent বলেন। ক্যাণ্ট্ যদিও তাঁহার "Unknowable" কে "Phenominal world" এর বাহিরে রাখিয়াছেন, তবুও তিনি একথা বলেন যে Noumena (thing in itself) সৎবস্তু হইতে Phenomina বা মায়িক জগতের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই মায়িক জগৎ সৎবস্তুর সত্তায় সত্তাবান্। আমাদের বাহিরের জগৎ আমরা নিজেরাই মানসিক ক্রিয়া দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি, সুতরাং তাহা আমাদেরই মনের অভিব্যক্তি। *

কিন্তু হিগেল Knowable ও Unknowable—Phenomena ও noumina ইহাদের মধ্যে যে প্রাচীর ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়া আত্মা বা ব্রহ্ম হইতে জীব-জগতের পরিণতি (development) অতি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে "Pure being is equivalent to nothing"—অর্থাৎ নামরূপ বিবর্জ্জিত বিশুদ্ধ সত্তা বলিতে যাহা, কিছু নয় বলা ও তাহা। কিন্তু তাঁহার nothing মানে শূন্য নহে। nothing মানে no-thing. কিছু নয় ভাবিতে গেলে আমরা কিছু না ভাবিয়া পারি না—"nothing exists as something thought" কিছু হইতে কিছু-না আবার কিছু-না, হইতে কিছু কি করিয়া হয়? ইহা যে

"না সতো বিদ্যতে ভাবো
না ভাবো বিদ্যতে সতঃ"—

গীতার এই শ্লোকের বিপরীত কথা। না, ইহা অসম্ভব নহে। বালক যখন বালক থাকে তখন সে বৃদ্ধ থাকে না, আবার বালক যখন বৃদ্ধ হয় তখন সে বালক থাকে না। অথচ বালক ও বৃদ্ধের মধ্যে একটা সংযোগ রহিয়াছে, সেই সংযোগের নাম "becoming"—অর্থাৎ ক্রমপরিণতি। একই বস্তু সত্তা বালকত্ব হইতে বৃদ্ধত্বে পরিণত হইয়াছে—বালকত্ব ও বৃদ্ধত্ব সেই বস্তুর মায়িক প্রকাশ (Phenomener) মাত্র—সেই বস্তু সত্তা মূলে একই রহিয়েছে।

* "Our world is a mental growth not our individual Product but the work of that Common mind in which we live, and think, and its lives and thinks in us"—Wallaces Logic of Hegel

সেইরূপ ব্রহ্মের সত্তাই জগতের আকারে পরিণত (বা বিবর্ত্তিত) হইয়াছে, জীব-জগৎ ব্রহ্মের বহিঃ প্রকাশ—("The Idea externalises itself and so we get Nature")

কিন্তু ব্রহ্মের এই জগৎ-রূপে প্রকাশিত হওয়ার কারণ কি?

"একোঽহং বহুঃ স্যাম্"—এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বহু হইতে বাসনা করিয়া নিজের সঙ্কল্প বলে এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার এই সঙ্কল্প (Idea) ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য আকার ধারণ করিলে আমরা তাঁহাকে বলি বাস্তব জগৎ (actual) এই Idea (সঙ্কল্প) মনস্তত্ত্ব বিশেষ—সুতরাং ইহা ব্রহ্মস্বরূপ নহে। ইহা যত-ক্ষণ ব্রহ্মস্বরূপ হইতে অবিচ্ছিন্ন (undifferentiated) থাকে, ততক্ষণ কোন সৃষ্টি ক্রিয়া হয় না। ইহা সৃষ্টি ক্রিয়ার উদ্দেশ্যে ব্রহ্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া জীব জগতে পরিণত হয় ও পরে সেই জীব-জগতের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া আবার ব্রহ্ম-স্বরূপে ফিরিয়া আসে। "The Idea not content with the development in nature, returns to bring ourself called spirit".

আমরা এইরূপে দেখিলাম হিগেলের মতে ও জীব-জগৎ ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি (development) সেই একই বহু হইয়াছেন—বহু সেই একেরই রূপান্তর—"One in All, All in one."

"মত্তঃ সর্ব্বমহং সর্ব্বং ময়ি সর্ব্বং সনাতনে।"

বিষ্ণু-পুরাণে, প্রহ্লাদের বিষ্ণুস্তব।

যিনি নিজের সঙ্কল্প বলে এই অনন্ত বিশ্বব্যাপী বিরাটরূপ ধারণ করিতে পারেন, তিনি কি ইচ্ছা করিলে ক্ষুদ্র অবয়ব বিশিষ্ট সাকাররূপ ধারণ করিতে পারেন না? অবশ্যই পারেন! কারণ ক্ষুদ্র হইতেই বিরাটের অভিব্যক্তি সাঙ্কেতে মধ্যেই অনন্তের প্রকাশ। আমাদের বেদপুরাণাদি শাস্ত্রে ভগবানের এই প্রকার সাকাররূপে আবির্ভাবের অনেক প্রমাণ আছে।

কেনোপনিষদে আছে দেবাসুর সংগ্রামে বিজয়দৃপ্ত ইন্দ্রাদি দেবগণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য একবার ব্রহ্ম যক্ষরূপ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায় নিমিষের জন্য। সেই যক্ষের তিরোভাবের পরে,

"স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম
বহু শোভমানা মুমাং হৈমবতীং।"

ইন্দ্র আকাশে পরম সুন্দরী একটী স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন, তাঁহার নাম হৈমবতী উমা। তিনি [illegible]

হইয়াছিলেন, ব্রহ্মের বিজয়েই দেবগণ মহিমান্বিত হইয়াছেন: বলা বাহুল্য হৈমবতী উমা ব্রহ্মশক্তি, শক্তিদ্বারাই শক্তিমানের পরিচয় পাওয়া যায়।

আর একবার এই ব্রহ্মশক্তি বা বিষ্ণুমায়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে রক্ষা করিবার জন্য দেবগণের শরীরের তেজোরাশি হইতে সমুদ্ভূত হইয়া মহিষাসুরকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন।

আর একবার তিনিই শুম্ভনিশুম্ভ দৈত্যকর্ত্তৃক স্বর্গরাজ্য হইতে বিতাড়িত দেবগণের স্তবে তুষ্ট হইয়া হিমাচলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং দৈত্যগণকে মহাযুদ্ধে বিনাশ করিয়া দেবগণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

তিনিই আবার মর্ত্ত্যলোকে ঋগ্‌বেদোক্ত অম্ভৃণঋষির গৃহে বাক্-নাম্নী কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া এইরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন,—

"অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি
অহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্মি
অহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥"

"আমিই একাদশ ও রুদ্ররূপে বিচরণ করিতেছি, আমিই সমস্ত বসুরূপে অবস্থান করি, আমিই বিষ্ণু প্রভৃতি দ্বাদশাদিত্য হইয়া বিচরণ করি, আমিই সমস্ত দেবগণের আকারে অবস্থিতি করিতেছি। আমিই আত্মরূপে অবস্থিতি করিয়া মিত্র ও বরুণকে ধারণ করিতেছি আমিই ইন্দ্র এবং অগ্নিকে ধারণ করিতেছি, আমিই অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ধারণ করিয়া আছি। কারণ আমাতেই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিতি করিতেছে, আমার সত্তাই এই ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা। যে মায়া দ্বারা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লিখিত হইয়াছে, অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় সেই মায়া আমাতেই অবস্থিতি করিতেছে।"

এইরূপে সেই পরমদেবতা পুণ্যবান্‌দিগের রক্ষার জন্য ও দুষ্কৃতিদিগের বিনাশের জন্য, এবং কখনও কখনও ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য, যুগে যুগে বিবিধরূপ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হন। তিনি এইরূপে আবির্ভূত হন বলিয়াই মানবগণ তাঁহার সেই সকল মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া তাঁহার উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে। নচেৎ সাধারণ মানব কখনও তাঁহার বিশ্বব্যাপী বিরাটরূপের অথবা তাঁহার "অশব্দ-অস্পর্শ-অরূপ-অরস" ভাবের সম্যুধীন হইয়া তাঁহার উপাসনা করিতে পারিত না।

এ স্থলে কথা হইতে পারে, সান্ত সাকার রূপের ধারণা দ্বারা ত অনন্তের উপলব্ধি হয় না। সুতরাং মানব সাকার উপাসনা দ্বারা তাঁহাকে কি প্রকারে লাভ করিবে?

মহামতি ক্যাণ্ট বলেন, আমাদের জ্ঞান মাত্রই সসীম (relative) অনন্ত সত্তার জ্ঞান আমাদের পক্ষে অসম্ভব। তাই আমাদের অনন্ত ঈশ্বরের জ্ঞান হইতে পারে না। তবে তিনি আমাদের জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি ও বিশ্বাসের বিষয়ীভূত হইতে পারেন। সেই বিশ্বাস ও ভক্তি আমাদের একমাত্র উপজীব্য। ক্যাণ্ট এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর হিগেল বলেন অনন্তের জ্ঞান যে একেবারে অসম্ভব তাহা নহে। বিশেষ সত্তা অবলম্বনে বিশেষ সত্তার মধ্যে আমাদের অনন্তের জ্ঞান হয়।

"Hegel seeks out the universal notes without the particular but in it It should not find the Infinite beyond the finite, nor the absolute at an unattainable distance above the world, or the essence hidden behind the phenomena, but manifesting therein" (Falckenburg.)

অর্থাৎ হিগেল অনন্তসত্তাকে জগৎ হইতে এতদূরে স্থাপন করেন না যে, তাঁহাকে ধরা-ছোঁয়া যায় না, তিনি আত্মাকে মায়িক জগতের মধ্যে লুকাইয়া রাখিতে চাহেন না, মায়িক জগতের মধ্যে প্রকটরূপে দেখাইতে চান। তাঁহার Subjective Spirit বা জীবাত্মা objective sprit or জীব জগতের মধ্য দিয়া absolute পরমাত্মার সহিত মিলিত হইতে যায়। তিনি সান্ত জীবের অনন্ত ব্রহ্মের সহিত মিলনের তিনটি উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—Art, Religion Philosophy হিন্দুর সাকারোপাসনা বা প্রতিমা পূজাতে এই তিনটী পথ মিলিত হইয়াছে। হিন্দুর প্রতিমা পূজা দার্শনিক শিরোমণি হিগেলের আবিষ্কৃত উচ্চতম দার্শনিক সিদ্ধান্তদ্বারা সমর্থিত।

আর্ট অনন্ত হইতে অনন্তে লইয়া যাইবার প্রথম সোপান। আর্ট-মাত্রেই সৌন্দর্য্যের উপাসনা, কোন বিশেষ (cannot) সুন্দর বস্তুর ধ্যানের দ্বারা

* "Knowledge is of the relative—but an absolute and unconditional totality has no relations. We may therefore possibly feel, believe in, presuppose it is absolute, but know it in the srricter sense we cannot. It may be the object of a rational faith" * * * "we live by admiration, hope and love"—Wallace Logic of Hegel.

সেই অনন্ত চির সুন্দরের অগাধ সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া যাওয়া Wallace যথার্থ বলিয়াছেন,—

"All true art whether it awakes awe or admiration, laughter or tears, whether it melts the soul or steels it to endurance has a common characteristic and that is to raise the single instance, the prosaic or common place fast into its universal eternal infinite significance."

আর্ট তিন প্রকার। প্রথম "symbolic art" অর্থাৎ আর্টের বস্তু একটা প্রতীক বিশেষ, তাহার নিজের মধ্যে কোন সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি নাই। তাহা ব্যঞ্জনা (suggestion) দ্বারা অনন্তের ভাব জাগাইয়া তোলে। আমাদের শালগ্রামশিলা, শিব লিঙ্গ এই শ্রেণীর আর্ট।

দ্বিতীয় প্রকারের আর্টের নাম "classic art" তাহাতে কল্পিত বস্তুর (প্রতিমার) নিজের সৌন্দর্য্য আছে আবার তাহা যে ভাবদ্যোতনা করে তাহার ঐ সৌন্দর্য্য আছে। বস্তুর সৌন্দর্য্য ও ভাবের সৌন্দর্য্য সমান পরিমাণে মেশামিশি, মাখামাখিভাবে থাকিয়া আমাদিগকে অনন্তের পথে লইয়া যায়। গ্রীকদিগের ভাস্করমূর্ত্তি অধিকাংশ এই শ্রেণীর। হিন্দুদের প্রত্যেক দেবদেবীর মূর্ত্তি এইরূপ উভয়বিধ সৌন্দর্য্যের আকর।

তৃতীয় প্রকারের আর্টের নাম "romantic art" ইহার মধ্যে বস্তুর সৌন্দর্য্য অপেক্ষা ভাবের দ্যোতনা অনেক বেশী। যেমন আমাদের কালীমূর্ত্তি বা নটরাজ শিবমূর্ত্তি। অন্যান্য দেবদেবীর মূর্ত্তিও ধ্যান করিতে করিতে ভক্তের চিত্ত যখন বস্তুর সৌন্দর্য্য ছাড়াইয়া ভাবে তন্ময় হইয়া উঠে, তখন সেগুলিও romantic art. এর নিদর্শন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন চিত্রকলা, সঙ্গীত কাব্য ও romantic art.

আপাতদৃষ্টিতে জড় ও চৈতন্যকে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া মনে হয়। ইতিপূর্ব্বে দেখান হইয়াছে জড় ও চৈতন্যের মধ্যে যে প্রাচীর ছিল তাহা হিগেল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন, আমরা যাহাকে জড় ও চৈতন্য বলি তাহার মধ্যে মূলতঃ ভেদ নাই, তাহারা উভয়েই পরমাত্মার (universal or absolute spirit) অভিব্যক্তির প্রকার ভেদ মাত্র (different process of devolopment) সুতরাং আমরা যাহাকে জড় বলি, তাহার

মধ্যে চৈতন্য সুপ্ত অবস্থায় আছে ("intelligence petrified")—আমরা জড়ের মধ্যে চৈতন্যের কল্পনা করি না, সৃষ্টিও করি না, আমরা কেবল তাহা উপলব্ধি realise করি। জীব পশুর মধ্যে চৈতন্যে পদার্থ স্বতঃস্ফূর্ত্ত—তাহা আমাদের চোখে সহজেই ধরা পরে—যেমন ফুলের মধ্যে সৌন্দর্য্য। উদ্ভিদের মধ্যে যে চৈতন্য আছে, তাহাও জীব জন্তুর মধ্যস্থ চৈতন্যের ন্যায় সুখ দুঃখের সাড়া দেয়, এই তত্ত্ব আচার্য্য স্যর জগদীশচন্দ্র বসু তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন। উদ্ভিদের নিম্নস্তরের যে জড় পদার্থ (মাটী, পাথর ইত্যাদি,) তাহাদের মধ্যেও চৈতন্য সুষুপ্ত আছে, তাহাকে জাগাইবার উপযুক্ত যন্ত্র আবিষ্কৃত হইলেই তাহা ধরা পড়িবে। জড় প্রতিমূর্ত্তির মধ্যে চৈতন্য আছে বলিয়াই তাহা আমাদের আত্মচৈতন্যের নিকট সাড়া দেয়, জড়প্রতিমাটী আমাদের দিকে তাকাইয়া হাসে, কথা কয়। এই ঐক্যের কারণ, যে পরমাত্মা মানুষকে হৃদয়ে বসিয়া দেখিতেছেন, তিনিই জড় প্রতিমার অভ্যন্তরে বসিয়া দেখা দিতেছেন ("The lord of nature is one with the lord of the human soul"—Wallace.) সুতরাং জড়প্রতিমার মধ্যে চৈতন্যের আবির্ভাব আমাদের মনের কল্পনা নহে, তাহা সত্য। শিল্পী তাঁহার কল্পনা দ্বারা সেই আবির্ভাবকে প্রস্ফুট করিয়া তোলেন। তারপরে পুরোহিত তাঁহার মন্ত্রদ্বারা এবং ভক্তসাধক তাঁহার ভাবগর্ভ চিন্তা ও ধ্যানের দ্বারা সেই প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। যিনি সাধনমার্গে যত অধিক অগ্রসর, সেই জড়প্রতিমা তাঁহার নিকট তত অধিক প্রাণবন্ত হইয়া সাড়া দেয়। তুমি আমি স্থূলস্তরের মানুষ যে কালীমূর্ত্তিকে পুতুল বলিয়া মনে করি, পরম সাধক রামকৃষ্ণপরমহংসের নিকট তাহা "মৃণ্ময় আধারে চিন্ময়ীমূর্ত্তি"রূপে দেখা দিতেন।

আর্টের দ্বারা কল্পিত মূর্ত্তিতে এইরূপ ভাবে দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইলে, তখন তাঁহার পূজা আরম্ভ হয়। এই পূজা "religion" এর ব্যাপার। হিগেলের এই "religion" জ্ঞান-মিশ্রাভক্তির সাধনা।

"Religion is not merely a feeling of piety, but a thought of the absolute only not in the form of thinking."* Wallace বলেন,—

"The essence of religion, of course for Hegel, as for other exponents of its inmost nature, is a feeling of the gulfs and

* Falckanberg's History of modern Philosophy. (Hegel)

separations of peculiar consciousness, which sees with the believing soul, the inner place, the absolute harmony of true reality.....The sense of utter dependance on God, in complete identity with the sense of absolute independence in God—the strength of faith is the very life religion.*

"In philosophy absolute spirit attains the highest stage, its perfect self-knowledge. It is the self-thinking Idea."
(Falckenberg Hegel.)

এইরূপে আমরা দেখিলাম, মানবাত্মা কি প্রকারে art, religion, philosophy দ্বারা পরমাত্মার সহিত মিলিত হইতে পারে। পরম জ্ঞানী আর্য্য ঋষিগণ যে সকল নিগূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব অবলম্বনে আমাদের উপাসনা পদ্ধতি প্রণয়ন করিয়াছেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের তত্ত্বানুসন্ধানে এখন তাহার কিছু কিছু আবিষ্কৃত হইতেছে। আমাদের দুর্গা-পূজায় যে চণ্ডী পাঠ হয়, সেই চণ্ডীর সক্রাদিস্তবটী একবার প্রণিধান করুন। দেবগণ মহিষাসুর বিনাশের পরে মহামায়ার এইরূপ স্তব করিতেছেন,—

"ঈষৎ সহাস্যাননং অরিপূর্ণচন্দ্র—
বিম্বানুকারি কনকোত্তম কান্তিকান্তম্।
অত্যদ্ভুতং প্রহৃতমাত্তরুষা তথাপি
বক্ত্রং বিলোক্য সহসা মহিষাসুরেণ॥"

তোমার ঈষৎ হাস্য সমুদ্ভাসিত সুবর্ণ বর্ণোজ্জ্বল নির্ম্মল মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্র বিম্বকে পরাস্ত করে। তোমার সেই মুখমণ্ডল দর্শন করিয়াও মহিষাসুর মোহিত না হইয়া তোমাকে যে প্রহার করিল ইহাই আশ্চর্য্য।

(দেবী প্রতিমার সম্মুখে বসিয়া সাধনা করিতে করিতে, আর্টের চরম বিকাশ দ্বারা ভক্তের চিত্ত অনন্ত সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া গিয়াছে)

"কিং বর্ণয়াম তব রূপ মচিন্ত্য মেতৎ
কিঞ্চাতিবীর্য্যমসুরক্ষয়কারী ভূরি।
কিঞ্চাহবেষু চরিতানি তপতিষানি
সর্ব্বেষু দেবাসুর দেবগণা দিতেষু॥"

হে দেবি! তোমার রূপের আমরা কি বর্ণনা করিব, কারণ সেরূপ আমাদের চিন্তার অতীত। তোমার অতুলনীয় পরাক্রম অসুরক্ষয় করিয়া

থাকে সুতরাং তাহাও অচিন্তনীয়। তুমিও দেবাসুর যুদ্ধে অসুর ও দেবগণের মধ্যে যে চরিত্র প্রকটিত করিয়াছ, তাহাও আমাদের বাক্য ও মনের অতীত। তাহাই বা আমরা কিরূপে বর্ণনা করিব?

[এখানে বিশেষ বিশেষ রূপ, কার্য্য বা ঘটনা অনন্তের আভাস দিতেছে। পরবর্ত্তী শ্লোকে এই আভাসের পূর্ণ অভিব্যক্তি।]

"হেতুঃসমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ
র্ন জ্ঞায়সে হরি হরাদিভি রূপপরা।
সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত—
মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা।

তুমি সমস্ত জগতের কারণ ত্রিগুণময়ী অব্যাকৃতা পরা প্রকৃতি। ব্রহ্মাদি দেবগণ এক এক বিশেষ গুণ প্রধান বলিয়া তোমার সেই ত্রিগুণাসাম্যাবস্থা পরাপ্রকৃতিরূপ জানিতে পারেন না। তুমিই অখিল বিশ্বের আশ্রয় হইয়া এই চরাচরাত্মক বিশ্বরজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় তোমাতেই আশ্রয় করিয়া আছে। কিন্তু তাই বলিয়া তুমি জগৎরূপে অভিব্যক্ত হও নাই, জগৎ কেবল তোমার একাংশে অবস্থিত।

[এখানে সাধক ভগবতীর অসুর নাশিনীরূপে বিশেষ প্রকট মূর্ত্তি অবলম্বনে, তাঁহার পরাপ্রকৃতিরূপ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছেন। ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকে তিনি যে ব্রহ্মস্বরূপিনী ব্রহ্মবিদ্যা এই তত্ত্বে উপনীত হইতেছেন।]

"যা মুক্তি হেতু রবিচিন্ত্য মহাব্রতা চ,
অভ্যস্যসে সুনিয়তেন্দ্রিয় তত্ত্বসারৈঃ।
মোক্ষার্থিভি র্মুনিভিরস্তসমস্ত দোষৈ-
র্বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমাহি দেবী॥"

তুমিই মুক্তির কারণ পরমা ব্রহ্মবিদ্যা। মোক্ষাভিলাষী মুনিগণ রাগদ্বেষাদি সমস্তদোষ পরিহার পূর্ব্বক সংযতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইয়া তোমাকেই দিব্যাসনাদি অভ্যাসের দ্বারা চিন্তা করেন।

এই স্তবের মধ্যে দেখিলাম সাধক কি প্রকারে দেবতার স্থূলরূপ অবলম্বে ধ্যান করিতে করিতে জ্ঞান মিশ্রাভক্তির সাহায্যে ক্রমে তাঁহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে উপনীত হইয়া পরিশেষে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারেন। আমরা এইরূপে দেখিলাম হিন্দুর ধর্ম্মোৎসবাদি প্রতিমা পূজাতে art, religion ও philosophy কিরূপে মিলিত হইয়াছে। আমরা দেখিলাম, সচ্চিদানন্দ

যখন তাঁহার স্বরূপে অবস্থান করেন, তখন তিনি আমাদের উপাসনার বিষয় হইতে পারেন না। আবার তিনি যখন তাঁহার বিশ্বব্যাপী বিরাট মূর্ত্তিতে বিরাজমান থাকেন, তখনও আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিদ্বারা তাঁহার ধারণা করিতে পারি না। তিনি যখন পুণ্যাত্মাদিগের রক্ষা, দুষ্কৃতিদিগের বিনাশ সাধন এবং জগতে ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য বিশেষ বিশেষ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন, আমরা তাঁহার সেই সেই বিশেষ মূর্ত্তি অবলম্বনেই তাঁহার উপাসনা করিতে পারি। আমরা আর্টের সাহায্যে সেই সকল মূর্ত্তি রচনা করিয়া, তাহাদের অবলম্বনে অনন্ত হইতে অনন্তের উপলব্ধি করিতে পারি এবং ভক্তি ও জ্ঞানের সাধনা দ্বারা তাঁহার সহিত মিলিত হইতে পারি। তখন তাঁহাকে সর্ব্বভূতে বিরাজমান্ দেখিয়া সাধক ভক্তি গদগদচিত্তে তাঁহার স্তব করেন,—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

* * * * *

ইন্দ্রিয়ানামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

* * * * *

চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

কবির ব্যথা।

সারাদিন খেটে খেটে
পেটে ধরে খিল্,
কখন কবিতা লিখি—
জড় করি মিল্?
জুতো জোড়া বেঁকে গেছে
ভেঙে গেছে হিল্—
একটুতে চৎ করে'
চটে' ওঠে দিল্।

অনুপ্রাস ঘরে নাই
শাড়ি নাম তিল—
ছাতা নাই জুতা নাই
কেঁচো কিল্ বিল্।
পেয়াদা হাঁ হাঁ করে
আসে যেন চিল—
দাও দাও—না দিলেই
খেতে হয় ঢিল্।
দিনে খেতে পাওনাদার
নিয়ে আসে বিল্—
বাক্সে নাই কাণাকড়ি—
একেবারে 'নীল্'।
ছোট বড় দুটো কথা
মারে যেন কিল্—,
একেবারে উপে যায়
'পইটিক্ ঝিল্"!
খাই ভাত শাক রুটী,
ঝোল নয় ঝিল্—
তার চেয়ে খাওয়া ভাল
'ফুই নাইন্ ফিল্'।
"বই ছাপা হ'—জোটে নাক
শ্লেট পেন্সিল্—
এ বয়সে কার বল
ভাঙি তহবিল্?
জীবনটা নহে 'প্লেন'—
শুধু 'আপ্ হিল্'—
রূপচাঁদ বিনে ভায়া
সব গণ্ডমিল্।

শ্রীঅঙ্গদা মুখোপাধ্যায়।

ইরাক্

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

(৩)

বলিয়াছি রাজনীতির চর্চ্চার জন্য ইরাকে বিশেষ করিয়া কোন সভাসমিতি ডাকিবার আবশ্যক মোটেই হয় না। তাহাদের জীবন যাত্রা প্রণালী এমনই ভাবে গঠিত, তাহাদের ধর্ম্মের ভিত্তি এমনই পাঁচ জনের মিলনের উপর প্রতিষ্ঠিত যে, দিনের কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহারা তাহাদের ধর্ম্মমন্দিরে সমবেত হইয়া কেবল যে ধর্ম্মালোচনাই করিয়া থাকে তাহা নহে, পরন্তু তাহাদের সেই ধর্ম্মমন্দিরগুলি মসজিদই হউক, আর গির্জ্জাই হউক বা সিনাগগই হউক্—সামাজিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ব্যাপারের ভাব চালনায় সম্যক সহায়তা করে। ধর্ম্মক্ষেত্রের আবরণের মাঝখানে বাজে কথা বা কু-কথা হইতে পারে না কিন্তু কাজের কথা হইতে কোনই বাধা নাই। বাজে কথা না থাকায় তাহাদের কোন বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণ করাইবার জন্য সময়ের অপব্যয় অপচয় ঘটিতেও পারে না।

এই সমস্ত ধর্ম্মমন্দিরগুলির কথা ছাড়িয়া দিলেও তাহাদের আর একটা বিশেষ মিলনের যায়গা আছে। সে দেশের কাফিখানাগুলি এক একটা "টাউন হল।" সারাদিনই অকেজো লোকগুলা এই সমস্ত কাফিখানার ভিড় বাড়ায়। আবার কাজের লোকগুলাও তাদের দিনের কাজ সারা করিয়া সন্ধ্যার সময় একটা না একটা কাফিখানায় আসিয়া বসিবে। বাগদাদ, বসোরা বা মূছালের মত বড় বড় সহরে এমন বড় এক একটা কাফিখানা আছে যাহাতে হাজার লোক অনায়াসে বসিয়া আরাম করিতে পারে—পাশে গুজরের সঙ্গে সঙ্গে ওড়গুড়ির ভুলুক ভুলুক শব্দ ভুলিতেছ পাত্রের পর পাত্র কাফি ওড়াতে পারে। গরমের দিনেই এই সমস্ত কাফিখানাগুলি বেশী সরগরম হয়। তখন ঘরের ভিতর হইতে সোফাগুলি টানিয়া বাহিরে আনে। মুক্ত বায়ুতে কাফির এই মজলিস্ রাত বারটার পরেও খুবই গুলজার থাকে। রমজান মাসে তাহাদের

রোজার দিনের রাতগুলি তাহারা সহরের অলিগলি ঘুরিয়া এবং কাফিখানায় কাফিখানায়, চা, কাফি তামাক ধ্বংস করিয়াই এক রকম কাটাইয়া দেয়। অনেকেই তাহাদের রজনীর অন্ত্যযামের আহারের পূর্ব্বাহ্নে বড় একটা শুইতে যায় না। গভীর রাত্রে দীপাবলী শোভিত জনতাকীর্ণ রাজপথগুলি অপূর্ব্ব দেখায়। আমাদের দেশের বড় বড় সহরগুলির জনতাও যখন কমিয়া আসে সেই সময় সহরের অধিকাংশ মুসলমান নরনারী তাহাদের নৈশ ভ্রমণে বাহির হইয়া রাজপথের জনতা বাড়ায়, কাফিখানাগুলিকে অধিকতর গুলজার করিয়া তুলে।

এই সমস্ত কাফিখানাগুলিতে আলোচনা হয় না এমন বিষয় ভূ-ভারতে আর নাই। যে, যে দরের লোক, সে তা সেই দরের সঙ্গী সাথী লইয়া দেখিতে পাইবে কাফিখানার কোন একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ দখল করিয়া লইয়াছে। এখানে সাধু ফকির তাহার ধর্ম্মের কথা পাঁচজনকে শুনায়, ব্যবসায়ী তাহার ব্যবসায়ের আলোচনা করে—পথ প্রস্তুত করে, বিলাসী তাহার বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিবার উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত থাকে; চোর ডাকাইতও বোধ হয় তাহাদের আপন আপন পরামর্শ সেখানেই করিয়া থাকে! যাহার কোন রকমে দিন কাটানর ছাড়া আর কোনই কায নাই সেও এখানে আসিয়া, দাবা-পাশা-তাস প্রভৃতি বিশরকম কুড়ের খেলা খেলিয়া, হুশ ইয়ারকি মারিয়া, মজলিসি, গুলিখুরা গল্প চালাইয়া, তাহার অরসর নিবেদন করে। এই সমস্ত কাফিখানায় যে জুয়ার আড্ডাও না বসে এমন নয়।

কিন্তু লোককে বলিতে শুনিয়াছি, তাহারা এখন আর পূর্ব্বের মত প্রাণ খুলিয়া কথা বলিতে পারে না, ইংরেজ রাজত্বের বা সমরক্ষণের যে সমস্ত সুফল তাহারা প্রাপ্ত হইয়াছে গুপ্তচর বা গোয়েন্দা বিভাগ তাহাদের অন্যতম। যদি ভ্রমেও কোন দিন কাহারও মুখ দিয়া বে-ফাঁস কথা বাহির হইয়া যায়, অনভি-বিলম্বে সে কথা কোন না কোন রাজপুরুষের কানে উঠিবেই উঠিবে। আর যে রকমেই হউক না কেন বেচারীকে তাহার কথার মূল্য আদায় করিতে হইবে। অনেক সময় 'মেয়-শাবকের' বাপ গালি দিয়া থাকিলেও সেই অপরাধে শাবকের দণ্ড লাভ ঘটে। কথাটাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই বা একে-বারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। আমাদের দেশের স্কুল কলেজে ছাত্রদের ভিতর টিকটিকি পুলিশের বেতনভোগী গোয়েন্দার অভাব ছিল না এবং এখন শুনা যাইতেছে দেশের সর্ব্বস্থল কংগ্রেসের কর্ম্মীমণ্ডলীর ভিতরেও

আমাদের শুভাবির্ভাব ঘটিয়াছে। সুতরাং তাহাদের দেশে—যে দেশে বিদ্রোহ সর্ব্বদাই লাগিয়া আছে, যে দেশ পরাভূত হইয়াও পরাভব মানিতে চাহিতেছে না—যে দেশে বৃটিশের সুনাম-সম্মান বজায় রাখিবার জন্য যে বহু বিস্তৃত গুপ্তচর বিভাগের সৃষ্টি হইবে তাহাতে অভাবনীয়ের বিষয় কিছুই নাই।

গোয়েন্দাদের নিন্দা আমাদের দেশেও আছে; দেশদ্রোহী দিগকে, জয়চাঁদ মিরজাফর দিগকে, আমাদের দেশের লোকেও ভক্তির সহিত দেখে না; কিন্তু সে দেশের জনসাধারণ গোয়েন্দা ও দেশদ্রোহীদের যত ঘৃণার চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে আমাদের দেশে তত ঘৃণার সহিত দেখা হয় না। এই জাতীয় জীবদের ঘৃণা বোধ হয় পৃথিবীর যাবতীয় উন্নতিকামী বা স্বাধীনজাতিসমূহই করিয়া থাকে, বোধ হয় আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীরাও করিতেন। ক্রমে অধীনতার অভ্যাস আমরা আর ইহাদিগকে তেমন ঘৃণার চক্ষে দেখি না। এমন কি আমাদের মধ্যে অনেকে এই সমস্ত ঘৃনিত কাজ গ্রহন করিতেও দ্বিধা বা সঙ্কোচ অনুভব করে না। দেশের পতন কি সাধে হয়? দাসত্ব অধীনতা আমাদের দেহের শোনিতের বিন্দুতে বিন্দুতে, শিরায় শিরায়, অস্থি-মজ্জায় ওতপ্রোত ভাবে জড়াইয়া আছে; অর্থের চরণে মনুষ্যত্বকে বলি দিতে, সামান্য কয়েক খণ্ড রৌপ্যচাক্তির বিনিময়ে যে কোন ঘৃণিত হীন কাজ করিতে আমরা অনেকেই পশ্চাৎপদ নহি; আমাদের এই জীর্ণ মেরুদণ্ড লইয়া আমরা সোজা আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিব কি না তাহাতে যথেষ্টই সন্দেহ আছে।

বহির্জগতে আমাদের এই দাসত্ব-প্রীতিকে কি চক্ষে দেখে তাহা যাহারা বাহিরে যান নাই তাহারা সম্যক উপলব্ধি করিয়া উঠিতে পারিবেন না। অন্যান্য দেশের কথা ছাড়িয়া দেই; এই ইরাকেই, যে দেশকে আমাদের অনেকেই নিতান্তই অসভ্য বলিয়া মনে করিবার স্পর্দ্ধা রাখি, বিগত ১৯২০ সনের বিষম বিদ্রোহের পর যখন বৃটিশরাজ সাময়িক জাতীয় শাসন যন্ত্রের (Provtiional National Government) প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশীয় মন্ত্রী-সভার পত্তন করিয়াছিলেন তার কিছুদিন পরেই 'ইরাকের জাতীয় সংবাদপত্র সমূহের কয়েকখানি কিরূপ ভাবে ভারত-বিদ্বেষের বিষ উদ্গীরণ করিয়াছিল তাহা ভাবিলে বাস্তবিকই অবাক হইতে হয়। তদানীন্তন 'ইরাকের হাই কমিশনার স্যর পার্শি কক্স মহোদয় যখন ক্রমে ভারতীয় শ্রমজীবী মসীজীবী প্রভৃতির সংখ্যা সে দেশের হ্রাস করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তখন সেখানের জাতীয় দল কি বলিয়াছিল জানিবেন কি? বলিয়াছিল 'যে ভারত শতাব্দীর

পর শতাব্দী পদদলিত ও পদানত তাহারা আমাদিগকে কোন্ মানুষের কথা শিক্ষা দিবে? যাহারা নিজেদের দেশ শাসন করিতে শিখে নাই বা পারে না তাহারা আমাদিগকে দেশ শাসন শিক্ষা দিবে? মরিয়া যাই!' আর বাঁহা বাহা বলিয়াছে তাহার সঙ্গে আমার প্রবন্ধের সম্বন্ধ অল্প সুতরাং সে সমস্তের উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

এই রকমের আর একটা কথা মনে পড়িতেছে। আলেক্‌জান্দ্রিয়াতে আমার এক বন্ধু কোন হোটেলে খানা-পিনা করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে সাদা-কাল গৌর-পিঙ্গল সব দেশের সব জাতীয় লোকের অবাধ প্রবেশাধিকার আছে কিন্তু সেই হোটেলে বন্ধুবর যে অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা অপূর্ব্ব। বন্ধুবর হ্যাট কোট নেকটাইয়ে পুরামাত্রায় সাজিয়া হোটেলে ঢুকিয়াছিলেন কিন্তু তথাকার সমবেত জনবৃন্দ জিজ্ঞাসায় যখন বক্তাকে ভারতীয় বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন তখন যে ভাবে তাহারা নাসিকা সিট্‌কাইয়াছিল এমন কি হোটেলের চাকর-খানসামা-ওয়েটার-বাটলাররা পর্য্যন্ত এমন তাচ্ছিল্যের সহিত তাঁহার আহার্য্যাদি সরবরাহ করিয়াছিল যে বন্ধুবরের মস্তক মত চৈতন্যের উদয় হইয়াছিল। সেখান হইতে ফিরিয়াই তিনি তাঁহার বড় সাধের ভারতীয় চিকিৎসা বিভাগের (Indian Civil Service) চাকরী কাপ্তেনগিরিতে ইস্তফা দিয়াছিলেন।

পূর্ব্ব কথিত 'ইরাকের জাতীয় পত্রসমূহ যে সময় ভারতবিদ্বেষ প্রচার করিতে আরম্ভ করে তাহার প্রায় সব সময়েই 'ইরাকে ভারত সভা (Indian Association) প্রতিষ্ঠা হইতে আরম্ভ হয়। ঠিক কোথায় ইহার আরম্ভ হইয়াছিল তাহা আমার জানা নাই। যখন আমি মুহালে যাই তখন সেখানে গিয়া তিনটা স্বতন্ত্র ক্লাব দেখিতে পাইয়াছিলাম। বাঙ্গালীদের যেমন ক্লাব, মাদ্রাজীদের মাদ্রাজ রিক্রিয়েশন ক্লাব আর পঞ্জাবীদের 'জাঙ্‌বির'। বিহারী, মারাঠি, ওরিয়া প্রভৃতি যে সমস্ত জাতির এইরূপ কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না তাহাদের অনেকেই আগ্রহে আর বিশেষ করিয়া কাপ্তেন শ্রীযুক্ত এম, এন, বসু, আই, এম, এস, মহাশয়ের বিশেষ প্রচেষ্টায় ও এইরূপই আর কয়েক জনের সহায়তায় তিন ক্লাব মিলিত হইয়া—'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারত সভা'—প্রতিষ্ঠা হয়। সেই সভার প্রথম সেক্রেটারী যখন আমি নিযুক্ত হই বিভিন্ন সমবেত জনমণ্ডলীর একরূপ সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে, তখন আমি বড় কম বিস্মিত হইয়া যাই নাই।

এসোসিয়েশনের অনুষ্ঠান পত্রে একটু বিশেষত্ব ছিল। ক্লাবের উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র চিত্তবিনোদন এবং অবসর বর্জ্জন ও ব্যায়াম বর্জ্জন। এসোসিয়েশনের এই সমস্ত উদ্দেশ্য ত ছিলই, তা'ছাড়া ভারতবাসীর স্বার্থরক্ষাও একতম উদ্দেশ্য ছিল। মুছালের ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন লাইব্রেরীতে অনেক গুলি বই সংগৃহীত হইয়াছিল।

উপরোক্ত মুছাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন যখন পত্তন হয়, তার পর বাগদাদেও এক ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। শুনিতে পাইতেছি বর্ত্তমানে এই প্রতিষ্ঠান রাজদরবারের সমাদর লাভ করিয়াছে অর্থাৎ এই সমিতিকে গভর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিয়া লইয়াছে। সুতরাং বঙ্গদেশে ভারতবাসীদের চতুর্ভুজ হইয়া উঠিতে আর বড় বিলম্ব নাই বোধ হয়।

রাজদরবারের সমাদর লাভ ছাড়াও এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির অপর উদ্দেশ্য বর্ত্তমান আছে। বিদেশে পরস্পর মিলনের ভিত্তিকে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান দৃঢ় করে; পরস্পরের সুখে দুঃখে সমবেদনা-সহানুভূতি প্রকাশের অবসর দেয়; মিলিতভাবে কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে, প্রতিবাদ করিতে পারা যায়। ব্যবসায়ী, সৈনিক, শ্রমজীবী, মসীজীবী প্রভৃতি সকলে, একসঙ্গে মিলিত হইবার সুবিধা পাওয়াতে পরস্পর পরস্পরের অভাব অভিযোগের কথা অবগত হইতে পারে।

বেশী লাভবান হয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। তাহারা পরস্পরের নিকট হইতে ব্যবসায় সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য তথ্যসমূহ অবগত হইতে পারে। আর এই সূত্রে দেশও যে একেবারে লাভবান না হয় এমন বলা যায় না; দেশের উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রীর কাটতি বিদেশে বাড়াইতে হইলে অনেকের মিলিত চেষ্টা ব্যতীত তাহা সম্ভব হয় না। (ক্রমশঃ)

শ্রীব্রহ্মদাস গোস্বামী।

ভ্রান্ত।

মৃগমদ রয় আপন নাভিতে
তবু মৃগ ঘুরে মরে।
তেমতি হৃদয়ে দেবতা থাকিতে
মানবে তীর্থ করে।

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু।

বলু গল্প।

'বলু' মশায় 'তর্কচঞ্চু' মশায়ের ঘরের রকে ব'সে তাঁর সঙ্গে গল্প কচ্ছেন। নানা দেশ বিদেশের কথাবার্ত্তা হ'ল। তারপর তর্কচঞ্চু মশায় বলুমশায়কে ধরে বস্‌লেন, 'আপনাকে একটা গল্প বল্‌তেই হবে। আপনি ত অনেক দেশবিদেশে বেড়িয়েছেন।' বলুমশায় কি আর সে সুযোগ হারাতে পারেন? তিনি তখনই মত দিলেন। তর্কচঞ্চু মশায় সেইদেশের রাজার সভাপণ্ডিত। তাই তিনি বড়লোক। আর বলু মশায়ের পেশা দেশ ঘোরা আর গল্প বলা—কি না তাঁকে তিনি খুব নাম পেয়েছেন। রাজা তাঁকে মাঝে মাঝে ডাকেন। এখন বলু-মশায়ের গল্প শুনুন।

বলু। আর মশায় গল্প বল্‌তে বল্‌তেই আমার চুল পাকল—যদিও আমি প চিশ বছরের।

তর্ক। নিশ্চয়, নিশ্চয়। আচ্ছা এখন একটা গল্প বলুন যাতে আমাদের সময়টা কাটে ও কিছু শিখতে পারি।

বলু। মশায় গল্প বল্‌তে আমার বিশেষ কোন আপত্তি নাই—কিন্তু কি জানেন?

তর্ক। না, মশায়, ভাল বুঝ্‌তে পাচ্চি না। পরিষ্কার করেই বলুন যাতে আমি বুঝ্‌তে পারি।

বলু। হ্যাঁ মশায়, সেত ঠিক কথা, সেত ঠিক কথা। আমি, মশায়, অনেকক্ষণ আগে পরিষ্কার হয়ে গেছি, তবে কিনা—

তর্ক। আবার, মশায়, বল্‌ছেন, তবে কিনা' 'তবে কিনা'র উত্তর টা একেবারে, চোকবুজে, যতশীগ্‌গীর পারেন তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন। দেরীকরা কোনও মতে উচিত নয় কারণ ওটা বড্ড খারাপ জিনিষ—যদিও মধ্যে মধ্যে ভাল। আর আপনি ত জানেন, আমাদের শাস্ত্রে বলেছে—বলেছে—নাঃ, দূর ছাই।—মনে পড়্‌ছে না।—পেটে আস্‌চে মুখে আস্‌চে না। সেই যে সেই শ্লোকটা—সেই। হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। দেখুন।

বলুমশায় তাড়াতাড়ি উঠে তর্কচঞ্চু মশায়ের দিকে সরে গিয়ে বল্লেন, কি?

কি? কি দেখেছেন? নাগটাগ্ না কি? না ভয়ঙ্কর সরীসৃপ? শীগ্‌গীর বলুন, শীগ্‌গীর বলুন, আমার মেটা ভুড়ভুড়ী হয়ে ভয়ের দিকে অগ্রসর হচ্চে।

তর্ক। হাঃ—হাঃ—হাঃ। আরে মশায়। হাঃ—হাঃ—হাঃ। কি মজা। দেখ্‌চি আপনি বড় ভীতু। মশায় কিছু দেখিনি। তবে সেই শ্লোকটা বল্‌তে যাচ্ছিলুম—তখন আপনার ভয় হ'ল। আর আমার সেই শ্লোকটা 'মুখ থেকে পেটে চলে গেল।' বোধ করুন—সেটা বহুদিনের বিদ্যা। হাঃ—হাঃ—হাঃ। নাঃ আপনি গল্প আরম্ভ করুন।

বল্। সেটা সবে আরম্ভ কর্‌চি। কিন্তু যে পরমশায় আমায় গল্প বিদ্যায় বিশারদী করেছেন—তিনি মন্ত্র দিয়াছেন যে, প্রতিগল্পের দাম নেবে। মশায়, আমার গল্পের একটা নির্দ্দিষ্ট তালিকা আছে। আমি চার পয়সার থেকে ষোল টাকায় পর্য্যন্ত গল্প বল্‌তে পারি। বলুন, বল্‌ব?

তর্ক। ষোল টাকা!

বল্। গল্প শুনে বিস্মিত হবেন। কি মিষ্টি গল্প!

তর্ক। আচ্ছা, ষোল টাকায়টাই বলুন।

বল্। তবে শুনুন। হ্যাঁ—আর একটা কথা। মশায়, তামাক আন্‌তে বলুন, নইলে গল্প বল্‌তে সুবিধে হবে কেন? আর গল্প জম্‌বেই বা কেমন করে? 'খোঁয়া' খেলে বুদ্ধি খোলে। আর দেখুন, 'হুঁ; হুঁ'। তারপর? তারপর? কি হলো' বল্‌বেন। হ্যাঁ, তা'হলে তামাক আন্‌তে বলুন।

তর্ক। আচ্ছা মশায়, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ওরে রামা, শ্যামা ব্যাটাকে বলে দে যেন সে যোদোকে বলে, এক কল্কে তামাক সেজে সেদোর হাত দিয়ে আমায় পাঠায়।

তামাক আস্‌লে পর তর্কচঞ্চু মশায় হুঁকোটাকে ধোঁয়া ছাড়্‌বার উপযোগী করে বল্‌মশায়কে দিলেন। বল্‌মশায় গুড়্ গুড়্ করে ধোঁয়া উদ্গীরণ কর্‌তে কর্‌তে পূর্ব্বোদ্যমে গল্প বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন।

"একদেশে এক রাজপুত্রী নিজে রাজ্যশাসন কর্‌তেন। তাঁর মেয়ে মন্ত্রী, মেয়ে সেনানায়ক, মেয়ে সব। তিনি পুরুষগুলোকে নিজেদের চেয়ে নিকৃষ্ট ভাব্‌তেন। কেন না তারা খালি 'foot ball' খেল্‌বে, দাসত্ব করবার জন্যে স্কুল কলেজে পড়্‌বে। দিনরাত নভেল পড়্‌বে,—বা তা বক্‌বে, আর গল্পাবাজী করে, নিজেদের অস্তিত্ব আছে জানাবার জন্যে নিজেদের মধ্যে মারামারি কর্‌বে। স্ত্রীজাতিকে কষ্টদেবে। রাজপুত্রী মেয়েমন্ত্রীর স্ত্রীদের দুঃখ মোচনার

মন্ত্রণা শুনে দিগ্বিজয়ে বেরুলেন—খালি নারীসৈন্য নিয়ে। অনেক নদনদী পার হয়ে তারা মিলনরাজার দেশে আচম্‌কা এসে উপস্থিত হলো। মিলন-রাজা দেখ্‌লেন—'নিশ্চয় এটা একটা বিপদ। কোথায় সুখে' রাজ্য করবি তা নয়, না এক অকাল-কুষ্মাণ্ড মর্‌তে এলেন এখানে। তাও আবার মেয়ে মানুষ! কিন্তু মিলনরাজা—তখন জান্‌তেন না যে তাঁকে রাজপুত্রীর হাতে মর্‌তে হবে। মিলনরাজা চুপকরে বসে থাকবার ছেলে নন্। তিনি কি করে বিপদ এড়াবেন তাই মন্ত্রীদের সঙ্গে বুঝি আঁটচেন। রাজার একটু ভয় ও হয়েছিল, তাই সেই সঙ্গে সঙ্গে ভাবছিলেন—যদি হেরে যায়? সেত' খুব লজ্জার কথা! মেয়েদের কাছে হারা! গলায় দড়ি দিয়ে মরা যে তার চেয়ে ভাল। কিন্তু অনেক মাথা ঘামাবার পর একটা বুদ্ধি বেরিয়ে এল। সেটা গুপ্তচর নিযুক্ত করা।

এক বুদ্ধিমান চর নিযুক্ত হয়ে কোনরকমে সমস্ত সংবাদটা নিয়ে আস্‌লেন। সংবাদটা আজ রাজার গুপ্ত সভায় বলা হবে। বিকেল বেলায় মাতব্বর মাতব্বর লোকেরা সভায় আস্‌লেন। তখন গুপ্তচর মশায় সংবাদ বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন,

'ভদ্র মহোদয়গণ,—আমি আজ আপনাদিগকে হাস্যজনক, ভীতিপ্রদ, রোমাঞ্চকর সংবাদ বল্‌তেছি। আপনারা কি মনে কর্‌বেন তা জানি না, তবে আমার মনে কি হচ্ছে তা বল্‌তে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌ব। উঃ, কি সুন্দর খারাপ সংবাদ! সেই রাণী যে কি না এই আমাদের মহারাজ, প্রবল রাজাকে জিতে, তাঁর রাজ্য নেবে—সমস্ত দ্রব্য নেবেন—এমন কি রাজার পর্য্যন্ত লুণ্ঠিত-দ্রব্যের একটী মহামূল্য রত্ন বলে নিজে গ্রহণ কর্‌বেন। রাণী তাঁর সৈন্যদিগকে বল্লিলেন, 'কি, রাজারা আমাদের জিতে আমাদের বিয়ে কর্‌বে, আমরা কর্‌ব না? এ কেমন কথা? পুরুষরা স্ত্রীজাতিকে পায়ে দলে থাকে। দেখ সৈন্যগণ, তোমরা স্ত্রীজাতির জন্য যুদ্ধ কর্‌তে এসেছ, তোমরা দেশের কাজ কর্‌তে এসেছ, তোমরা মাতৃভূমি ও স্ত্রীজাতির নাম রাখ্‌বার জন্যে প্রাণ দিতে এসেছ। সৈন্যগণ, প্রাণের মমতা কর না। প্রাণ ত তুচ্ছ, এমনি স্বাধীনতা সব জিনিষের সেরা। যদি আমরা সেই স্বাধীনতা রক্ষা কর্‌তে না পার্‌লেম, তবে আমাদের এই কষ্টকর, দুঃখে প্রাণধারণে প্রয়োজন কি? আমরা পুরুষের পায়ের তলায় পড়ে থাক্‌ব না। ওরা যা খুসী তাই ব্যবহার কর্‌বে। উঃ! কি মিষ্টি অত্যাচার! স্ত্রীরা কি মানুষের সৃষ্টি নয়? তাদের কি রক্ত-মাংসের দেহ নয়? তারা কি কেবল ঘরে বসে থাক্‌বার জন্য এসেছে?

না কেবল অন্যায় অত্যাচার সহ্য করবার জন্য সৃষ্ট হয়েছে? তাদের কি শিখিবার কোন আকাঙ্ক্ষা নাই? তারা কি নির্জ্জীব? যেমন তরুণ পুরুষেরা বলে, যাদের সমস্ত জীবনের সম্মুখে পৃথিবীর সমস্ত আদর্শ পড়ে রয়েছে, তাদের জীবনের সম্মুখে অফুরন্ত আকাশকুসুম আশা বিরাজ করছে,—তাদের সম্মুখে যখন তাদের মাতৃভূমি হীনাবস্থায় পরপদদলিত হবে কত লাঞ্ছিত হয়, সৈন্যগণ, তোমরা কি মনে কর, তারা সেই সমস্ত আদর্শ, সেই সমস্ত আকাশকুসুম আশা পূরণ করচে না? আর সেই হীনাবস্থায় পতিতা, পরপদদলিতা, বিশেষপ্রকারে লাঞ্ছিতা অভিমানিনী মাতৃভূমির অশ্রু মুছাবে না? যদি তোমরা মনে কর যে ওরা অকর্ম্মণ্য, তবে তোমরা ভুল বুঝেছ। ওরা নিজেদের ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে শতসহস্র বাধা বিঘ্ন মানুষের মত অতিক্রম করবে। ওরা কঠোর জাতি;—ওরা মাতৃভূমির অশ্রু মুছাতে কিছুমাত্র ব্যথা বোধ করবে না। মাতৃভূমির অশ্রু মুছাতে শতসহস্র হস্ত ছুটে আসবে। যদি তাহাতে কেহ বাধা দেয়, সেই শতসহস্র হস্ত আরও শতসহস্রে পরিণত হয়ে বাধাকারীর উপর নির্ম্মমভাবে পতিত হবে এবং তারা ততক্ষণ মাতৃভূমির অশ্রু মুছাতে চেষ্টা করবে যতক্ষণ না সকলে অশ্রু মুছাতে মুছাতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। ওদের স্বার্থ সম্বন্ধেও তাই। সৈন্যগণ, মাতৃভূমির প্রকৃত সন্তান কারা, তা তোমরা কি জান? যারা প্রতি বিষয়ে 'conquer or die' জানে, যারা মায়ের জন্যে হাসতে হাসতে মরতে পারে, তারাই প্রকৃত সন্তান। তোমরা এই রাজাকে জিতে জগতকে দেখিয়ে দাও যে স্ত্রীরাও সমস্ত করতে পারে এবং তারা জগতের উপকার ভিন্ন পুরুষদের মত অপকার করে না। তারা পুরুষদের মত স্বাধীনতা চায়—তারা 'ঘরে বন্ধ' থাকতে চায় না। তারা শিখতে চায়। তারা ভাল করতে চায়, মন্দ করতে চায় না। সৈন্যগণ, যদি তোমরা সত্য সত্যই স্ত্রীজাতির জন্য যুদ্ধ করতে এসেছ, যদি তোমাদের মাতৃভূমির প্রতি একটু মমতা ও ভক্তি থাকে তবে প্রতিজ্ঞা কর—যে সে প্রতিজ্ঞা নয়, মৃত্যুপণ করে প্রতিজ্ঞা কর—'আমরা স্ত্রীদের দুঃখ ঘোচাব।' সমস্ত নারীসৈন্য একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল, 'আমরা মৃত্যুপণ করে প্রতিজ্ঞা করচি যে স্ত্রীদের দুঃখ ঘোচাব।" রাজপুত্রী বললেন, 'তোমাদের জয় হোক্। মাতৃভূমিকে প্রণাম কর যেন আশা সফল হয়।" সৈন্যগণ তাহাই করিল।"

রাজা এই রোমাঞ্চকর সংবাদ শুনে স্তম্ভিত, রাগান্বিত ও ভয়ান্বিত হলেন। সভা ভঙ্গ হ'ল। ঠিক হ'ল পরশুদিন শুভদিন। সেইদিন আক্রমণ করা হবে।

কিন্তু তার পরদিনে এই রাজপুত্রীর মেয়ে সৈন্যেরা—মিলন-রাজার সৈন্যের উপর প'ড়ে তা'দিগে ছত্র ভঙ্গ করে দিল। কাজেকাজেই রাজা হারলেন। মন্ত্রী প্রভৃতিরা বীরের মত যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় রাজা বন্দী হলেন। রাজপুত্রীর কাছে তাঁর বিচার হ'ল। রাজপুত্রী বল্‌লেন, 'হে সুন্দর, আমি স্ত্রীজাতির জন্যে লড়্‌তে এসেছি। তাদের দুঃখ ঘোচাবার জন্য এসেছি। আপনি আমাদের কাছে হেরেচেন। এখন আপনি কেমন বিচার চান ?"

রাজা। মহারাণীর যো হুকুম।

রাজপুত্রী। বেশ। আপনাকে জিতেছি। আপনি এখন আমার জিনিষ। আপনি আমার অন্তঃপুরচারী হয়ে থাক্‌বেন। আমার এই হুকুম।

রাজা। রাণীজি, আপনি যে, আজ্ঞা কর্‌বেন, দাস অবনত মস্তকে তা পালন কর্‌বে। যদি কোন ত্রুটী হয়ে থাকে, দাসকে অনুগ্রহ করে মার্জ্জনা কর্‌বেন।

রাজপুত্রী ঈষৎ হাস্য করে বল্‌লেন, "আচ্ছা, এখন আপনি অন্তঃপুরে গিয়ে বিশ্রাম করুন। আমার এখন অনেক কাজ আছে। রক্ষী, এঁকে অন্তঃপুরে নিয়ে যাও। রাজার মত ব্যবহার কর্‌বে—যেন কোন ত্রুটী না হয়।'

তারপর মহাড়ম্বরে 'শুভকার্য্য শেষ হ'ল। রাজা অন্তঃপুরে বাস করেন রাণী রাজকার্য্য দেখেন। রাজ্যের সমস্ত স্ত্রীলোকেরা স্বাধীনতা পেয়ে। রাজ্য হাস্যময়ী হয়ে উঠ্‌ল।"

সন্ধ্যে হয়ে এল যে। গল্প আজ এপর্য্যন্ত থাক। অন্যদিন বল্‌ব।

তর্ক। কিন্তু যেন আস্‌তে ভুলবে না। গল্পটা আমার মনের মত হয়েছে।

বল্। আস্‌ব বৈকি। আস্‌ব বৈকি। তবে আজ আসি

তর্ক। বসুন, বসুন। জলযোগ করে যান। ধনীর গৃহে পদ ধূলি দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করেছেন। জলযোগ না করে যাবেন ? ওরে বেটা মধু শীগ্‌গীর গুড়্‌ আর জল নিয়ে আয়। দেখুন ধনীর গৃহে এসেছেন। 'গুড়-জল' না কল্লে মানাবে কেন ?

বল্‌মশায় 'গুড়-জল' করে পান চিবুতে চিবুতে বোলটাকা দস্তরী নিয়ে বাড়ী যাবার মেঠো রাস্তা ধরে শিকড়ের মত টিকি নাড়্‌তে নাড়্‌তে একটা শিব দিয়ে গান ধর্‌লেন,

"ওরে কুলাঙ্গার, হিন্দু দুরাচার,
এই কি তোদের দয়া, সদাচার ?

হয়ে আর্য্যবংশ, জননীর সার,
জননী বধিছ পিশাচ হয়ে ?
এখনও ফিরিয়া দেখনা চাহিয়া,
জগতের গতি—ভ্রমেতে ডুবিয়া,
চরণে দলিছ মাতা, সুতা, জায়া,
ছড়ায়ে কলঙ্ক পৃথিবীমাঝে !

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

৺চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

"উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম" প্রণেতা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় আর নাই। তিয়াত্তর বৎসর বয়স পূর্ণ করিয়া মুর্শিদাবাদে ভাগীরথী তীরে তিনি দেহ রাখিয়াছেন। একে একে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিকরের সকল জ্যোতিষ্কই নির্ব্বাপিত হইল। সে মনীষার হোমাগ্নি একা রক্ষা করিতেছেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। বঙ্কিমচন্দ্র যেন্দ্রগত সূর্য্যের ন্যায় নিত্য ভাস্বর থাকিতেন আর, তাঁহার চারি পার্শ্বে চন্দ্রনাথ, চন্দ্রশেখর, হেমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, রাজকৃষ্ণ, রামদাস, ইন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, প্রফুল্লচন্দ্র, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি তারামালা অপূর্ব্ব দ্যুতিতে প্রোজ্জ্বল থাকিত। এই সপরিকর বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা ইংরেজীযুগে সাহিত্য সৃষ্টির প্রধান ব্রহ্মমণ্ডল। শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে বাঙ্গালার মনীষায় এমন সমবায় আর কখনও ঘটে নাই। হায়, সে জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল আজ নির্ব্বাপিত হইয়া—একেবারেই নিভিয়া গিয়া তমিস্রায় আত্মগোপন করিল,—ঘোর বিস্মৃতির যবনিকা বিমণ্ডিত হইল, হায়!

চন্দ্রশেখর বাঙ্গালা সাহিত্যের যে কেমন পুরুষ ছিলেন, তাহা আধুনিক যুবজন জানে না—বুঝি বা তাঁহাকে বুঝিবার চেষ্টাও করে না। চন্দ্রশেখর বাঙ্গালা সাহিত্যের একজন ঋষি বা স্রষ্টা প্রবর্ত্তক ছিলেন। গদ্যে পদ্যের ভাব ও রসোল্লাস, মাধুরী ও বচন চাতুরী তিনিই প্রথমে আমদানী করেন। তাঁহার "উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম" গদ্যে একখানি মহাকাব্য,—অপূর্ব্ব, অতুল্য এবং অদ্বিতীয়। উহা আর হইবে না, বুঝি বা হইবার নহে! চন্দ্রশেখর বঙ্কিম যুগের একজন

সন্দর্ভকার ছিলেন। এত প্রবন্ধ নিবন্ধ আর কেহ লিখে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেন চন্দ্রশেখরের লেখায় কলম ডাবিবার যো নাই। সে এমন সাজাইয়া গোছাইয়া লিখে, এমন ওজন করিয়া শব্দ চয়ন করে যে একটী শব্দও বদলাইবার অবসর থাকে না। চন্দ্রশেখরের গদ্য সত্যই অতুল্য ও অনুপম ছিল।

চন্দ্রশেখর নিয়মিত টোলের ছাত্র ছিলেন; তাই তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্র ভাল করিয়া জানিতেন। তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ও সুস্পষ্ট ছিল। কেবল সংস্কৃত ও ইংরেজী নহে, চন্দ্রশেখর ফরাসী বা ফ্রেঞ্চ ভাষা বেশ জানিতেন। ইংরেজী ও ইউরোপীয় সাহিত্যকে যেন গুলিয়া খাইয়া ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পরিকরের মধ্যে মূর্খের স্থান ছিল না—তারাপ্রসাদ, রাজকৃষ্ণ চন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, নীলকণ্ঠ, চন্দ্রশেখর, হরপ্রসাদ প্রমুখ অনেকেই এক একটী দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন। চন্দ্রশেখর আবার সুগায়ক ছিলেন, আর এমন সুর, তান লয় শুদ্ধ সুকণ্ঠের গান ইংরেজীনবীশের দলের মধ্যে কাহারও মুখে শুনি নাই। আর সে গানের সংগ্রহই বা কত। কীর্ত্তন বাঙ্গালী শ্যামাবিষয়ক ও টপ্পা চন্দ্রশেখর যে কত জানিতেন তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। কোন মজলিসে চন্দ্রশেখর উপস্থিত থাকিলে গায়কের অভাব উপস্থিত হইত; সকল শ্রেণির গায়কই জানিতেন যে গজল, খেয়াল, টপ্পা বেশী গানে ফাঁকি দিবার উপায় নাই। চন্দ্রশেখরের আর একটী ব্যসন ছিল, তিনি বটতলার দোকানে দোকানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং পুরাতন পুঁথি ও কাব্য যাহা ছাপা পাইতেন তাহাই ক্রয় করিতেন। চন্দ্রশেখরকে বটতলার ফাঁকিবাজী ধরিয়া দেন। বটতলার মালিক জনকয়েক পয়লা নম্বরের পটু ব্রাহ্মণ কায়স্থ ছিলেন, তাঁহারা কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইহাঁরা ইন্টারপোলেশন (Interpolation) করিতে ছিলেন। কোন পুরাতন পুঁথি পড়া যাইত না, বা অর্থ গ্রহণ করা কঠিন হইত, সেখানে ইহাঁরা অনায়াসে গোটাকতক শ্লোক বসাইয়া কাজ সারিতেন। ছেলের হাতে নাই কাণ্ড দেখা দেন এবং বটতলার গুপ্ত কবিদিগের দুই তিন সহস্র নামও প্রকাশ করেন। চন্দ্রশেখরের এই আবিষ্কারের ফলে প্রভুপাদ বলাই চাঁদ এবং প্রভুপাদ অক্ষয় গোঁসাই, উভয়ে মিলিয়া অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া চৈতন্য ভাগবতের একটী পবিত্র সংস্করণ বাহির করেন। চৈতন্যচরিতামৃতের কতকগুলি পাঠ এই সময়ে বটতলায় ছিল।

চন্দ্রশেখর উদার, উন্নত, সত্যবাদী ও সরলহৃদয় পুরুষ ছিলেন। তিনি একেবারেই বিষয়ী গৃহস্থ ছিলেন না; সংসার বুঝিতেন না। তাঁহার

প্রথম পক্ষের পত্নী বিয়োগের পরেই তাঁহার জীবনটা শিথিল হইয়া যায়, জীবনে দৃঢ়তা থাকে নাই, সংসারে আঁটও ছিল না। শেষে ক্রমে ক্রমে তাঁহার প্রতিভাও বিক্ষিপ্ত ও [illegible]শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল।

গেল—সব গেল! ভারতীর অতুলকৃপায় সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ মনীষার গজমুক্তার সাতলহরের মালা বঙ্গভূমির কণ্ঠে এতদিন দুলিতেছিল, বঙ্গভূমির কণ্ঠে কত ভাবের কত ছাঁদের লেখা সে মালার আন্দোলনে অনপনেয় রেখায় অঙ্কিত রহিয়াছে,—হায় রে, এতদিনে সে মালা বুঝি বা ছিন্ন হইয়া ধূলায় লুটায়! একদিকে কেশবচন্দ্র, অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র, মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র ধক্‌ধকির মতন বিরাজ করিতেছিলেন, আর দুইদিক হইতে ব্রাহ্ম সাহিত্য ও বঙ্কিমী সাহিত্য, গঙ্গা যমুনার ন্যায় কূল কূল, কল-কল ছল-ছল রবে অবিশ্রান্তধারায় বাহির হইতেছিল। মাইকেল ভূদেব হইতে রবীন্দ্রনাথ হরপ্রসাদ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর সাধের দেবতা সকল সে যুগলধারাকে দুইকূল উপচাইয়া পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আচার্য্য শিবনাথের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে সে ব্রাহ্মমনীষার ধারা অর্থাকাঙ্ক্ষার মহাসঙ্কটে আত্মগোপন করিয়াছে। বঙ্কিমযুগের রবীন্দ্রনাথ এবং হরপ্রসাদ এখনও বিদ্যমান। তাঁহাদের অন্তর্দ্ধান হইলে থাকিবে কি? থাকিবে বিলাসের এবং অভাবের মেলিয়ান জিহ্বা বিস্তারের সহিত শুষ্ক কণ্ঠের ব্যর্থ "টাকা টাকা" রব—থাকিবে বাসনাসেবের বিদ্বেষ বিজৃম্ভণ স্বরূপ প্রতিবিধিৎসার নীলিম বহ্নি মুখের উৎকট বিকাশ! আর মুখ্যতার ঘোর ত্রিযামায় ফেরুপালের হা হা রব, অট্ট-অট্ট খট খট খট হাস্য। চন্দ্রশেখর চলিয়া গেলেন—ভাষার নির্ম্মল প্রতিচন্দ্রও সেই সঙ্গে ডুবিল: সে বাহারী ঢং নাই, উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া শোকগাথা লিখিবে কে?

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধনী ও বড়লোক।

ধনীর পায়ে ফুটলে কাঁটা সবাই কষ্ট পায়।
পাহাড় থেকে পড়লে গরীব কেউ না ফিরে চায়।

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু।

মাসিক-সাহিত্য-পরিচয়।

প্রবাসী (ভাদ্র, ১৩২৯)—

'ভাসে' ও 'গোপনবাসী' সর্ব্বভাবসিদ্ধ রবীন্দ্রনাথের আখড়াই সঙ্গীত। শুনিলে কি ঘটিবে বলা যায় না, তবে পড়িয়াই অহিফেন-সেবনের ফললাভ হয়, বেশ একটু ঝিমুনী আসে। যদুনাথ সরকারের 'বাঙ্গালার স্বাধীন জমিদারদের পতন' তথ্যপূর্ণ সন্দর্ভ; ভূতের কাহিনীই যে ভবিষ্যতের বাহন এই বিশ্বাসে যাঁহারা ইতিহাস-চর্চ্চা করেন তাঁহারা "ভুলে যাও, ভোলে নয় স্বপ্ন যথা" প্রভৃতি নিষেধবাক্য কাণ না দিয়া পাঠ করুন। উপনিষদে শিক্ষাপ্রণালী ও ব্রহ্মবিদ্যায় ব্রাহ্মণের প্রভাব" প্রবন্ধের লেখক বলিতে চান যে ফলিয়েশা উক্ত বিদ্যার জনক ও শিক্ষক ছিলেন না; তাঁহার প্রদত্ত যুক্তিগুলি আলোচ্য বটে, তবে জনক বা শিক্ষকের তল্লাস করা অপেক্ষা বিদ্যাটার প্রকৃতিই বোধ করি অধিকতর জিজ্ঞাস্য। শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের 'স্বদেশীর দ্বিতীয় যুগ সারগর্ভ; সুতরাং উন্নতিকামী কর্ম্মীকুলের অবশ্য পাঠ্য। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ধর্ম্মপূজা' অলস অবসরের মন্দ সহচর নহে। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের 'চরকার সূতা' সময়োপযোগী, 'মধ্যপ্রদেশে বাঙ্গালী' শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস খাণ্ডোয়ার কর্ম্মবীর হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের পরিচয় দিয়াছেন। 'কষ্টিপাথর'—চয়ন-নৈপুণ্যের পরিচায়ক। 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিন'—সরল বর্ণনাগুণে সুপাঠ্য। রঘুনাথ কৃষ্ণ ফড়কের প্রতিকৃতিসহ সচিত্র ভাস্কর্য্য-পরিচয়। 'পঞ্চশস্য' উপভোগ্য। রবীন্দ্রনাথের 'বিদ্যাসাগর'-পরিচয়ে প্রকাশ, যে বিদ্যাসাগরের দেশের লোক তাঁহাকে যে শ্রদ্ধা দিয়াছেন, সেটা মন-খোলাও নয়, বড়ও নয়, যেহেতু ঠাকুর মহাশয়ের অন্তর্দৃষ্টি বলে, যে 'দেশাচারের দুর্গ নির্ভয়ে আক্রমণ' করার মধ্যেই মানুষের সব চেয়ে বড় বাহাদুরী থাকে, এবং 'স্রোত' 'ডোবা' 'সমুদ্র' 'গঙ্গা' প্রভৃতির গালভরা উপমার-সমবায়ে তথাকথিত প্রবৃত্তিটা উস্কাইয়া দেওয়াতেই সব চেয়ে বড় শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। সে যাহাই হোক, বিদ্যাসাগরের কর্ম্মাচারী, 'দেশের

লোকের' ত্রুটী, তাঁহার নিন্দুকের 'চোখ' যে এতকাল পরে কয়েকপৃষ্ঠা প্রবন্ধেই নিঃশেষে ঘুচাইয়া দিলেন, ইহাও দেশের ভাগ্য বলিতে হইবে। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের চক্ষেই দেশ-বিদেশ দেখিয়া থাকেন, এ-ইঙ্গিতে তাঁহারা 'আলোক' পাইবেন। 'রমলা' উপন্যাস চলিতেছে,—ভাষায় প্রবাহ বর্ণনায় কবিত্ব, ও চরিত্র-চিত্রণে নৈপুণ্য প্রকাশ পাইতেছে। আরও অনেক গল্প ও প্রবন্ধ আছে।

ভারতবর্ষ (ভাদ্র, ১৩২৯)—

গোড়াতেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ; যথাশিক্ষা "dont-care-চালে 'শ্রীমান সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী 'কলার কথা' কহিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু শ্রদ্ধাহীনের হাতে 'চালের' সহিত 'কলা' এমন চটকাইয়া গিয়াছে যে বাণী পূজার 'নৈবেদ্য' না উহা 'শ্রাদ্ধের পিণ্ডই দাঁড়াইয়াছে—উহাতে আছে সেক্সপীয়ার, ল্যাম্ব, রবীন্দ্রনাথ—ব্যাস, বিশ্বামিত্র, বিবেকানন্দ—যাত্রা, কীর্ত্তন, কথকতা,—কবিত্ব, বাগ্মিতা, দার্শনিকতা—পেডাগগিক্স, Oxymoron, Dilettante—এবং মাত্র সাত পৃষ্ঠায় আরও কত-কি। এতেও যে উহা ভারতবর্ষের বৃদ্ধ সম্পাদককে ভড়্‌কাইয়া দিবে না, ইহা আশা করাই অন্যায়। "শিশু যে আঁকশী দিয়ে চাঁদ পাড়তে চায়, তা' এই জন্যই যে, তার কাছে চাল-কুমড়ো ও চাঁদ একই সমতলে ঝুলছে" লেখকের এই উক্তি 'কলার কথা'র সর্ব্বাঙ্গেই দৃষ্টান্ত ফলাইয়াছে। 'নব-দাম্পত্য-আলাপ' শীর্ষক কবিতাটির 'মূল' জন্মে নাই, যেহেতু উহার উপাদান নিতান্তই মামুলী। শ্রীমান দিলীপকুমার রায়ের 'য়ুরোপে' সুখভোগ্য। 'আন্দামান'—মন্দ নয়, তবে দুর্বলী রমণীর চিত্রগুলি না ছাপাইয়া চাপিয়া রাখিলেই শোভন হইত, চিত্রগুলির মুখে যে পশুবৎ নির্ব্বিকার ভাব আছে তাহা কামজয়ী চিত্তশুদ্ধির পরিচয় নয়, সুতরাং আর্টের দোহাই ওখানে অগ্রাহ্য; বিশেষতঃ দ্বিজেন্দ্রলালের 'ভারতবর্ষ'কে পশুশালায় পরিণত আর নাই বা দেখিলাম। শ্রীমান শৈলেশের দুর্গকে "নির্ভয়ে অতিক্রম" করার পৌরুষ-প্রকাশই যদি কাম্য হয় তবে লেখক আর কিছু না লিখিলেও পারিবেন, যেহেতু ঐ একমাত্র প্রবন্ধই বিশেষজ্ঞদের চক্ষে তাঁহার "সব চেয়ে বড় পরিচয়" হওয়াও আশ্চর্য্য নয়। 'হুকুম রদ'—শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কবিতা—অনাড়ম্বর সহজ বিশ্বাসের সরল কথা—ভাল। শ্রীদীনেন্দ্রকুমার

রায়ের 'নায়েব মহাশয়' চলিতেছে। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা ভাদ্র মাসের 'আষাঢ়ের মেঘ'কে ডাকিয়া বলিতেছেন—

"আমার অতীত অলকা—তোমায়
ছায়া ও আলোকে গড়ে দাও;
ও মায়া-মোহন সুখের বেদনে
শূন্য হৃদয় ভরে দাও"—

লেখক সফলকাম হোন, তবে সেই সঙ্গে চোখ-কান বুজিয়া এই আট-নয়টা মাস 'বিহ্বল সারা অন্তরে' প্রতীক্ষা করুন এবং 'কান্ত' স্নিগ্ধ, শ্যামকায়' এর সহিত 'প্রিয়তম, তোমারেই চায়' মিলাইবার লোভ সম্বরণ করুন। শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নারীর কথার আর একদিক' সংযত ও স্বচ্ছ; প্রবন্ধের উক্তিগুলি ধীরভাবে আলোচ্য। 'আমাদের নাট্যশাস্ত্র'—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্যের প্রবন্ধ—তথ্যপূর্ণ ও সুন্দর হইলেও নিতান্তই হোমিও-প্যাথিক ডোজের; বিস্তৃততর আলোচনার অপেক্ষা রাখে। 'বিবিধ প্রসঙ্গ' উপভোগ্য। 'স্মরণে'—শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষের কবিতা—ছোট ছোট কথায় ছবির মতন ফুটিয়াছে,—তৃপ্তিকর।

ভারতী (ভাদ্র, ১৩২৯)

'অক্ষয়চন্দ্র সরকার' এবারের প্রথম প্রবন্ধ—লেখক শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। হৃদয়ের শ্রদ্ধায়, ভাষার সারল্যে ও সহজগতিতে উক্তিগুলি দীপ্তি-সুন্দর। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—"বই আর লেখক স্বতন্ত্র পদার্থ। লেখক হইতে বই অনেক তফাৎ। সময় সময় বিপরীত ও দেখা যায়। মাতাল মদ ছাড়াইবার জন্য বই লিখিতেছেন; ঘোরবাবু সংযম-শিক্ষা দিতেছেন—"আমরা যাহা বলি তাহাই কর, যাহা করি তাহা করিও না"। অক্ষয়বাবু সেরকম লোক ছিলেন না; তাঁহার জীবন সাহিত্যময় ছিল; তাঁহার সবটাই বাঙ্গলা সাহিত্য; তাই তিনি 'আচার্য্য'।" সত্য কথা,—একখানি সিদ্ধ জীবনগ্রন্থ শত-শত-লিখিত গ্রন্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাঁহার জীবনগ্রন্থই গ্রন্থময়, তাঁহার মন হইতে উৎসারিত প্রতি বাক্যই মন্ত্র। কারুকার্য্য লক্ষ্য রাখিয়া রচনাও যে পাঠকের মনে মন্ত্রশক্তির কাজ করে না, তাহার কারণই মনের দৈন্য। প্রবন্ধের যবনিকা-পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ঐক্যতান—দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরলিপির কাটগড়ায় রবীন্দ্রনাথের গান—

"তার বিদায়-বেলার মালা-খানি
আমার গলে রে—
দোলে দোলে বুকের কাছে
পলে পলে রে"—

হুলুক, আপত্তি কি? আমরা দূর হইতে দেখিয়াই মুগ্ধ! "সাহিত্যে রাজা ও রাণী" শীর্ষক নিবন্ধে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত গালে হাত দিয়া ভাবিতেছেন—'রাজা নাই, রাণী নাই, তাস খেলি কেমন করিয়া' অথচ 'রাজা নাই, রাণী নাই, গল্প লিখি কাহাকে লইয়া?' অবশেষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—'প্রজাতন্ত্র হইলে প্রজার মঙ্গল হইবে কি না তাহার বিচার করিতেছি না, কিন্তু রাজা, ও রাণী না থাকিলে কল্পনার একটা চিত্তবিনোদন রাজ্য লুপ্ত হইবে এবং সাহিত্যের ঐশ্বর্য্যপূর্ণ একটী কক্ষ শূন্য হইবে'। আমরা বলি—মাভৈঃ, প্রজাতন্ত্র যদিও বা হয়, রাজ্য আমরা ছাড়িব না—"বঁধু তোমায় করবো রাজা তরুতলে" —আর রাণী? ও বয়সের রাণী হইতে কোনো নাতনীই আপত্তি করিবে না। 'সমাচার-চন্দ্রিকা'-পরিচয়ে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলা সাময়িক পত্রিকার প্রত্ন-সংগ্রহ করিয়াছেন—ভাল। 'বৌঠান'—শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর গল্প; লেখকের নামেই প্রেমের অঙ্কুর থাকায় বর্ণনীয় বিষয়ের মধ্যে উহা অনুবিদ্ধ হইবার সুযোগ পায় নাই; চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু মন বসাইতে পারি নাই। তবু 'ভারতীর' আট পৃষ্ঠার খোরাক উহা যে যোগাইয়াছে তাহাই সম্পাদকের লাভ ও ক্রেতার লোকসান। শ্রীগিরিজা বসুর 'সাধ'—

"আনন্দ মোর হোক সহচর, প্রীতি মোর হোক সাথী
তোমারি বীনায় ঝঙ্কারে মোর চিত্ত উঠুক মাতি;
তোমারি পরশে ফুটুক জীবনে অক্ষয় মধুরিমা
এস তুমি প্রাণে, জাগিবে হৃদয়ে অমৃত পূরণিমা"

—ওগো 'তুমি'!—বর দাও 'তথাস্তু'—নতুবা সব শিয়ালের এক ডাক আর শুনিতে পারা যায় না। কনক মুখোপাধ্যায়ের সঙ্কলিত 'মিলনের মন্ত্র'—মন্দ নয়, তবে প্রারম্ভেই বর্ত্তমান ও অতীত কালের খিচুড়ি পাকাইয়া গিয়াছে। 'প্রেমের তীর্থ যাত্রা'—ফরাসী হইতে অনুদিত জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুরের গল্প। শেষে প্রকাশ—"প্রেম কখনই আবার নূতন রূপে আরম্ভ করা যায় না"। 'ব্যথার দান'—সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরিত কবিতা—না পড়িলেও কেহ ব্যথা পাইবেন এমন আশঙ্কা নাই, অন্ততঃ রবিবাবুর জীবদ্দশায়। 'মানুষের ডাক'

শীর্ষক নিবন্ধে শ্রীযুত বারীণ ঘোষ বলিতেছেন—'মানুষ চাই। একটা অরবিন্দ দেবকীর বুকের পাষাণ আঙ্গুলের ভরে টলিয়ে দেয়—একটা গান্ধি'—ইত্যাদি। ইত্যাদি। শুনিতে মন্দ নয়, কিন্তু দুঃখ এই যে, যাহা চাই, তাহা (নিজের মধ্যেই না গড়িলে) পাই না। শ্রীযুক্ত নিরুপমা দেবীর উপন্যাস অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতেছে।

মানসী ও মর্ম্মবাণী (ভাদ্র, ১৩২৯)

প্রথম প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত অমৃত লাল শীল কর্ত্তৃক জৈনগ্রন্থ হইতে সংগৃহিত 'চন্দ্রগুপ্ত'; লেখক মহাশয় এইরূপ সংগ্রহে ব্রতী থাকিলে ভবিষ্যৎ তাঁহার দ্বারা উপকৃত হইবে। 'উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বাঈলীলা'—মন্দ নয়। 'বাঙ্গালী বীর ভীম ভবানী'। রামমূর্ত্তির ছাত্র ভীম মূর্ত্তির পালোয়ানী কীর্ত্তিকথা ইহাতে চিত্রসহ বিবৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মাণিক ভট্টাচার্য্য "অপূর্ণ" উপন্যাস লিখিতেছেন—এ সংখ্যায় দুটীমাত্র পরিচ্ছেদ আছে। শ্রীপ্রমথসহায় বেদান্তশাস্ত্রীর "উত্তরচরিতে চিত্রদর্শন" উল্লেখযোগ্য আলোচনা, তবে বড়ই ভাসা ভাসা। যোগেন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। ৺ মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের 'দেশী লোক' গন্ধেরই মত অনায়াস-পাঠ্য। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সিংহের ব্যবস্থা কুমারীর ডায়রি' স্বামীনিকারী কুমারীদের জন্য অনুকম্পার উদ্রেক করে। সমাজচিন্তাশীলেরা পাঠ করুণ। শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর 'প্রবাসীর পত্র' নানা তথ্যে পূর্ণ। বৌদ্ধযুগের মথুরা" আলোচ্য সংখ্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিবন্ধ—ক্রমশঃ চলিতেছে—লেখক শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারি দত্ত। "রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গ পন্থা"য় শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন রায় তাঁহার প্রতিবাদী বিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়ের মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় "রবীন্দ্রনাথের ছন্দ" শীর্ষক প্রবন্ধে কবিবরের ছন্দপাবকগুলির নামকরণের চেষ্টা করিতেছেন—মন্দ কি!। মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের 'দারার দুরদৃষ্ট' ক্রমশঃ চলিয়াছে। তাঁহার 'নূরজাহানের' মত ইহাও সুন্দর হইতেছে। শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র "বঙ্গ সাহিত্যে সত্যেন্দ্রের" পরিচয় দিয়াছেন; অক্ষয় দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রকৃতির তুলনাকল্পে তাঁহার উক্তিগুলি মূল্যবান। শ্রীযুক্ত কালীদাস রায়ের 'ভাদরে' আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ কবিতা-সুমিষ্ট ও সুপাঠ্য। কাজীনজরুল ইসলামের 'বেদন-মণি' ও ভাল।

সহচর (শ্রাবণ, ১৩২৯)—

গোড়ায় গলদ-আধড়াই,—এটুকু সম্পাদকীয় এবং পত্রেরই প্রতিনিধি; আড়ামোড়া ভাঙিতে ভাঙিতে লেখা। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নন্দীর সংগৃহীত 'সাদীর বাণী' নীতি-উপদেশ সংগ্রহ; উপভোগ্য। উপদেশ ভাল, কিন্তু মানে কে? কাজীনজরুল ইসলাম এবার 'শেষের গান' ধরিয়াছেন—গান শুনিয়া বোধ হয় তাঁহার শেষের এখনও দেরী আছে; ছন্দের জ্ঞান টন্‌টনে থাকিতে নাড়ী ছাড়ে না। সম্পাদকের 'রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র' পড়িলে নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়। 'মিতব্যয়ের প্রকৃত মূলতত্ত্ব' পড়িবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু 'ব্যঙ্গোক্তি' শুনিয়া ও পাতা গুনিয়া পিছাইয়াছি—আট পৃষ্ঠা 'ব্যঙ্গোক্তি' পড়িবার ধৈর্য্য নাই। 'সাদীর গুলিস্তাঁ'—মন্তব্যসহ, ইংরাজী হইতে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষের অনুবাদ। ঐতিহাসিক মূল্যের সহিত স্নিগ্ধ-গম্ভীর কবি-চিত্তের রসায়ন যুক্ত হওয়ায় পংক্তিগুলিতে একটী বিশিষ্ট শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে; পুস্তিকাকারে এগুলির প্রকাশ বাঞ্ছনীয়। শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেনের 'বঙ্গসাহিত্যে মধুসূদনের ব্যক্তিত্ব' উপভোগ্য; প্রায় একই ছাঁচের রচনা পড়িয়া পড়িয়া মন যখন ক্লান্ত হয়, তখন যে মুষ্টিমেয় লেখকের বিশিষ্ট লিপিচাতুর্য্য মনকে জড়তা মুক্ত করে, শশাঙ্কবাবু তাঁহাদের অন্যতম। তবে' 'অবিরুবা সহানুভূতি' না চাহাইতে পাঠকের সহানুভূতি হারাইবার ভয় নাই। সম্পাদকের 'মানবাত্মা' প্রজ্ঞা-সুরভি-সুন্দর।...

বেতাল।

সোয়াস্তি।

রবিতাপে ছারখার সৃষ্টি
ওই হেনে এলো ধারা বৃষ্টি।
ছাড়িয়াছে জ্বর গেছে তাতটী
ঘুমাইবে রোগী সারা রাতটী।
প্রবাসী যে গৃহে আজ ফিরলো
হাবা তরী বন্দরে ভিড়লো।

২

শেষ করি অর্থ ও যুক্তি
নির্দ্দোষ আজ পেলে মুক্তি,
বিভীষিকা সিলাইল দুন্তে
দেবী আজ দেখা দিল পুন্যে।
শ্রমে রাঙ্গা শিথিলিত অঙ্গ
তবু সুখী রাজসুয় সাঙ্গ।

৩

রণ শেষ, হল আজ সন্ধি
ঘরে ফেরে সৈন্য ও বন্দী,
দরশন শেষ আজ তীর্থে
যাত্রীরা চলে গৃহে ফিরতে।
মানতের ফুল ওই পড়লো
সাধনের চোক্ জলে ভরলো।

৪

যাহাদান্ হের নল রাজকে,
কলি তার ছেড়ে গেছে আজকে।
শেষ বাসুকীর শ্বাস বিস্বাদ
আজ পাবে পীযুষের আস্বাদ।
মহা শেষ দেব হাসছে
অমিয়ের কণা উড়ে আসছে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, প্রভৃতি প্রেমভক্তির যাত্রীগণ যে মহাবাণীর প্রতাপে চতুর্দ্দিক সম্মোহিত করিয়াছিলেন, তাহার ঝঙ্কার আজিও লুপ্ত হয় নাই। বাঙ্গালা শিশু সাহিত্যের উন্নতিকল্পে তাঁহাদের হৃদয় তন্ত্রীও যে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, কাল তাহা প্রমাণ করিয়া আসিতেছে।

সাহিত্যের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আর্টের বিকাশ অবশ্যম্ভাবি। জ্ঞানের প্রসার ও সভ্যতার দীপ্ত আলোকে সাহিত্যের গণ্ডি বৃহত্তর হইতে লাগিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার স্রোত নানাবিধ রস বৈচিত্রে এদেশীয় নব্যজ্ঞান পিপাসুগণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে লাগিল। এই সময় হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যে বিদেশীয় সাহিত্যের ছায়া পড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বিদেশীয় রীতি নীতি ও কাব্য কৌশল এদেশীয় সাহিত্যিকগণের আদর্শস্থল হওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে।

আর্টের আদর্শ।

কবিগুরু Shakespeare ও শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক Scott, রাশিয়ার বিখ্যাত উপন্যাস লেখক "Tolstoy, "আবার ভারতের কালিদাস ভারবি, মাঘ ঐতিহাসিক যুগের আর্টের গুরু; আবার তাঁহাদের গুরু জগতের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য রচয়িতা ব্যাস ও বাল্মিকী। যুগ যুগান্তর ধরিয়া তাঁহাদের অমৃতময় অসীম জ্ঞান-ভাণ্ড বিশ্বজনের তৃষ্ণা নিবারণ করতঃ শত শত জটিলতথ্য দিব্যালোকে সুপরিস্ফুট করিয়া দিতেছে। এই সকল মহাকবিগণের রচনা হইতে আমারা আর্টের আদর্শ উপলব্ধি করিতে পারি।

অধুনা বাঙ্গালা সাহিত্যের বেগবতী তরঙ্গমালা সাগরাভিমুখে প্রবাহিতা। অদ্যাবধি কত পুস্তকই যে রচিত ও মুদ্রিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু কাল মহাবিচারক। সে যেমন সত্যকে চিরদিন আপন বক্ষে বহন করিতে জানে তেমনি অসত্যকে অচিরে আপন বিশাল গর্ভে প্রেরণ করিতে পারে, সেই জন্য সংখ্যাতীত পুস্তকরাজি আজ কাল গর্ভে বিলীন! যে সাহিত্য সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, যে সাহিত্যের কেন্দ্র, আনন্দ ও রসধারা যে সাহিত্যের অন্তর ও বাহির সরস করিয়া রাখিয়াছে, এই উন্নতযুগে সেইরূপ সাহিত্যই সাধারণের নিকট আদৃত হইতে পারিবে।

আর্টের বিশিষ্ট গুণ।

ইতিহাস প্রমাণ করে ইজিপ্টই সর্ব্বপ্রথমে সর্ব্বোন্নত সভ্যতালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। ইজিপ্টের শিল্প তাহার সাক্ষ্য। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চিত্রকলার আদর্শ

ইজিপ্টই প্রথমে উদ্ভাবন করে। গ্রীস ও পরবর্ত্তী সভ্যদেশ সকল তাহার কাছে শিল্প-শিক্ষা লাভ করিয়াছিল। ইজিপ্টের শিল্প

সৌন্দর্য্য

আমরা সৌন্দর্য্যের যে চিত্র পাই তাহাতে তাহাদের আদর্শ কিরূপ মহান ছিল তাহা সহজেই অনুমিত হয়। আর্টের প্রধান লক্ষণ সৌন্দর্য্য; এই সৌন্দর্য্যবোধ মানবহৃদয়ে অল্পবিস্তর পরিমাণে বিরাজমান থাকে, তাহা বাহির হইতে শিখিতে হয় না। কবির এই সৌন্দর্য্যবোধ সুতীব্র ভাষায়; এমন চক্ষু আছে যাহার দ্বারা জগতের মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর ও মহান তাহা তিনি বাছিয়া লইতে পারেন। কালিদাস পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয় লইয়া মহাকাব্য রচনা করিলেন। হিমালয়ের কত সৌন্দর্য্য, কত সম্পদরাশি তাঁহার চক্ষে ধরা পড়িয়াছে। প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু বিশাল সেইগুলি তিনি প্রেমনয়নে সন্দর্শন করিয়া সুললিত কবিতা সম্পদে ভূষিত করিয়াছেন। সমুদ্র খনিজ ও অতিরিক্ত বিষয়সমূহ তাঁহার চিন্তার সামগ্রী ছিল।

যে সৌন্দর্য্য আর্টের কেন্দ্রীভূত, তাহা সকল সময়েই সর্ব্বজনের সমাদর লাভ করিয়া থাকে; কাল তাহাকে কখনও রসহীন করিতে পারে না। সেক্সপিয়র বা কালিদাসের কাব্য তাই নিত্যনূতন। প্রকৃতি

আনন্দ ও রস

রাজ্যে সৌন্দর্য্যের পূর্ণাঙ্গ ছবি পাওয়া যায়। একটী সুপ্রস্ফুটিত গোলাপ গন্ধে, বর্ণে, ঘ্রাণে চিরদিনই আনন্দপ্রদ। সৌন্দর্য্যে নির্ম্মিত জীবন্ত চিত্র প্রকৃতি রাণী অহরহ সৃষ্টি করিতেছেন। কবি হৃদয় এই মোহে নিশিদিন তন্ময়, তাই কবি চিত্র আঁকিতে যেমন পারদর্শী এমন আর কেহ নয়। আর্ট আনন্দ ও রসদানে কৃতকার্য্য হয় যখন সে স্বভাবের নিকট সংরক্ষণ করে। এই জন্য অন্তর্দৃষ্টি আবশ্যক। যিনি যিনিষের মর্ম্ম অন্তরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহার চিত্র তত স্বাভাবিক ও ভাবময় হয়। যে সকল গ্রন্থ কালের গর্ভে অকালে বিলীন হইয়াছে, বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে লেখকগণের অন্তর্দৃষ্টি ও সত্য প্রতিষ্ঠার অভাব তাহার প্রধান কারণ।

সৌন্দর্য্য বোধের জন্য যেমন অন্তর্দৃষ্টি আবশ্যক তেমনি [illegible] ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও সূক্ষ্ম অনুভূতি চাই। রস রূপকে কেন্দ্রীভূত হইয়া তাহার সংরক্ষণ ও স্ফূর্ত্তি বিধান করে সুতরাং রসলাভের জন্য রূপের মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। আবার রূপকে অপরূপ করিবারজন্য নব নব রস তাহার সঙ্গে মিশাইতে হয়। যে সকল কবি শুধু রূপের আকর্ষণে মোহাক্রান্ত হন তাঁহারা চিরদিন রূপেরই বর্ণনা করিয়া যান, ফলে রসের অভাবে

তাহাদের কাব্য অকালে শুকাইয়া যায়। এ সম্বন্ধে পূজনীয় কুলকুমারী গুপ্তা বলিয়াছেন "সমুদয় জগতিক বস্তুরই দুইটী কবিয়া বিভাগ আছে; একটী বাহ্যিক ও অন্যটী আন্তরিক। কবির ভাবচক্ষু অনেক সময় অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। কেবল বাহির বা রূপ লইয়াই উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পরে। তাই কবিরা প্রায় বস্তুর বস্তুত্ব ছাড়িয়া রূপমোহে জ্ঞানহত হইয়া যায়; এই মোহমদিরাই, অনেকের নিকট কবির কবিত্ব বলিয়া বিবেচিত হয়; সেই জন্যই বিকশিত কুসুম, সুশোভন কুঞ্জবন, কোকিলের কুহুতান, ভ্রমরের গুণ গুণ গান, চাঁদের বিমল কিরণ ইত্যাদি প্রায় কবিজনের কবিতার প্রাণ হয়। এসকল বস্তুর বহির্বাঙ্গ বা রূপমাত্র। যে মুহূর্ত্তে কবি এই বাহ্যবিভাগ ছাড়িয়া অন্তর্রাজ্যে বা গুপ্তময় ভূমিতে আসিয়া উপনীত হয়েন, সেইক্ষণ হইতে কবির দিব্যচক্ষু উন্মিলিত হয়। তিনি তখন রূপ ও গুণযুক্ত একটী যথার্থ বস্তু অঙ্কনে অধিকারী হইয়া যথার্থ কবি নাম পাইবার যোগ্য হয়েন। ফলকথা বস্তুর স্বরূপ না জানিলে বস্তুকে ধরিতে পারা যায় না। তাই বস্তুজ্ঞান বিরহিত সাধারণ কবির কবিতা প্রায় অসংস্কৃত অবস্থায় দেশ-কালপাত্র অবস্থার অধীন হইয়া অকালে কাব্যরাজ্য হইতে বিদায় গ্রহণ করে"

যতই কবি এইভাবে বস্তুর অন্তরে প্রবেশ করিতে থাকেন, ততই তাঁহার চিন্তার প্রণালী গভীর ও হৃদয়-গ্রাহী হইয়া থাকে। বস্তুর স্বরূপ ধরিতে পারিলেই নানা রস সৃষ্টির জ্ঞান আসিয়া থাকে। কাব্যসৌন্দর্য্যের প্রধান উপকরণ এই রস। কাব্যরূপ অধিকতর সুন্দর করিতে হইলে তাহার মধ্যে বিচিত্র রসের সমাবেশ করিতে হয়। শুধু কাব্যের নয়, কবিতা ও আখ্যানেরও ইহা প্রধান সম্পদ। যে কবি এক একটী কবিতার মধ্যেও বিচিত্র রসের সমাবেশ করিতে পারেন তাঁহারই কৃতিত্ব অধিক। রবীন্দ্রনাথের "পুরাতন ভৃত্য" হাস্য রস হইতে আরম্ভ করিয়া কিরূপে করুণরসে পর্য্যবসিত হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিলে কবিবরের রস-সমাবেশ শক্তির বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়; দ্বিজেন্দ্রলালও এ বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শী।

পূর্ণাঙ্গ আর্ট, বিশিষ্ট জনসমাজ বা কালের মধ্যে আবদ্ধ নহে। যাহা সুন্দর তাহা চিরদিনই সুন্দর, সকলের কাছেই তাহা সুন্দর। অপূর্ণ আর্টই কেবল সকলের কাছে সকল সময়ে সুন্দর নহে। আর্টের গুণাগুণ বিচার হয় তাহার ইঙ্গিত শক্তিতে। একটী সাধারণ চিত্র, একটী কবিতা চরণ, যদি একসঙ্গে আমাদের মনে অনেক

ইতি।

ভাবের সৃষ্টি করিতে পারে, অনেক পুরাতন স্মৃতি জাগাইয়া দেয়, তাই সেই সাধারণ চিত্র ও কবিতাচরণ শ্রেষ্ঠ আর্টের অঙ্গীভূত। রবীন্দ্রনাথের 'বধূ' কবিতায় :—

"বেলা যে পড়ে এল জলকে চল"—

এই একটী চরণে কবি কতভাবই প্রকাশ করিয়াছেন! সহরের প্রাচীর বেষ্টিত অট্টালিকায় আবদ্ধা নবোঢ়া বধূর নিরাকুল হৃদয়ের এমন প্রাণময় করুণ চিত্র সাহিত্য-জগতে অদ্বিতীয়!

আবার বঙ্কিমচন্দ্রের নবকুমারের একাকী পরিত্যক্ত স্থানে একটী কথা, "সন্ধ্যাকালে এক একটী তারা উঠিতে লাগিল, তাহার নিজের জন্মভূমিতে যেরূপ ভাবে উঠিত, ঠিক তেমনি ভাবে উঠিতে লাগিল"। 'তাহার নিজের জন্মভূমিতে যেরূপভাবে উঠিত' এই একটী কথা কতভাবই জাগাইয়া দেয়! এই সামান্য কথায় কবি নবকুমারের সমগ্র ভারাক্রান্ত হৃদয়টী আমাদের সম্মুখে প্রতিফলিত করিলেন। এইরূপ এক একটী ইঙ্গিতে আর্টের সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে। বঙ্কিম-চন্দ্রের কপালকুণ্ডলায় আর্টের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। "কপালকুণ্ডলা" তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি।

আর্টের বিকাশ।

আর্ট সত্যকেই আশ্রয় করে। আবার সত্যের কেন্দ্র মানবহৃদয়। পুষ্পকলির মধ্যে যেমন গন্ধ প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমান থাকিয়া মলয়ানিলকে পূর্ণে একদা চতুর্দ্দিক সুরভিত করে, তেমনি সৌন্দর্য্যবোধ জীবনে সেভাতেই মানবহৃদয় আশ্রয় করিয়া থাকে। অনুকূল শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার গুণে তাহার স্ফূর্ত্তি হয় এবং সত্যের সাধক সৌন্দর্য্যের সংস্পর্শে তাহার পূর্ণ বিভূতি মনঃক্ষেত্রে আমোদিত করে। সাধিত সাধনাই সেই পরিস্ফুরণের প্রধান সহায়।

আর্টের বিকাশ।

আত্মবঞ্চনা যেমন আত্মাকে বিকাশ পাইতে দেয় না, সত্যের অনুশীলন তাহার অপরূপ করে, তেমনি সাহিত্যসেবায় ভাব গোপন করিলে আর্টের হ্রাস হইতে থাকে ও সকল শ্রম ব্যর্থ হয়। মানব হৃদয়ের অসংখ্য ভাবরাশি প্রকাশ নিমিত্ত হৃদয়ের মধ্যে আসিতে চাহিতেছে, প্রকৃত সাহিত্য সেবক তাহাদের মধ্যে যেগুলি পবিত্র ও কল্যাণকারী তাহাদিগকেই ঐ অপরূপ সাজে সাজাইয়া সাহিত্য মন্দিরে বাহির করেন। এই ভাবে আর্টের প্রতিষ্ঠা যতই বাড়িতে থাকে, ততই সাহিত্যের সমৃদ্ধি হয়।

বিশ্বপ্রকৃতি এইভাব ও চিন্তার সামগ্রী চিরদিন যোগাইয়া আসিতেছে। তাহার মধ্যে যে আনন্দ বিরাজমান থাকিয়া তাহার প্রত্যেক অঙ্গের শোভা নয়নাভিরাম করিয়া রাখিয়াছে সেই আনন্দানুভূতিই বিশিষ্ট ভাবোদ্রেকের প্রধান সহায়। প্রকৃতিরাজ্যে এমন এক একটী শুভক্ষণ আসিয়া থাকে যে, কেবল তখনই তাহার বিরাট আনন্দ রসের সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয়। সাহিত্য-সেবাই যাহাদের সাধনা, প্রতিভায় যাঁহাদের হৃদয় আলোকিত তাঁহারাই সেই শুভক্ষণের প্রতীক্ষায় আকুল প্রাণে বসিয়া থাকেন। প্রকৃতি তাঁহাদিগকেই গুপ্ত সম্পদ দেখাইয়া থাকেন।

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে শান্ত, সরল ও আনন্দময় নিয়ম চলিয়া আসিতেছে আমাদের অন্তর প্রকৃতির মধ্যে সেই নিয়ম পরিচালিত করিলে সাহিত্যসাধনায় সিদ্ধি লাভ হয়। অন্তরে এই আদর্শ রাখিয়া তাহাকে বাহিরে শিল্পকলার বা কাব্যরসে প্রকাশ করিতে পারিলেই তাহার সার্থকতা ও ক্রমোবিকাশের পথ সুগম হয়। তবে অনেক সময় অন্তরকে বাহিরে ফুটাইয়া তুলা যায় না। হৃদয়ে প্রবল উচ্ছ্বাস অনেক সময় ভাষায় বা চিত্রে ব্যক্ত হয় না। সাহিত্য সাধনায় উঠিতে উঠিতে এই দুর্ব্বলতা অনেকটা চলিয়া যায়, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে যাইতে পারে না, কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ।

কবি ভাবকে যতই ধরিতে চাহিতেছেন সে ততই তাঁহাকে ঊর্দ্ধে টানিতেছে; তাই তাঁহার চির অতৃপ্তি। কবি যেখানে মনে করিলেন এই শেষ হইল পরক্ষণেই দেখেন, সেখানে কেবলমাত্র আরম্ভ। শিল্পিরও এই অবস্থা। চিত্রসাধনায় তিনি কখনও তৃপ্তি পান না। কখনও কখনও তুলি ফেলিয়া দিয়া তিনি নীরব হইয়া বসিয়া থাকেন, কারণ তাঁহার মনের মত চিত্র আঁকিবার তুলি এ জগতে নাই। ইহাতেই বুঝা যায় কবির মধ্যে এক মহাকবি ও শিল্পির মধ্যে এক মহাশিল্পি নীরবে কার্য্য করিয়া যাইতেছেন, তাই কবি পরিশেষে সেই গণ্ডী ছাড়িয়া সেই মহাকবির বিশ্বকাব্যে শুধু হৃদয় মিলন করিয়া তন্ময় হইয়া থাকেন ও শিল্পি তুলি, রং ও কাগজের গণ্ডি ত্যাগ করিয়া বিশ্বপ্রকৃতির অনন্ত রূপ ছবি দেখিতে দেখিতে সেই মহাশিল্পীর পদে মস্তক অবনত করেন।

শ্রীশিবরক্ষ দত্ত বি এ।

বাপ—আর ক'টা দিন থেকে গেলে হ'ত না! আর ক'দিনই বা বাঁচব?, আষাঢ় দিন যে ঘনিয়ে এল বাবা!

ছেলে—আস্‌ছে হপ্তায় যে কলেজ খুল্‌বে!

বাপ—"আচ্ছা, এস বাবা, শীতের ছুটীটায় যেন একটু শীগ্‌গীর, শীগ্‌গীর এস"—কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধের বক্ষস্থল স্নেহাশ্রুজলে ভাসিয়া গেল। একমাত্র ছেলেকে বুকে জড়াইয়া, তার মাথায় আশীষ চুম্বন দিলেন, তারপর হুকায় টান দিতে দিতে, ছেলের সঙ্গে ষ্টেসন পর্য্যন্ত গেলেন।

বিনোদ মুখুটী, হরিশপুরের, ভবেশ মুখুটীর একমাত্র ছেলে। গৃহিণী সেই পাঁচ বৎসর বয়সের ছেলেটী রাখিয়া সুখ দুঃখের পরপারে চলিয়া গেলেন, হরিশবাবুও সেরেস্তাদারী কাজে ইস্তফা দিয়া, পৈতৃক ভদ্রাসন বাটী বিক্রী করিয়া, তার স্ত্রীর শেষ স্মৃতি-বিজড়িত এই মামুদপুর গ্রামখানিতে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। ছেলেকে লেখা পড়া না শিখাইলেও, পৈতৃক ভদ্রাসন এবং দেশের জমীজমা বিক্রী করিয়া যে টাকাটা তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতেই চলিয়া যাইত। কিন্তু তার পৈতৃক গ্রামের দশজনার পরামর্শে এবং বিনোদের আব্দারে, সে অগত্যা তার একমাত্র মাণিককে "লক্ষ্ণৌ" ছাড়িয়া দিল।

(৩)

বিনোদ যেদের দোতলায় একটী পরিষ্কার ঘর ভাড়া লইয়াছিল। সে ঘরে সে একাই থাকিত। নীচে পানওয়ালীর দোকানের সাম্‌নে প্রত্যহই ভীড় জমিত। বিনোদ পাড়াগাঁয়ের নিরীহ ভালমানুষ, সে ওসব হৈ চৈ ভালবাসিত না। পানওয়ালী তার রূপের পোসরা লইয়া মাতাল লোকগুলার সঙ্গে দোকানদারী করিত। বিনোদ ততক্ষণ মাথায় দুই ঘটি জল ঢালিয়া, চটিজুতা পায়, টীফিন সাটি বাঁধিয়া কলেজে ছুটিত। বিনোদের চেহারাখানা বড়ই সুন্দর ছিল। মুখখানি সর্ব্বদাই সরল হাসির রেখা ফুটিয়া থাকিত; রোজই সে পানওয়ালীর দোকানের সাম্‌নে দিয়া যাইত, কিন্তু কখনও সে ভুলক্রমেও একবার তাহার দোকানে তাকাইত না। যেখানে বড় বড় জুড়ি থামিত, যেখানে বাজা মেয়েরা নাচের আসর জাকাইত, সেই পানওয়ালীর লুব্ধদৃষ্টিতে নবীন তাপস বিনোদের দেহ একটু স্পর্শ করিতে পারিত না। ক্রমে পানওয়ালীর ধৈর্য্য চড়িয়া গেল। একদিন সে বিনোদকে ডাকিল। একটা খুব ভাল পান সাজিয়া তার হাতে দিল, একটু মুচকি হাসিল, একটু বঙ্কিম গ্রীবা বাঁকাইল; বিনোদের,

বুকের ভিতরে একটা কি যেন ব্যথা বাজিল। সে পান ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া তার নিজের প্রকোষ্ঠে যাইয়া দরজা বন্ধ করিল। বিনোদ তখন ভাবিতেছিল "হায় হায়, এ পাগলকরা রূপের প্রতিমার মধ্যে এতখানি পাপ!"

(৪)

এক, দুই, তিন্—তিনটা বাজিয়া গেল। পানওয়ালীর ঘরের ভিতর আজ কি যেন তোলা পাড়া করিতেছিল। যাহার দ্বারে অত বাঙ্ময় ব্যথা খুঁড়িয়া মরে, সে পানওয়ালী কিনা আজ একটা মেসের ছোকরার কাছে হার মানিল। দুঃখে, ক্ষোভে, তার প্রাণটা তখন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইতেছিল।

(৫)

দীর্ঘ চার বৎসর চলিয়া গিয়াছে। পানওয়ালীর যৌবনে ভাঙ্গন টান পড়িয়াছে। এখন আর তার দোকানের সামনে অত ভিড় নাই। যৌবনের বাজারে খুব প্লেগ দেখা দিয়াছিল। একদিন বিনোদ দেখিল, পানের দোকানের সামনে পূর্ব্বের ন্যায় ভিড়। বিনোদ ঔৎসুক্য সহকারে সামনে যাইয়া দেখিল—একটি স্ত্রীলোক "বর্মি" করিয়া বাসায় পড়িয়া আছে, তার মুখ দিয়া কাপড় দিয়া চলিয়া যাইতেছে। বিনোদ সেই মেসে গিয়া ডাক্তার আনিয়া নিজের হোমিওপ্যাথিকের বাক্স খুলিয়া ঔষধ দিল। পানওয়ালী চক্ষু মেলিয়া কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে বিনোদের পানে চাহিল। বিনোদ জিজ্ঞাসা করিল "এ আপনি কে" ?—স্ত্রীলোকটী উত্তর করিল—বাবা! আমি পানওয়ালী।

(৬)

প্রাগুক্ত ঘটনার ঠিক দুই বৎসর পরে, হেমন্তের প্রভাতে এক সন্ন্যাসিনী বিনোদ দের মেসের কাছে দাঁড়াইয়া কাহাকে খুঁজিতেছিল, তার হাতে একখানা মস্ত কাগজ; বিনোদ তখন কোথায় চলিয়া যাইতেছিল, সে সন্ন্যাসিনী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কাকে চান? সন্ন্যাসিনী বলিল—এই কাগজ খানা পড়ুন। বিনোদ দেখিল—তাহারই নামে লেখা একখানা নালিশ। সন্ন্যাসিনী বিনোদের পানের ঘুণা করে নাই। বিনোদ জিজ্ঞাসা করিল,—কি করতে চান আপনি? সন্ন্যাসিনী উত্তর করিল—বাবা! আপনি যার দুর্নাম ফিরাইয়া দিয়াছেন, আমি সেই পতিতা পানওয়ালী।

শ্রীযুক্ত বি। মজুমদার।

বৈজ্ঞানিকের আসল এবং নকল।

আজকাল জগতে এক বিষম হুড়াহুড়ি লাগিয়া গিয়াছে কেহই যেন আর প্রকৃতিদত্ত জিনিষে সন্তুষ্ট নহেন। প্রকৃতিরাজ্যের নিয়ম এই যে, জগতের সকল দেশকেই পরস্পরের নিকট কোন না কোন প্রকৃতিদত্ত জিনিষের জন্য মুখাপেক্ষী থাকিতে হইবে। যখন আমরা জাপানের কর্পূর, ভারতের নীলের বিষয় চিন্তা করি তখনই আমরা প্রকৃতির এই নিয়ম উপলব্ধি করিতে পারি। একমাত্র জাপান এবং চিনের কতকাংশ ব্যতীত পৃথিবীর আর কোথাও কর্পূর এবং ভারতবর্ষ ব্যতীত আর কোথাও নীল পাওয়া যাইত না সুতরাং অন্যান্য দেশগুলিকে অন্ততঃ এই দুই জিনিষের জন্য জাপান এবং ভারতের নিকট মস্তক অবনত করিতে হইত। এই রকম প্রত্যেক দেশেই এমন দুই একটি প্রকৃতিদত্ত বিশেষ জিনিষ আছে যাহার জন্য অন্যান্য দেশগুলিকে উহার মুখাপেক্ষী হইতে হইবে।

আজপর্য্যন্ত আমাদিগকে কতকটা প্রকৃতির অধীন হইয়া চলিতে হয় কিন্তু বিজ্ঞান প্রকৃতির গণ্ডীকে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে এবং যেভাবে দ্রুতগতিতে বিজ্ঞান জগতের সমস্ত জিনিষকে প্রকৃতির বিধানের বাহিরে লইয়া যাইতেছে, তাহাতে বোধহয় যে আরও কিছুদিন পরে আমরা প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া চলিতে সক্ষম হইব।

কৃত্রিম কর্পূর এবং নীলের কথাই ধরা যাক। পূর্ব্বে সমস্ত দেশগুলিকে ঐ দুই জিনিষের জন্য জাপান ও ভারতের অবস্থ হইতে হইত। এখন বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধি ও চেষ্টার ফলে যেখানে সেখানে এই সকল জিনিষ প্রস্তুত হইতেছে। যে জার্ম্মানী ও ইংলণ্ডে কখনও কর্পূর ও নীলউৎপন্ন হইবে একথা কে কল্পনাও ভাবিত না সেই জার্ম্মানী এখন ভারতের নীলের বাজার দখল করিয়া বসিয়াছে এবং জাপানের বা হইবে খুব কমই কর্পূর রপ্তানী হইবার সুবিধা দিতেছে। এই বিজ্ঞানাগার-জাত কর্পূর ও নীল যেন অংশেই প্রকৃতিজাত জিনিষ হইতে নিকৃষ্ট নহে, বরং অনেক ভালো। ইহা প্রকৃতিজাত জিনিষ হইতে উৎকৃষ্ট। এই ভাবে কেবল দুই একটিমাত্র জিনিষ বিজ্ঞানাগারে প্রস্তুত হয় তাহা নহে, পরন্তু আজকাল জগতের অধিকাংশ জিনিষই কারক হইতে চিনি

পর্য্যন্ত বিজ্ঞানাগারে বসিয়া বসিয়াই প্রস্তুত করা হইতেছে। অবশ্য সমস্তগুলি দ্বারা যে এখনই লাভজনক ব্যবসায় খোলা যাইতে পারিবে তাহা নয়, কিন্তু আমরা অন্ততঃ আশা করিতে পারি যে, কালে এইগুলিই বিস্তৃতি লাভ করিয়া আজকালকার কৃত্রিম কর্পূর ও নীলের মত একান্ত লাভজনক ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইবে। বিজ্ঞানের উন্নতির মাত্রা দেখিয়া বোধ হয়, সেই ভবিষ্যৎ স্বপ্নের দিন অতি নিকট, যখন ঘরে বসিয়া মাংস প্রস্তুত করিতে পারা যাইবে এবং সেই আমিষ নিরামিষাশীগণও খাইয়া তৃপ্তিলাভ করিবে। তখন জীবহত্যা একরকম উঠিয়া যাইবে।

এখন সে সব কথা যাউক। কি ভাবে সাধারণ অঙ্গার হইতে হীরক এবং অঙ্গার ও অন্যান্য বায়বীয় পদার্থ হইতে কর্পূর, নীল, চিনি ইত্যাদি প্রস্তুত হইতেছে, তাহা অন্য প্রবন্ধে আলোচিত হইবে। এই প্রবন্ধে আমি অন্য একটি বিষয়ে পাঠকদের মন আকৃষ্ট করিতে চাই; বিষয়টি বৈজ্ঞানিকের উর্ব্বর মস্তিষ্কের ফল বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বিজ্ঞানবলে কৃত্রিম উপায়ে কর্পূর, নীল ইত্যাদি প্রস্তুত হইতেছে, কিন্তু এই কৃত্রিম পদার্থগুলি যে উপাদানে ও অনুপাতে প্রস্তুত, আসল পদার্থগুলিও সেই উপাদানে এবং অনুপাতে প্রস্তুত অর্থাৎ এই নকলগুলি ঠিকই প্রকৃত জিনিষ। আমি এখন যাহা বলিতে যাইতেছি তাহা এইরূপ নয়। এখনও প্রকৃতিতে এমন জিনিষ প্রচুর আছে যাহা বিভিন্ন পদার্থের কি অনুপাতে প্রস্তুত তাহাই ঠিক করিতে পারা যায় নাই। এরূপ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকগণ আসল জিনিষের আবিকলতনবিশিষ্ট এমন সকল জিনিষ বাহির করিয়াছেন, যাহাদ্বারা আসল জিনিষের কাজ অবাধে চলিয়া যাইতে পারে অথচ এই সকল জিনিষের দাম আসল অপেক্ষা অনেককম। এই জিনিষগুলাকেই প্রকৃত পক্ষে কৃত্রিম বলা যায়, এই সকল জিনিষের মধ্যে কৃত্রিম রেশম, হাতির দাঁত, মৃগনাভি, মুক্তা, চাষড়া প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কেবল সমুদ্র হইতেই মুক্তা পাওয়া যাইত এবং এই সকল মুক্তার দাম এত অধিক ছিল যে, সাধারণ লোকে মুক্তার ব্যবহার করা দূরে থাক্, মুক্তা কি রকম জিনিস তাহাই জানিত না। তারপর পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ কৃত্রিম মুক্তা প্রস্তুত করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং এই বিষয়ে যথেষ্ট কৃতকার্য্যতালাভও করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল কৃত্রিম মুক্তা আসল মুক্তার সমকক্ষ ছিল না এবং এই গুলা যে কৃত্রিম তাহা অতি

সহজেই ধরা যাইত; কিন্তু সম্প্রতি জাপান একরকম আশ্চর্য্য কৃত্রিম মুক্তা বাহির করিয়া পাশ্চাত্য মনীষিগণের তাক্ লাগাইয়া দিয়াছে। জাপানী মুক্তা সকল বিষয়েই আসল মুক্তার সমতুল্য এবং এই সকল কৃত্রিম মুক্তা এমন জিনিষ দ্বারা এমন ভাবে তৈরী যে আজ পর্য্যন্ত কোন রকম বৈজ্ঞানিক উপায় দ্বারা ইহা যে আসল মুক্তা নহে তাহা প্রমান করা যায় না। ইউরোপীয়গণ আজকাল উঠিয়া পড়িয়া কেবল লাগিয়া গিয়াছেন, একটা উপায় বাহির করিবার জন্য যাহাতে এগুলাকে আসল মুক্তা হইতে পৃথক করা যাইতে পারে; এই রকম কোন উপায় বাহির করিতে না পারিলে তাহাদের বাজার মাটি হইয়া যাইবে, কেননা তাহাদেরই চক্ষের সামনে জাপানি মুক্তা আসল মুক্তার দরে বিকাইতেছে। ইহাতে জাপানের কতদূর কৃতিত্ব তাহাই বোঝা যায়।

মৃগনাভীর মত এমন সুগন্ধি জিনিষ খুব কমই আছে। একটু মৃগনাভী ঘরে রাখিয়া দিলে সমুদয় ঘরটি বৎসরের পর বৎসর সুগন্ধে আমোদিত হইতে থাকিবে। সাবান প্রস্তুত করিবার সময় একটু মৃগনাভী গলিত সাবানের মধ্যে দিলে পর স্থায়ী মনোরম সুগন্ধযুক্ত সাবান প্রস্তুত হয়। কিন্তু মৃগনাভী খুবই মূল্যবান্ জিনিষ এবং ইহা খুব অল্প পরিমাণেই পাওয়া যায়। সাবানের মধ্যে অন্য কোন জিনিষ দ্বারা এই রকম গন্ধ জন্মান যাইতে পারে কি না, এই বিষয় নিয়া অনেক গবেষণা হইয়াছে; অবশেষে নাইট্রো বেঞ্জিন বা নিরবেনের এসেন্স (Nitrobenzine) নামক একরকম জিনিষ দ্বারা ঠিক মৃগনাভী দ্বারা সাবানের যে গন্ধ জন্মে, ঠিক সেই গন্ধের সাবান প্রস্তুত করা হইয়াছে। নাইট্রোবেঞ্জিন অল্পমূল্যে প্রচুর পরিমানে পাওয়া যায় সুতরাং ইহা দ্বারা মৃগনাভীর অপ্রাচুর্য্য অনেকটা পূরণ হইয়া আসিয়াছে।

হাতীর দাঁত হইতে কারুকার্য্যময় অনেক জিনিষ প্রস্তুত হইয়া থাকে। মৃগনাভীর মত আসল হাতীর দাঁতও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না। সেই জন্য কৃত্রিম হস্তীদন্ত প্রস্তুতের জন্য অনেক জাতিই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, এই বিষয়েও জাপান খুব অগ্রগণ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জাপানে কি উপায়ে হস্তীদন্ত প্রস্তুত হয় জানিনা, কেননা তাহারা উহা কাহাকেও শিখাইতে চায় না; তবে নিম্নলিখিত দুই উপায়ে কৃত্রিম হস্তীদন্ত প্রস্তুত হইতে পারে বলিয়া জানি। এ বিষয়ে আমি নিজে কোন পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই, কাহারও ইচ্ছা হইলে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন। প্রথম উপায়টি এই!—দশ-ভাগ সাদা শেলেক (White shallec) চার ভাগ হাতীর দাঁতের গুঁড়া, ৩॥ ভাগ লেড্ এসিটেট

(lead acetate) ৫ ভাগ কর্পূর একত্র মিশান। তারপর তাপ দিতে থাকুন এবং শুকাইয়া গেলে পর চূর্ণ করিয়া ফেলুন এবং শেষে সাঁচের মধ্যে গরম অবস্থায় রাখিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা না হইয়া যায় ততক্ষণ যথেষ্ট পরিমাণে চাপ দিতে থাকুন। কিছুক্ষণ পরে অবিকল হাতীর দাঁতের জিনিষ প্রস্তুত হইয়া যাইবে।

দ্বিতীয় নিয়মটি এই যে—১ সের রবার ১৬ সের ক্লোরফর্মের (chloro form) মধ্যে দ্রব্য করিয়া লউন, তারপর এই মিশ্রিত তরল পদার্থের মধ্যে এমনিয়ার গ্যাস (ammonia gas) দিতে থাকুন, যে পর্য্যন্ত না বাহির হইতে এমনিয়ার গন্ধ পাওয়া যায়। তার পর উত্তাপ দ্বারা ক্লোরোফর্ম তাড়াইয়া দিন। তারপর অবশিষ্ট জিনিষের সহিত ক্যেলসিয়াম ফস্‌ফেট (calcium phosphate) চূর্ণ অথবা জিঙ্ক কার্ব্বনেট চূর্ণ (zinco carbonate) মিশাইয়া লউন, ব্যবহারের সময় এই চূর্ণমিশ্রদ্রব্য গরম অবস্থায় সাঁচের মধ্যে রাখিয়া চাপ দিতে থাকুন; যখন ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে তখন সুন্দর হাতীর দাঁতের জিনিষ প্রস্তুত হইল।

চামড়ার দ্বারা আজকাল "যে কত রকমের জিনিষ প্রস্তুত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আমাদের জুতা, সুট্‌কেস্, বইয়ের মলাট প্রভৃতি চামড়া দ্বারাই প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বে এক মাত্র জীব দেহ হইতেই চামড়া সংগ্রহ করা হইত। কিন্তু আজকাল বৈজ্ঞানিকগণ প্রকৃতির উপর সমস্ত কার্য্যের ভার চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না বলিয়া কৃত্রিম—চামড়া প্রস্তুত করা যায় কিনা দেখিতেছিলেন এবং এই বিষয়ে অনেক দূর অগ্রসরও হইয়াছেন। আজকাল কারখানায় বসিয়া যে সব কৃত্রিম চামড়া প্রস্তুত হইতেছে তাহা দ্বারা সুট্‌কেস্, বইয়ের মলাট প্রভৃতি কাজ সুন্দররূপে করা যাইতেছে। বিজ্ঞান যে ভাবে উন্নতি লাভ করিতেছে তাহাতে বোধ হয় অতি নিকট ভবিষ্যতে এমন দিন আসিবে যখন কৃত্রিম চামড়া দ্বারা জগতের সমস্ত কাজ পরিচালিত হইবে; তখন আর আসল চামড়ার বিশ্রীগন্ধ কাহাকেও সহ্য করিতে হইবে না।

সর্ব্বশেষে কৃত্রিম রেশমের আলোচনা করিয়াই আমার এই প্রবন্ধ শেষ করিব। মানুষ যত কৌষীন দ্রব্য ব্যবহার করে তাহার মধ্যে রেশম অতি দ্রব্য একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৯০৯খৃঃ এই পৃথিবীতে প্রায় তিন লক্ষ দুই হাজার পাঁচ শত মন রেশম উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ইটালীতে প্রায় ৫৩০০ মণ ফ্রান্সে প্রায় ৭৫০০ মণ এবং এশিয়াতে (প্রধানতঃ চীন,

জাপান, ভারতবর্ষ) প্রায় ২ লক্ষ মণ রেশম উৎপন্ন করিয়াছিল। জাপান ১৮৮৫খৃঃ ১৫০০০মণ রেশম উৎপন্ন করিয়াছিল কিন্তু ১৯০৬খৃঃ তাহার উৎপন্নের পরিমাণ ৩৫০০০ মণে দাঁড়াইয়াছে। ভারতবর্ষ ১৮৮৫খৃঃ ৫৫০০ মণ রেশম উৎপন্ন করিয়াছিল কিন্তু ধ্বংসোন্মুখ জাতির লক্ষণ স্বরূপ ১৯০৬ খৃঃ ভারতের উৎপন্নের পরিমাণ মাত্র ৫০০ মণ। এমন কি যে চীনকে আমরা আলস্যের অবতার বলিয়া জানি, তাহারাও ১৮৮৫খৃঃ ৪১০০০ মণ উৎপন্ন করিয়া ১৯০৬খৃঃ ৮৮০০০ মণ রেশম উৎপন্ন করিয়াছে।

ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী এবং আমেরিকাতে রেশম একেবারেই উৎপন্ন হয়না, সুতরাং এই সমস্ত দেশের লোকগুলা যে রেশম উৎপাদক লোক দিগকে প্রীতির চক্ষে দেখিবে না, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু ইংলণ্ড, জার্ম্মাণীর লোক সকল ত আর আমাদের মত নয়, তাই তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া অন্য উপায়ে রেশম-উৎপাদন করা সম্ভবপর কিনা দেখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং তাহারই ফল স্বরূপ আজ প্রায় ৬ রকম বিবিধ উপায়ে সাধারণ তুলা হইতে কৃত্রিম রেশম উৎপাদন করিবার কৌশল বাহির করিয়াছেন।

কি উপায়ে তুলা হইতে কৃত্রিম রেশম বাহির করিতে হয় তাহা অন্য প্রবন্ধে বিবৃত হইবে; এই প্রবন্ধে মাত্র ইহার গুণাগুণ সম্বন্ধে কিঞ্চিত আলোচনা করিব। কৃত্রিম রেশম আসল রেশমের চেয়ে দেখিতে অধিক উজ্জ্বল এবং ইহাতে খুব সহজে খুবতাল রং দেওয়া যাইতে পারে। এই উজ্জ্বলতা গুণ থাকার জন্যই কৃত্রিম রেশমের এত আদর। কৃত্রিম রেশমের অবশ্য অনেক দোষ আছে; প্রথমতঃ ইহা একটু খস্‌খসে বোধ হয়। এই খস্‌খসে হইবার প্রধান কারণ এই যে কৃত্রিম রেশমকে আসল রেশমের মত চিক্কণ করা যায় না; অবশ্য কালে এই দোষ যে বিদূরিত হইবে, তাহাতে সন্দেহই নাই। কৃত্রিম রেশমের সর্ব্বাপেক্ষা বড় দোষ এই যে ইহা বেশীশক্ত করা যায় না এবং ভিজাইলে ইহার শক্তি আরো কমিয়া যায়। কৃত্রিম রেশমের টান সহ্য-শক্তি বাড়াইবার জন্য অনেক চেষ্টা করা হইতেছে এবং অনেকটা কৃতকার্য্যও হওয়া গিয়াছে। আগের চেয়ে কৃত্রিম রেশমের সহ্য-শক্তি এখন প্রায় দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। কৃত্রিম রেশম দ্বারা তুলার কাপড়ের উপর খুব ভাল কাজ করা যায়, এমন কি এই কার্য্যে কৃত্রিম রেশম আসল রেশমের চেয়েও ভাল, কেন না কৃত্রিম রেশমের উজ্জ্বলতা গুণ যে আসলের অপেক্ষা অনেক অধিক তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কৃত্রিম রেশম দ্বারা সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের অনেক সাজসজ্জা প্রস্তুত হইতেছে।

মেমসাহেবদের টুপীতে যে রেশমের কাপড় দেখা যায়, তাহা প্রায় সবই আজকাল কৃত্রিম রেশম হইতে প্রস্তুত হইতেছে। কৃত্রিম রেশম দ্বারা নকল 'ঘোড়ার বাগ্' (horse hair) প্রস্তুত হয়। বৈদ্যুতিক বাতির মধ্যে যে তার (matle দেওয়া হয় তাহাও আজকাল কৃত্রিম রেশম হইতে প্রস্তুত হইতেছে। কৃত্রিম রেশম হইতে প্রস্তুত বাতির তার দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং সমান বৈদ্যুতিক শক্তিতে অন্যান্য রকমের বাতির চেয়ে বেশী আলোক দিয়া থাকে।

পৃথিবীতে কিরূপ দ্রুতগতিতে কৃত্রিম রেশমের আদর বাড়িয়া যাইতেছে তাহা নিম্নলিখিত সংখ্যা হইতেই বুঝা যাইবে। চার্ডনেট (chardonett) ১৮৯৯ খৃঃ কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত করিবার কারখানা বসান কিন্তু তখন ইহাতে বিশেষ ফল লাভ করা হয় নাই। ১৯০০ খৃঃ হইতেই কৃত্রিম রেশমের খুব কাট্‌তি আরম্ভ হয়। ১৯০৫ খৃঃ পৃথিবীতে ৬৩৭০০ মণ কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত করা হইয়াছিল, কিন্তু ১৯১১ খৃঃ উৎপন্নের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ লক্ষ ৬০ হাজার মণ। ১৯১১ খৃঃ পৃথিবীতে কৃত্রিম রেশমের ৩৪ টী কারখানা ছিল, ইহাদের মধ্যে ৩টী আমেরিকার যুক্তরাজ্যে, ১টী জাপানে এবং ৩০টী ইউরোপে। ইউরোপের ৩০ টির মধ্যে ফ্রান্সে ৭টী, জার্ম্মানীতে ৮টী, ইংলণ্ডে ২টী, বেলজিয়ামে ৩টী এবং অন্যান্য দেশে অবশিষ্ট ১০টী। আমাদের ভারতবর্ষের এমনই দুর্ভাগ্য যে এখানে একটী ও কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতের কারখানা নাই এবং হইবে যে হইবে এমন আশাও নাই।

কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতের কোম্পানীরা আজকাল বৎসরে ১০০ টাকার উপর ৫০৲ হইতে ১০০৲ লাভ দিতেছে।

আজকাল কিরূপ সূক্ষ্ম কৃত্রিম রেশমের সূতা প্রস্তুত হইতেছে তাহা এই বলিলেই বোঝা যাইবে যে, ২ লক্ষ ৪৫ হাজার গজ কৃত্রিম রেশম সূতার ওজন কিঞ্চিদধিক এক সের মাত্র।

কি উপায়ে আসল রেশম হইতে কৃত্রিম রেশম পৃথক্ করা যাইতে পারে এই বিষয়ে একটু আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধটী শেষ করিব।

(১) একখণ্ড রেশমের কাপড় ২০০° (in centigrade scale) তে দশ মিনিট-কাল গরম করুন; কৃত্রিম রেশম হাত দিবা মাত্রই ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া পড়িয়া যাইবে কিন্তু আসল রেশমের কিছুই হইবে না।

(২) কয়েক খণ্ড "কষ্টিক্ পটাশ" কিঞ্চিৎ জলের মধ্যে ফেলে দিন, তারপর উপরের পরিষ্কার মিশ্রণকে ছাঁকিয়া লউন। এই মিশ্রণের মধ্যে একখণ্ড রেশম

কোটিন দিলে যদি রেশম দ্রবণ হয় তাহা হইলে শীঘ্রই দ্রব হইয়া যাইবে কিন্তু কুত্রিম রেশম হইতে কিছুই দ্রব হইবে না সুতাগুলি একটু ফুলিয়া উঠিবে মাত্র।

(৩) একটু তুঁতে মিসারিণের মধ্যে দ্রব করিয়া লউন। ইহাতে একটু কাপড়ে পরীক্ষা করিবার মতো মিশাইয়া লউন। এই মিশ্রণ আসল রেশমকে অল্প নীল রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া ফেলিবে। কিন্তু কৃত্রিম রেশমের কিছুই করিতে পারিবে না।

(৪) ডাইফেনিলেমাইন বালফেট নামে এক রাসায়নিক দ্রব্যের দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়। ইহা আসল রেশমে দিবামাত্র রেশম ধূসর (brown) বর্ণ ধারণ করিবে কিন্তু এক প্রকার কৃত্রিম রেশমে দিলে পর গাঢ় নীল বর্ণ হইয়া যাবে এবং অন্যান্য প্রকারের প্রচলিত কৃত্রিম রেশমের মধ্যে দিলে কোন রঙ্গই হয় না।

শ্রীনবেন্দ্রচন্দ্র দেব বি, এস্, সি,।

তৃষা।

যারে আজো পাই নাই, তারি তরে বক্ষে কেন,
আকাঙ্ক্ষার সীমা নাই! চাহি তার প্রিয় দরশন
পাহাড়ের বুক ভেদি' যথা,—যবে নদী বাহিরায়,
কোন বাধা নাহি মানে, কোন দিকে ফিরে নাহি চায়,
নিজ মনে গান গাহি নিজ মনে চলে, শুধু চলে!
কে তার খবর রাখে ধরণীর শ্যামল অঞ্চলে
তৃষা থাকে কোন রন্ধ্র? কেবা দেখে, কেবা তারে চায়,
দূরে যায় প্রিয়তমা, কথা তার সময় কোথায়
থামিবার, শুনিবার, ভাবিবার, বলিবার কথা?
রহে তার সারা প্রাণে মূক মৌন এক ব্যাকুলতা
প্রিয়রে পাবার তরে। যত পথ চলা হয় তার
গতি শিথিলিয়া আসে; যেইখানে পরম প্রিয়ার
চলা তার নাহি রহে! হৃদে যারে লইয়াছে বেঁধে
তারে পেয়ে সে প্রাণ না-পাওয়ারে চাহি সদা কাঁদে!

শ্রীব্রহ্মদাস গোস্বামী।

শকুন্তলা।

(অভিনব সংস্করণ)

সেদিন রবিবাবুর "ঘরে বাইরে" খানা পড়িতেছিলাম,—এমন সময় কনিষ্ঠ সহোদর আসিয়া বলিল, তাহাকে শকুন্তলার কয়েকটী শ্লোক বুঝাইয়া দিতে হইবে। ভায়া আমার সংস্কৃত ভাষায় মহাপণ্ডিত ; 'গচ্ছতি' না বলিয়া "গমনং করোতি"—বলিতে পারিলেই সন্তুষ্ট। এ হেন বিদ্বানের সহিত দেবভাষার শ্রেষ্ঠ নাটকের আলোচনা করিতে করিতে আমার ক্লান্তি আসিল, চেয়ারে ঠেস দিয়াই তন্দ্রামগ্ন হইলাম।.....তখন আমার নেত্রের সম্মুখে যেন শকুন্তলা নাটকের দৃশ্যাবলী অভিনীত হইতে লাগিল,—কথাবার্ত্তা যতদূর স্মরণ আছে লিপিবদ্ধ করিলাম।

PROGRAMME.

চরিত্র।

পুরুষ	স্ত্রী
দুষ্মন্ত।—বালিগঞ্জ নিবাসী জমিদার।	শকুন্তলা।—কণ্বের কন্যা।
সুন্দরলাল।—ঐ মোটরের শোফেয়ার।	প্রিয়ংবদা— } সখীদ্বয়।
চাকরগণ, ইত্যাদি—ইত্যাদি	অনসূয়া— }

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—দেওয়ন—কাল অপরাহ্ণ।

দৃশ্য—মাঠের পার্শ্বে রাস্তা—দূরে কণ্বের বাগান বাটী।

(শকটের মোটর চালাইতে চালাইতে সুন্দরলাল ও রাইফেল উদ্যত করিয়া দুষ্মন্তের প্রবেশ;—শূন্যে একটী কাকাতুয়া পাখী উড়িয়া যাইতেছে)।

সুন্দর।—সার! পাখাটীকে ও বন্দুক হস্তে আপনাকে দেখিয়া মনে হয় যেন গোরাসৈন্যের শিকারই দেখিতেছি,!

দুষ্মন্ত।—সুন্দরলাল! পাখীটী আমাদের অনেক দূরে টানিয়া আনিয়াছে; আচ্ছা—আমরা ত' পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতেছি—তবুও ওটা কি প্রকারে দূরে দূরে সরে যাচ্ছে?

সুন্দর।—সার,! রাস্তা উঁচু নীচু বলিয়া আমি motion কমিয়ে দিয়ে ছিলুম। এই এখন ভাল রাস্তায় এসেছি motion দোব কি?

দুষ্মন্ত।—আচ্ছা দাও।

(মোটর বেগে চলিতে লাগিল, পাখীটী শ্রান্ত হইয়া একটী গাছে বসিল; দুষ্মন্ত মোটরে ব্রেক কসিতে হুকুম দিয়াই fire করিলেন; লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল, পাখী আবার উড়িতে লাগিল। দুষ্মন্ত পুনরায় রাইফেল উঠাইলেন—এমন সময় চীৎকার করিতে করিতে কণ্বের চাকরগণের প্রবেশ)

চাকরগণ।—বাবু—বাবু—গুলি কর্ব্বেন না—গুলি কর্ব্বেন—না—এটা পোষা পাখী।

দুষ্মন্ত।—সুন্দরলাল, মোটর থামাও।

চাকরগণ।—মহাশয় গুলি কর্ব্বেন না—এটা আমাদের পোষা কাকাতুয়া—সকালে ছেড়ে দিয়েছিলুম—

দুষ্মন্ত।—কে তোমরা?

চাকরগণ।—আজ্ঞে—আমরা মহর্ষি কণ্বের বাটীতে চাকুরী করি;—ঐ বাটী।

দুষ্মন্ত।—মহর্ষি কণ্ব বাটীতে আছেন?

চাকরগণ।—আজ্ঞে তিনি এইমাত্র তাঁহার কন্যাকে বৈঠকখানায় আগত লোকজনদের খাতির করিতে বলিয়া "সমাজে" লেকচার দিতে কলিকাতা যাত্রা করিয়াছেন।

দুষ্মন্ত।—আচ্ছা; তোমরা যাও।—সুন্দরলাল,—মোটর ছাড়—(মোটর কণ্বের বাটীর নিকবর্ত্তী হইল)

দুষ্মন্ত।—সুন্দরলাল! না বলিলেও বোঝা যায় যে ভদ্রলোকের বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী হইয়াছি।

সু।—কেমন করিয়া?

দু।—দেখ্‌ছ না—রাস্তা পরিষ্কার; ও পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ লতাসমূহ। ওখানে যে সব পাথরের বসিবার স্থান রহিয়াছে—তাহাতে ছেলেরা সব বাদাম ভাঙ্গিয়া খাইয়াছে—এখনও খোসা ছড়ান রহিয়াছে; (অগ্রসর হইয়া) বাটীর লোকদের অসুবিধা ঘটাইয়া কায নাই; তুমি মোটর ঘুরাইয়া একটু দূরে থাক।—

সু।—যো হুকুম।

দু।—আর দেখ, ভদ্রলোকেদের বাটীতে মোহন বেশেই যাওয়া কর্ত্তব্য (শিকার সূট উন্মোচন করিয়া সাদা সিল্কের পাঞ্জাবী—গিলা করা চাদর—পিন্‌নে চশমা ও পাম্পসূ ইত্যাদি পরিধান করিলেন; হস্তে বন্দুকের পরিবর্ত্তে Ivory stick শোভা পাইল)

দু।—দেখ তুমি টায়ারের ফুটোটী মেরামত করিয়া লও যতক্ষণ না আমি ফিরি।

সু।—যো হুকুম হুজুর। (মোটর সহ প্রস্থান)

দু।—এই যে গেট—ঢোকা যাক্! এ কি? এখানে আমার 'ভান্ চোক্ নাচছে' কেন? বিদেশে—পরের বাটীতে এরূপ ফললাভ সম্ভবে কি? অথবা যেটা হবে—সেটা সর্ব্বত্রই হয়ে থাকে.....

নেপথ্যে—"এই দিকে—সখি, বইগুলো এই দিকে দাও")

দুষ্মন্ত।—(উৎকর্ণ হইয়া)—এই যে পাপীয়ের এই দিকটায়ই যেন কথা শোনা যাচ্ছে না? ঐ দিকেই যাই! Ah! here they are! বাড়ীর মেয়েগুলি নিজেরাই আলমারীতে বই সাজাচ্ছে। আহা! কি সুন্দর

দেখ্‌তে এরা। মনে হয় এরা সৌন্দর্য্যে সহরের রূপসীদেরও ছাপিয়ে গেছে! এই Pillar টীর আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখি, (অন্তরালে অবস্থান)

(পট পরিবর্ত্তন)

দৃশ্য।—আলমারীতে পুস্তক সাজাইতে ব্যাপৃতা শকুন্তলা ও সখীদ্বয়।

শকু।—এইদিকে,—সখী, ওগুলো এইদিকে দাও,—

অন।—তাই শকুন্তলা, মনে হয় বাবা বইগুলোকে তোর চেয়েও বেশী ভালবাসেন।—তুই গোলাপের চেয়েও কোমলাঙ্গী—তবু এগুলিকে সাজিয়ে কষ্ট পাচ্ছিস্।

শকু।—বাঃ—রে! আমিই যে বইগুলোকে খুব ভালবাসি—শুধু বাবার কথায় নয়!

দু।—এ্যা! ইনিই কণ্বের কন্যা! স্বয়ং লোক ভাল হতে পারেন, কিন্তু এই কোমলাঙ্গীকে সংসারের শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া অতিশয় অবিবেচনার কার্য্য করেছেন। এই স্বভাব সুন্দর দেহলতাকে যিনি শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিতে চান—তিনি বসোরাই Rose এর পাপড়ির ধারে 'শুকশাখা' ছেদনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিতে হইবে। যাহা হউক, দেখা যাক্!

শ।—ভাই অনসূয়া, প্রিয়ংবদা আমার ব্যাকেটের বোতাম সবগুলো খুলিয়া দিয়াছে,—আমার হাত খেলিতেছে না, গোটা দুই বোতাম খুলিয়া দাও ত।

অ।—(তথাস্তু কার্য্য)

প্রি।—ভাই, এ বিষয়ে আমার দোষ নাই,—বরং তোমার যৌবনের দোষ বল।

দু।—ব্যাকেট এ দেহের উপযুক্ত নহে—ব্লাউজই যোগ্য; কিন্তু ওতেও যে শরীরের শোভা হয় নাই এমন নহে, কেন না, পদ্মফুল শালুকের মধ্যে থাকিলেও সুন্দর দেখায়; আর গ্রহণ লাগিলে চাঁদকে যেন আরও সুন্দর দেখায়। আহা! যার দেহ সুন্দর—সব জিনিসই তার অলঙ্কার হইয়া থাকে।

শ।—Fan এর বাতাসে 'ঘরে বাইরের' পাতাগুলো নড়ছে—মনে হচ্ছে যেন বইখানা হাত নাড়িয়া আমাকে কাছে ডাকিতেছে—যাই ওর কাছে।

প্রি।—ভাই শকুন্তলা;—তুই ওটার কাছেই থাক; তুই নিকটে থাকাতে মনে হচ্ছে যেন "বিমলা" লাইব্রেরীতে দণ্ডায়মানা।

শ।—এইরূপ মনোহর কথার জন্যই লোকে তোকে প্রিয়ংবদা বলে।

দু।—প্রিয়ংবদা যথার্থ কথাই বলিয়াছে। প্রকৃতই-শকুন্তলার অধর গোলাপের পাপ্‌ড়ির মত—বাহুযুগল নভেলের নায়িকার মত-অঙ্গে নবীন যৌবন তরঙ্গায়িত—যেন সেই কবি সম্রাট কল্পিত স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী—নারী কুলেশ্বরী "বিমলা"।

অ।—ওগো শকুন্তলা, এটা যে "ঘরে বাইরের" তোমার দ্বারা কথিত বধূ-রূপিণী—"যমুনা পুলিনের ভিখারিণী",—একে তুমি ভুলিয়া যাইতেছ?

শ।—তাহা হইলে নিজেকেও ভুলিয়া যাইব। (কাছে যাইয়া) আহা সুন্দর সময়ে এদের মিলন হইয়াছে। "যমুনা পুলিনের ভিখারিণীর" যৌবন যেন নূতন বাঁধাইরূপে দেখা দিয়াছে। আর "ঘরে বাইরে"ও সঙ্গে কে না। তাহা দেখিবার যোগ্য।

প্রিয়।—আচ্ছা অনসূয়া, বল্ দেখি; শকুন্তলা "যমুনা পুলিনের ভিখারিণীকে" কেন এত ভালবাসে?

অ।—কি জানি ভাই—তুমি বল দেখি?

প্রিয়।—"যমুনা পুলিনের ভিখারিণীর নায়িকা যেমন শেষে প্রাণের অতলের সহিত মিলিত হইয়াছিল—আমিও যেন মনের মানুষকে পাই—এই ভাবে।

শ।—হাঁ—দূর—এ নিশ্চয় তোর মনের কথা (অবনত বদন)

দু।—শকুন্তলা কি অন্যের হিন্দুমতে বিবাহিত স্ত্রীতে যাত? অথবা তর্কের প্রয়োজন কি! ইনি নিশ্চয় ব্রাহ্মের প্রণয় যোগ্য—কেন না আমার মত লোকের মন যখন ইহাতে আকৃষ্ট হইয়াছে! তবুও আসল কথা জানিতে হইবে।

শ।—(ব্যস্তভাবে) ওমা! বই ঝাড়ায় তাড়া পেয়ে একটা বোলতা উড়ে আমার মুখের দিকে আসছে.....না—এটা থামবে না.....ওকি এদিকেও যে আসে ওভাই, এখনি কামড়ে দেবে—দেনা তাড়িয়ে।

দু।—ওরে বোলতা, আমি আশায় আশায় মরিলাম, তুমিই কৃতার্থ হইলে সুন্দর চঞ্চল আঁখি তুমি বারবার চুম্বন করিতেছ, প্রেমিকের মত কর্ণমূলে অস্ফুটস্বরে কথা বলিতেছে।—

শ।—না—এ হতভাগা বোলতা থামবে না—(সরিয়া যাইয়া)—এদিকেও আসে যে—এটা তারি আলাতন করছে, দেনা ভাই তাড়িয়ে।

উভয়ে।—(সহাস্যে) আমরা কি করে তাড়াব ভাই। দুষ্মন্তকে ডাক; এদেশ তাঁরই জমিদারীর মধ্যে, সুতরাং তিনি রক্ষাকর্ত্তা।

দু।—উপস্থিত হইবার এই-ই সুযোগ (প্রবিষ্ট হইয়া) দুষ্টের দমন অনাবারী ম্যাজিষ্ট্রেট ব্রাহ্মকুলতিলক দুষ্মন্ত উপস্থিত থাকিতে কে এ সরল প্রকৃতি যুবতীদিগের প্রতি অবিনয় প্রদর্শন করিতেছে? (সকলে ব্যস্ত হইল)

শ।—মহাশয়, তেমন কিছুই হয় নাই। আমাদের এই প্রিয়সখি—একটা বোলতা দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন।

দু।—(শকুন্তলার প্রতি) কেমন, পড়াশোনা বেশ হচ্ছে ত?

শ।—(লজ্জায় নিরুত্তর)

অ।—আপনার মত বিদ্বানের সংসর্গে এখন হবে। ভাই শকুন্তলা—ও ঘর থেকে ক্যোচ্‌টা আনাবার বন্দোবস্ত করা যাক্ এ ঘরের গুলো সব বই বোঝাই।

দু।—থাক্,—থাক্—আপনাদের কথাতেই বসা হয়েছে।—"এদিকে না—এদিকে না—পড়ে যাবে"—।

ভাইত একি; হঠাৎ পার্শ্বায়ের বাসাকণ্ঠের মধ্যে—কে অভদ্রভাবে চীৎকার করচ্ছে?—ভাল করিয়া চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখি—ভায়া আমাকে ধাক্কা দিচ্ছেন—"দাদা ঢুল্‌ছ—আর এদিকে ঝুঁকছ: এখনি পড়ে যাবে যে।"

হাঃ—কোথায় বা শকুন্তলা আর কোথায় বা বৈঠকখানা! আমি ত "ঘরে বাইরে" হাতে করে তন্দ্রামগ্ন; ভায়া তখনও শকুন্তলা পাঠ করিতেছে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পাল।

ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য।

আহাকি সুখের নিশি
ভাসিছে জ্যোৎস্নারাশি:
অসংখ্য তারকা রাশি
হাসিছে গগণে।
এই যে সৌন্দর্য্য হার,
দেখে প্রাণ ভরে যায়
র'য়েছেন দয়াময়
নিজ শক্তি গুণে॥
কোথাও কোকিল দল
কুহু কুহু গায়।
কোথাও বিটপি শ্রেণী
দুলে পড়ে গায়।
কোথাও বসিয়ে শিখী
আনন্দ জানায়;
এসকল রাখছেন
সেই দয়াময়॥
এ হেন শকতি যাঁর
কি আছে তুলনা তাঁর
নয় সবে অনময়
তাঁহার শরণ।
বিভু পদে করি আমি
এই আকিঞ্চন।
চিরদিন পাই যেন
ও রাঙ্গা চরণ॥

অন্নপূর্ণা হাজরা।

বাঙ্গলার জাতি।

বঙ্গদেশে যাহারা বাস করে তাহারাই বাঙ্গালী। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান, কোল, ভীল, সাঁওতাল, যে কেহ বাঙ্গলায় বাস করিয়াছে, সেই বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছে। যখন আর্য্যেরা বাঙ্গলায় পদার্পণ করেন নাই, তখনও বাঙ্গলা জনশূন্য ছিল না; তখন বাঙ্গলায় যাহারা ছিল, তাহারাও যেমন বাঙ্গালী, আবার আর্য্যবংশীয়গণের বাঙ্গলায় উপনিবেশ স্থাপনের পরে, তাঁহারাও হইলেন, তেমনই বাঙ্গালী। এক সম্প্রদায় আর্য্য ও অন্য সম্প্রদায় আর্য্যবংশ জাত হইলেও, উভয়েই বঙ্গদেশের অধিবাসী বলিয়া উভয় সম্প্রদায়ই বাঙ্গালী। এই যে বাঙ্গালার অধিবাসী বাঙ্গালী, এই বাঙ্গালীর জাতি নির্ণয় করিতে যাইয়া অর্থাৎ বাঙ্গালী "আর্য্য" কি "অনার্য্য" এই সমস্যার মীমাংসা করিতে যাইয়া, গত আষাঢ় মাসের "সাহিত্য ও দর্শনবাণী" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু অনেক কথার অবতারণা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার সিদ্ধান্তের অনুকূল বলিয়া যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহারই কয়েকটী যুক্তির বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক, তাঁহার ঐতিহাসিক নিবন্ধ কতদূর ঘাতসহ। কিন্তু এইরূপ আলোচনার আগে, তাঁহার সিদ্ধান্তের কথাটাই আগে বলি; কেন না তিনিও এটা আগেই বলিয়াছেন।

ফণীন্দ্র বাবুর সিদ্ধান্ত এই,—"একটা কথা আগেই বলা দরকার যে, জাতি হিসাবে অবিমিশ্র জাতি পৃথিবীতে প্রায়ই নাই। পৃথিবীর প্রায় সব জাতিই বিভিন্ন জাতি। সংমিশ্রণে উৎপন্ন। এ নিয়ম যেমন বাঙ্গালীর পক্ষে খাটে, তেমনি ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মাণ প্রভৃতি স্বাধীন জাতির পক্ষেও খাটে।"

তাঁহার অন্যত্র লিখিতেছেন,—"আমাদের প্রশ্ন ছিল বাঙ্গালী কোন জাতি? আর্য্য না অনার্য্য? ইহার উত্তর যখন জনশ্রুতি ও কুলজী ঠিক ভাবে দিতে পারিল না, তখন আমাদের অন্যদিকে খুঁজিতে হইবে। ভারতের জাতি তত্ত্বের বিষয়ে রিজলী সাহেবের মতবাদ অনেকে গ্রাহ্য করেন। তাঁহার মতে বাঙ্গালী "মঙ্গোলীয় দ্রাবিড়ীয়।"

ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, বাঙ্গালী মিশ্রজাতি ত' বটেই, অধিকন্তু আর্য্য

রক্ত বাঙ্গালীর মধ্যে এক ফোঁটাও নাই ; সব "মঙ্গোলীয়" এবং "দ্রাবিড়ীয়।" বামুন কায়েত হইতে বুলা বাগ্দী পর্য্যন্ত সকলেরই এক গোত্র! বেশ না এটা রিজলী সাহেবের ফতোয়া।

ইউরোপীয়দিগের এইরূপ আজগুবী সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন,—"বিলাতী বিদ্যার একটা লক্ষণ এই যে, তাঁহারা স্বদেশে যাহা দেখেন, মনে করেন বিদেশে ঠিক তাই আছে। তাঁহারা Moor ভিন্ন অন্য কোন জাতি জানিতেন না, এজন্য এদেশে আসিয়া হিন্দুদিগকে Moor বলিতে লাগিলেন। সেইরূপ স্বদেশে Epic কাব্য ভিন্ন পদ্যের চিহ্ন আখ্যানমাত্র দেখেন নাই ; সুতরাং ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মহাভারত ও রামায়ণের লক্ষণ পাইয়াই ঐ দুই গ্রন্থকে Epic কাব্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন।"

ঠিক এই যুক্তির বলেই বলিতে পারি, বিলাতী পণ্ডিত আপনাদিগের মধ্যে অমিশ্ররক্ত দেখেন নাই বলিয়া, বাঙ্গলায় আসিয়াও দেখিতে পান নাই। কিন্তু ইহা তত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যত আশ্চর্য্যের বিষয় "তাঁহাদের এদেশীয় চেলা" দিগের গুরুর অন্ধ অনুবর্ত্তিতা !

লেখক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-কায়স্থদিগের "কুলজী" গ্রন্থাদিকে অবিশ্বাস করিয়াছেন। নিজের পূর্ব্বপুরুষগণকে এইরূপ অবিশ্বাস করা, এমনকি তাঁহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলা এবং তাঁহাদের আভিজাত্যের প্রতিকূল মত প্রচার করা, উপযুক্ত ইংরেজ শিষ্যের পক্ষেই সম্ভব! তিনি "একাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গলা দেশে আদিশূর নামে যে রাজা ছিলেন, ইতিহাস তাহা স্বীকার করে" বলিয়াও "আদিশূরের পক্ষ ব্রাহ্মণ আনয়নের মূলে কোনও ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে" তাহা স্বীকার করেন না। তাই তাঁহার বিশ্বাস," ইহা কোনও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ব্রাহ্মণের ঊর্ব্বর মস্তিষ্কে জন্মলাভ করিয়াছিল।"

কবীন্দ্র রবির "ঊর্ব্বর মস্তিষ্ক" জাত এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সন্দেহ হইবার জন্য আমরা জিজ্ঞাসা করি, সে কালের "কোন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি" ও "ঊর্ব্বর মস্তিষ্ক" বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের এরূপ কল্পনার উদ্দেশ্য কি ছিল ? কেন তিনি নিজের পিতৃ-পিতামহের নাম ডুবাইয়া, পরের পিতৃপিতামহকে নিজের পিতৃপিতামহ বলিয়া পরিচিত করিতেছিলেন ? যে দেশের লোকেরা বাপের নাম জিজ্ঞাসা করা অসভ্যতার পরিচায়ক, তাঁহারা যা তাঁহাদের শিষ্য প্রশিষ্যেরা পাশ্চাত্য এদেশের কোনও "তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ব্রাহ্মণ" ত' দূরের কথা, কোনও হীন বুদ্ধি নিম্ন শ্রেণীর লোকেও এরূপ নিজের বাপের নাম ডুবাইয়া পরের বাপকে বাপ বলিতে

পারে না। আর এই অসম্ভব সম্ভব হইলেও অর্থাৎ কোন "উর্ব্বর মস্তিষ্ক" ব্যক্তি নিজেদের গৌরব বৃদ্ধির জন্য মিথ্যা করিয়া এরূপ লিখিলেও দেশের অন্যান্য অনুর্ব্বর মস্তিষ্ক লোকেরা, বিশেষতঃ যাহাদিগকে ছোট করা হইয়াছিল, তাহারা, একথা মানিয়া লইত কি? ইহা "উর্ব্বর মস্তিষ্ক" জাত কল্পনা হইলে, ইহার বিরুদ্ধে সে সময়ে একটা কথাও কি কেহ বলে নাই? তবে ঐতিহাসিক মহাশয়-দিগের যেরূপ অনুগ্রহ, তাহাতে বোধহয় "কুলজী"র কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার জন্য, শীঘ্রই কোন শিলালিপির আবিষ্কার হইবে। আমরা সেই শুভ অবসরের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

লেখক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আদিশূরের "সময়ে বাংলার যে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের দুর্ভিক্ষ (?) উপস্থিত হয় নাই, তার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। আদিশূরের পূর্ব্বে পালবংশ বাংলায় রাজত্ব করিতেন। পালবংশীয় রাজারা * * বৌদ্ধ ছিলেন, * * তাঁহাদের মন্ত্রীবংশ গৌড়া (?) ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই মন্ত্রী-বংশের ইতিহাস দিনাজপুর বাদল নামক স্থানে একটী স্তম্ভে লিপিবদ্ধ আছে। তাহাতে স্পষ্ট লেখা আছে যে, তাঁহারা শাণ্ডিল্যবংশ হইতে উদ্ভূত। সুতরাং আমরা ঐতিহাসিক প্রমাণ পাইতেছি যে, আদিশূরের পূর্ব্বে বাংলাদেশে শাণ্ডিল্য বংশীয়" ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং তাঁহারা পদমর্য্যাদায় ও গৌরবে হীন ছিলেন না।

লেখক বোধ হয় নিজে এ বিষয় অনুসন্ধান করিবার অবসর প্রাপ্ত হয়েন নাই। নিজে একটু চেষ্টা করিলেই দেখিতে পাইতেন, আদিশূরের পূর্ব্বে এদেশে ব্রাহ্মণ কায়স্থ থাকার কথা কুলজীকারগণ অস্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে আদিশূরের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় ৭০০ সাত শত ঘর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবে বাঙ্গলার ব্রাহ্মণগণ "পদমর্য্যাদায় ও গৌরবে হীন" না থাকিলেও বৈদিক আচার অনুষ্ঠানে "হীন" হইয়া পড়িয়াছিলেন। বৌদ্ধ পালরাজগণের সৌভাগ্য অবসানের পর, বৈদিক ধর্ম্ম পুনঃ প্রচারের জন্যই বেদজ্ঞ, যজ্ঞাদি কর্ম্মপটু সাগ্নিক ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হইয়াছিল। এই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই আদিশূর কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ গোত্রের পঞ্চ ব্রাহ্মণ বাঙ্গলায় আগমন করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার রাঢ়ী ও বারেন্দ্র সমাজের তাঁহারাই মূল পুরুষ। পূর্ব্বের সেই সাত শত ঘর ব্রাহ্মণ এক্ষণে "সাতশতী" ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত এবং পূর্ব্বের কায়স্থগণ এক্ষণে "বঙ্গজ" নামে বিখ্যাত।

অতঃপর আমরাও ঠিক লেখকের ভাষাতেই বলি, "অতএব কেহ চীৎকার

করিয়া বলিতে পারেন না যে, আদিশূর রাজার পূর্ব্বে বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ কায়স্থের দুর্ভিক্ষ (!) উপস্থিত হইয়াছিল।" কিন্তু রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের "কুলজী" গ্রন্থকে উড়াইয়া দিবার জন্য লেখক খুব "চীৎকার" করিয়াছেন। কিন্তু যতই "চীৎকার" করা হউক বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস স্বরূপ "কুলজী" গ্রন্থকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা কখনই সফল হইবে না। কেন না প্রকৃতই তাহার ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। "কুলজী" গ্রন্থকে অস্বীকার করিবার বিরুদ্ধে একটা বিশিষ্ট কারণ এই দেখা যায় যে, কল্পনাকুশলী লেখকের কল্পিত কোন একজন "উর্ব্বর মস্তিষ্ক" ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা এই বিষয় লিপিবদ্ধ হয় নাই এবং লিখিত বিষয় গোপন রাখাও হয় নাই। কুলাচার্য্যগণের মধ্যে অনেক ন্যায়নিষ্ঠ, বিদ্বান ও "তীক্ষ্ণ বুদ্ধি" ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই সকল কুলগ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল এবং তৎকালের হিন্দুনরপতিগণ কর্ত্তৃক এই কুলজীগুলি সমর্থিত ও আদৃত হইয়াছিল। ফণীন্দ্রবাবু যদি এ সম্বন্ধে সত্যানুসন্ধিৎসু হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে একটু শ্রমস্বীকার করিয়া কুলজী বিষয়ক পুঁথি লইয়া আলোচনা করিতে হইবে। তিনি যদি এতটুকু পরিশ্রম স্বীকার করিতে পারেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে, বাস্তবিকই এই "কুলজী"র মধ্যে হিন্দুস্বাধীনতা-যুগের সামাজিক ইতিহাস নিহিত রহিয়াছে। অনেকে বলেন, "কুলজী" গ্রন্থ-সমূহকে তাঁহারাই অস্বীকার করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে যত্ন করিতেছেন, যাঁহারা ঐ কুলজীর সাহায্যে নিজেদের আভিজাত্য প্রতিপন্ন করিতে সক্ষম নহেন।

লেখক কুলজীগ্রন্থাবলীকে অসার প্রতিপন্ন করিবার জন্য শ্রীযুত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা এই, "রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের কুলশাস্ত্র বিশ্বাস করিবার আর একটী বাধা যে, ইহাতে ধরিয়া লইতে হয় যে, ৩০ হইতে ৩৫ পুরুষ পূর্ব্বে অর্থাৎ ৮ হইতে ১০ শতাব্দী পূর্ব্বে বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ ছিল না বলিলেই হয়। রাঢ়ীরগণের কুলশাস্ত্রে লেখে যে, যে সময়ে কনোজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসেন, তখন বাঙ্গলায় ৭০০ ঘর ব্রাহ্মণ ছিল। কিন্তু আজকাল সেই ৭০০ ঘরের কোন বংশধর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না, অথচ পাঁচজন আগন্তুক ব্রাহ্মণগণের বংশধরেরাই সমস্ত দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে।"

চন্দ মহাশয় অনুসন্ধান করিলে ইহার মীমাংসা নিজেই করিয়া লইতে পারিতেন। যখন সে চেষ্টা করেন নাই, তখন এ প্রসঙ্গেও কিছু বলিতে হইতেছে।

আমরা প্রথমতঃ দেখিতে চেষ্টা করিব, বঙ্গের পূর্ব্বাধিবাসী সাড়ে তিন

ব্রাহ্মণের মধ্যে কাহাকেও "কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়" কিনা? কনোজ হইতে নবাগত পঞ্চবিপ্রের বংশধরগণের সামাজিক সম্মান ও রাজ সভায় প্রাধান্যহেতু সাতশতীগণ হীনপ্রভ হইয়া, কতক নীচবর্ণের পৌরহিত্যে, কতক ভাট প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়া আত্মনাশ করিলেন; আবার বংশ-মর্য্যাদায় হীনতা বশতঃ বিবাহ করিতে না পারায়, অনেকের বংশও লোপ পাইল। তথাপি কতক স্বভাবেই রহিলেন, এবং নবাগত ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে মিশিয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে কেহ কেহ কৃতকার্য্য ও হইলেন। সাতশতী-কন্যার রূপ লাবণ্যে আকৃষ্ট হইয়া, কান্য কুব্জাগত বিপ্রবংশের অধস্তন পুরুষেরা সাতশতীয় ঘরে বিবাহাদিও করিতে লাগিলেন। তথাপি "আজকাল সেই ৭০০ ঘরের কোন বংশধর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না" এ কথা একেবারেই মিথ্যা। ঐতিহাসিকের আসনে বসিয়া, নিজেদের সামাজিক ইতিহাসে এতদূর অজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে, তাহা ভাবিতেও পারি নাই।

ঐতিহাসিক মহাশয়গণ বোধ হয় জানেন না যে, খুলনা জেলার সাতক্ষীরার বিখ্যাত জমিদার-বংশ কাশ্যপগোত্রীয় কাটানি গাঞী সম্ভূত। যদিও তাঁহারা শুদ্ধ শ্রেণীবদ্ধরূপে রাঢ়ী শ্রেণীতে মিশিয়াছেন বটে, কিন্তু আত্মগোপন করেন নাই; এখনও সাতশতীত্ব উজ্জ্বল করিয়া স্বভাবের পরিচয়েই বর্ত্তমান আছেন। এইরূপ অনুসন্ধান করিলে, রাঢ়ীয় কৌলীন্যের কেন্দ্রভূমি ফুলিয়া গ্রামে ও তৎসন্নিহিত শান্তিপুরে বিখ্যাত ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের জন্মভূমিরূপে পবিত্র শান্তিপুরে কৌণ্ডিল্য গোত্রীয় সাতশতী বংশ স্বভাবেই সগৌরবে বর্ত্তমান আছেন দেখিতে পাইবেন।

প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের মহাকবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কোয়াড়ী গাঞী সম্ভূত সাতশতী বংশীয়। তিনি এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন:—

"কোয়াড়ী কুলের রাজা, সুকৃতি তপন ওঝা,
তস্যসুত উমাপতি নাম॥
তনয় যাদব শর্ম্মা, সুকৃতি সুকৃত কর্ম্মা,
তার তনয় তনয় সোদর।
উদ্ধারণ পুরন্দর, নিত্যানন্দ সুরেশ্বর,
বাসুদেব মহেশ সাগর॥
সর্ব্বেশ্বর অনুজাত, মহামিশ্র জগন্নাথ,
একভাবে পূজিল শঙ্কর।

"কুলজী"র সত্যতার একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ! নিতান্ত আধুনিক কালেও হিন্দু, মুসলমান অনেক জমিদারই ব্রাহ্মণ, মৌলভী ও অন্যান্য জাতীয় যোগ্য ব্যক্তিগণের বৃত্তির ব্যবস্থায় অনেক ভূমিদান করিয়াছিলেন। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে একটা প্রবাদই চলিয়া গিয়াছে যে, যে ব্রাহ্মণের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অথবা প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীদেবীর প্রদত্ত বৃত্তি ভূমি নাই, সে ব্রাহ্মণই নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, তৎকালে এমন কি শত বৎসর পূর্ব্বেও ব্রাহ্মণগণকে উদরান্নের চিন্তায় চিন্তিত হইতে হইত না। কোন সৎব্রাহ্মণই স্ববৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া চাকরীর জন্য ছুটিয়া বেড়াইতেন না, একান্নবর্ত্তিতার জন্য অনেক দূর সম্পর্কীয় অনাথ অনাথাও পরিবার মধ্যে নিতান্ত ঘনিষ্ঠভাবে স্থান পাইত। তখন অতিথি, অভ্যাগত; আশ্রিত ও ছাত্রগণকে অন্ন দান করিতে কোন ব্রাহ্মণই কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। তখন জমিতে ধান ও কার্পাস জন্মাইত, বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা অবসর-সময়ে তদ্দ্বারা চাউল ও সূত্র প্রস্তুত করিতেন। প্রতি গৃহস্থের বাটীর পার্শ্বে তরিতরকারীর বাগান ছিল, জল ও মাছের জন্য পুকুর ছিল; সুতরাং তখন মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের জন্য কাহাকেও চব্বিশ ঘণ্টা উৎকণ্ঠিত থাকিতে হইত না। তাই তখন বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল, এবং তার ফলে এক একজনের বহু পুত্র জন্ম গ্রহণ করিত। আমার সপ্তম পুরুষ ঊর্দ্ধে ঋষিপ্রতিম যে মহাত্মা বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহার ১৬ টী পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। পরে তাঁহারাও এক একজন বহুপুত্রের জনক হইয়া বঙ্গে বংশ বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। কেবল বঙ্গেই নয়, অনুসন্ধান করিলে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে কাশী, এলাহাবাদ; কানপুর প্রভৃতি বিখ্যাত স্থানেও এই মহাপুরুষের বংশধরগণকে প্রতিষ্ঠাপন্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

তখন যেমন একদিকে খাদ্যাদি সুলভ ছিল; তেমনি অন্যদিকে দেশের জল বায়ু ও স্বাস্থ্যের অনুকূল ছিল। তখন ম্যালেরিয়া এমন করিয়া এদেশবাসীর শোণিত শোষণ করিত না—তখন কলেরায় এমনভাবে পল্লী গ্রামগুলি শ্মশানে পরিণত হইত না। আর তখন শিশুমৃত্যুর এরূপ ভয়ঙ্কর দৃশ্যও ছিল না। যেটী জন্মিত, সে প্রায়ই নীরোগ শরীরে স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘজীবি হইত। তাই তখন পঞ্চব্রাহ্মণের বংশবৃদ্ধির বিঘ্ন ঘটে নাই। যে সকল কারণে সাতশতী ব্রাহ্মণগণের বংশলোপ হইতে ছিল, কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণবংশের সে সকল কিছুই ছিল না। সুতরাং তাঁহাদের বংশ ক্রমেই বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল।

ফণীন্দ্র বাবু এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"বাঙ্গালাদেশে যে সব ব্রাহ্মণ আসিয়া

ছিলেন, তাঁহারা অনার্য্যরমণী গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহারা পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাই বলিতে হয় যে, বাঙ্গালায় আজ খাঁটি ব্রাহ্মণ নাই।" ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে আর্য্য ব্রাহ্মণগণ বাঙ্গালায় আসিয়া ব্রাহ্মণীর "দুভিক্ষ" বশতঃ দলে দলে "অনার্য্যরমণীগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন" এই মনগড়া সিদ্ধান্তই কি ইতিহাস? তথাপি যদি তর্কস্থলে লেখকের কথাই মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও দেখি, লেখক নিজেই নিজের মতের প্রতিবাদ করিতেছেন, কেননা কিছুপূর্ব্বে তিনিই বলিয়াছেন,—"বাঙ্গালীত আর্য্য নয়, একেবারে অনার্য্য দ্রাবিড়ীয়। আবার তার উপর পূর্ব্ব বাঙ্গালায় মোঙ্গলীয় মিশ্র আছে।" তিনি একবার বলিতেছেন আর্য্য "ব্রাহ্মণ" গণ "অনার্য্য রমণীর গ্রহণ দ্বারা আর্য্য ও অনার্য্য রক্তে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের উৎপত্তি, আবার তিনিই বলিতেছেন, বাঙ্গালী (ব্রাহ্মণাদি সকলেই) একেবারেই অনার্য্য সম্ভূত; আর্য্যরক্ত সে শরীরে বিন্দুমাত্রও নাই। আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, বিরুদ্ধ দু'টা কথাই কি সত্য? ইহাই কি ফণীন্দ্রবাবুর ঐতিহাসিক গবেষণার এই পরস্পর গৌরব?

ফণীন্দ্রবাবু বলেন,—"বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ খাঁটি ব্রাহ্মণ নয়। তাহা যদি নাই হয়, তবে পশ্চিমের ব্রাহ্মণ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের হাতে জল গ্রহণ করেন না কেন? যদি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ আর পশ্চিমের ব্রাহ্মণ একই ব্রাহ্মণ শ্রেণির অন্তর্গত হন, তবে অপর দেশীয় ব্রাহ্মণেরা বাঙ্গালীব্রাহ্মণকে একটু অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন কেন?

একথার উত্তর দিতে গেলে অনেক কথাই বলিতে হয়; তত দূর গেলে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির সম্ভাবনা। তাই সংক্ষেপে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, সাধারণতঃ এক প্রদেশের ব্রাহ্মণ অন্য প্রদেশের ব্রাহ্মণের জল গ্রহণ করেন না; এমন কি এক দেশের বিভিন্নশ্রেণী ব্রাহ্মণের মধ্যেও পরস্পর অন্নগ্রহণ প্রথা প্রচলিত নাই। এনিয়ম কেবল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেই আবদ্ধ নহে, ক্ষত্রিয়াদি অন্যান্য বর্ণের মধ্যেও এই নিয়ম দেখা যায়। কোন কোন ব্রাহ্মণের অন্নগ্রহণ না করিবার আরও একটা কারণ এই যে, কায়স্থগণ মৎস্যভোজী, কিন্তু অপর প্রদেশের ব্রাহ্মণেরা মৎস্য মোক্ষণ দূরের কথা, তাহা স্পর্শও করেন না। সুতরাং মৎস্য ভোজীকে তাঁহারা হীন বলিয়া ঘৃণা করেন।

ফণীন্দ্রবাবু একস্থানে লিখিয়াছেন,—"বাঙ্গালার গাত্রে একবিন্দু পবিত্র

বেদ ব্যাখ্যা দিলেন। তাঁহার পাঁচপুত্র ছিল অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র। তাঁহাদের নাম হইতেই বাঙ্গালায় এই পাঁচটি রাজ্যের নাম হইয়াছিল।" অঙ্গ কলিঙ্গাদি বঙ্গের অংশ নহে, পৃথক দেশ। উক্ত পাঁচজন রাজপুত্রের নাম হইতে ভারতবর্ষের যে পাঁচটি প্রদেশের নাম করণ হইয়াছিল, বঙ্গ তাহারই একটি। প্রমাণ, তাঁহারি উদ্ভট মনু বচন—

"অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র মগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন পুনঃসংস্কার মর্হতি॥"

আশ্চর্য্যের বিষয় ইনিই আবার অন্যত্র বলিতেছেন,—"বাঙ্গালী নামটা কোথা হইতে আসিল? শুনিলে হয়ত অনেকে আশ্চার্য্যান্বিত হইবেন যে, আমাদের এই জাতিত্ব ব্যঞ্জক শব্দটি পর্য্যন্ত অনার্য্যদের নিকট-হইতে আমরা ধার করিয়া লইয়াছি। "বং নামে এক অনার্য্য জাতির নাম হইতেই আমাদের জাতীয় নাম বাঙ্গালী উৎপন্ন হইয়াছে।" আমরা বলি এটা একেবারেই কষ্ট কল্পনা। হইতে পারে, এই বঙ্গদেশে যে সকল অনার্য্য জাতি বাস করিত, তাহাদের মধ্যে এক সম্প্রদায় "বঙ্গ" দেশে বাসের জন্য "বঙ্গ" শব্দের অপভ্রংশ শব্দের দ্বারা আপনাদিগের পরিচয় দিত, অর্থাৎ তাহারা আপনাদিগকে "বং" নামে অভিহিত করিত। যেমন বঙ্গ শব্দের অপভ্রংশে "বং" বা "বঙ" তেমনই "বঙ্গ" শব্দের অপভ্রংশে "বং" বা "বঙ" উৎপন্ন হইয়াছিল। "বঙ" হইতে "বঙ্গ" শব্দের কল্পনা যেমন অস্বাভাবিক, "বঙ" হইতে "বঙ্গ" শব্দের কল্পনা ও তদ্রূপ হাস্যোদ্দীপক। "বং" জাতি হইতে বঙ্গের বা বাঙ্গালার নাম করণ হয় নাই; "বঙ্গ" শব্দ হইতেই "বং" জাতির নাম করণ হইয়াছিল।

বাঙ্গলার অধিবাসী বলিয়াই আমরা "বাঙ্গালী"। যেমন উড়িষ্যার অধিবাসী উড়িয়া, বাড়োয়ারের অধিবাসী বাড়োয়ারী, ইত্যাদি। কোন জাতি হইতে দেশের নাম হয় না, দেশ হইতেই জাতির নাম হয়। আবার কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতিষ্ঠিত বা আবিষ্কৃত দেশ বা স্থানপর্ব্বের নাম প্রতিষ্ঠাতা বা আবিষ্কর্ত্তার নামেও পরিচিত হইতে পারে। যেমন ভারতের নামে ভারতবর্ষ, সিংহবাহুর নামে সিংহল, রাজপুত্র বঙ্গের নামে বঙ্গ বা বাঙ্গলাদেশ। আমাদের এই বঙ্গদেশের নাম "বঙ্গ" নামক রাজপুত্রের নাম হইতে হইয়াছে, ক্ষীরোদবাবু ও "পুরাণ হইতে" তাহা "জানিতে" পারিয়াছেন। আর সেই বঙ্গের অধিবাসী বলিয়াই তিনি বাঙ্গালী, একথাও মানিয়া লইয়াছেন। তবে তাঁহার এ "বং" জাতির সহিত কল্পনা কেন? যদি তর্কচ্ছলে ইতিহাসকে পরিত্যাগ করিয়া ক্ষীরোদ

বাবুর অনুমানকেই প্রাধান্য দেওয়া যায়, তাহা হইলে প্রতিপন্ন হয় না যে, "বং" নামক অনার্য্য জাতির নাম "বাঙ্গালায়" আর্য্যভূমি হইতে আর্য্যের আসিয়া বাস করার জন্য, একেবারেই আর্য্যরক্ত শূন্য "অষ্ট্রো-এশিয়াটিক" অনার্য্যবংশে পরিণত হইলেন।

রবীন্দ্রবাবু বলেন—"আমাদের অনেক আচার ব্যবহার অনার্য্য প্রতিবেশিদের নিকট লওয়া।" একথা সমর্থন জন্য তিনি লিখিয়াছেন,—"আমরা সকলেই বাঙ্গালী রমণীকে ভ্রাতার মঙ্গল কামনায় যমের দুয়ারে কাঁটা দিতে দেখিয়াছি, তাঁহাদের নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃস্নেহ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি ও ভাবিয়াছি যে, জগতের ইতিহাসে এমন পবিত্র এমন মধুর চিত্র বিরল। কিন্তু আমরা জানিতাম না যে, বাঙ্গালী রমণী এ পবিত্র ব্রত প্রতিবেশিনী অনার্য্য রমণীর নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, বাঙ্গালী রমণীর কাছে যাহা ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া নামে পরিচিত, তাহাকেই তাঁহাদের অনার্য্য ভগিনীরা "ভাই জিউতা" বলিতেন। কি করিয়া এই ভাই জিউতা কালে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় পরিণত হইল তাহার ইতিহাস এখন অন্ধকারে ঢাকা।"

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বাস্তবিকই এই ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া কি অনার্য্য ব্রত? আমাদের ত' তাহা মনে হয় না। ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার যে অনুষ্ঠান, তাহাতে যম, যমুনা ও চিত্রগুপ্ত পূজার বিধি আছে এবং ভ্রাতাকে অন্ন প্রদানের জন্য "ভ্রাতস্তবাগ্রজাতাহং" অথবা "ভ্রাতাস্তবানুজাতাহং ভুঙ্‌ক্ষ্ব ভক্তং সিতং ময়া, প্রীতশ্চ যমরাজস্ত যমুনায়া বিশেষতঃ।" এই সংস্কৃত বাক্য আছে। যদি অনার্য্য রমণীদিগের নিকট হইতে আর্য্য রমণীরা এই প্রথা লইতেন তাহা হইলে এই প্রথায় আমরা যম, যমুনা ও চিত্রগুপ্তের পূজার বিধি দেখিতাম না। কারণ এই পৌরাণিক পূজাবিধি, অনার্য্য রমণীরা জানিত ছিলেন না, এবং ইহার মধ্যে কোন মানের সংস্কৃত বাক্যও থাকিত না, কারণ অনার্য্য রমণীরা সংস্কৃত জানিত না। বঙ্গের মহিলাকুলের এখন অনেক ব্রত আছে, যাহাতে সংস্কৃত ভাষায় রচিত মন্ত্রাদি নাই। তাঁহারা বাঙ্গলা ভাষায় প্রচলিত ছড়ায় দ্বারা ঐ সকল ব্রতের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াদি নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এ গুলির মূলে কোন অনার্য্য প্রথা ছিল, এমন সন্দেহ হইলেও হইতে পারে; কিন্তু এমন কোন মূলে পদ্ধতি ও সংস্কৃত বাক্যযুক্ত প্রথাটাকে একেবারে অনার্য্যরমণীর ঘাড়ের উপর চাপাইতে যাওয়া ঐতিহাসিকের উপযুক্ত কার্য্য নয়। তাই রাখাল বাবু [illegible] কিন্তু এখানে প্রমাণ কোথায়? যদি বিরুদ্ধ প্রমাণই না থাকে [illegible]

প্রথার নামটাই দেখুন। লেখক মহাশয়ের কথিত "ভাই দ্বিউতা" কোন অনার্য্য ভাষার বাক্য নয়। ইহা যে আর্য্য ভাষামূলক হিন্দি ভাষার বাক্য, তাহা বোধ হয় আর বুঝাইবার প্রয়োজন হইবে না। ইহাতে বরং ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, অনার্য্য রমণীরা আর্য্য রমণীদিগের সংসর্গে থাকিয়া এই পবিত্র প্রথাটা গ্রহণ করিয়াছিল। লেখকই স্বীকার করিয়াছেন, "কি রকমে এই ভাই দ্বিউতা কালে ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ায় পরিণত হইল, তাহার ইতিহাস এখনও অন্ধকারে ঢাকা।" যাহা "অন্ধকারে ঢাকা" তাহাকে কি এইরূপেই আলোকে আনিতে হয়? প্রমাণ নাই, যুক্তি নাই, একটা যা' তা' সিদ্ধান্ত করিলেই হইল! লেখক এইরূপ যে প্রথাগুলির উল্লেখ করিয়াছেন, সে সকল প্রথা সম্বন্ধেই এইরূপ বিরুদ্ধ মতের প্রমাণ প্রদান করা যায়। কিন্তু আর পুথি বাড়াইবার ইচ্ছা নাই।

যাহা হউক এইরূপ প্রথাগুলি অনার্য্যদিগের নিকট হইতে লওয়া তর্ক স্থলে ইহা স্বীকার করিলেও, এরূপ প্রতিপন্ন হয় না যে, বাঙ্গালী অনার্য্য জাতি। বরং লেখকের এই উদাহরণের দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বাঙ্গালী আর্য্য জাতি। কেন না তাহারা "অনেক আচার ব্যবহার অনার্য্য প্রতিবেশিদের নিকট হইতে" লইয়াছে। বাঙ্গালীকে যদি "মঙ্গোলীয় দ্রাবিড়ীয়" বলিয়াই স্থির করা যায়, তাহা হইলে "অনার্য্য প্রতিবেশিদের নিকট" এ কথার কোনই সার্থকতা থাকে না!

শেষে লেখক মহাশয়, "বহু দ্রাবিড়ী শব্দ বাঙ্গলা ভাষার মধ্যে অবাধে প্রবেশ লাভ করিয়াছে দেখিয়া," বাঙ্গালীর অনার্য্যত্বের ইহাও একটা প্রমাণ বিবেচনা করিয়াছেন, এবং সেই প্রমাণ উপস্থিত করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিয়াছেন। বাঙ্গলার "ঢেঁকি," "কুলো," "ধুচুনী" ইত্যাদি দ্রব্য বাচক শব্দগুলি সংস্কৃত মূলক না হওয়ায়, লেখকের সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে যে, বাঙ্গালী আর্য্য নহে অনার্য্য।

আর্য্যেরা যখন বাঙ্গলায় আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের "উদ্‌খল" অপেক্ষা অনার্য্যদের "ঢেঁকি" বড় ভাল; সুতরাং তাঁহারা উদ্‌খলের পরিবর্ত্তে "ঢেঁকি"ই ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু তাহার নাম পরিবর্ত্তন করার প্রয়োজন না দেখিয়া তাহাকে ঢেঁকি নামেই সাদরে গ্রহণ করিলেন। যে জাতির যে দ্রব্য নাই, সে জাতি যদি ভিন্ন জাতির নিকট হইতে সেই দ্রব্য গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার আর নাম পরিবর্ত্তন করার প্রয়োজন হয় না, ভিন্ন জাতির প্রদত্ত নামেই তাহা আদৃত হইয়া থাকে।

যেমন, চেয়ার, টেবল, বেঞ্চ, গ্লাস ইত্যাদি। এই কারণেই আমেরিকা অধিবাসিগের ঢেঁকিকে ঢেঁকি নামেই নামের বাহন করিয়া দিয়াছেন। ঢেঁকি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, "কুলো," "ধুচুনি" ইত্যাদি সম্বন্ধেও ঐ কথা প্রযোজ্য। আরবী, পারশী, ইংরেজী, পর্ত্তুগিস ইত্যাদি ভাষার শব্দ সমূহ বাঙ্গলা ভাষায় স্থান পাইয়াছে. বলিয়াই কি বাঙ্গালীকে ঐ সকল জাতির বংশধর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে?

লেখক বলিয়াছেন, "বাঙ্গলার কুকুর, অথর্ব্ববেদের কুর্কুর—বোধ হয় দ্রাবিড়ীয় কুর হইতে উৎপন্ন।" লেখকের এই "বোধ হয়"ই কি ভাষা বিজ্ঞানের প্রমাণ? এরূপ "বোধ" হইলে জগতের কিছুই ত মীমাংসা করিতে বাকী থাকে না! এবং রামা শ্যামা সকলেইত "বোধ হয়" যুক্তির বলে ঐতিহাসিক হইতে পারে! লেখক অথর্ব্ববেদের ভাষা পর্য্যন্ত দ্রাবিড়ীয় ভাষা হইতে উৎপন্ন, ইহা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন এক "বোধ হয়" যুক্তির বলে! ভাষা বিজ্ঞানে লেখকের এই অগাধ পাণ্ডিত্য দেখিয়া আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না!

ফণীন্দ্রবাবু আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য শ্রীযুক্ত শশধর রায় প্রণীত "মানব সমাজ" নামক গ্রন্থ হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমাদের ও কিছু বলিবার আছে। উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, শশধরবাবু বলিতেছেন,—"কান্যকুব্জ-দেশীয় কতিপয় কায়স্থ এবং এতদ্দেশীয় কতিপয় ব্রাহ্মণ কায়স্থের মস্তক পরিমাপ করিয়া যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহাতে মোটের উপর বলা যায় যে, কান্যকুব্জীয়গণের মাথা লম্বা আর বঙ্গীয়গণের মাথা চওড়া।" এই কথাই একটু বিস্তৃতভাবে বলিলে এইরূপ বলিতে হয়,মাথায় প্রস্থ ও দৈর্ঘ্যের সাপেক্ষ পাত এতদ্দেশীয়গণের অধিক, আর কান্যকুব্জীয়গণের অপেক্ষাকৃত কম। মাথার খুলির পিছনদিকে যে একটা টিপি আছে, তথা হইতে ভ্রূযুগলের মধ্যস্থান পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্য ধরিলাম; আর এক কর্ণের উপর হইতে অন্য কর্ণের উপর পর্য্যন্ত প্রস্থ ধরিলাম। এখন অনুপাত আনিতে হইলে, প্রস্থকে দৈর্ঘ্য দিয়া ভাগ করিতে হয়, এবং ভাগফলকে একশত দিয়া গুণ করিতে হয়। যথা:—

$$\frac{\text{প্রস্থ} \times ১০০}{\text{দৈর্ঘ্য}} = \text{অনুপাত}।$$

"এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া দেখিয়াছি, কান্যকুব্জীয়গণের গড় অনুপাত ৭২, ৭৩; এবং বঙ্গীয়গণের অনুপাত ৭৮ হইতে ৮০; এবং কোন কোন

আরও কিছু অধিক। এ বৈষম্য বংশগত অর্থাৎ জাতিগত, সম্ভবতঃ জল বায়ু নিবন্ধন নহে। তবেই কান্যকুব্জীয়গণ হইতে বঙ্গীয়গণ কত পৃথক!"

শশধরবাবুর কথিত নিয়মে মস্তক মাপিয়া এ বিষয়ে সকলেই চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিতে পারেন। আমরা এই নিয়মে বাঙ্গলার কয়েক জাতির মস্তক মাপিয়া যে অনুপাত পাইয়াছি, এবং যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

বর্ণ বা জাতি	যত জনের মাপা হইয়াছে	গড় অনুপাত ৭৩ এর মধ্যে	গড় অনুপাত ৭৩ এর অধিক
ব্রাহ্মণ	১৫	১১	১
কায়স্থ	৬	৪	২
নবশাক	৬	২	৪
গোয়ালা	৩	১	২
কৈবর্ত্ত বা মাহিষ্য	১	০	১
জল অচল জাতীয়	৩	২	১
বাগ্দী	৪	০	৪
চণ্ডাল বা নমশূদ্র	৮	৩	৫
মুসলমান	২	১	১

সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নগড় ৬৬৯, আর-উর্দ্ধ-৮১। একজন কান্যকুব্জীয় ক্ষত্রিয়, যাঁহার জন্ম গাজিপুর জেলায় তাঁহার মস্তকের অনুপাত ৭২৯ পাইয়াছি। মাহিষ্য মাত্র একজন পাইয়াছিলাম; সুতরাং নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। অতঃপরও কি বাঙ্গালীর সম্বন্ধে রিজলীর সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে হইবে?

কান্যকুব্জ হইতে আদিশূরের সভায় যাঁহারা আসিয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ এদেশীয় কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের কন্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা স্বীকার করা যায় না। কিন্তু সকলেই তা' করিয়াছেন, এ কথাও স্বীকার করা যায় না। পূর্ব্বের ব্রাহ্মণ কায়স্থগণও আর্য্যবংশ জাত। সুতরাং ইঁহাদিগকে রিজলীর মতে একেবারে অনার্য্য সিদ্ধান্ত করা ত দূরের কথা, বাঙ্গালার পতিত জাতির মধ্যেও আর্য্য-রক্ত দেখা যাইতেছে। বাঙ্গালী বলিতে আমরা আর্য্যবংশীয়কেও বুঝি, অনার্য্যবংশীয়কেও বুঝি, আবার আর্য্য অনার্য্য মিশ্রবংশকেও বুঝি। বাঙ্গার ব্রাহ্মণ কায়স্থ যাঁহারা আদিশূরের সভায় আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরেরা ঘোল, সাঁওতাল প্রভৃতি অনার্য্য

কন্যার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাহাদিগের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং ঐ বণিতার সংসর্গে থাকিয়াও তাহাদের হাতের পকান্ন ভক্ষণ করিয়াও হিন্দুত্ব ও স্বধর্ম্ম বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন, ইহা নিতান্তই অশ্রদ্ধেয় কথা। একথা যদি কেহ বিশ্বাস করেন, তবে তাঁহার সহিত আর তর্ক চলে না।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, "সম্ভবত" "বোধ হয় প্রকৃত প্রমাণ নহে। সুতরাং এই "সম্ভবত" "বোধহয়" শব্দের উপর নির্ভর করিয়া ইতিহাস গড়া চলে না, কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করাও চলে না। যদি প্রকৃতই অনুসন্ধিৎসু হইয়া ঐতিহাসিকের আসন গ্রহণ করিতে চান, তাহা হইলে সমস্ত বিষয় নিজে পর্য্যবেক্ষণ করুন। পরের কথায় নির্ভর করিয়া সত্যের অপলাপ করিবার চেষ্টা করিবেন না। মনে রাখিবেন "সম্ভবত," "বোধ হয়" প্রভৃতি যুক্তির দ্বারা ইতিহাস গড়িতে যাইলে, তাহা ইতিহাস হয় না, গালগল্প হইয়া পড়ে।

এতক্ষণ আমরা বোধ হয় বাঙ্গালীর জাতি নির্ণয় করিতে পারিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি সকল বাঙ্গালীই অনার্য্য নহে। বাঙ্গালীর মধ্যে বিশুদ্ধ আর্য্যও আছে, অনার্য্যও আছে, আবার আর্য্য অনার্য্য মিশ্র জাতিও আছে। সুতরাং এখানেই আমরা পাঠকগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

"প্রত্যাখ্যাতা"।

(১)

হে ফাল্গুনি, অভিসারে আগতা উর্ব্বশী
তোমার সমীপে, শুক্লাদেশে ক্ষুব্ধ-শশি
মোহিবারে তবমন, হে নিবাচনাশিন্
হিরণ্য অধিপসহ যত দেবদ্বেষী।
উর্ব্বশী অপ্সরীকুল-মুকুটমলিনী
তৃষিতা চাতকী সমা, আগতা নৃমণি
সাজি সুমোহন সাজে। কন্দর্প আপনি
দাসীর বাসনা বুঝি' সাজাইল মণি
মরকত ধন্ন নানা অলঙ্কারে, মম
এ বয়াদ্ধ। কন্দর্প মোহিনী গণ্ডে মম
লেপিলেক নয়নয়ং নিরুপম
নানারাগে। অঙ্গরাগে মানস বিভ্রম
ঢলিলেক যেথা ছিল সখী মালবিকা,
হেরি চারুবেশ মম, দিলা ভালে টিকা
সিন্দুরের। কহিলা প্রণমি মোরে,—দেখা
মিলে বড় সুসময়ে। সৌন্দর্য্য প্রতিমা,
কারে মোহিবারে এত আয়োজন, সখি,
কহ মোরে?" এত কহি, আলোড়িত দেখি'
কেশপাশ মম, বিনাইয়া দিলা তাহা
পরিপাটি করি,' "যাও" কহিলা—হে নরমর্ম্মহা,
"যাও তবে আজ, লহ বাঞ্ছিত তব;—
মনরঞ্জি' তাঁর সুকঠিন গর্ব্ব অভিনব
স্বপ্নময় কামরাজ্য —পাতে চুমি মম,
চিরহিতৈষিণী চির- সখী মম,

আশুগতি দিয়া নেত্রে কন্দর্পের বেগ,
কহিলেন,—"যাও যেথা কান্ত, কর যেথা।
সাগর সঙ্গমে যথা ছুটা মন্দাকিনী
সেইরূপ পূর্ণবালা হও তুমি ধনী।"

(২)

আসক্তা উর্ব্বশী দ্বারে তোমার, নৃমণি,
বাঁধ হে মৃণালভুজে,—কাতরে রমণী,
আশ্রিতা চরণে তব,—এই ভিক্ষা মাগে,
তুষ তাঁরে, আসিয়াছে বড় অনুরাগে
নাথ।—যখন চাহিলে মোরে, মগনা
নর্ত্তনে, আছিলাম দেবধামে। আপনা
ভুলিয়া, সঁপিনু এ প্রাণ মোর, চরণে
তোমার। স্থাপিলায় মূর্ত্তি হৃদাসনে।
লহ বক্ষে তবে নাথ, স্মরজিৎ প্রিয়,—
দানিব তোমারে আমি, যৌবন অমিয়
দেবালেবঞ্চি। উর্ব্বর হৃদয় তব
হইবে উর্ব্বর তাহা চারু অভিনব।

(৩)

হে বাঞ্ছিত, চল তবে যাই দুই জনে
মোরা মন্দাকিনী তটে। নন্দন কাননে
দেখিব প্রকৃতি শোভা। মন্দার মালিকা
কণ্ঠে তব দিব পড়াইয়া। দিব টিকা
ভালে তব, ললাট হইতে লয়ে মম।
কামের নিগড় দিয়া, করি পর্য্যুক্রম
তব অঙ্গে মম অঙ্গ করিব বন্ধন।
জগতের-সুখতন্ত্রী করিব স্পন্দন।
বসিব দুজনে মোরা কুঞ্জের মাঝারে
পাশাপাশি। অনুরাগে এ ধরারে
দেখিব হে যথার্থই সুখ বিজড়িত।
সঙ্গে সঙ্গে প্রেমণীরে করিব সিঞ্চিত,—

যতদিন ভাগীরথী উৎস ত্যজিয়া
হে নরশ্রেষ্ঠ আসি হও না নির্দ্দয়।

(৩)

কহ যদি, ফাল্গু,—"কি হেতু মানবে প্রীতি
তব। কহিবে উর্ব্বশী,—"কৌরবের রীতি
জানি আমি। নরপ্রেম সম্পদে বিপদে
প্রাণ সঙ্গে চির বাঁধা। ক্ষণেক বিচ্ছেদে
বাহিরায়, নেত্র দিয়া, মুক্তাবিন্দুসম
অশ্রু,—অনুরাগ নিদর্শন, প্রিয়তম!
কিন্তু স্বর্গে নাহি সেই হৃদয় কাহার—
সহস্র সহস্র বর্ষ একত্র বিহার—
তথাপি বিচ্ছেদকালে, ক্ষণ হা হুতাশ
করিবেনা স্বর্গবাসী। পাছে তপ্তশ্বাস
অগ্নিসম দগ্ধ করে ত্রিদিব আনন্দ।
অলি,—স্বর্গবাসী। ফুরাইলে মকরন্দ
যাইবে না শতদল পার্শ্বে কভু তারা,
ভাবিবে না ক্ষণতরে কিবা যাতনায়
পদ্মিনী দহিতেছে, হিমায়—হিমায়—।
তাই ত্যজি, দেবসঙ্গ, আসিয়াছে নারী
হে নরভূষণ! তব ঠাঁই। তুমিই—কাণ্ডারী।

(৫)

বিস্ময়ে চাহিলা পার্থ দেবাঙ্গনা পানে
দেখিল বিদ্যুদাম স্ফুরিছে নয়নে
তার। দেখিলেন মণালসা নেত্রদ্বয়;
ভাবিলা মানসে,—এত কলুষাতাময়
স্বর্গ। চরিত্রবিহীন ত্রিদিব নিবাসী
হেন।—তুলনায় অমিতীয় পুণ্যবাসী।
কহিলা কৌরব তাঁরে—অমরী উর্ব্বশী
চির পবিত্রতাময়ী ভাগীরথীসমা
তুমি। পূজ্যা তুমি চির মোর। ক্ষমিবে।

পূজিবেক পূজ্যজ্ঞানে,—তুমি যে জননী।
শুনিয়াছি মোর পূর্ব্বপিতা পুরুরবা
সঙ্গিনী তুমি যে ছিলে অযোনী সম্ভবা
তেঁইত জননী তুমি প্রণম্যা আমার
সন্তানে ছলিতে আজি একি ব্যবহার
আনিতাম স্বর্গ, পুণ্যজ্যোতিঃ বিভাসিত,—
নহে ইহা তামসী ধরিত্রী সম। চিত
হেরি তব, পুরোভাগে মম, অভিনব
স্বর্গ প্রতি জ্ঞান আজি—সর্ব্বত্র-বলিব।
বৃথা দেবি! আগমন। আমি জিতেন্দ্রিয়
চির। কটাক্ষঈক্ষণে পারে নাই কেহ
ক্ষণ মাত্র বিচলিতে পার্থের হৃদয়,
আশা ত্যজি মম দেবি! যাও নিজালয়

(৬)

শুনি ফাল্গুনীর-বাণী উর্ব্বশী ক্রোধিতা
কহিলা তাঁহারে চাহি' এত অদোদ্ধতা
হে ফাল্গুনি, কল্লোলিনীসম যুক্তি স্রোত
শুনিবারে আসি নাই। হয় ওতপ্রোত
আমি। স্মরয়নে পূর্ব্ব-পিতা সহরণ
তব, তপতীর লাগি করিলা সাধন
কি অসাধ্য কর্ম্ম বহুকাল লাগি।
এস তবে হে বাগ্মিবর, আমি অনুরাগী।
কহিলা অচল পার্থ, যাহ নিজালয়
নারী হেতু টলিবে না পার্থের হৃদয়
কভু। শুনি তাঁর বাণী, ক্রোধভরে
ফুৎকারি উঠিল নারী অরণের ঘারে,
রে পাষাণ নারী আশা করি প্রত্যাখ্যান
চাহ-বিশ্বে জানাইতে আদর্শ মহান
শীলতার। দিনু অভিশাপ, অর্জ্জুনি
ক্লীব হও পার্থ, ভুঞ্জ কষ্ট নিরবধি।

আমে দুষ্ট অন্যবারি শমীতরুসম
মর্ম্মে—মর্ম্মে অনে যাও গাঢ়তর বিষাদ নিশ্বাস।

(৭)

হাসিয়া কহিলা পার্থ, মৃদুক বাবতা
ফিরিয়াছে নারী, পার্থ অগ্রে প্রভ্যাখাতা।

শ্রীভীমচন্দ্র ধর।

কর্ম্মবীর টাটার জীবন কথা।

(ভূমিকা)

আজ বিজ্ঞানালোকিত নববলদৃপ্ত প্রতীচ্য-সভ্যতার নিকট প্রাচ্যের এই বহুযুগব্যাপী সাধনাপক্ক প্রাচীন সভ্যতা যেন নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। নবনব শিল্পকলা ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতার যে রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে; তাহাতে আমাদের চক্ষু যে ঝল্‌সাইয়া গিয়াছে, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। ভিতরে যাহাই থাকুক, উহার বাহিরের চাকচিক্যময় চেহারাটি আমাদিগকে এমনি মুগ্ধ করিয়াছে যে আমাদের পক্ষে উহা এখন পরিত্যাগ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

একথা স্বীকার না করিলেও আমাদের বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে এই কলকারখানা মণ্ডিত সভ্যতার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে তাহাদেরই মত আমাদের বিজ্ঞান ও শিল্পকলার চর্চ্চা করা একান্ত প্রয়োজন। শুধু ঘরের কোনে চুপ করিয়া বসিয়া, অতীত গৌরবের দোহাই দিয়া আত্মপ্রবঞ্চনা করিলেও, জগতের কাছে ঘৃণা ও অবজ্ঞা ছাড়া আর যে কিছু লাভের আশা নাই তাহা মনে মনে বুঝিতে আর বাকি আছে কি?

আপনার অধ্যাপক শ্রদ্ধাস্পদ "ওকাকুরা" তাঁহার "Ideals of East" নামক বইতে বলিয়াছিলেন এতদিন পর্য্যন্ত আপনের প্রতি পাশ্চাত্য জাতির যে অবজ্ঞা ছিল, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে প্রতীচ্যের বিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়া

জাপান রুষের দর্প চূর্ণ করিল, সে মুহূর্ত্তে তাহাদের সুর বদলাইয়া গেল ; বিশ্বের দৃষ্টিতে তাহারা বলিয়া উঠিল—"হাঁ জাপান সত্য বটে"।

একথাটি বিশেষ ভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই সুযোগ্য পুত্র কর্ম্মবীর জেমসেটজী টাটা শিল্প বিজ্ঞানের প্রসার দ্বারা প্রতীচ্যের প্রতিযোগিতা করিবার জন্য আপনার সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। সাধারণ ব্যবসায়ীর মত তিনি কেবল নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু যাহাতে স্বদেশীয় শিল্পের উন্নতি হয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা দেশের সেবা মঙ্গল সাধিত হয় তাঁহার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম, তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনা ইহারই পরিচয় দিতেছে। "বাঙ্গালোরের বিজ্ঞান মন্দির ও টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টিল কোম্পানী" তাঁহার এই সাধনার বিশিষ্ট প্রমাণ।

বহু দিনের জড়তা পরিত্যাগ করিয়া আজ ভারতবর্ষও যেন যাদুকরের স্বর্ণ দণ্ড স্পর্শে জাগিয়া উঠিয়াছে। আজ নবনব শিল্প বিজ্ঞান আহরণ করিবার জন্য তারও অদম্য বাসনা জাগিয়াছে। এই স্বর্ণপ্রসূ ভারতের নিবীড় খাতুরে ও শৈলাহাড়পর্ব্বতে অপর্য্যাপ্ত ধনরাশি লুক্কায়িত থাকিতেও অন্নের জন্য তাহাকে আজ পরমুখাপেক্ষী—এ দৃশ্য অসহ্য।

এই নব প্রাণ্ডত ভারতের জাতীয় অভ্যুত্থানের দিনে যদি আমাদের সম্মুখে জীবনের পরিচয় লাভের আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে, তবে যিনি ভারতের শিল্প-বাণিজ্যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন, স্বদেশের লুপ্তরত্নের সন্ধান করিতে করিতে যাহার জীবনপাত হইয়াছে, সেই কল্যাণকামী কর্ম্মবীরের জীবনই আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূত হওয়া উচিত।

এই ভরসায় আমরা এই অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন পুরুষের সংক্ষিপ্ত জীবনী বঙ্গীয় পাঠকের নিকট উপস্থিত করিলাম। তাঁহার মহান চরিত্র ও কর্ম্মকুশলতা যদি এই শ্রমবিমুখ আলস্যপরায়ণ-বাঙ্গালী জাতিকে অণুমাত্রও উদ্বুদ্ধ করিতে পারে, যদি এই পার্শিকুলতিলক বণিকরাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, আমরা কর্ম্মময় জগতে বিচরণ করিতে পারি, তবে জেমসেটজীর জীবনী পাঠ ও কীর্ত্তি ভারতে অবিনশ্বর হইয়া থাকিবে।

(২)

সমৃদ্ধপরিবারে জন্মগ্রহণ না করিয়া, বরং বাল্যে অপেক্ষাকৃত দরিদ্রের পাঠশালে জীবন কাটাইয়া, পরলোকগত সিঃ জেমসেটজী নাসেরভানজী টাটা আপনার সৌভাগ্যের উন্নত-সৌধ আপনি রচনা করিয়াছেন।

যাঁহারা কেবলমাত্র অসাধারণ চরিত্রগৌরব ও অসীম উদ্যমশ্রান্ত আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার বলে কমলার অজস্র কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছেন, মিঃ টাটা তাঁহাদের অন্যতম। প্রকৃতিদত্ত অসাধারণ কার্য্যদক্ষতা ও তীক্ষ্ণপর্য্যবেক্ষণ শক্তি লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই জন্যই বৎসরের পর বৎসর যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতেই তিনি আপনার বিরাট ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। মিঃ টাটার অপরিসীম ধৈর্য্য ও অপূর্ব্ব দৃঢ়প্রতিজ্ঞার মধ্যে নৈরাশ্য বা নিষ্ফলতা স্থান লাভ করিতে পারে নাই। ক্রমশঃ ধনাগম ও অভিজ্ঞতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার কর্ম্মপ্রবণ মনীষা সম্পন্ন মস্তিষ্কে যে সকল অভিপ্রায় পোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন,—ভবিষ্যতে সে গুলি তাঁহার দৃঢ়সঙ্কল্পের গুণে সফলতা লাভ করিয়াছে। যদিও তাঁহার অনেক সুদূর প্রসারিণী কল্পনা দুর্ভাগ্যক্রমে অসমাপ্ত ছিল, অত্যন্ত আনন্দের বিষয় তাঁহার পুত্রগণ অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত সে গুলিকে কার্য্যে পরিণত করিয়া বস্তুতঃই প্রশংসনীয় হইয়াছেন।

দেশ ভ্রমণ ও নবভাব গ্রহণে তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ ছিল। তিনি প্রকৃতই আড়ম্বরহীন, পদচারণশীল গ্রীক্ পুরাণোক্ত 'অর্গাসের' মত দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন পরিব্রাজক ছিলেন। ১৪৬৩ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি ইয়োরোপ ভ্রমণ আরম্ভ করিয়াছেন এবং জাপান ও অষ্ট্রেলিয়াও ঘুরিয়া আসিয়াছেন।

বণিক জীবনের অতিপ্রারম্ভে, বোধহয় প্রায় ১৮৫৮ অব্দে, তাঁহার পিতার ব্যবসাবাণিজ্য চালাইবার জন্য তিনি কিছু দিন হঙ্‌কঙে ছিলেন। তারপর ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁহাকে লণ্ডনে যাইতে হয়। ভূয়োদর্শনের ফলে নানা অভিজ্ঞতা লইয়া তিনি বোম্বায়ে ফিরিয়া আসেন। সেই সব বিদেশলব্ধ জ্ঞান, তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে বিশেষ কাজে আসিয়াছিল। কি করিয়া বিপুল ধনের সদ্ব্যবহার করিতে হয়, তিনি সে দেশ হইতেই এ শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছিলেন। বিপুল ধনরাশিও একদিন ধ্বংশ হইয়া যাইবে, একথা বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় যতদূর সম্ভব তাঁহার স্বদেশবাসীর সেবায় তাঁহার ধনরাশি ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এইরূপে তাঁহার সহজাত স্বদেশহিতৈষণা উদ্বুদ্ধ হয়। সেই প্রেরণা বলে, ভারতের উপকারার্থ তাঁহার জীবনে তিনি কম অর্থ দান করিয়া যান নাই! সেই জন্য তাঁহার দিগন্ত বিশ্রুত নাম ও কীর্ত্তির যশঃ সৌরভ ভবিষ্যত যুগে বহুদিন অটুট থাকিবে।

তিনি যখন সামান্য কলেজীয় শিক্ষা শেষ করিয়া তাঁহার পিতার ব্যবসায়ে

প্রবিষ্ট হন্, তখন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে নবজীবনের প্রেরণা আজ হইয়াছে। তাঁহাদের অহিফেন ও তুলার ব্যবসায় ছিল, এবং ইহাই এই দুই পণ্য-দ্রব্যের উপর তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রথমোক্ত জিনিসের ব্যবসা করিতে তাঁহাকে হংকং ও শেষোক্ত ব্যবসায়ের জন্য লণ্ডন ও লিভারপুল যাইতে হয়। সে সময় যে সকল বণিকেরা বোম্বায়ে কাঁচা মালের ব্যবসা করিতেছিলেন, তাঁহারা তুলার ব্যবসায়ে অতিশয় মনোযোগ করেন; এবং ১৮৬১-৬৫ খৃষ্টাব্দের মার্কিণ গৃহ যুদ্ধের ফলে, সৌভাগ্য ক্রমে তাঁহাদের কোটী কোটী টাকা অর্থাগম হইতে আরম্ভ হয়। কার্য্যানুরোধে তখন মিঃ টাটার ল্যাঙ্কেশায়ারে উপস্থিতি প্রয়োজন হইয়া পড়িল। সেখানে তিনি তাঁহাদের কোম্পানির পক্ষে আমদানী রপ্তানির (চালানি) কার্য্যের প্রতিনিধিত্ব করিতে লাগিলেন; ইতি-মধ্যে বোম্বায়ে অনুকূল অংশলাভ কল্পনার সুবাতাস বহিতে আরম্ভ করিল। মিঃ প্রেমচাঁদ রায় চাঁদের প্রতিভা ১৮৬৩-৬৪ অব্দে আপনার সৌভাগ্য-প্রাসাদ তুলে উন্নতির বীজ বপন করে এবং সুবাতাসে ক্রমশঃ উহা বাড়িয়া চলিতে থাকে। কিন্তু ভবিষ্যতে যে মহাক্লেশ সঞ্চিত রহিয়াছে ইহা কাহারও চিন্তার বিষয় হয় নাই। বোম্বাইয়ের বণিক সমাজ শীঘ্রই আপন বাতুলতা ও নির্ব্বুদ্ধিতার ফুর্ত্তি বর্ত্তে পড়িয়া হাবু ডুবু খাইতে আরও করে, এবং ১৮৬৫-৬৬ অব্দে উহা ঘোর সার্ব্বজনীন দেউলিয়া অবস্থায় ও অব্যক্ত দুঃখকষ্টে পর্য্যবসিত হয়। বাজারে সমস্ত ব্যবসায়ীর সুনাম নষ্ট হইয়া যায় ও ব্যবসায়গত বিশ্বাস অভূতপূর্ব্ব রূপে প্রবল বাধা প্রাপ্ত হয়। ঘোরতর অবসাদে নগরী সমাচ্ছন্ন হয়। মিঃ টাটার কোম্পানীও এই দারুণ দুর্ঘটনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে নাই। তিনি লণ্ডন হইতে বোম্বায়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখেন বোম্বাই নগরী বিভূতি ভূষিত দেহে ছিন্নমস্তা পড়িয়া অনুতাপের অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইতেছে এবং উত্তম-র্ণেরা হতাশ ভাবে তাহাদের পাওনাদারদের নিকট শুধু ধর্ম্মের দোহাই দিয়া বেড়াইতেছে।

... কিন্তু যেমন অনেক সময় অমঙ্গল হইতে মঙ্গল উৎপত্তি হয়, তেমনি ১৮৬৫ অব্দের শোচনীয় অবস্থা হইতেও বোম্বায়ের যথেষ্ট উপকার সাধিত হয়। অর্থনৈতিক ভূকম্পনের ফলে, ধীরে ধীরে বাণিজ্যসৌধ আবার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। বাণিজ্যের পুনরুত্থান ও ব্যবসায়ীর সুনাম প্রতিষ্ঠার সঙ্গে এক নবভাবের আবির্ভাব হইয়া কার্পাসশিল্পের ঘুণাক্ষর দেখা দেয়। অর্থনীতির হিসাবে ইহা অতি আশাপ্রদ ঘটনা।

স্থল ও বহির্বাণিজ্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাই নগরীর ধনসম্পদ ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। এই বাণিজ্য পুনরুত্থানেই মিঃ টাটার সৌভাগ্যসম্পদ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই নবজাগ্রত শিল্প সমুত্থান ও মিঃ টাটার সৌভাগ্যসম্পদ একত্রে সম্ভূত। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দেই মিঃ টাটা একজন উন্নীয়মান অধ্যবসায়ী ও ধনসম্বাণিজ্যকারী রূপে সুপরিচিত হন। ব্যবসাবাণিজ্যে তিনি অচিরেই খ্যাতি লাভ করিয়া উঠেন। তিনি ইহাতে এমন প্রশংসার সহিত আপন কার্যশক্তির পরিচয় দেন যে অবিলম্বে ভারতে তাঁহার যশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এবং তাহার পরলোকগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি সেইরূপ গৌরবের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হন। তাঁহার জীবনের শেষ বিশবৎসর প্রকৃতই সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। তাহা শুধু বোম্বাইবাসীর নহে, সমগ্র দেশের পক্ষে শ্লাঘার বিষয়।

এখানে বোম্বাইয়ের প্রথম কার্পাস শিল্পের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যাহারা বোম্বাইয়ের ইহার ক্রমোন্নতি ও বিস্তার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ভালবাসেন, অধ্যবসায়ী বোম্বাইবাসীর অক্লান্ত চেষ্টায় উহা যখন উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করে, ১৮৫৫ হইতে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের কার্যকরী অবস্থার তুলনা করিলে এই বিচিত্র ও কৌতূহলোদ্দীপক অবস্থায় বিস্মিত হইবেন।

মিঃ কাউয়াজী নানাভাই ডোবার নামক একজন উদ্যোগী পার্শী ভদ্রলোক সর্ব্বপ্রথম ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে টায়ডোতে একটি কটন ফেক্টরী প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপর পুনরায় আর এক দল পূর্ব্ববৎ উৎসাহী ব্যবসায়ী এই শিল্পের পুষ্টি সাধন করিয়া আর একপুরুষ পরে উহার বিপুল উন্নতি করেন। ইহার মধ্যে পরলোকগত মিঃ দাদাভাইজী জেমজী পাণ্ডে, সার দিনসা মানেকজী পেটিট, তাহার ভ্রাতা স্বর্গীয় মিঃ নাসেরভানজী পেটিট এবং মিঃ যেমসেটজী টাটা সর্ব্বপ্রধান। যখনি মনে হয় সর্ব্বপ্রথম পথপ্রদর্শক মিঃ ডোবার তাঁহার ফেক্টরী প্রতিষ্ঠা করিতে কি রকম গুরুতর অসুবিধা ভোগ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে শত মুখে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। আমাদের দেশের রেলওয়ে ও টেলিগ্রামের তখন শৈশবাবস্থা। বাষ্পীয় জাহাজের অচলনের অপরাহ্ণের শক্তি তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত ছিল। খুব পরিষ্কার দিন থাকিলেও বৈদেশিক কাগজপত্র ও কলকব্জা সম্ভারপূর্ণ জাহাজ, লিভারপুল হইতে বোম্বাই আসিতে অন্ততঃ একশত বিশ দিন লাগিত। সমুদ্রে যাতায়াতোপযোগী জাহাজের শিক্ষা শৈশব অবস্থাতেই ছিল। সুদক্ষ শিল্পী বিরল। সাধারণ রকম অভিজ্ঞ লোকও

তখন পাওয়া কষ্টসাধ্য। দেশে অবশ্যই যথেষ্ট শ্রমজীবী ছিল এবং তাহার মজুরীও সস্তা ছিল; কিন্তু সেইসব অনভিজ্ঞ লোকদিগকে অতি কষ্টে কাজ শিখাইতে শৃঙ্খলার সহিত কোন বিষয়ের ব্যবস্থা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। তখনকার অবস্থার সহিত ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের অবস্থার তুলনা করিলে পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাইবে, ভবিষ্যৎবংশীয়দিগের সুফল উৎপাদনকারী কার্য্যাবলী সম্পাদন করিবার জন্য প্রথম পথপ্রদর্শকদিগকে কিরূপ আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

শ্রীবতীন্দ্রমোহন রায়।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

(জীবনী প্রসঙ্গ)

৬

কলিকাতা জ্বর ও স্বাস্থ্য কমিটী।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে টাইফয়েড জ্বরের উৎপত্তি, বীজাণু ও কারণ অনুসন্ধানের জন্য গভর্ণমেণ্ট একটী কমিটী গঠন করেন। ডাক্তার মউট সভাপতি, প্রিন্সিপ্যাল চিভার্স এই কমিটীর প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে বদলী হইয়া তারকনাথ এক বৎসরের জন্য জ্বর ও স্বাস্থ্য কমিটীর অন্যতম কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন: স্বর্গীয় ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি, স্বর্গীয় ডাক্তার হরিশচন্দ্র তলাপাত্র (শর্ম্মা) ও তারকনাথ, ডাক্তার নরম্যান চিভার্সের সহকারী নিযুক্ত হন। এই সমিতিতে অতিশয় কৃতিত্বের সহিত কর্ম্ম করিয়া তারকনাথ ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে স্যানিটারী কমিশনরের অধীনে দার্জ্জিলিঙ্গ বিভাগের Vaccination Superintendent রূপে জলপাইগুড়িতে প্রেরিত হন।

রেভাঃ হরিহর সান্যাল।

কলিকাতাস্থ বাঙ্গালী খৃষ্টীয় সমাজের মধ্যে রেভাঃ কে, এম, ব্যানার্জ্জী (কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়) যেমন একজন প্রসিদ্ধ পাদরী, লেখক, বাগ্মী, বহুভাষাবিৎ, বিদ্বান ও সর্ব্বজনপরিচিত ছিলেন, তেমনি রেভাঃ হরিহর সান্যাল মহাশয় তৎকালীন কলিকাতা খৃষ্টীয় সমাজের একজন নেতা, প্রসিদ্ধ বিদ্বান ছিলেন।

রেভাঃ সান্যাল নীরব কর্ম্মী ছিলেন; রেভাঃ কৃষ্ণমোহনের মত তিনি সাধারণ সভা সমিতিতে দিশিতেন না। তিনি নিজে যেরূপ বিমল চরিত্র ও তত্ত্ববিৎ ছিলেন, তাহার পার্শ্বিপার্শ্বস্থ অন্যান্য বন্ধুগণকে সেইরূপ প্রকৃতির করিয়া গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি যুবক বন্ধুগণকে অতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। পুণ্যশ্লোক রামতনুলাহিড়ীর গৃহের মত রেভাঃ সান্যালের গৃহে যুবজনের সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন বিষয়ক তর্ক-আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত হইত। ৺বন্ধুবিহারী গুপ্ত (Major B. B. Gupta I. M. S.) তারকনাথ, প্রিয়নাথ বসু, গোপালচন্দ্র গোস্বামী, বিহারীলাল ভাদুড়ী, শ্রীযুক্ত রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মেডিক্যাল কলেজের অনেক ছাত্রই রেভাঃ সান্যালের গৃহে যাতায়াত করিতেন। তাঁহার পুত্র স্বর্গীয় মণিলাল সান্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটী উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। কলিকাতাস্থ Sandel Street রেভাঃ সান্যালের স্মৃতি ঘোষণা করিতেছে।

তারকনাথের খ্রীষ্টধর্ম্মে অনুরক্তি ও খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণের সঙ্কল্প।

রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, রেভাঃ সান্যাল পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠতার ফলে তারকনাথ ও বন্ধুবিহারী গুপ্তের খৃষ্টধর্ম্মে অনুরক্তি হয়, এবং তাঁহারা খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করেন। স্বর্গীয় ডাক্তার প্রিয়নাথ বসু, ৺গোপালচন্দ্র গোস্বামী, স্বর্গীয় ডাক্তার বিহারীলাল ভাদুড়ী প্রভৃতি অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ তাঁহাদিগকে ধর্ম্মান্তরগ্রহণ-কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করেন। ঠিক এই সময় তারকনাথ জলপাই গুড়ি প্রেরিত হওয়ায় তারকনাথের ধর্ম্মান্তর গ্রহণ কার্য্যে পরিণত হয় নাই। বন্ধু-বান্ধবগণের ইচ্ছা পূর্ণ হয়। স্বর্গীয় ডাক্তার Major B. Gupta I. M. S. কিছুদিন পরে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন ও রেভাঃ সান্যালের এক কন্যাকে বিবাহ করেন।

রেভাঃ লালবিহারী দে।

রেভাঃ হরিহর সান্যালের বাটীতেই লালবিহারী দের (পরে রেভাঃ) সহিত তারকনাথের পরিচয় হয়; এই পরিচয় আত্মীয়তায় পরিণত হয় এবং ইহা চিরদিনই সমভাবে ছিল। লালবিহারী রেভাঃ সান্যালের অতিশয় প্রিয়পাত্র ন। লালবিহারী তারকনাথের মত বিদ্যানুরাগী, স্বাবলম্বী, নিজ চেষ্টায় ইংরাজী সাহিত্যে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে লালবিহারী ও তারকনাথ অভিন্নহৃদয় ছিলেন এবং তারকনাথ লালবিহারীর অনুরোধ

রক্ষা করিয়া বন্ধুদের যে সম্মান রক্ষা করেন তাহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য; সেই জন্য আমরা সেই ঘটনা বিবৃত করিতেছি। লালবিহারী আমাদের ইংরাজী ও সাহিত্যের চর্চা করেন, তারকনাথ প্রথম জীবনে ইংরাজী রচনা-বিষয়ে নিমগ্ন ছিলেন; পরে যে ঘটনায় বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন, সেই ঘটনাটি চির-স্মরণীয় হইবার যোগ্য, নিম্নে আমরা সেই ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করিলাম।

দুর্গেশ নন্দিনী ও তারকনাথ।

তারকনাথ যখন মেডিক্যাল কলেজে পাঠ করিতেছেন, সেই সময় [illegible] চন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হয়। কলেজের বন্ধুরা দুর্গেশনন্দিনী ক্রয় করিলেন। সকলেই মহা আনন্দের সহিত পাঠ করিতে লাগিলেন। তারকনাথ তখনও দুর্গেশনন্দিনী পাঠ করেন নাই। স্বর্গীয় ডাক্তার বিহারীলাল সরকার মহাশয় তারকনাথকে এক খণ্ড দুর্গেশনন্দিনী উপহার দেন। [illegible] ডাক্তার রাধাপ্রসাদ বসু বাহাদুর বলিয়াছেন, তারকনাথ যে সময় বাঙ্গালা পড়িতেন না বলিলেই হয়। তিনি প্রথম দুর্গেশনন্দিনী পড়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। আমরাও যে পাঠে আগ্রহ করি। কলিকালের ঠিক তা' বলা যায় না, তবে নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার্থীর নিম্ন ঐ পুস্তকের সহিত পরিচিত ছিল বলিয়াই অনেকেই আগ্রহসহকারে পাঠ করিয়াছিলেন।

তারকনাথ দুর্গেশ নন্দিনী পাঠ করিলেন। তিনি পাঠ করিয়াই বলেন, ষ্টের আইভানহোর ঘটনার সহিত এই পুস্তক বর্ণিত স্থান বিশেষের বাহ্য আছে। তা হউক, একটী বিষয় অত্যন্ত অসহ্য—যাহা স্বাভাবিক নয় তাহা চিত্রাঙ্কণ করা—অনেক স্থানই অস্বাভাবিক চিত্রে পূর্ণ, সুতরাং এ গ্রন্থ পাঠে স্থানে পাওয়া দূরে থাকুক বরং বিরক্তিই উদয় হয়। আর গ্রন্থকার যে সব স্ত্রী চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা কোন বাঙ্গালী লেখকের চিত্রিত চিত্র বলিতে পারি না, বোধ কোন বিদেশীয় অঙ্কিত। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া কোন বিদেশী আমাদের দেশের লোকের প্রকৃত চরিত্র বা দেশের সম্যক্ পরিচয় পাইবে না।

তারকনাথ স্বর্ণলতার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এই কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন, গ্রন্থকারেরা লোকের মনের কথা টের পান ও ইচ্ছা হইলে সকল স্থানে গমনাগমন করিতে পারেন; তা না হলে সুন্দর বকুল

তথায় বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন, তারকচন্দ্র রায় তাহা কি প্রকারে জানিতে পারিলেন ; মাইকেলই বা কিরূপে পরলোকের বৃত্তান্ত অবগত হইলেন ? তদপেক্ষাও দুর্গম যে মুসলমানের অন্তঃপুর, বঙ্কিম বাবুই বা কিরূপে তথায় উপস্থিত হইয়া ওস্মান ও আয়েসার যথোপকথন শুনিতে পাইলেন ? ইহা ভিন্ন গ্রন্থকারগণের আরও একটী শক্তি আছে, অর্থাৎ ইচ্ছা হইলেই তাঁহারা অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন। এটী বড় সাধারণ শক্তি নহে। এ শক্তি না থাকিলে অনেক গ্রন্থকার মারা যাইতেন। বিষ্ণু শর্ম্মা তো একেবারে বোবা হইতেন। কিন্তু এই শক্তিটী ছিল বলিয়াই লঘুপতনক ন্যায়শাস্ত্রের বিচার করিতেছে, এবং চিত্রগ্রীব অবোধ কপোতদিগকে উপদেশ দিতেছে। এই শক্তির প্রভাবেই বঙ্কিম বাবু আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে এক যবন তনয়ার মুখ হইতে অধুনাতন ইউরোপীয় সুসভ্য জাতীয় কামিনীগণের ভাষা অবলীলাক্রমে নির্গত করাইয়াছেন।

উপন্যাস রচনার সঙ্কল্প।

তারকনাথ অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বিহারীলাল ভাদুড়ী, প্রিয়নাথ বসু, গোপাল চন্দ্র গোস্বামী রাসবিহারী ঘোষ (পরে স্যর) প্রভৃতি বন্ধুগণকে বলেন, দেখ, আমি এমন একটী উপন্যাস লিখিব, যাহার সমস্ত চিত্রই স্বাভাবিক হবে। অস্বাভাবিকতার লেশ মাত্র থাকিবে না। বিদেশীরা সমস্ত চরিত্র পাঠ করিয়া দেশের লোকের পরিচয় পাইবে। রাসবিহারী ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, তোমার আর নভেল লিখে কাজ নেই, নাড়ী টেপার বিদ্যেটা ভাল করে শেখ। অক্ষয়বাবু ও বিহারী বাবু তারকনাথের অকৃত্রিম বন্ধুগণ তারকনাথকে অত্যন্ত উৎসাহিত করেন। ইহার পরই স্বাভাবিকতার উপাসক ও পরিপোষ্টা তারকনাথ স্বর্ণলতা রচনায় প্রবৃত্ত হন। স্বর্ণলতার জন্ম-ইতিহাস পরে লিখিত হইতেছে।

রেভাঃ লালবিহারী ও তারকনাথ।

উত্তর পাড়ায় বরেণ্য জমিদার স্বর্গীয় জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যেমন দানশীল, তেমনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি সংবাদ-পত্রে একটী প্রতিযোগীতা পুরস্কারের জন্য বিজ্ঞাপন প্রচার করেন যে, বঙ্গের উৎকৃষ্ট গার্হস্থ্যচিত্র লেখককে পঞ্চাশ পাউণ্ড পুরস্কার দিবেন। এইগার্হস্থ্যচিত্র লেখকের ইচ্ছানুযায়ী ইংরাজী বা বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইবে। এই বিজ্ঞাপন প্রচার হইবার পর

তৎকালীন অনেক কৃতবিদ্য উক্ত প্রতিযোগিতা পুরস্কার লাভের আশায় আপন আপন রচনা প্রেরণ করিয়াছিলেন। লালবিহারী ও তারকনাথ উভয়েই বন্ধু ছিলেন পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি। য়েভাঃ সাম্যাল মহাশয় এই বিজ্ঞাপনটী উভয় বন্ধুকেই দেখান, এবং উভয়কেই লিখিতে অনুরোধ করেন। তৎক্ষণাৎ উভয়েই রাজী হন। উভয়েই এই চিত্র ইংরাজীতে লিখিতে প্রবৃত্ত হন। দুই বন্ধু একত্র মিলিত হইলে লালবিহারী, তারকনাথকে অনুরোধ করেন যে, এই উপন্যাস রচনায় তারকনাথ যেন অগ্রসর না হন, এবং তাঁহার রচনাও অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। তারকনাথও এই প্রতিযোগিতা রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার রচনাও অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল। তিনি বন্ধু লালবিহারীর অনুরোধ রক্ষা করেন, তিনি লালবিহারীকে বলেন, তুমি ইংরাজীতে লেখ, আমি এই চিত্রের বাঙ্গালা আরম্ভ করিব। ইহার এক বৎসর পরেই তারকনাথ স্বর্ণলতা রচনা আরম্ভ করেন। স্বর্গীয় আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বলিয়াছিলেন, এই পুরস্কার রচনার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রও অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনিও ইংরাজী ভাষায় এক উপন্যাস লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার রচনা পুরস্কৃত হয় নাই। এই রচনাই Rajmohan's wife নামে স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত Mookerjees' Magazineএ প্রকাশিত হয়।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাহিত্যক্ষেত্রে সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য লইয়া লেখক বা কবি বা সাহিত্যিকের মধ্যে যে, প্রেম মিলন বন্ধুত্ব হয়, তাহা চিরস্মরণীয় হয়। সকলদেশের সাহিত্যেই এরূপ বন্ধুত্বের প্রচুর পরিচয় বা নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন বন্ধুত্ব, পারস্য সাহিত্যে কবি-সম্রাটের শেখ সাদী ও কবি জলালউদ্দিন রুমির মিলন বন্ধুত্ব, ইংরাজী সাহিত্য ক্ষেত্রে কার্লাইল এবং ইমার্সন পরস্পরের নীরব মিলন ও আলাপ চিরস্মরণীয়। কার্লাইল ও কবি টেনিসন সম্বন্ধেও এরূপ গল্প শুনা যায় যে, একদিন সন্ধ্যাকালে উভয়ে নীরবে পরস্পরের সম্মুখে বসিয়া তাম্রকুটের ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে পরস্পরের চিন্তায় মগ্ন হইয়াছিলেন। বিদায়কালে কার্লাইল কবিকে বলিয়াছিলেন, আলফ্রেড! আবার কবে আসিবে? আজ আমরা এক অপূর্ব্ব সন্ধ্যা কাটাইলাম। আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যে দীনবন্ধু বঙ্কিম, তারকনাথ

ইন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব ও স্মরণীয়। দীনবন্ধু বঙ্কিমই যেরূপ "ক্ষণভিন্ন সুহৃদ", তারকনাথ ও ইন্দ্রনাথ তেমনি "প্রণয় গর্ব্বিত অভিন্ন হৃদয় সুহৃদ" ছিলেন। এইজন্যই তারকনাথ ও ইন্দ্রনাথ "একবৃন্তের দু'টী ফুল" ছিলেন।" চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কার্লাইল, টেনিসন যেরূপ নীরব প্রেম, নীরবতার পক্ষপাতী ছিলেন, ইন্দ্রনাথ তারকনাথও সেইরূপ নীরব প্রেম ও নীরবতার উপাসক ছিলেন। প্রেমের ভাষা নীরব, প্রেমের নীরব বাগ্মিতার নিকট অন্য বাগ্মিতা পরাস্ত। কার্লাইল বলিয়াছেন, " His silence more eloquent than words, ।" তারকনাথ ইন্দ্রনাথ কি কৈশোর কি যৌবন, কি প্রৌঢ়ে যখনি পরস্পর পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতেন, তখনি তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইয়া নীরবেই কাটাইতেন। অপরের সম্মুখে তাঁহারা মুখর হইতেন, রসের তুবুড়ি ফোয়ারা ছুটাইতেন। উভয় বন্ধু যেখানে একত্র হইতেন, বংশীধ্বনি মুগ্ধ গোপিকাগণের মত দর্শক ও শ্রোতা ধীরে ধীরে আসিয়া সমবেত হইত।

দীনবন্ধুর মৃত্যুতে বঙ্কিমচন্দ্র যেরূপ কাতর হন, ব্যক্তিগত বন্ধুভাবে আর কেহ সেরূপ কাতর হন নাই,—তারকনাথের অকাল মৃত্যুতে ইন্দ্রনাথও সেইরূপ কাতর হইয়া স্বর্গীয় ঠাকুর দাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, 'তারক আমার জীবনের সমস্ত খানি জুড়িয়া, আমরা বাল্যকাল হইতেই অভিন্ন হৃদয়, তার কথা বলিতে গেলে আমার কথা, আমার কথা বলিতে গেলে তার কথা বলিতে হয়। আমরা দূরে দূরে থাকিলেও আমাদের হৃদয় পরস্পরের অতি নিকটেই থাকিত। তারকের কথা বলিতে গেলে। আমার হৃদয় ব্যথিত হয়ে সে স্মৃতির দংশন জ্বালা আর সইতে পারি না। তোমার দেশস্থ লোক, তোমার বড় লেখক গিয়াছে, আমার কি গিয়াছে জান? আমার কলিজা জান গিয়াছে।" ইন্দ্রনাথ ও তারকনাথ পরস্পর পরস্পরের ব্যথার ব্যথী, একমন একপ্রাণ অভিন্ন হৃদয় উভয়ে উভয়ের প্রণয়ে গর্ব্বিত ছিলেন। পূজনীয় শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন এইজন্যই ভূদেববাবু, তারকনাথ ও ইন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে বলিতেন "একবৃন্তে দু'টী ফুল।" বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে দীনবন্ধু বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় তারকনাথ ও ইন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব অতুলনীয় ও চিরস্মরণীয়।

ইন্দ্রনাথ ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে, গঙ্গাটিকুরীর নিকটবর্ত্তী মাতুলালয় পাণ্ডুগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় আগমন করেন। এই সময় তারকনাথের সহিত ইন্দ্রনাথের মিলন হয়, এই মিলন বন্ধুত্ব—"একবৃন্তে দু'টী ফুলে" পরিণত হয়। কিশোর হইতেই উভয়েই রসিক!

উভয় সদা প্রফুল্ল রসের কথা ঠোটের আগায় সদা বিরাজিত। এইরূপ রস উভয় বন্ধুর জীবনে সমভাবে বিদ্যমান ছিল। কখনও বিষাদ-বারিদ উভয় বন্ধুর সদা প্রফুল্ল হৃদয়ে রেখাপাত করিতে পারে নাই। রসসম্ভোগে ইন্দ্রনাথ ও তারকনাথ উভয় বন্ধুই যশস্বী ছিলেন। শিশিরকুমার, বঙ্কিমচন্দ্রের পরই ইন্দ্রনাথ রস রচনায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইন্দ্রনাথের ভারত উদ্ধার কল্পতরু, ফুলীরাম, সারিণী, বঙ্গবাণী, জন্মভূমিতে প্রকাশিত পঞ্চানন্দ, সাপ্তাহিক সমাচারে পঞ্চানন্দ রসের খনি বিশেষ। যে পাঠক ভাঙ্গি ও ভারত উদ্ধার, কল্পতরু, ফুলীরাম, পঞ্চানন্দ পাঠ করেন নাই—রসের আস্বাদন করেন নাই,' তিনি যে কিরূপ দুর্ভাগ্য, তাহা বলাই বাহুল্য। পূজনীয় শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, ইন্দ্রনাথের রস-রচনা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ইংরাজীতে যাহাকে humour কহে, কাহা বিদ্রূপ ও শ্লেষের সমবায় অভিব্যক্ত ইন্দ্রনাথ বঙ্গ ভাষায় তাহারই সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইন্দ্রনাথের লেখায় একদিকে যেমন ইংরাজী wit ও Humour যেখান আছে, অন্যদিকে তেমনি ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, শ্লেষ, তর্ক, কৌতুক, উপহাসাদি যেন ছড়ান—বিছান আছে। ইন্দ্রনাথের ভারত উদ্ধার ব্যঙ্গ কাব্য বাঙ্গালা ভাষায় অপূর্ব্ব ও অতুলনীয় satire। ইন্দ্রনাথ হাস্য হাসাইতেন না, তাঁহার হাস্যের অন্তরালে মর্ম্মন্তুদ ব্যথা ক্রন্দন লুকান থাকিত, তাঁহার ফুলীরাম হাসি অশ্রুর আধার। যে পড়িতে জানে, সেই হাসির অন্তরালে ইন্দ্রনাথের ব্যথা, অশ্রুর উৎস দেখিতে পাইবে। তাঁহার ফুলীরাম হস্তিকায় শ্মশানের বিকট হাস্য ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। ফুলীরামকে পড়িতে জানে, তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইবে। অথচ উহার ব্যঙ্গ-শক্তি, এমনই অপূর্ব্ব, উহার ভাব ও ঘটনা-বিন্যাস-কৌশল এমনই অনন্যসাধারণ যে এক স্থান পড়িতে পড়িতে হাস্য সংবরণ করিতে পারা যায় না। ইন্দ্রনাথ তাঁহার "ঘরোয়া প্রিয় সুহৃদ" তারকনাথের মত হাসি অশ্রুর উৎস পাশাপাশি সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

ইন্দ্রনাথ তারকনাথের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। ইন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "১২৭৯ কি ১২৮০ সালে তৎকালীন দার্জ্জিলিঙ্গ ডিপোর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব ভ্যাক্সিনেশন আমার প্রিয় সুহৃদ স্বর্গীয় তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কার্য্য উপলক্ষে যখন দিনাজপুরে আসেন, তখন সাহিত্য সম্বন্ধে বহু আলাপ তাঁহার সঙ্গে হইত। স্বর্গীয় এ কবি

* সাহিত্য ১৩০৯।

উভয় সদা প্রফুল্ল রসের কথা ঠোঁটের আগায় সদা বিরাজিত। এইরূপ রস উভয় বন্ধুর জীবনে সমভাবে বিদ্যমান ছিল ও কখনও বিষাদ-কালিমা উভয় বন্ধুর সদা প্রফুল্ল হৃদয়ে রেখাপাত করিতে পারে নাই। সমসাময়িক ইন্দ্রনাথে তারকনাথ উভয় বন্ধুই যশস্বী ছিলেন। শিশিরকুমার, বঙ্কিমচন্দ্রের পরই উচ্চাঙ্গ রস রচনায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইন্দ্রনাথের ভারত উদ্ধার কল্পতরু, ঘুঁটেরাম, সাবিত্রী, বঙ্গবাণী, জন্মভূমিতে প্রকাশিত পঞ্চানন্দ, সাপ্তাহিক সাকারে পঞ্চানন্দ রসের খনি বিশেষ। যে পাঠক আজিও ভারত উদ্ধার, কল্পতরু, ঘুঁটেরাম, পঞ্চানন্দ পাঠ করেন নাই—রসের আস্বাদন করেন নাই,' তিনি যে নিতান্তই দুর্ভাগ্য, তাহা বলাই বাহুল্য। পূজনীয় শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, ইন্দ্রনাথের রস-রচনা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ইংরাজীতে যাহাকে humour আর wit বলে, যাহা বিদ্রূপ ও শ্লেষের সহায়ে অভিব্যক্ত ইন্দ্রনাথ বঙ্গ ভাষায় তাহারই সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইন্দ্রনাথের লেখায় একদিকে যেমন ইংরাজী wit ও Humour যেখান আছে, অন্যদিকে তেমনি ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, শ্লেষ, ঘৃণা, কৌতুক, উপহাসাদি যেন হুড়ান—বিছান আছে। ইন্দ্রনাথের তীব্র তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ কাব্য বাঙ্গালা ভাষার অপূর্ব্ব ও অতুলনীয় satire। ইন্দ্রনাথ কাঁদাইতেও জানেন, তাঁহার হাস্যের অন্তরালে মর্ম্মন্তুদ ব্যথা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার ঘুঁটেরাম হাসি পাইবার আধার। যে পড়িতে জানে, সেই হাসির অন্তরালে ইন্দ্রনাথের ব্যথা, অশ্রুর উৎস দেখিতে পাইবে। তাঁহার ঘুঁটেরাম হস্তিকায় শ্মশানের বিকট হাস্য মূর্ত্তিটা বাহির হইয়াছে। ঘুঁটেরামকে পড়িতে জানে, তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইবে। অথচ উহার ব্যঙ্গ-শক্তি, এমনই অপূর্ব্ব, উহার ভাব ও ঘটনা-বিন্যাস-কৌশল এমনই অনায়াস যে এক স্থান পড়িতে পড়িতে হাস্য সংবরণ করিতে পারা যায় না। ইন্দ্রনাথ তাঁহার "যশস্বী প্রিয় সুহৃদ" তারকনাথের মত হাসি অশ্রুর মিশ্রণে বাঙ্গালীকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

ইন্দ্রনাথ তারকনাথের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে কখনও সক্ষম হয়েন নাই। ইন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "১২৭৯ কি ১২৮০ সালে তৎকালীন পার্ক্লিয়া সিভিল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব ভ্যাক্সিনেশন আমার প্রিয় সুহৃদ স্বর্গীয় তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কার্য্য উপলক্ষে যখন নিলাজপুরে আসেন, তখন সাহিত্য সম্বন্ধে বহু আলাপ তাঁহার সঙ্গে হইত। অর্থলোভে এ কি

* সাহিত্য ১৩১১।

দুই অধ্যায় মাত্র তখন লেখা হইয়াছে এবং রাজসাহীর বাবু শ্রীকৃষ্ণদাসের জ্ঞানাঙ্কুর পত্রে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। তারকনাথ আমাকে আপন রচনা দেখাইলেন এবং জ্ঞানাঙ্কুরে লিখিতে অনুরোধ করিলেন। সেই অনুরোধ ও উত্তেজনার ফলে ১২৮০ সালের বৈশাখ মাসের শেষভাগে কি জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রারম্ভে 'কপালকুণ্ডলা' লিখি।"†

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী।

বন্দী।

সমুদ্র তরঙ্গের মত বিশাল জনসঙ্ঘ পুণ্য নগরে পেশোয়ারাজের বধ্যভূমি ঘিরিয়া রহিয়াছে, দিকে দিকে সশস্ত্র প্রহরী ফিরিতেছে, মধ্যস্থলে নীলচন্দ্রাতপ-তলে অমাত্য সভাসদ পরিবেষ্টিত মহারাষ্ট্রাধিপতি রঘুনাথরাও; সম্মুখে মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত শৃঙ্খলবন্দী বসন্তরাও নতমুখ, নতদৃষ্টি, অযুত দৃষ্টির তলে নির্ব্বাক দাঁড়াইয়া। দূরে প্রাসাদচত্বরে গবাক্ষদণ্ডের চিকের আড়ালে অন্তঃপুরচারিণীর বিলোলকটাক্ষের সোৎসুক দৃষ্টি বন্দীর মরণ-পাংশু-নিথর-নিশ্চল নয়নপল্লবে এবং গম্ভীর মুখমণ্ডলে নিবদ্ধ হইয়া আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছে।

চারিদিকে কোলাহল, অধিকারীরা জনসঙ্ঘ সংযত করিতে পারিতেছে না, সৈনিকের যষ্টিবন্ধে অসির ঝঞ্ঝনা উঠিতেছে, সন্দীনবদ্ধ গৈরিক নিশান বাতাসে দুলিতেছে, একজন হতভাগ্য বন্দীর অন্তিম যন্ত্রনার শোণিতাপ্লুত শোচনীয় পরিণাম দেখিবার জন্য বন্যাস্রোতের মত লোকস্রোত আসিয়া মিলিতেছে, কাহারো মুখে বেদনার হাহাকার, কেহবা বন্দীর অপরাধে তিরস্কার করিয়া কলরোলে রাজদণ্ডের বিভীষিকাকে ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিতেছে।

অকস্মাৎ ঝড়ের মত শুভ্র নিশান দুলিয়া জনসমুদ্র ভেদ করিয়া কে একজন রাজসিংহাসনের সম্মুখে গর্ব্বভরে আসিয়া দাঁড়াইল, মুহূর্ত্তমধ্যে অযুতকণ্ঠের মুখরমন্ত্র থামিয়া গেল, মহারাষ্ট্ররাজ সিংহাসন ছাড়িয়া সম্ভ্রমে শির নত করিলেন, এই বিপুল জনসঙ্ঘ তাঁহার অনুসরণ করিল।

---

† বঙ্গভাষার লেখক প্রথম ভাগ, শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

আগন্তুক দীর্ঘকায়, সুগৌরতনু, গৈরিকবসনে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত, চন্দনচর্চ্চিত প্রশস্ত ললাট, প্রদীপ্ত নেত্র, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হেলাভরে মহারাষ্ট্ররাজের পানে চাহিলেন।

শুব্ধ জনমণ্ডলী উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল, কেহ দেখিল, কেহ দেখিল না, একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অস্ফুট আভাষে ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়া গেল—"ন্যায়াধীশ রামশাস্ত্রী"।

রঘুনাথ রাও আনতশির সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন,—গুরুদেব, আজ এই অসময়ে এই মধ্যভূমিতে কেন?

শ্রাবণের মেঘনির্ঘোষের মত শাস্ত্রী উত্তর করিলেন,—রঘুনাথ রাও, এই পাপ হইতে আমি তোমায় নিবৃত্ত করিব।

বিশাল জনসমুদ্র কাঁপিয়া উঠিল—বন্দীর শৃঙ্খল বাজিয়া উঠিল—বাতাস অট্টরোলে ধ্বনিয়া তুলিল—"পাপ"! চকিত রঘুনাথ রাও নিম্নস্বরে ব্রাহ্মণের চরণতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন—প্রভু! বন্দী বসন্তরাও সৈনিকের পণ গ্রহণ করিয়া মহীশূরে হায়দর আলীর গর্ব্ব টুটাইতে আমার সহগামী হইতে অনিচ্ছুক, দুর্দ্ধর্ষ পাঠান অত্যাচারে দেশ জর্জ্জরিত করিয়া তুলিতেছে, আমি শান্তির শুভ্র পতাকার তলে পীড়িত নরনারীর অভয় শান্তনা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অভিযান করিতেছি।

মহারাষ্ট্রপতির কণ্ঠ কেহ শুনিল কেহ শুনিল না, ব্রাহ্মণের ললাট কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, বন্দীর পানে ঈষৎ ফিরিয়া চাহিলেন।

বন্দীর শীর্ণ দেহ নুইয়া পড়িল, চক্ষু সজল হইয়া উঠিল, আসন্ন জীবন শৃঙ্খল-পিষ্ট বেদনায় মর্ম্মন্তুদ একটী অস্ফুট হাহাকার বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া গেল।

ন্যায়াধীশ ক্রোধে কম্পিত বেতসের মত ক্রোধে কাঁপিয়া উঠিলেন, ভৈরব হুঙ্কারে সভাস্থল কাঁপাইয়া বলিলেন—দস্তি! জীবনের উপর রাজার প্রভাব কোথায়? দুর্ব্বল মানব যেই দিন আপনার ক্ষমতা ছাড়াইয়া ভগবানের বিধানে হস্ত দিবে সেই দিন আর জাতির অস্তিত্ব থাকিবে না। সোণার দেশ শ্মশান হইয়া যাইবে।

রঘুনাথ রাও সংযতস্বরে সিংহাসন এবং রাজদণ্ডের পানে চাহিয়া কণ্ঠে বিনয় করিয়া বলিলেন—প্রভো! আমার কোন দোষ নাই—বন্দী সমুচিত বিচারে এই দণ্ডাজ্ঞা পাইয়াছে।

ব্রাহ্মণ বিদ্রূপের হাসিতে সৃষ্ণাস্থল ভরিয়া উত্তর করিলেন—বিচারক! সকল

সময়ে আপনার বিচারকে, নির্দ্দোষ মনে করিও না, ইহা বন্দীর প্রতি তোমার সমুচিত বিচার হয় নাই; আমি তাহার আবার বিচার করিব।

বিশাল জনমণ্ডলী কি বুঝিল জানি না। "জয়গুরুদেও, হর হর মহাদেও" বলিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল।

শাস্ত্রী বন্দীর পানে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, তাহাকে কাছে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন, কম্পিত কলেবর বসন্ত ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল, হাতের শৃঙ্খলে ঝঙ্কার উঠিল, ব্রাহ্মণ তাহা মোচন করিয়া দিলেন।

জনক ন্যায়াধীশ আদেশ করিলেন বসন্ত রাও! আমি তোমার সমুচিত বিচার করিব, অকপটে আমার কাছে সকল অপরাধ স্বীকার কর।

বন্দী বসন্ত রাও গ্রীবা হেলাইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল, এই সুগৌর তেজঃপুঞ্জ কলেবর মহাদেবের মত অভয় বরদ হস্ত বাড়াইয়া তাহাকে যেন ঘোর মৃত্যুর সন্ধি স্থানে কোলে তুলিয়া লইতে আসিয়াছে, শুষ্ক চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল, এই করুণার পরশ লাগিয়া হৃদয় আকুলি বিকুলি করিল—প্রভু, জয় হোক তোমার! বসন্ত বার বার শির অবনত করিল। একবার গ্রীবা নত করিয়া বিশাল জনসঙ্ঘের পানে চাহিল—যেন জন্মসোধ সকলের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা মাগিয়া লইয়া। জনকোলাহল থামিয়া গেল। নিবাত অম্বরের মত নিস্তব্ধ শির তুলিয়া বিশালজনমণ্ডলী বন্দীর পানে নির্নিমেষ চাহিয়া রহিল।

বসন্ত একবার আকাশের পানে চাহিয়া, কি দেখিল জানি না, নীলাম্বরে জ্যোতিষ্পেল বিকীর্ণ করিয়া কাহার মানসী মূর্ত্তি যেন ভাসিয়া উঠিল, অভয় বরদ-হস্ত, মুখে আশীর্ব্বাদের বাণী, দৃষ্টি ভরিয়া শান্তনার অমৃত ধারা ক্ষরিয়া পড়িতেছে, বুকে বল পাইল—করযোড়ে বলিয়া উঠিল—গুরুদেব! আমি সৈনিক, মহারাষ্ট্র রাজার সৈনিক নিশানের ছায়ায় আমি একজন হীন সৈনিক। আজ দ্বাদশ বৎসর ব্যাপীয়া এই কাজে নিয়োজিত থাকিয়া ধর্ম্ম সাক্ষী আমি ইহার ধর্ম্ম এবং গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছি। সেই প্রথম দিন যখন আমি তোরণে মুসলমানি আমিরশির পেশোয়ার সিংহাসনতলে কর্ম্মপ্রার্থী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম তখন অপত্য মায়ামুগ্ধা জননী বাহুপাশে টানিয়া বুকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, স্নেহে প্রতিমেধে শান্ত ক্ষুব্ধ কর্ম্ম হইতে বিরত হইতে নিষেধ করিয়াছিল, কিন্তু যখন পাঠানের অত্যাচারে হিন্দুস্থান প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম নষ্ট প্রায় দেখিলাম তখন আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, হৃদয়ে প্রতিশোধের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। আমার এই দুর্ব্বল

বাহু হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠাকল্পে পেশোয়ার গৈরিক নিশান উড়াইবার সময় তরুণে ঝাঁপ দিবার সাধ হইল, তার পর প্রতি অভিযান—আক্রমণ, বিপক্ষের শোণিত-স্রোত নির্ম্মম পেষণে অগ্রগামী ছিলাম, স্বয়ং মহারাজ তাহা লক্ষ্য করিয়া দুইবার আমাকে পুরস্কৃত করিয়াছেন।

তার পর গুরুদেব! এই জীবনের পরপারে বৈতরণী তীরে দাঁড়াইয়া কিছু গোপন করিব না, রণক্ষেত্রে শিবিরে শিবিরে ঘুরিয়া তরুণ যৌবনের সকল সুখ-সম্ভোগস্পৃহা ভুলিয়া—গিয়াছিলাম। একদিন সংবাদ পাইলাম আমার পরিণীতা সাধ্বী স্ত্রী অন্তিম শয্যায় জন্মশোধ একবার দর্শন প্রার্থনা করিয়াছে, আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, ভীষণ দুর্যোগে ঝড় বৃষ্টি মাথায় করিয়া রণক্ষেত্র হইতে গোপনে ধাইয়া আসিলাম, হায়—ভগবন! কি দেখিলাম? আমার আলো আকাশের একমাত্র ধ্রুবতারা বসন্ত মালঞ্চের শ্যামা মাধবী বন্দীর উৎপীড়নে নিদাঘ দাহনের মত মলিনা জীর্ণ শয্যা আঁকড়িয়া রহিয়াছে, মল্লিকা ফুলের মত সংহত সৌরভ এবং অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য লইয়া সে আমার শৈশবের খেলা ঘরের বধূটীর মত আসিয়া দেখা দিয়াছিল। তার পর জানি নাই; এখন বয়সের সঙ্গে শিহরণে তার জীবনের দলগুলি ক্রমে বিকশিত হইয়াছিল, সে অভুল রূপ সুষমায় ভরপুর অকলঙ্ক দেবী প্রতিমাটির মত আমার ফুড়েখানি উজ্জ্বল করিয়া জাগিয়াছিল। আমার এই তরা যৌবনের উন্মাদ ভালবাসা রক্তের আগুনে শত্রুর বুকের রক্তপান করিতে ছুটিয়াছিল, আমার এই গোপন অন্তঃপুর প্রেয়সীর পিয়াসি অধরের চুম্বনে ধন্য হইবার সুযোগ তাহার কম জুটিয়াছে।

তারপর? তারপর কি বলিতে যাইয়া কি বলিতেছি, প্রভু মার্জ্জনা করিও; সেই মুমূর্ষুর শয্যা প্রান্তে বসিয়া রোগতপ্ত হাতখানি হাতে তুলিয়া লইলাম। রোগ মসিঢালা জীর্ণ ভগ্নখানি বুকে জড়াইয়া ধরিবার জন্য প্রাণের ভিতর ছট্ ফট্ করিতে লাগিল, ভয় হইল পাছে মল্লিকার জীর্ণদল আমার ভারে সহসা ঝড়িয়া পড়িবে, নির্নিমেষ দৃষ্টে রোগ-মসীঢালা সুন্দর মুখখানির পানে চাহিয়া রহিলাম।

সে আমার পায়ে ধরিয়া বলিল,—"প্রভু! ইহ পরকালের দেবতা, সবংশে শোণিত পাতে ধর্ম্ম নাই। বিধাতার সৃষ্টি খর্ব্ব করিয়া পাপের বোঝা বাড়াইও না, হিন্দু মুসলমান তাঁর এক হাতে গড়া। তোমাদের ভেদ দৃষ্টি পড়িলে হিন্দু স্থানে আর শান্তি নাই' সোণার দেশ পুড়িয়া ছাই হইবে। শ্মশানের বুকে বসিয়া পিশাচের দল অট্টহাসে নাচিবে।"

আমার দিব্য দৃষ্টি জাগিয়া উঠিল, দেখিলাম কি এক গরিয়সী দেবী প্রতিমা

তাহার ললাটে ম্লান দৃষ্টিতে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে, কিছু বলিতে সাহস পাইলাম না।

সে আবার তৈলহীন নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের মত নিষ্প্রভ হইয়া আসিল, অতি কষ্টে স্বর নির্গত হইল। দুই হাতে সবলে চরণ জড়াইয়া ধরিল, বলিল—"দেবতা! শেষ প্রার্থনা—তুমি আর নর শোণিতে হস্ত কলুষিত করিও না, তোমার হাতে আমার শেষ স্মৃতি চিহ্ন তুলিয়া দিতেছি—শয্যা পার্শ্বে ইঙ্গিত করিয়া একখানি ঘোমটা দেখাইল। দেখিলাম—একটী শিশুবালিকা মুখের ভিতর অঙ্গুলি পুরিয়া দিয়া অব্যক্ত ধ্বনি করিতেছে।

তারপর—আমার পানে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া কোন অজ্ঞাত দেশের গোপন যাত্রী হইল, বন্দীর দুই চোখে দর বিগলিত ধারায় অশ্রু ঝরিল, সমবেত জনমণ্ডলীর চোখে আর্দ্র হইল। চিকের আড়ালে দীর্ঘশ্বাস জাগিয়া চন্দ্রাতপ কাঁপাইয়া তুলিল।

বসন্ত রাও কতক্ষণ স্থির থাকিয়া বল সংগ্রহ করিয়া আবার বলিতে লাগিল। সেইদিন সংসারে সুখ-আশা টুটিয়া গেল, হৃদয়ের গতি ভিন্ন পথে বহিল, শারীরিক দুর্ব্বলতা জানাইয়া ছুটী লইয়া আমার সংসারের শেষ সম্বলটিকে মানুষ করিতে লাগিলাম। সমরক্ষেত্রে অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা শুনিলে বুক কাঁপিত, আক্রমণ করিতে সাহস পাইতাম না, কেবল আত্মরক্ষা করিয়া চলিতাম, বর্ম্ম বর্ম্মে ঠেকাইয়া আঘাত ব্যর্থ করিতাম, এইরূপে কত সময় ক্ষত বিক্ষত হইয়া শিবিরে ফিরিতাম, প্রতিহিংসুকের দলে মিশিয়া আমার সান্ত্বনা কোথায়? গোপনে নিশায় দিশাহীন ঘুরিয়া বেড়াইতাম, সমরক্ষেত্রে পশিয়া শোণিতাপ্লুত ছিন্ন বিচ্ছিন্নকায় মুমূর্ষু সৈনিকের সেবা করিতাম, মরণোন্মুখ তৃষিতকণ্ঠে বারিবিন্দু ঢালিতাম, ব্যথিতের আর্ত্তনাদে হাহাকারে কাঁদিয়া উঠিতাম, শত্রু মিত্র ভেদ থাকিত না। আহতকে বুকে বাঁধিয়া নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইতাম।

কে আমাকে ইহা শিখাইয়াছিল? আমার সৈনিক ধর্ম্মে যে এমন নিয়ম নাই। সেবাপরায়ণা নারীর মত এমন দুর্ব্বল হৃদয় লইয়া কি করিয়া অসি ধরিব?

যে আমার বুকের ভিতর থাকিয়া অহর্নিশ বলিত "বসন্ত! পালাও, দূরে চাহিয়া দেখ তোমার জন্য শান্তিকুঞ্জ রচিত রহিয়াছে, তাহার শীর্ষে সাম্যবাদের শুভ্র নিশান দুলিতেছে।"

করযোড়ে বিদায় মাগিলাম—মহারাজের অনুমতি পাইলাম না, মাতৃহীনা

শিশু কন্যার লালনের কথা বলিলাম, তবু বলা হইল না। তখন আর কি করিব? বিদ্রোহী সাম্রিয়া দলের হৃদয় বিচলিত করিয়া তুলিতে কুণ্ঠা হইত,—আমার সংসার-সম্বলটিকে, সাধ্বী পত্নীর শেষ স্মৃতিচিহ্নটিকে, আর যে সাধের কাহাকে তবুও দেখিতে পাইব—এই ভাবিয়া নেপথ্যের অন্তরাল হইতে আমাকে টানিয়া বাহির করিয়া আনিলাম। বিদায়ের সময় মাতৃ পিতৃ হারা শিশু কন্যাটিকে বুকে করিয়া সকল জ্বালা ভুলিলাম। সে যেন স্বর্গের সুধাময় বুকের মাঝে দেখিতাম অতুলন স্বর্গ, আমার ফুটিবদায়ে মলিন হইবে।

প্রভো! গুরুদেব! এ সুখ সাধ ভাঙ্গিতে পারি নাই, সময় ও স্থানে আপনাকে পড়িয়া পাছে আত্মরক্ষা করিতে না পারি-তাই মহারাষ্ট্রের রাজধানে বিষা প্রকাশ করিয়াছি। আমার হৃদয়ে স্বাধীনতা কোথায়? অসত্য মায়ার যে যে বাঁধন আমাকে অহরহ পিছন দিকে টানিতেছে আমার বিহনে সে সুখ শুকাইয়া অঙ্কুরে শুকাইয়া যাইবে!

বলিতে বলিতে বসন্ত উন্মাদের মত অধীর হইয়া উঠিল, স্নেহের উৎস যেন বুকের ভিতর সে টন করিতে লাগিল, গুরুর পানে চাহিয়া আবার সে মুখের ভিতর কাহাকে খুঁজিতে লাগিল, বোধ হয় মিলিল না, দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া এক ছুট নেত্রে ভূমির পানে চাহিয়া রহিল।

শাস্ত্রী দুই হাত তুলিয়া বলিলেন—বসন্ত যাও। তুমি নির্দোষ, আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম। বিশাল জনমণ্ডলী হর্ষে জয়ধ্বনি করিল।

মহারাষ্ট্র রাজের দুই চক্ষে অগ্নি জ্বলিল, ক্রোধে অধর কম্পিত হইল, তিনি নির্দোষে বলিয়া উঠিলেন—ব্রাহ্মণ! রাজবিধানে তোমার ক্ষমা বিধান পাইবে না, নরহীর দণ্ড অবশ্যম্ভাবী।

জনতরঙ্গ নীরব, ম্লান চোখে চাহিয়া রহিল, ব্রাহ্মণের মুখ প্রসন্ন হইল, সতেজ চোখের ভিতর দিয়া মলিন কুণ্ঠিত অথচ আশাময় প্রাণের একটি দৃষ্টি জাগাইয়া তুলিল, কাকিনে দেখিল—এই মহারাষ্ট্র-রাজ্যের ভাগ্য-বিধাতার ভ্রূ কুঞ্চিত দণ্ডমুণ্ডে বহিয়া দীনের মত নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া আছে!

ব্রাহ্মণ শান্ত স্থির কণ্ঠে করুণা ভরিয়া বলিলেন—নৃপতি! মৃত্যু যন্ত্রণা তুমি জান না। যে যন্ত্রণা সমাধিভঙ্গে দণ্ডধারীর বক্ষে আসিয়া বাজে সে তাহা নিস্পাপ নয়। বসন্তের প্রাণদণ্ডাধিক যাতনা সে পাইয়াছে, এখন মৃত্যু তাহার পক্ষে অসীম করুণা নহে।

রঘুনাথ নীরব, চোখে মুখে দৃঢ়তার তেজ বিকীর্ণ হইতেছে। শাস্ত্রী ধীর

মূর্ত্তি দেখিয়া বুঝিলেন বার্ত্তিকা রাজবিধানে লিখিত নাই। বসন্ত করুণা পিপাসু নেত্রে একবার সমবেত জনমণ্ডলীর পানে চাহিল, দেখিল তাহার বেদনায় সকলকে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে। সকল দৃষ্টির মধ্য দিয়া সহানুভূতির স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ ফুটিয়া আসিতেছে। বসন্ত আশ্বাস পাইল, আজ তাহার বেদনায় সকলকে ব্যথিত করিতে পারিয়াছে।

একবার সূর্য্যের পানে চাহিল, সূর্য্যের তীব্র দ্যুতি করুণায় বঙ্কিম, অনন্ত নীলাম্বরে ইন্দ্র ধনু-বর্ণে রঞ্জিতা কোন অপরীরি মিলন বাঞ্ছিতা বুকে লইবার জন্য দুই হাত বাড়াইয়া যেন আকুলে আহ্বান করিতেছে।

আলো! সেই কুণ্ঠাবিহীন সাম্য জ্যোতির্ম্ময়ের মিলন কতই সুন্দর! বসন্তের বড় সাধ হইল সেখানে যায়!

অকস্মাৎ দূরে কোলাহল উঠিল, প্রহরী, শাস্ত্রী, রক্ষী, সেনা পারিষদ ও বিশাল জনমণ্ডলী বিচলিত হইয়া উঠিল, দেখা গেল এই জনতরঙ্গ ভেদ করিয়া উন্মাদিনীর মত বিদ্যুৎবরণা কে ছুটিয়া আসিতেছে, তার গোলাপী আঁচল ধূলায় ধূসর, চূর্ণকুন্তল বাতাসে দোদুল্যমান, রাঙা ঠোঁট দুখানি ক্ষীত, ডাগর চোখ দুটী অশ্রু ছল ছল, কাহারো পানে দৃক্‌পাত না করিয়া এই উন্মাদিনী কামিনীমূর্ত্তি সমস্তের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। নাগপাশ বাঁধনের মত মৃণাল বাহুতে তাহার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া ধরিল।

এবং পর মুহূর্ত্তে বীণা ঝঙ্কারের মত সভাতল চমকাইয়া বলিল- "বাবা! বাবা তোমায় কেটে ফেলবে চল আমরা পালিয়ে যাই।"

এই উন্মাদিনীর স্পর্শে বসন্তের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিল, তার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। সে এই অপরূপ বাহুর বেষ্টনের মধ্যে দাঁড়াইয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিল।

এতক্ষণ মৃত্যুর জন্য সে অটলভাবে প্রতীক্ষা করিতেছিল, কিন্তু আর তার সাহস হইল না, সেই দৃঢ়তা টুটিয়া গেল, আবার বাঁচিতে সাধ হইল, এই সপ্তদশ বর্ষীয়া অধীরা বালার অমিয় মুখখানি দেখিয়া আবার নবলোকে ফিরিবার সাধ হইল, মনে হইল এই বিশ্ব রচনা কতই সুন্দর, নদ, নদী মালিনী, শস্যশালিনী ফলে ফুলে সুশোভিতা এই শ্যামাধরণী কতই সুন্দর! চারিদিকে কত হাসি কোলাহল, জীবনের সঙ্গে জীবনের কি মধুর মিলন! কেমন সোণার আলোক তরঙ্গ নাচিয়া নাচিয়া সীমা হইতে অসীমের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে।

হায় সকলি তাহার শেষ, সকলি তাহার স্বপ্ন! আজ চিত্তে বিশ্ব ব্যাপারের

বলিতে বলিতে অধীর বসন্ত অবলম্বনহীন কর্ত্তিত মূল দ্রুমের মত ধরাতলে পড়িয়া গেল। উন্মাদিনী বীণা "বাবা গো" বলিয়া বসন্তের বক্ষ আশ্রয় করিয়া মূর্চ্ছিতা হইল। স্বর্ণ প্রতিমা ধূলি ধূসরিতা হইল।

এই বিপুল জনতরঙ্গ চঞ্চল চক্ষু সজল, হৃদয় বেদনায় করুণ, চিকের আড়ালে রমণীর অশ্রু ঝরিল, দীর্ঘশ্বাসে চন্দ্রাতপ কাঁপিল,

শাস্ত্রী নৃপতির পানে ফিরিয়া আদেশ করিলেন—রঘুনাথ! বন্দী মুক্ত। দোষ থাকে যদি ক্ষমা কর, আমার কথা রাখ এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হও, নৃপতি কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া অবিচল কণ্ঠে উত্তর করিলেন—"রাজদণ্ড অমার্জ্জনীয়।"

ব্রাহ্মণ ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন,—তাঁহার চক্ষু প্রদীপ্ত হইল, মুখমণ্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ করিল। রঘুনাথের পানে এক মর্ম্মভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ব্রাহ্মণের দেহ নির্ঘোষের মত সভাতল কাঁপাইয়া বলিয়া উঠিলেন—দস্যু! এত টুকু মার্জ্জনা ও কি তোমার হৃদয়ে নাই? পিশাচের মত শোণিত পানে উন্মত্ত, তুমি যে নারায়ণ রাওয়ের বক্ষে হস্ত কলুষিত করিয়া রাজদণ্ড বহন করিতেছ তাহার কি শাস্তি গ্রহণ করিয়াছ? নির্দ্দোষ অসহায় ভ্রাতুষ্পুত্রের বুকে অসি হানিয়া কি করিয়া বিচার বিতরণ করিতেছ? আগে তাহার দণ্ড গ্রহণ কর তারপর অন্যের দণ্ডবিধানে আসিও। মনে রাখিও তোমার উপরও একজন বিচারক আছে তাঁহার হাতে কিছুতে নিষ্কৃতি নাই।

অগণ্য জনমণ্ডলী চমকিয়া উঠিল, নীরব ধিক্কারে পেশোয়া-রাজাকে মাটি করিয়া দিল।

বসন্তের চেতনা ফিরিয়া আসিল, সে ধূলি বিলুণ্ঠিতা হৈমপ্রতিমাকে বুকে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, সে সুন্দর অমিয় মুখের মোহিনী ছবি দেখিল, একবার চারিদিকে চাহিল, বিশাল জগত সূর্য্যালোকে হাসিতেছে স্নেহবাহুর অনন্ত টান তাহাকে টানিতেছে। মাথার উপর অসীম শূন্য দুর্জ্ঞেয় রহস্যের মত গম্ভীর, তাহার বাঁচিবার সাধ হইল, সে এই অনন্ত মায়া কিছুতেই কাটাইতে পারে না।

তারপর করুণাপিপাসুনেত্রে অনিমিষ গুরুর পানে চাহিয়া রহিল।

রঘুনাথ সরোষে বলিলেন—ব্রাহ্মণ! সংযত হও। এখানে তোমার ন্যায় বিধান খাটিবে না। আমার ন্যায় অন্যায় বিচারে তোমার অধিকার নাই।

শাস্ত্রী নৃপতির মুখের পানে তর্জ্জনী হেলাইয়া বলিলেন—রঘুনাথ! আমি তোমাকে এই পাপ হইতে রক্ষা করিব। বন্দীকে আমি মুক্তি দিব। মনে

বশিষ্ঠ রাজবিধান ব্রাহ্মণের ন্যায় বিধানের পদতলে। যে দিন ইহার অন্যথা হইবে সেইদিন এই গরিমাময় হিন্দুস্থান আঁধার হইবে।

বলিতে বলিতে বীণাকে বুকে বাধিয়া বসন্তের হাত ধরিয়া এই বিদ্যুৎ রেখা ভেদ করিয়া নক্ষত্রের মত ছুটিয়া চলিল।

উন্মত্তের মত রঘুনাথ চীৎকার করিয়া উঠিলেন—ব্রাহ্মণ! কে তাহার উত্তর করিবে? চতুর্দ্দিকে কোলাহল, অশ্বারোহীর অশ্ব নাচিল, অসি চমকিল বৈরিনিশান বাতাসে দুলিল, কেহ রুদ্রকোপ ব্রাহ্মণের গতিরোধ করিতে সাহস পাইল না।

পেশোয়াবাজ কাষ্ঠপুত্তলিকার মত স্থির, স্বপ্নপিষ্টের মত জ্ঞানহারা হইয়া একদিকে চাহিয়া রহিল।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন।

সন্ধান।

গৃহ, বন, মরুভূমি, পৃথিবী খুঁজিনা।
না পাই সন্ধান যবে ক্লান্ত প্রাণ নিয়া॥
ব'সেছি বিরাম লাগি অনন্তের পথে।
হৃদয়-দুয়ার খুলি অঞ্জলি সঙ্কেতে॥
কে যেন বিশ্বের পথে দিল দেখাইয়া।
তুমি বিশ্ব তুমি সর্ব্ব হৃদয় ভরিয়া॥

শ্রীবরদাচরণ চক্রবর্ত্তী।

বাঙ্গালা-সাহিত্যে দেশাত্মবোধ।

(প্রথম প্রস্তাব)

মহামহোপাধ্যায়—শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন—বাঙ্গালী একটী অতি বিস্মৃত জাতি। বাঙ্গালী নিজ গৌরব গাথার সন্ধানে উদাসীন। তাহার বাহুবলের ইতিহাস ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন। জাতীয় শৌর্য্য কাহিনী অপরিজ্ঞাত থাকিলে জাতি কখনও জাগ্রত সচেতন—হইতে পারে না। প্রত্যেক-দেশে জাতীয় সামরিক ইতিহাস বিশেষ আদরণীয়। এমন একদিন আসিবে যখন বাঙ্গালী অতীতের বর্ত্তিকাহস্তে ভবিষ্যতের অন্ধকার ভেদ করিয়া বিশ্বের পুণ্য সভায় নিজের স্থান অধিকার করিয়া লইবে। যাহারা জন্মাবধি শুনিতেছে "তোমরা ভীরু" তাহারা প্রকৃত ভীরু না হইলেও ভীরু হইয়া যায়। পরমহংসদেব বলিতেন শুধু "আমি পাপী, আমি পাপী" বলিতে থাকিলে তুমি পাপী হইয়া যাইবে। এই জন্য তোমাকে বীরের ন্যায় সাহসের সহিত বলিতে হইবে অমৃতের পুত্র আমি, আমার কিসের ভয়? ধর্ম্মজীবনে যদ্রূপ জাতীয় জীবনেও তদ্রূপ। সাহসীনের ধর্ম্ম হয় না—কাপুরুষের দেশভক্তি হয় না। যে বাঙ্গালী জাতির শৌর্য্য বীর্য্য ইতিহাস প্রসিদ্ধ—যাহারা খ্রীষ্টজন্মের পূর্ব্বে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন—যাহাদের সন্তান "তিব্বত, চীন, জাপানে মহিমা উপনিবেশ" বলিয়া আধুনিক কবি দর্পভরে উচ্চকণ্ঠে গাহিয়াছেন—তাহাদের জাতীয় সাহিত্য দেশভক্তির অনুপ্রাণনা দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল—যাহাদের হৃদয়ও জন্মভূমির পূজায় নিত্য-চন্দন-সম্পৃক্ত ভাষা-পুষ্পে সুশোভিত ছিল। সিংহ মিত্র, তারানাথ, ধর্ম্মপাল, মঞ্জুশ্রী, বোধিসেন প্রভৃতি বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকগণ এই বঙ্গ জননীর ক্রোড়ে পালিত হইয়াছিলেন। ইহা কবির কল্পনা নহে বিকৃত মস্তিষ্কের দিবাস্বপ্ন নহে—ঠাকুরমার ঝুলির অলীক কাহিনীও নহে।

২৬১পূঃখ্রীঃ সম্রাট্ অশোক কলিঙ্গ জয় করিয়া মেদিনীপুরকে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি কলিঙ্গ বিজয়ের চিহ্নস্বরূপ তাম্রলিপ্ত নগরে একটী ৫০০ ফিট্ উচ্চ স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। একসময় চেনিস সাম্রাজ্য তাম্রলিপ্তের পাদদেশ ধৌত করিত। সাহসী দুর্গা ও অট্টালিকা প্রভৃতির কথা মহাভা-

রত পুরাণ প্রসিদ্ধ তাহা এখন লোকলোচনের অন্তরালে প্রবেশ করিয়াছে। যে ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগরী এখন মনুষ্যবাস অপেক্ষা শ্বাপদের আবাস হইয়াছে। কেবলমাত্র জগন্নাথ অনন্তশয়ন নারায়ণ ভটে মাতাবর্গভীমার মন্দির সমুদ্র বিধৌত ভগ্নস্তূপের শ্মশানের উপর দণ্ডায়মান থাকিয়া বৌদ্ধ স্থাপত্যের সাক্ষ্যদান করিতেছে।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত সমতট, তাম্রলিপ্ত ও হরিকেল এই তিনটি বাঙ্গালীর বাণিজ্য কেন্দ্র হইতে দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ বাঙ্গালীর অর্ণবপোত দেশ বিদেশে গমনাগমন করিত। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতনের পর তাম্রলিপ্ত এবং "গৌড়ভুজঙ্গ" শশাঙ্ক কর্ত্তৃক বিজিত হয়। সেই প্রবল পরাক্রান্ত গৌড়েশ্বরের পতাকামূলে অসংখ্য বাঙ্গালী সমবেত হইয়া এই চিরনিন্দিত মহারাষ্ট্রিয় জাতিকে প্রশাসিত করিয়াছিল। শশাঙ্কের মানবলীলা সম্বরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সাম্রাজ্য অবসীলাক্রমে হর্ষবর্দ্ধনের পদানত হইল। সাহিত্য, শাসনলীতি ও জনহিতকর বহুবিধ প্রতিষ্ঠানে হর্ষবর্দ্ধনের যুগ বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ। কালের খরস্রোতে তাঁহার সাম্রাজ্য কোথায় ভাসিয়া গেল। উত্তর ভারত বহু স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িল। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বঙ্গে আর কেহ গৌড় প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই। অরাজকতা ও অত্যাচারে প্রজাকুল আহি হইতে লাগিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামিগণ স্বস্ব স্বার্থ লইয়া ব্যাপৃত হইলেন। বঙ্গের এই ঘোর দুর্দ্দিনে—এইঘোর অরাজকতার যুগে, অত্যাচার বিপর্দ্দিত গৌড়বাসী গোপাল দেবকে নির্ব্বাচিত করিয়া বঙ্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলে "সেই রাজ্য অপোহিত" হইয়াছিল। এই অষ্টম শতাব্দী এক মহাসিদ্ধিক্ষণের যুগ। এই যুগে এক অভিনব সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। মিথিলা হইতে কাঞ্চীর নিশান উড্ডীন হইল। উপযুক্ত নায়কের অভাবে বঙ্গদেশ চিরদিন অধিকৃত হইয়াছে। যে বিপুল বাহিনীর সাহায্যে গোপালদেব মাৎস্য-ন্যায় দূর করিয়া গৌড়ে শান্তি স্থাপন করিলেন তাহা বাঙ্গালীদ্বারা গঠিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। বাঙ্গালী চরিত্রে শূরত্ব ও সাহসের অভাব কখনও হয় নাই—অভাব হইয়াছে কেবল চরিত্রবান বীর্য্যসম্পন্ন ও স্বার্থত্যাগী নায়কের। সপ্তম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত গৌড় সাম্রাজ্য ভারতের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত-স্বরূপ। কিন্তু দেবপালের মৃত্যুর পর নবম শতাব্দীতে গৌড় সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছিল। যে সাম্যের—যে সমন্বয়—যে ঐক্য এই সাম্রাজ্য গঠনে সহায়তা করিয়াছিল তাহা জাতিভেদের [illegible] ভাষায়, "জাতি-প্রতিষ্ঠারূপ" তাহে উদ্ভূত [illegible]

পরাক্রান্ত ভূপতি রাজেন্দ্র চোলদেব এই সাম্রাজ্য ধ্বংস করিতে সমর্থ হইতেন না। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সেনরাজবংশ গৌড়ে প্রাধান্য লাভ করিতে লাগিল। পুনরায় মিথিলা, মগধ, উৎকল, কলিঙ্গ এক পতাকার নিম্নে সমবেত হইল। এই বংশেরই "বিক্রম নরীকৃত কামরূপ গৌড়েশ্বর" লক্ষ্মণসেন স্বাধীন হইলেন এবং দেশত্রয়ের চিহ্নস্বরূপ বিজয় স্তম্ভ স্থাপিত হইয়া বাঙ্গালীর বিক্রম কাহিনী বিঘোষিত করিতে লাগিল। এতদিন পর্য্যন্ত ইতিহাস যাঁহার সম্বন্ধে মিথ্যা-কাহিনী রটাইয়া কলঙ্কপঙ্কিলে বাঙ্গালীর সমস্ত যশঃ ডুবাইয়া দিয়াছে সেই লক্ষ্মণসেনকেই বঙ্গের বিক্রমাদিত্য উপাধি-ভূষণে অলঙ্কৃত করিতে পারা যায়। দ্বাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাস আত্মকলহপূর্ণ। সেই সময় আর এক নূতন জাতি অমিত বিক্রমে সমস্তদেশ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল—বাঙ্গালার গৌরব-রবি চিরঅস্তমিত হইলেন—এক ঘোর অন্ধকারে সকল দিক পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল—গগণ-স্পর্শী রণনিনাদে গর্ব্বস্থান পরিপূরিত হইয়া উঠিল। মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ বিজিত হইল। জাপানের সভ্যতার ইতিহাসে অন্তর্যুদ্ধে অন্তর্বিপ্লব ও কলহ যে জাতীয় শক্তিকে কেন্দ্রচ্যুত করিয়া দুর্ব্বল করিয়া তুলিয়াছিল তাহা বৈদেশিকগণের আগমন ও কামান-গোলা প্রভৃতির আমদানী দ্বারা দুরীভূত হইল; জাতি অবসাদ হিম হইতে উত্থিত হইল—ঘোর তমোনিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ হইল—কি যেন দৈবীশক্তি প্রভাবে তাহার জাতীয়ভাব ভাব উদ্দীপ্ত হইল—সকলে আত্মপর ভুলিয়া সেই জাতীয় জাগরণের রক্তিম-আভা-উদ্ভাসিত নূতন প্রভাতে যোগদিয়া তুলিয়া নব-আশা-প্রফুল্লিত সহাস্য আননে পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় উদ্যমহীনতা বালসূর্য্যের কিরণে রজনীর অন্ধকারের ন্যায় অপসারিত হইল। রণ-কেশরী নেপোলিয়ন জর্ম্মাণদেশ আক্রমণ করিলে জর্ম্মাণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাদেশিক রাজন্যবর্গ একত্রিত হইয়া জাতীয়তার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল।

যখন বাঙ্গালা ভাষা আকার গ্রহণ করে নাই—যখন তাহা প্রাকৃত ও পালি সংমিশ্রণে এক নূতন কলেবর ধারণ করিবার উপক্রম করিতেছিল—তখন সহজ, বোধ সংস্কৃতে তন্ত্রগ্রন্থাবলী রচিত হইয়াছিল, তাহার আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে বাঙ্গালীর মধ্যে পুরুষকার একেবারে লোপ পায় নাই। তন্ত্রগ্রন্থ সমূহ আলোচনা করিলে এবং তান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্ত্তি ও আরাধনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে জাতীয়তার ভাব পরিলক্ষিত হয়। মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে বাঙ্গালী নিতান্ত ভীরু ছিল না। তন্ত্রসাহিত্য তাহার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করে।

তান্ত্রিক উপাসনা ও আরাধনা বাঙ্গালীর নিজস্ব বস্তু। বাঙ্গালী-বীরত্ব-কাহিনীর জ্ঞান-পিপাসু ব্যক্তি তন্ত্রের মধ্যে উপাদান সংগ্রহ করিতে চেষ্টিত হইলে তাঁহার অনুসন্ধিৎসা কথঞ্চিৎ তৃপ্ত হইতে পারে। তন্ত্রশাস্ত্রের সম্পূর্ণ আলোচনা হইলে বাঙ্গালীর বীরত্বের ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় লোকলোচনের সম্মুখে উন্মুক্ত হইবে। সমাজ মঙ্গলকামী ও স্বদেশসেবী ব্যক্তিগণ প্রথমতঃ এই তন্ত্রশাস্ত্রের গহনকাননে প্রবেশ লাভ করিয়া ইতিহাস গঠনোপযোগী মালমসলা সংগ্রহ করিলে দেশের বাস্তবিক উপকার হইবে। তান্ত্রিক যুগের পূজা ও দেবদেবীর মূর্ত্তির সহিত সমসাময়িক ইতিহাসের একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। কুলচূড়ামণিপ্রভৃতি মাতৃপূজার সর্ব্বোত্তম তন্ত্রের অন্যতম। সেই তন্ত্রে মা মহিষমর্দ্দিনী রণচণ্ডী-মূর্ত্তিতে ভক্তহৃদয়ের পূজা গ্রহণ করিতেন। সেকালে কথিত ভীরু বাঙ্গালী রণ-আতঙ্ক ও শত্রুভয়ের জন্য রণচামুণ্ডার পূজা করিয়া ভৈরব-মূর্ত্তিতে রক্তপ্লাবিত সমরাঙ্গনে উদ্দাম নৃত্য করিত। এক সময় এই মহিষমর্দ্দিনীর ভৈরব বাঙ্গালীকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া কতভীরুকে রণোন্মাদে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল। ভক্তিরসপূর্ণ স্তোত্র কত যোদ্ধাকে অবশ্যম্ভাবী বিজয়বার্ত্তা শ্রবণ করাইয়া ও আত্মসুখ নিজক্ষুদ্র স্বার্থ বলিদান দিতে প্ররোচিত করিত তাহার আর ইয়ত্তা নাই। সে মাতৃত্বের কুসুমপেলব ভাবে পরবর্ত্তী কবিগণ তাহার কিঞ্চিন্মাত্র আভাস করিয়াছেন—যে আদ্যাশক্তির ভীষণতাকে বৈষ্ণবকবি প্রেমের মধুরতায় পর্য্যবসিত করিয়াছেন—সেই মোহন ভাবকে—সেই মধুর রসকে ভক্ত কবিগণ ভক্তি দিয়া বিবিধ আকারে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই ভীষণতা কালীর করালবদনে, পরিস্ফুট, ছিন্নমুণ্ড খড়্গ শোণিত ধারায় পুরুষের আত্মদানের ভাব ফুটাইবার চেষ্টায় প্রকট। ভীষণতা শ্রোতের ভাঁটার টানের মত—তাহার গৌরব-রবি পশ্চিমাকাশে অস্তমিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই ভীষণতার কল্পমূর্ত্তি আধিব্যাধিক্লিষ্ট হইয়া মোহন আকার ধারণ করিল। "কোথা কালী মহাদৈত্য-যুদ্ধযাগ-সহোদরী" "তাহি-পদ-পল্লবমুদারম্" হইয়া দাঁড়াইল—পুরুষকারের স্বাতন্ত্র্যভাব বড় কমিয়া গেল। তন্ত্র নারীত্বে মাতৃত্বে ভীষণতা আরোপ করিয়াছেন। কালী তাহাই আবার স্বামিবক্ষের কুসুমশয্যায় আপনভুলান শুভ্র ও শান্তির প্রতিমূর্ত্তিতে পর্য্যবসিত হইল। কবি মুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়া গাহিলেন—

নয়ন না তিরপিত ভেল।

নাথপন্থের যোগিগণ ও সিদ্ধাচার্য্যগণের রচনার সময় হইতে বাঙ্গালা দেশ বিজাতি কর্ত্তৃক পরাজিত ও অধিকৃত হইবারকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের শৈশবকাল বলিতে হইবে। মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে বৌদ্ধগণ একটী বিরাট সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার নিদর্শন অতি অল্পই পাওয়া যায়। গোরক্ষবিজয় ও ময়নামতীর গানে সাদৃশ্য বর্ত্তমান থাকায় উহারা সমসাময়িক বলিতে পারা যায়। বোধ হয় উহারা দ্বাদশ শতাব্দী কিম্বা তাহার পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। গোরক্ষবিজয় আদিযুগের বঙ্গসাহিত্যের মুকুট স্বরূপ। গোরক্ষ-যোগীর চরিত্রে উচ্চভাব প্রকটিত হইয়াছে। ক্ষুরধার সদৃশ দুরধিগম্য জ্ঞান-মার্গ ও মহামহিমময় চরিত্রবল তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছে। কুসুম-কোমল ভক্তি ও প্রেম তখনও বাঙ্গালী-চরিত্রের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দেয় নাই। লোকরুচি তখনও প্রেমের মাধুর্য্যে ডুবিয়া যায় নাই। তখনও বাঙ্গালায় ভাট ও চারণগণ প্রাচীন গাথা গাহিয়া সাধারণের মধ্যে বাঙ্গালীর পূর্ব্ব গৌরবের স্মৃতি জাগাইয়া দিতেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা বাঙ্গলার কাব্যে স্থান পায় নাই। তৎকালীন কাব্যে বাঙ্গালার রাজাগণের গুণগরিমা কীর্ত্তিত হইত। গোপীচন্দ্র রাজার গানে তাঁহাকে ২২দণ্ড স্থানের অধিপতি বলা হইয়াছে—"বাইশ দণ্ড বোলা হইয়া করিনু হাড়িকে প্রণাম"। কবি বলিতেছেন—

মহা প্রতাপী রাজা বঙ্গে বলিয়ারো।
তিন কোশ আয়তন কটক ইহারো॥

এই বর্ণনা গোবিন্দচন্দ্রের ক্ষমতার পরিচায়ক। এই কাব্যের অন্য স্থানে দেখিতে পাই—

নবলক্ষ বঙ্গ তোর ভেরু শত হাতী।
ষোল শত তুরঙ্গ উট শত বহি॥

গৌড়েশ্বরের এই নবলক্ষ বঙ্গীয় সৈন্য তখনকার বাঙ্গালীজাতি ও তাহার সৌর্য্যের কথা আমাদের কর্ণে স্বপ্নের মোহনবাণীর মত ধ্বনিত হয়। এই সৈন্য বঙ্গরাজগণ স্বদেশেই সংগ্রহ করিতেন এবং তাহাদিগকে যুদ্ধশিক্ষা দিয়া অশ্বারোহণ করিতেন। বাঙ্গালার প্রজার সুখসমৃদ্ধিও যথেষ্ট ছিল। কবি বলিতেছেন—

মাণিকচন্দ্র রাজা বসে বড় জত্তা।
হাতখানায় খাজনা দিল বেড় বুড়ি কড়ি॥
* * * * *
কারও পুষ্করিণীর জল কেহ নাহি খায়।
আধাইসের ঘন কড়ি পাথাইলে ওকার॥
সোণার-ছোটা দিয়া-রাইঅতের ছাওয়ালে খেদায়।
হেন-দুঃখী কাঙ্গাল নাই ধরিয়া পাসাণে॥

লোভা সুন্দর সরল ভাষায় গ্রাম্যকবি প্রজার তাৎকালিক অবস্থা চিত্রিত করিয়াছেন। এমন কি "বেতনা কবি যে ভাত খাএ তার দুআরত যোড়া।"

আবার, বাঙ্গালীচরিত্রের যেটী বিশেষ গুণ—যাহা তাহার চক্ষুর তৃপ্তিকর—যাহা তাহার হৃদয়ের ধন—প্রাণের বস্তু—যাহা তাহার ইহকাল পরকাল—যাহাতে সে তাহার সর্ব্বস্ব ডুবাইয়া দিয়াছে—যাহার জন্য সে স্বর্গ চায় না—সেই প্রেম ভিখিরীটীও আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মাণিকচন্দ্রের [illegible] অঙ্গনা প্রভৃতির খেদোক্তি যেমন স্বাভাবিক, তেমনি মর্ম্মভেদী, [illegible] যখনে গোপীচন্দ্র রাজা সিংহাসন অধিরোহণ করিলেন এবং মাতার [illegible] সন্ন্যাসী হইয়া যাইবার সময় "একশত সুন্দরী কান্দে চরণ ধরিয়া"।

না যাইও না যাইও রাজা দূর দেশান্তর।
কারে লাগিয়া বান্ধিলাম শীতল মন্দির ঘর॥
শীতল পাটী এ আমি কত্তা সঙ্গে গেলে।
গাটিয়া দিবু অন্ন সুধার কালে॥
পিপাসার কালে দিমু পানি।
হাসিয়া খেলিয়া পোহাবু রজনী॥
আইস পাসার দেখিবে কথা কহিয়া যামু।
সিদ্ধি লোকের বাড়ীতে সঙ্গে স্বামী বসিমু॥

পুনরায়—

এরূপ ভাবেতে সদা দুইয়ে করে ভোল।
নারী হইয়ে এ-সব রঙ্গ জানে কতকাল॥
কতকাল রাখিবু পরাণ বান্ধিয়া রাখিয়া।
নিশ্চয় করি পোরে তোর যাবী বলিয়া॥

এই অতি প্রাচীন বাঙ্গালী-কবির বীণায় যে প্রেমের ঝঙ্কার উঠিয়াছিল তাহা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসে—ভারতচন্দ্রও দাশরথি রায়ে—বিহারীলাল ও রবীন্দ্র নাথে—নানা তরঙ্গভঙ্গে উত্থিত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রকে সরস করিয়া তুলিয়াছে।

মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ অধিকৃত হইবার সময় শূন্যপুরাণ রচিত হইয়াছিল। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণের লক্ষ্য মহাজনদিগের শূন্যবাদ। তখনও যজ্ঞীয় হোম ধূমে গগনমণ্ডল পরিব্যাপ্ত—তখনও বেদগানে সর্ব্বদিক মুখরিত। ব্রাহ্মণগণের অত্যাচার জনসাধারণকে কথঞ্চিৎ উত্তেজিত করিয়াছিল। শূন্য-পুরাণের "নিরঞ্জনের কথা" অংশটি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে গৌড়দেশ মুসলমান অধিকার প্রাপ্ত হওয়ায় কবি আহ্লাদিত হইয়াছেন। বিদেশীকর্ত্তৃক দেশ বিজিত হইল কিন্তু কবি তাহাতে দুঃখিত বা মর্ম্মপীড়িত না হইয়া বরং আহ্লাদিত হইতেছেন। সদ্ধর্ম্মিগণের উপর অত্যাচার হইতেছে দেখিয়া দেবগণ মুসলমান বেশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

ব্রহ্মা হৈল মহম্মদ বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর
আদম্ফ হৈল শূলপাণি।
গণেশ হইলা গাজী কার্ত্তিক হৈল কাজি
ফকির হইলা যত মুনি॥
ত্যজিয়া আপন ভেক নারদ হইলা সেক
পুরন্দর হইল মওলনা।
চন্দ্রসূর্য্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সবে
সবে মিলি বাজায় বাজনা॥

শত্রু কর্ত্তৃক দেশ বিজিত হইল—মুসলমান শাসন প্রবর্ত্তিত হইল, এবং একটা প্রকাণ্ড বিপ্লব ঘটিয়া গেল, কিন্তু কবি তাঁহার কাব্যে সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন উল্লেখ না করিয়া সেই একঘেয়ে তত্ত্বকথা দেবদেবীর জন্মকথন প্রভৃতি লইয়াই গৌড়ের জনসাধারণকে আনন্দিত করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালার ন্যায় অতবড় একটা দেশ বিজিত হইল অতবড় একটা পুরাতন জাতীয় স্বাধীনতা লোপ পাইল কিন্তু কোন কবি স্বদেশের দুর্দ্দশার কথা স্মরণ—করিয়া ও দেশবাসিদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়া স্বদেশ রক্ষাকল্পে তাহাদিগকে উত্তেজিত করিলেন না এবং তাহাদের সুপ্ত প্রাণহীন দেহপিণ্ডে উদ্দীপনার বীজ ছড়াইয়া দিলেন না—ইহা জগতের ইতিহাসে অতি বিরল।

ইংরাজি সাহিত্যের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষায় আদিযুগের গ্রন্থসমূহ ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিবার জন্য রচিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহার সহিত মনুষ্য হৃদয়ের যে একটি স্বাভাবিক গুণ আত্মশক্তি জাহির করিয়াছে। তাহা প্রেম। সেই প্রেমের পূর্ণবিকাশ চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলীতে এবং ধর্ম্মের চরম পূর্ণতা বৈষ্ণব সাহিত্যে। অজয়ের অমর কবি যে প্রেম সঙ্গীত-লহরী তুলিয়া নিজে হৃদয়দেবতার পূজা করিয়াছিলেন তাহার উন্মাদনী শক্তি পঞ্চদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব-সাহিত্যে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

স্বাধীনতা হারাইবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী দুর্ব্বল হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। দুর্ব্বল ব্যক্তি ও বালকের শক্তি ক্রন্দনে প্রকাশ পায়। তাই বুঝি বাঙ্গালীকবি চিরকাল কাঁদিতে শিখিয়াছে—তাই বুঝি-বাঙ্গালী-কবি অশ্রুসিক্ত নয়নে নিজ হৃদয়ের ভাব কোমল মৃদু ভাষায় প্রকাশ করিতে শিখিয়াছে; তাহার ঐতিহাসিক সাহিত্যও জাতির দুর্ব্বলতার সাহায্য করিয়াছিল। জয়দেব-প্রমুখ কবিগণের "ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে" প্রভৃতি গান [illegible] কোকিলানী তাঁহাদের চিত্ত-বিনোদন করিতেন। প্রণয়ের [illegible] পদাবলী "কাণের ভিতর দিয়া মরমে" প্রবেশ করিয়া বাঙ্গালীকে [illegible] করিয়া দিয়াছিল। বাঙ্গালী যে নিস্তেজ, অসার, অলস ও উচ্ছাভিলাষ [illegible] হইয়া শ্রমবিমুখ হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহা তাহার সাহিত্যে পরিস্ফুট।

ক্রন্দন ও প্রেম রূপ দুইটি প্রোত বাঙ্গালী চরিত্রের অন্তস্তলে বহিতেছে। এই প্রসন্নতোয়া-প্রেম-ভাগীরথীর পবিত্রবারিসেকে বঙ্গসাহিত্য যেন উপ্তমরুমধ্যস্থিত কুঞ্জবনের ন্যায় মধ্যে মধ্যে নয়নাভিরাম শ্যামল শোভায় শোভিত হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালার কথা সাহিত্যে লক্ষ্মীর,— মনসা,শনি প্রভৃতি দেবতার [illegible] পাশে বাঙ্গালীহৃদয়ের সেই চিরন্তন ভাব দেখা দিয়াছে। এই সাহিত্যে [illegible] ও পৌরুষের অভাব। সাধারণের মুখরোচক করিয়া কথা সাহিত্য রচিত হইয়াছিল। ব্রতকথাও গান শুনিবার জন্য লোকের আলয় পূর্ণ হইয়া যাইত। গায়কগণ চণ্ডীমণ্ডপে ও মুক্তনীলাম্বরতলে কামর মন্দিরা সহযোগে শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করিতেন। শুধু তাহাই নহে। সাধারণ গৃহস্থের কার্য্যকলাপে তাহার আরাধনা প্রার্থনায়—তাহার পূজা অর্চ্চনায় এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। প্রেমের করুণরস বাঙ্গালা সাহিত্যের স্তরে স্তরে কখনও বা

অন্তঃসলিলা বস্তু নদীর ন্যায় কখনও বা বিশাল সিন্ধু নদভবতীর ন্যায় প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে।

বাঙ্গালীর দুই প্রাচীন কবি—কৃত্তিবাস ও কাশিদাস আধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক মধুকর গণের সংগৃহীত মধু গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ কাব্যে তাহার ঘনভাসাধন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সমাজ সংস্কারক বা রাষ্ট্র সংস্কারকের আসনে উপবিষ্ট হইয়া আত্মবিস্মৃতির মধ্যে ডুবিয়া যান নাই। তাঁহারা সাহিত্যের সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বকালীন আদর্শ পরিচালিত হইয়া যে রস সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন তাহা সমাজ চিরকাল পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে। মুসলমানগণ দেশ জয় করিয়া নিজেদের ক্ষমতা ও শাসন বিস্তার করিলেও অদৃষ্টবাদী বাঙ্গালী তাহা বিধাতার বিধান বলিয়াই গ্রহণ করিয়া লইয়াছিল—তাহা নিষ্ঠুর নির্ম্মম ভাগ্য দেবতার কঠিন নিয়ম বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল। জাতীয় কবিগণ সেইজন্য স্বদেশিকতা ও স্বাজাত্যের ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে পারেন নাই। রামায়ণ ও মহাভারত রচনার সময় স্বাজাত্য মহিমা ঘোষণা কবির মনে প্রধান হইতে পারে নাই। রামায়ণ ও মহাভারতে আর্য্য কর্ত্তৃক অনার্য্য জয় ভারতে আর্য্যগণের উপনিবেশ স্থাপন প্রভৃতি আধুনিক ঐতিহাসিকগণের স্বকপোল কল্পিত "থিওরি" সমূহ অদৃষ্টবাদী বাঙ্গালী কবি কৃত্তিবাস ও কাশীদাসকে পরিচালিত করিয়া তাঁহাদিগকে কাব্যাদর্শের উচ্চতম সিংহাসন হইতে টানিয়া আনিয়া রাষ্ট্রনীতির সাময়িক ও সংকীর্ণক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করে নাই বলিয়াই তাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যদেবীর কৌস্তুভমণি। বাল্মিকি ও ব্যাসের ন্যায় তাঁহাদের হৃদয় বিরাট ও উন্মুক্ত ছিল এবং বাল্মিকী ও ব্যাসের মতই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল মহাপুরুষ চরিত গানে—উহার মাহাত্ম্য ও গরিমা উদ্ঘাটনে—উহার সর্ব্বজয়ী শক্তির পূর্ণতার মহাসঙ্গীতের উদ্বোধনে। তাই তাঁহারা কাব্য শিল্প সাধনায় সাফল্য লাভ করিয়াছেন। রামায়ণ ও মহাভারতে স্বদেশিকতার অভাবের আর একটী কারণ আছে বলিয়া অনুমিত হয়। আচার ব্যবহার গত পার্থক্য থাকিলেও মুসলমানগণ এই দেশে বাস করিয়া হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। গৌড়দেশ বিদিত হইলে মুসলমানগণ দেখিলেন যে বাংলাদেশ সুজলা সুফলা ও শস্যশ্যামলা এবং ইহার অধিবাসিগণ শান্ত ও নম্রনীত কোমল স্বভাবসম্পন্ন। মুসলমান প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দুই জাতির মধ্যে সদ্ভাব ও সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইয়াছিল। এমন কি মুসলমানগণ হিন্দুর শীতলা ও কালীপূজা করিতে আরম্ভ করিলেন, হিন্দুগণও সত্যপীরের পূজা ও কোরাণের প্রতিশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে

লাগিলেন। উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ ও যবনের মধ্যে কুটুম্বিতা ও স্নেহ বন্ধন চলিতে লাগিল। মুসলমান নরপতিগণ বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে এবং সংস্কৃত সাহিত্য হইতে মূলগ্রন্থ বাঙ্গালায় অনুদিত করিতে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। মালাধর বসু শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ করিয়া গৌড়েশ্বরের নিকট "গুণরাজ খাঁ" উপাধি পাইয়াছিলেন। মুসলমান কর্ম্মচারীগণ বহু অর্থ ব্যয়ে বাঙ্গালী হিন্দু কবিগণকে মহাভারত অনুবাদ করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। পরাগল খাঁর সাহায্যে কবীন্দ্র পরমেশ্বর প্রায় সমগ্র মহাভারতের ও ছুটী খাঁ শ্রীকরনন্দী নামা অশ্বমেধ পর্ব্বের অনুবাদ করাইয়াছিলেন।

রামায়ণ ও মহাভারত এই অন্ধযুগের দুইটী আলোক স্তম্ভস্বরূপ। সংসার যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত মানব বাঙ্গালা সাহিত্যবৃন্তে এই দুইটী প্রস্ফুটিত ফুলের সুরভি মধুপান করিয়া সংসার জ্বালা নিবারণ করিয়া থাকে। বহু কালাবধি বাঙ্গালা দেশের আপামর জনসাধারণ এই দুই বিশাল মহীরুহের স্নিগ্ধ ছায়ায় আশ্রয় লাভ করিয়া ধর্ম্ম ও তত্ত্বজ্ঞানের শান্তি বারি পান করিতেছেন। কাশীদাস ও কৃত্তিবাস বাঙ্গালা ভাষায় যে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহাদের নাম উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। বাঙ্গালীর এই দুই মহাকাব্যে দেশ প্রীতি কিম্বা স্বদেশ হিতৈষণার ভাব বিশেষ কিছু দেখিতে পাই না। জাতি এক ভাব এক প্রাণ হইয়া হিন্দু মুসলমান এক মহাসঙ্ঘে পরিণত হইয়া জগতের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইতে পারে তাহার কোন নিদর্শন দেখিতে পাই না।

যাহা হোক কৃত্তিবাসের রামায়ণে ও কাশিদাসের মহাভারতে একটি বস্তু আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা ভক্তি। ভক্তিরূপ চাবীর সাহায্যে বাঙ্গালী জীবনের অন্তরতম প্রকোষ্ঠ খুলিয়া গিয়াছে। কবি বীরবাহুকে বৈষ্ণব সাজাইয়াছেন এবং বলিতেছেন—

ধরণী লুটায়ে রহে নুড়ি দুই কর।
অকিঞ্চনে কর দয়া রাম রঘুবর॥

আবার তরণীসেনের অতি ভক্তি দেখিয়া বানরগণ উপহাস করিতেছে—

অঙ্গে লেখা রামনাম রথের চারিপাশে।
তরণীর ভক্তি দেখি কপিগণ হাসে॥

এই জন্য শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন—

এই সব পড়িয়া রাম রাবণের ভীষণ যুদ্ধস্থলকে গৈরিক-রেণু রঞ্জিত সংকীর্ত্তন ভূমি বলিয়া ভুল হয় এবং তথাকার দামামা রোল খোল মাতের মৃদুতা লক্ষ্য

করে। যাহা হউক রামায়ণ এইরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া বাঙ্গালীর ঘরের উপযোগী হইয়াছিল সন্দেহ নাই—সেই ঘরে মরিচাধরা তলোয়ার অপেক্ষা নয়নাশ্রুই বেশী প্রভাবশীল অস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, চক্ষুজল এতদ্দেশের একটী প্রধান শক্তি, বাঙ্গালীর যুদ্ধক্ষেত্রে সেই শক্তির প্রয়োগ দেখিয়া উপহাস করিবার কারণ নাই।" এই বৈষ্ণবীভাব এই কোমলতা যাহা বাঙ্গালী চরিত্রের প্রধান গুণ—যাহা তাহার চরিত্রের কমনীয়তা সম্পাদন করিয়াছে—ইহাই রামায়ণকে বাঙ্গালীর নিজস্ব করিয়াছে,ইহাই বাঙ্গালীর প্রাণের ধন হৃদয়ের বস্তুরূপে পরিণত হইয়াছে,

কৃত্তিবাস চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল এবং কাশিদাস ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহাদের গ্রন্থ সংস্কৃত মূলের অনুগামী নহে। বাঙ্গালী কবিগণ তাঁহাদের দেশের লোকের হৃদয়ের ভাবরাশির উৎস স্বরূপ মধুর সরস ভক্তিবারি সেচন করিয়া বাঙ্গলা রামায়ণ ও মহাভারতের অপূর্ব্ব শ্রীসম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহারা অনুবাদক হইয়া পূর্ব্বকবিগণের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিলেও শ্রেষ্ঠ কবিযশ অধিকারী, কৃষ্ণ ভক্তি ও ব্রাহ্মণ ভক্তি কাশিদাসের মহাভারতকে বাঙ্গালী পাঠকের নিকট এত প্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। এই ভক্তি প্রবাহ প্রসন্নতোয়া ভাগীরথির সুবিমল ধারার ন্যায় কত নরনারীর জীবন মরুকে সুশ্যামল করিয়া যুগ যুগব্যাপী বর্ত্তমান রহিয়াছে। যিনি বাঙ্গালী পাঠককে যে ভক্তিফুলহার পরাইয়াদিছেন তাহা চিরকাল সুন্দর-সুরভি ছড়াইতে থাকিবে।

প্রাচীনকাল হইতে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের সময় পর্য্যন্ত—শুধু তাহাই নহে, ইংরাজ আমলে রঙ্গলাল পর্য্যন্ত, প্রেম ও ভক্তি ব্যতীত দেশাত্মবোধের কোন ভাব বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশেষরূপে পরিস্ফুট নহে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের পূর্ব্বে সাহিত্যে কোন কোন চরিত্রে ক্ষাত্র দৃঢ়তা, পুরুষকার ও রজোভাব পরিদৃষ্ট হয়। পঞ্চ গৌড়েশ্বরের প্রবল প্রতাপ, সিংহল বিজয় প্রভৃতি বীরত্বের কাহিনী মাঝে মাঝে কাব্যের উপজীব্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। বিজয় গুপ্ত কবিত্বের উজ্জ্বল তুলি সাহায্যে চাঁদের চরিত্রের বীরত্ব ও দৃঢ়তার ভাব আনয়ন করিয়াছিলেন। রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন প্রভৃতির বীরগণ আলোক চিত্রের প্রাণহীন ছায়া পুত্তলিকার মত প্রতিভাত হইলেও যুদ্ধাদি বর্ণনা মামুলী বাঁধিযাতের গতানুগতিক ভাব-যুক্ত হইলেও তাহা বাঙ্গালী পাঠকের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিত। এবং তাহাদের মানস নয়নে প্রাচীন আদর্শের অস্পষ্ট ক্ষীণ ছবিগুলি প্রতিবিম্বিত হইয়া এক সুন্দর ভাবের অবতারণা

করিত। এই সাহিত্যে দেশাত্মবোধের কথা বেশী যায় না। কবিদের উজ্জ্বলে কিম্বা ভাষাব্যঞ্জনায় কোন কবি দেশ মাতৃকার আহ্বান করেন নাই কিম্বা দেশবাসীর কর্ণে দেশাত্মবোধের মোহন মন্ত্র প্রদান করেন নাই। পরবর্ত্তী কালেও আমরা দেখি যে প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের অন্তস্তলবাহী প্রেমভক্তি স্রোত চৈতন্যচরণ সংস্পর্শে অপূর্ব্বভাব ধারণ করিয়াছে—চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির গভীর প্রেম যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নবদ্বীপচন্দ্রের গৌরকান্তিতে পুরামাত্রায় আত্ম প্রকাশ করিয়াছে। (ক্রমশঃ)

চা।

ওলো,

কৃষ্ণবর্ণা শুষ্ক পর্ণা
চিত্তহারিণী ললনা ;
কেমনে অধীনে প্রণয়ের ডোরে
বাঁধিয়াছ মোরে বলনা ?
হেম ফেলে তব প্রেম-সুধা চাই,
নধর 'কাপে'তে অধর ডুবাই,
বিরহেতে তোর প্রাণে মরে যাই
একি সুনিবিড় ছলনা ?
অমিত বরণা ললনা !

শীতের প্রভাতে যবে মুখ-বাঁধা
অল্পশিক্ত মত কেঁপেছি ;
তখনই উষ্ণ তোরি সুখা পরে
প্রাণের আশায় সঁপেছি।

রাগ-মানেতে চড়িয়া যখন
গাই গানেতো করিতে রমণ,
প্রতি তানেতে তোর পরশন
বড় হরষণে পেয়েছি।
তোমারই পরে প্রাণ সঁপেছি।

এত ভালবাসা এত সুখ-আশা
দেয়নাক মোর ধরণী;
তাই মোর হৃদি সরোবরে, বঁধু,
ভাসে তোর মধু-তরণী,
কালো তবু তোরে বড় ভালো লাগে,
তোর মুখ-ছবি সদা মনে জাগে,
দুখ অবসাদ ভোলায় প্রেমরাগে
তুলি, ওলো কালোবরণী।
ক্লান্তি-বেদনা-হরণী!

ছিপি চীনদেশে দীন হীন বেশে
কেন বা এসিলো ভারতে?
ওলো গুণনিধি কেন তোরে বিধি
সৃষ্টি করিল ধরতে?
আজ পথে যাই যেথা ফিরে চাই,
'চা'য়ের বিপনি অনন্ত পাই;
নিদাঘে, প্রাবৃটে, আসা যাই যাই,
কিবা বসন্তে, শরতে,
পথ-হৃদয়ের পরতে!

ভারতবর্ষে যে দিবা রাতে
সুখে আসা দিবি;
সেইদিন হোতে দাসত্বের তোমারে
[illegible] দিয়ে স্পর্শি!

মুচী-মজুরেরা সাঁঝে ও সকালে
আধমন জলে দুটো পাতা ফেলে,
কত কোলাহলে সুখে ঘাঁথি মেলে,'
প্রকাশি' কত না হর্ষ,
তব সুধা করে স্পর্শ

সারাটী জগত তব সুষমায়
ফেলেছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।
বাঙ্‌লা ভাষায় তব নাম হ'তে
'চাকর' শবদ সৃষ্টি।
নানা দেশে তব নাম নব নব,
'টে' 'টি' 'ওচা' 'চায়'—আর কত কব;
সারা ধরা গাহে জয়-গৌরব
চাহে করুণার দৃষ্টি,
আঁখি লালিমার দৃষ্টি।

পাণ-তামাকের একাধিপত্য
তুমিই করেছ খর্ব্ব।
তোমার বিহনে বাঙালী বাবুর
বিফল পাল্ ও পর্ব্ব।
সভ্য সমাজে শোভে তব বাটি,
আর যদি শোভে বোতলের খাঁটি,
তাহে যদি থাকে তব্‌লার চাঁটী,
সেই হয় সেরা গর্ব্ব।
নব্যের যথা সর্ব্ব!

সুধা-বিনিময়ে ক্ষুধা-নিদ্রার
কর কত অবমাননা।
মানবের দেহে 'ক্যান্সার' আদি
কত ব্যাধি তুমি আন না!

আছে তব গায়ে লেখা শত পাপ,
কত কুলীদের শোণিমার ছাপ,
কত কেরাণীর দুঃখাভিশাপ,
লক্ষ সতীর বেদনা।
তবু তব রূপ, হায়, চা, আমার
প্রভাত-সন্ধ্যা-সাধনা।

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু।

রূপের দুলালী।

প্রজাপতি।

(৯)

ধরণী বাসী জীবগণের দৈহিক সৌন্দর্য্য ও বিচিত্র কার্য্যাবলীর পর্য্যালোচনা করিলে আমরা বিস্ময় বিমুগ্ধ হই। ইহাদের কতকগুলির অঙ্গসৌষ্ঠব ও বিচিত্র বর্ণ-সৌন্দর্য্যের বিষয় চিন্তা করিলে স্বতঃই মনে হয়, ইহারাই প্রকৃতির প্রকৃত রূপের দুলালী। পুষ্প, বিহঙ্গ ও প্রজাপতির অসামান্য অঙ্গ সৌন্দর্য্য বিশ্বস্রষ্টার অচিন্ত্য শিল্প নৈপুণ্যের ক্ষণিক পরিচয় মাত্র।

আমরা যখন আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ অগণিত প্রাণী জগতের অদ্ভুত বৈচিত্র্য পূর্ণ জীবনের কার্য্যাবলীর বিষয় চিন্তা করি, তখন সত্যই মনে হয় আমরা এক অপূর্ব্ব মায়া-রাজ্যে বাস করিতেছি। জোনাকি, * বিহঙ্গ, মৌমাছি, প্রজাপতি, ঝিঁঝি, উই, মালপোকা, মাকড়সা, পিপীলিকা প্রভৃতির কার্য্যাবলী আমাদের সবিশেষ কৌতূহল উদ্রেক করে। এই সমস্ত অগণিত কোটী কোটী প্রাণীর তুলনায় আমাদের সংখ্যা কত অল্প ও নগণ্য। তবুও আমরা এই অগণিত প্রতিবেশীর কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে অতি অল্পই জানি। ইহাদের মধ্যে যাহারা আমাদের নানা প্রয়োজন সাধন করে—তদতিরিক্ত তাহাদের জীবনের কার্য্য কলাপ সম্বন্ধে কোন সন্ধান লই না। তাহাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের কার্য্য কলাপ অনেকাংশে আমাদের মত, এমন কি কোন কোন বিষয়ে তাহাদের

* লেখকের জোনাকী-জীবনের কৌতূহলপূর্ণ কাহিনী ১৩১৯ সালের প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

কার্য্যের শ্রেষ্ঠতাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। তাহাদের অনেকে যে আমাদের মতকর্ত্তা ও বুদ্ধিবিচারে আমাদের সমদর্শী এ কথা শুনিলে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করিবেন, কিন্তু একটু বিশেষ ভাবে তাহাদের কার্য্যের অনুসন্ধান করিলে এ বিষয়ের সত্যতা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। যদিও তাহাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন কাহিনী Romance নামের যোগ্য, তবু এ সমস্ত জীবন কথাই সম্পূর্ণ সত্য ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যদিও এই সমস্ত প্রাণীর অনেক কার্য্যাবলী দ্বারা ইহাদের চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু ইহাদের অনেকেই জন্মগত সংস্কার বলেই এরূপ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছে। এই জন্মগত সংস্কার বলেই ইহারা স্ব স্ব জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। জগতের মধ্যে মানুষই সর্ব্বাপেক্ষা নিঃসহায় অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করে—যত দিন পর্য্যন্ত তাহার কার্য্যকরী বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ কর্ম্মক্ষম না হয়, ততদিন পরের করুণাই তাহার জীবন ধারণের একমাত্র সম্বল। শিক্ষা ব্যতিরেকে আমাদের সমগ্র বৃত্তিগুলির পরিস্ফূর্ত্তি হয় না; কিন্তু একটী মাকড়সা জন্মিয়াই জাল বুনিবার যে নিপুণতা লাভ করে, তজ্জন্য তাহাকে কোনই শিক্ষা লাভ করিতে হয় না, এবং সমগ্র জীবনে তাহার অপেক্ষা অধিক নিপুণতাও জন্মে না। এই যে ইহারা দ্রব্য নির্ম্মাণ কিম্বা জীবনের নির্ব্বাহের বিস্ময়কর কার্য্যকারিতা লাভ করে—এই অজ্ঞাত সৃষ্টি প্রসূত মানসিক কার্য্যকারিতা, সংস্কার নামে অভিহিত হয়। যখন ইহারা কোনও নূতন অবস্থার মধ্যে নীত হয়, তদ্রূপ অবস্থায় ইহাদের কার্য্য কারণ সম্বন্ধে নির্ণয় দুরূহ হইয়া উঠে। পিপীলিকা স্বীয় বাসগৃহ কিম্বা রাস্তা ঘাট নির্ম্মাণের সময় কোন আকস্মিক কারণ উপস্থিত হইলে তাহাও স্বীয় চেষ্টায় আয়ত্ত করিয়া লইতে চেষ্টা করে। এরূপ ভাবে ইহারা অনেক অজ্ঞাত বিপদও স্বীয় নৈপুণ্য বলে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়।

অনেক সময় এই সংস্কার নির্ব্বুদ্ধিতার নামান্তর হইয়াও দাঁড়ায়,—যেমন কাঠঠোক্রা পাখীর বৃক্ষ কোটরে ফলের বীচি সঞ্চয় করিয়া রাখিবার অভ্যাস আছে, অনেক সময় তাহারা বীচির পরিবর্ত্তে বাক্সকে ছোট পাথরের টুক্‌রা চঞ্চুর করিয়া স্বীয় পরিশ্রমের অপব্যবহার করে। তাহাদের এতাদৃশ ভুলনেও নৈপুণ্যে তাহারা মানুষের অনেক নিকটবর্ত্তী সন্দেহ নাই। যদি এই সমস্ত প্রাণীদিগকে সর্ব্বদাই স্বীয় চিন্তা শক্তির উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতে হইত, তবে তাহারা বোধ হয় বেশী সময়ই ভুল করিয়া বসিত এবং তাহা তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পথ আরও জটিল হইয়া উঠিত।

প্রাণীজগতের কার্য্যকারিতার বিবরণের একটা সাধারণ শ্রেণী বিভাগ করিতে গেলে অনেকাংশে তাহা কৃত্রিম হইয়া উঠিবে। তাহাদের শিল্প কৌশল, বয়ন, বুনন, সূতা তৈয়ারী, কাগজ নির্ম্মাণ এবং তাহাদের অন্যান্য কার্য্যকুশলতা সমস্তই আমাদের আদিম শিল্পকলার প্রতিচ্ছবি বলিয়া মনে হয়।

প্রাণীগণের সর্ব্বপ্রকার শিল্পকুশলতাই জীবন-সংগ্রামে নিজকে বাঁচিয়ে রাখা, আহার সংগ্রহ, বাসস্থান নির্ম্মাণ কিম্বা তাহাদের শিশুদের জন্য খাদ্য সঞ্চয় এই সব উদ্দেশ্যে পরিচালিত। এতদ্ব্যতীত তাহারা জীবনের বৈচিত্র্যপূর্ণ কার্য্যাবলীর মধ্যে পতিত হইয়া যে সমস্ত উদ্ভাবনাশক্তির পরিচয় প্রদান করে তাহা একান্তই বিস্ময়কর। ইহা ছাড়া ও প্রাণীগণের মধ্যে প্রেম, ঈর্ষা দ্বেষ, সন্তান-স্নেহ, একতা, সমাজ-প্রীতি ইত্যাদি মানসিক বৃত্তিগুলির প্রচুর স্ফূর্ত্তি পরিলক্ষিত হয়।

ঝিঁঝি ও মাঠপোকার করুণ আর্ত্তনাদ মানবের পথীভূত ব্যথাকে যেন জাগ্রত ও সচকিত করিয়া দেয়। ইহাদের সকরুণ চীৎকার-ধ্বনি ইহাদের প্রেম-ক্ষুধিত অন্তরের অভিসঙ্কেত বা মর্ম্মান্তিক আহ্বান মাত্র। স্তব্ধ বনানীর অচিন শান্তিভঙ্গ করিয়া বেদনা-মুখর চিত্তের আবেগ ধ্বনিতে ঝিঁঝি যখন প্রহরের পর প্রহর কেবলই ডাকিতে থাকে, তখন বনানীর শ্রুতিপথ যে সুতীব্র ভিক্তরসে 'ঝালা পালা' হইয়া উঠে তাহা সুনিশ্চিত, কিন্তু যখনই দেখিয়াছি অপর একটি ঝিঁঝি এই অভিসঙ্কেত ধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়া প্রথম ঝিঁঝিটীর সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, তখনই বিরহীহৃদয়ের সমস্ত চীৎকার প্রেমানন্দে নীরব হইয়া গিয়াছে! অনেক সময় দেখিয়াছি দুইটী কাষ্ঠখণ্ড কিম্বা নারিকেল খোল দ্বারা ঝিঁঝিবিতায় শব্দ উৎপন্ন করিতে পারিলে মুগ্ধ ঝিঁঝি আসিয়া ধরা দেয়, ঝিঁঝি বড় সতর্ক প্রাণী। ইহাদের ধরিবার ইহাই উৎকৃষ্ট উপায়।

মাঠপোকা মাটীর অভ্যন্তরে ঈষৎ লুক্কায়িত থাকিয়া ধরণীর সংতপ্ত ব্যথাকে যেন কুড়াইয়া তোলে; নির্জ্জন মাঠ প্রান্তর একমাত্র ইহাদের ধ্বনি যেন স্তব্ধ হইয়া শুনিতে থাকে। ঘন অন্ধকারে নির্জ্জন মাঠে কেবল মাত্র ইহাদের ধ্বনি শ্রবন করিয়া বিশ্ব চরাচরের সজীবতা অনুভূত হয়।

মোনাকি রাত্রির অন্ধকারে স্বীয় রূপের জ্যোৎস্নায় বনানীর চতুর্দ্দিকে সহস্র মাণিক জ্বালিয়া দেয়।

ঝিঁঝি বনানীর ক্রন্দনময়ী প্রেম অভিব্যক্তি; মাঠপোকা ধরণীর বিদীর্ণ হৃদয়ের সংগুপ্ত বেদনাময়ী ইতিহাস; মোনাকি বনানীর উজ্জ্বল অঞ্চল ভূষণ;

বিহঙ্গ বনানীর গায়ক কবি; রূপের দুলালী প্রজাপতি যুক্তপ্রকৃতির যৌবন সতেজ চঞ্চল আনন্দমূর্ত্তি বলিয়া মনে হয়।

প্রজাপতি উন্মুক্ত সূর্য্যকিরণে চঞ্চল বাতাসের মত আনন্দে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায়! কি দ্রুত তাহার গতি! কি সচ্ছন্দ তাহার পতি ভ্রমণ! কি উৎফুল্লতা তাহার চঞ্চল পাখায়!—মনে হয় যেন আনন্দের একটী সজীব প্রতিমূর্ত্তি।

প্রজাপতির পক্ষ সৌন্দর্য্যে অশেষ বর্ণ সুষমার সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। যেন কোন নিপুণ চিত্রকর স্বীয় রঙ্গের বিচিত্র সমাবেশ দেখিবার জন্য মনোহর প্রজাপতির সৃষ্টি করিয়াছেন! বিশ্বশিল্পী বুঝি ফুলের রং ও প্রজাপতির পক্ষ সৌন্দর্য্যে রঙ্গের যত কারিকুরী দেখাইয়াছেন। বিভিন্ন রঙ্গের ও বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতি ছয় সাত হাজারের ও বেশী হইবে।

প্রজাপতির পাখায় যে কত রকমের বর্ণশোভনা আছে, তাহার ইয়ত্তা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। হরিৎ, পীত, সবুজ, পিঙ্গল, নীল বেগুনী নিলুরী, মাটিয়া কত বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ দৃষ্ট হয়।

আমাদের বাংলা দেশেই কত রকমের প্রজাপতি দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণ পক্ষ ও রক্তবর্ণ দেহ, এবং সবুজ, রক্ত কৃষ্ণ পীত মিশ্রিত পক্ষ বিশিষ্ট ও কৃশ দেহ—এইদুই শ্রেণীর প্রজাপতি দ্রোণ ফুলের মধু খাইয়া বেলা হইতে দেখা যায়। তা'ছাড়া পাখার উপরের দিকে শ্বেতবর্ণ ও ভিতরের দিকে উজ্জ্বল পীতবর্ণ ক্ষুদ্র এক শ্রেণীর প্রজাপতি সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়। নানা রঙ্গের বর্ণ-যুক্ত প্রজাপতি ও আমাদের দেশে দেখা যায়।

প্রজাপতির পাখা খুব হাল্কা, মসৃণ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁইস দ্বারা নির্ম্মিত। ইহাদের ডানার এত জোর যে, সারাদিন পরিভ্রমণ করিয়াও ইহারা কিছুতে ক্লান্তি হয় না। ইহাদের গতি এত দ্রুত যে, পলক ফেলিতে ইহারা ২০ গজ দূরে চলিয়া যায়। প্রজাপতির দুইটী মাত্র কাজ,—এক, ফুলে ফুলে বিচরণ; দ্বিতীয়, ফুলের মধু আহরণ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ দে।

"আলেয়া"!

আলেয়া—আলেয়া—আলেয়া! মরি, মরি—কি মধুর, কি মিষ্ট; কি মধুমাখা নাম! কোথায় লাগে হরি নাম, কোথায় লাগে রাম নাম—কোথায় লাগে ও তোমার শিব, দুর্গা, কালী—ভারা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ তেত্রিশ কোটী দেবতার নাম! কোথায় লাগে রাজভোগ, হালাবড়া, পানতোয়া, কোথায় লাগে মিহিদানা, ভীমনাগের সন্দেশ, বাদামে বর্ফি; কোথায় লাগে অমৃতি, পাপর ভাজা, চানাচুর! ফেলে দাও ওসব আঁস্তাকুরে। আমার আলেয়ার পাশে কি ওরা দাঁড়াতে পারে, আলেয়ার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে! না আলেয়ার ত্রিসীমানায় পদার্পণ কর্ত্তে পারে! আলেয়া—আলেয়া—আলেয়া!! আহা! কি সুন্দর, কি সুশ্রী, কি স্নিগ্ধ! কোথায় লাগে জোছনার আলো, পূর্ণিমার চাঁদ, ঘনঘটামেঘের বিজলী! কোথায় লাগে রম্ভা, তিলোত্তমা, উর্ব্বশী! কোথায় লাগে শীতের রোদ, গ্রীষ্মের বারিধারা, বসন্তের মলয় অনিল! আলেয়া আমার সকলকে হারিয়েছে, সকলের অহঙ্কার ভেঙ্গে দিয়েছে, সকলের দেমাক ঘুচিয়ে দিয়েছে!

আহা নাম তো নয় যেন একটী অন্ধকারের প্রদীপ! আলাবামাত্র সব তিমির দূর হ'য়ে যায়—নাম করবামাত্র প্রাণের নদীনালা গর্ত্ত, গেঁড়ে, পাহাড় পর্ব্বত, অধিত্যকা উপত্যকা সব যেন আলোয় আলোকাকীর্ণ হ'য়ে যায়! তবু হায় এ জগতের এমনি পোড়া নিয়ম, এমনি বেয়াক্কিলে ব্যবহার, এমনি তাক লাগান—চমক লাগান আচরণ যে কিছুতেই ওকে ভাল বলবে না। কিছুতেই ওকে চিন্তে চাবে না, কিছুতেই ওকে আপনার ব'লে নেবে না!

আলেয়া আমার নামেও যেমন কাজেও তেমন—মুখেও টেমন পেযও তেমন—বাহিরেও যেমন ভেতরেও তেমন! ওর ভেতর বার এক! নামটীও যেমন মধুর কাজটিও তেমনি সুন্দর! কেমন সুন্দর জোছনা রাত্রে খোলা মাঠে নদীর কিনারায় খেলা ক'রে বেড়ায়-পাছে পথভোলা পথিক পথভুলে কষ্ট পায়, পথ হারিয়ে বিপথে যায়, তার জন্য কেমন নিজে হাতেই আলো ধ'রে তাকে রাস্তা দেখিয়ে দেয়, অভয় দিয়ে সাহস করে, আশা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে।

কেমন দুঃখ কষ্ট নিজে সয়ে, আপন বিপদ ডেকে নিয়ে, কাঁটা খোঁচা ভ্রুক্ষেপ না ক'রে তাকে টেনে নিয়ে যায়! আলেয়ার আমার এমনি দয়াল প্রাণ যে তাকে জান্‌তে পর্য্যন্ত দেয় না যে কোথায় চলেছে—পাছে অনেক দূর যেতে হবে জানলে সে ভড়কে যায়, ভয় পায়। তার পর দেখ আলেয়া কেমন সমঝদার! যখনই দেখিল যে পান্থময় অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে হাঁপিয়ে মুকুন্দ হাঁপানি হাঁপাতে সুরু ক'রেছেন, যেমে গায়ের লোমকূপে লোমকূপে মা সুরধুনীর সৃষ্টি ক'রে পাল্লাপাল্লিতে ভগবান বিষ্ণুকে হার মানিয়েছেন, সামনে আলো থাকতেও চোখে আঁধার দেখ্‌তে আরম্ভ ক'রেছেন, তখনই অমনি আলেয়ারাণী মোর গুদ্‌গদ হ'য়ে আলোটীকে নিবিয়ে বাছাটীকে তাঁর নদীকূলে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেন—দিয়ে বলেন বাবা, ভেষ্টা পেয়েছে? জল খাই জল খাই ডাক ছাড়ছে? আত্মারাম আর বুলি বলতে না পেরে খাঁচা ছাড়া হবার মত হ'য়েছে? ভয় কি বাবা? এই দেখ সামনেই জল, যত পার খাও, খেয়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে শিরিয়ে বাড়ী যাও। সমস্ত রাতটা কোথায় গিয়ে কষ্ট পেতে তাই ভেবে আমি তোমায় এতক্ষণ আট্‌কে রেখছিলাম। যাও, এখন বাড়ী যাও! কিন্তু শুধু কি এই স্নেহ বিকাশ, করুণা প্রকাশ—শুধু কি তাই? ছেড়ে যাবার আগে কেমন সারগর্ভ উপদেশ দিয়ে যান। বলেন—বাপধন আমার! মণি আমার! মাণিক আমার! আর রাতে বেরিও না। নেশায় ঝোঁকে যেখানে সেখানে যখন তখন যেওনা-গায়ের জোরে কাজ কত্তে যেওনা। কিলের আলো ছেড়ে অন্ধকারে চুপি চুপি মতলব আঁটতে চেষ্টা ক'র না—। সারাদিন সাধু সেজে, রাত্তির বেলায় আনাচে কানাচে, গুয়ে গোবরে, কুলতলায় নেড়-তলায় ঘুরে ঘুরে বেড়িও না! এবার না হয় আমি তোমায় রক্ষা ক'রবো তাইব'লে কি বারে বারে পারি?—তাই কি পারি? বলি বাবা! তুমি তো আমার একা নও, আমার তো আবার আরও অনেক আছে—ভাদেরও তো দেখতে হবে? এইবার কাছা খুলে কাপড় ঝেড়ে পর—প'রে আস্তে আস্তে বাড়ী যাও—আর কখনও এমন কায ক'র না? দেখ দেখি কেমন উপদেশ! কত স্নেহ! কত টান!

তবু এমনি কালের সধর্ম্ম যে ঐ আলেয়াকেই দোষ দেবে! ওকেই গাল দেবে! আরে বাপু! নিজের তা' একবার ভাব, নিজে কি কাণ্ড এক একবার মনে কর, তারপর আলেয়াকে দোষ দিও। যদি তুমি অন্ধকারে না বেরোও তা'হ'লে তো আর আলেয়ায় পায় না? তবে বেরোও কেন? ভাল ছেলে

বড় থাকলেই হয়। পেটে এক থাক্, মুখে এক থাক্ কর্ত্তে যাও কেন? রাতে দিনে পুরুষ পোষাক পর কেন? সমস্ত লোককে লুকিয়ে, পেটে কথা চেপে রেখে, মুখে লাগাম দিয়ে কথা কও কেন? সাদাসিদে হও। ভেতর বাহির এক কর। দিনে রাতে এক রকম পোষাক পর। যখন যা ব'লবে ঢোক গিলে, চিবিয়ে না ব'লে বেশ স্পষ্ট ক'রে, প্রাণ খুলে সকলের সাম্নে বল'। দেখবে তখন আলেয়াও পেছুনে লাগবে না—গর্ত্ত গেঁরেও ঘুরে বেড়াতে হ'বে না, আর মাছা খুলে কাপড় ঝেরেও প'রতে হবে না।

আজ দেখছি ভারতের রাজনীতির ময়দানে 'আলেয়া' এসে জুটেছে! ছোট বড় সকলকে নিয়েই কেমন ছিনি মিনি খেলা খেলছে। কাকেও গর্ত্তে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—কাকেও গেঁরেতে কাত ক'রে ফেলছে—আবার কাকেও বা সমস্ত রাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আয়পিত্ত তার বের ক'রে দিচ্ছে!—আলেয়া প্রায়ই শুনেছি একজনের পেছুনেই লাগে—এযে দেখছি সকলের পেছুতেই লেগেছে—দেশশুদ্ধ লোককে নিয়ে ছুটাছুটি করাচ্ছে। কাউকে এদিকে নাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে—কাউকে ওদিকে কানমলা দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, আবার কাকেও পিঠে দুটো থাপ্পর দিয়ে বসিয়ে রাখছে! যে বসছে সে আর উঠছে না! একেবারে হতভম্ব হ'য়ে ব'সে থাকছে।—আর যারা একটু এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি ক'রছে তারা তো দেখি কিছুতেই এক হ'তে যাচ্ছে না—কিছুতেই আলেয়ার হাত থেকে চিরতরে মুক্তি পাবার উপায় স্থির কর্চ্ছে না—সকলেই তার আলোকময় বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে বিভোর, জ্ঞানহারা! তবেই তো মুস্কিল! ওমা আলেয়া! তুমি এক কাজ কর মা—ভারতের এই শেষ রাত্রে যখন রঙ্গ ক'রে এসেছ—তখন নিশ্চই বুঝছি তার এ আঁধার রাত শেষ হবার আর দেরী নেই! তাই বলছি মা—বেশী খেলা না খেলিয়ে এই অচেতন মূর্খদের চৈতন্য ক'রে দাও! মাগো! একেই শীতের রাত—দেশীতে তোর হয়! আর তার ওপর কুয়াসার সৃষ্টি ক'রে মেঘ আনিয়ে দিনকেও রাতের মত ক'র না। ঐ দেখ মা! পূর্ব্বদিক অরুণ কিরণে আলো ক'রে সূর্য্যদেব উঠবো উঠবো কর্চ্ছেন—আর তাকে মেঘ দিয়ে, ঝটিকা দিয়ে, ঝড়ো দিয়ে, বিদ্যুতে ঢেকে বিপর্য্যস্ত ক'র না। শিগ্‌গির শিগ্‌গির কাপড় নেড়ে পরিয়ে দিয়ে বিদায় দাও।

শ্রীনিত্যহরি ভট্টাচার্য্য।

গয়ার কথা।

—:০:—

ব্রহ্মগয়া।

(৪)

ব্রহ্মপুরাণে।

ব্রহ্মপুরাণে চারিজন গয়রাজার উল্লেখ আছে, তাহাদের মধ্যে একজন স্বায়ম্ভুবমনুর পুত্র উত্তানপাদের তনয় ধ্রুবের বংশধর চাক্ষুষ মনুর অতিশ পুরুর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় ঐ বংশেরই পৃথুরাজার পৌত্র হবির্দ্ধানের পুত্র। তৃতীয় বৈবস্বত মনুর পুত্র সুদ্যুম্নের তনয়, সুদ্যুম্নের কর্ত্তৃক গয়ের পূর্ব্বদিক্‌স্থিত গয়া প্রদেশ অধিকৃত হয়। আর চতুর্থ পুরু দুষ্মন্ত রাজার আত্মজ ভরতের তনয় বিভথের পুত্র। *

---

* "পুরোর্ব্বসনসঃ পুত্রান্ ষড়াগ্নেয়ী মহাপ্রভান্ ॥ ১৯
কক্ষং সুবনসং থাভিং ক্রতুনাঙ্গিরসংগয়ম্ ॥" ২০
(ব্রহ্মপুরাণ ৪র্থ অধ্যায়)

বিষ্ণু পুরাণে পুরুর স্থলে ২০ গয়ের স্থলে শিব আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে পুরুর স্থলে ঔরুক্ষয় এবং তাঁহারই ছয় পুত্রের মধ্যে গয় অন্যতম বলিয়া দেখা যায়।

"পূরোস্তু পৌরবো বংশো যত্রাতে হ্যুত্তমো নৃপঃ।
পৌরবিণী তবির্যদি মতব্যং নিবোধ মে নৃপত।
হবির্ধ মাৎ বভ্রাগ্নেয়ী ধিষণা যবসৎ সুতান্ ॥
প্রাচীন বর্হিষং শুক্রং গয়ং কৃষ্ণং ব্রজাজিনৌ ॥" ২১
(ব্রহ্মপুরাণ ২য় অধ্যায়)

সুদ্যুম্নস্তু দ্বয়োর্জ্যেষ্ঠঃ পুরুষ ধার্ম্মিকঃ।
উৎকলায়াং গয়শ্চৈব বিনতায়াশ্চ ভোজিতাঃ ॥ ১৭
উৎকল যোৎকলা বিপ্রা বিনতায়ন্তু পশ্চিমা।
গৈলুষ্যুর্বী মুনিশার্দ্দূলা গয়স্য তু গয়াস্মৃতা ॥" ১৮
(ব্রহ্মপুরাণ ৭ম অধ্যায়)

"সচাপি বিতথঃ সূনুস্তস্য জনমানো পক্ষবে।
সুহোত্রস্য সুহোতারঃ সুতং গর্গং তথৈব চ ॥ ৬২
ধনিনক্ষ নরানরং" ব্রহ্মপুরাণ ১৩ অধ্যায়

উক্ত পুরাণের তীর্থ প্রসঙ্গে গয়ার কথা দেখিতে পাওয়া যায়, মহানদী, ব্রহ্ম-সরোবর, গয়াশীর্ষ; অক্ষয় বট, কপিলাহ্রদ, গৃধ্রবট, সাবিত্রীহ্রদ, প্রভাসন, যোনি-দ্বার, ধেনুকাতীর্থ, মতঙ্গ হ্রদ প্রভৃতিরও কথা আছে। ০

প্রাদ্ধকল্পে উল্লিখিত হইয়াছে যে, গয়াশ্রাদ্ধে পিতৃগণের অনন্ততৃপ্তি এবং শ্রাদ্ধ-কারীর ও সুখ বৃদ্ধি ঘটে। সকলের বহু পুত্রের কামনাই বিধেয়, কারণ তাহাদের মধ্যে যদি কেহ গয়াধামে গমন, গৌরীকন্যাকে বিবাহ অথবা নীলবৃষ উৎসর্গ করে। পূর্ব্বে ঐলরাজার নিকটে পিতৃগণ যে গাথা গান করিয়াছিলেন, ব্রহ্ম-বাদীরা শ্রাদ্ধকালে তাহা গান করিয়া থাকেন। সে গাথা এইরূপ;—"আমাদের কাহার কোন্ কালে এমন এক সংযত ও অব্যগ্র সন্তান জন্মিবে, যে যোগি-গণের ভুক্তাবশেষ দ্বারা ভূতলে আমাদিগকে পিণ্ড প্রদান করিবে। অথবা আমাদের তৃপ্তির জন্য গয়ায় পিণ্ডদান, গণ্ডার মাংস, হবি, কালশাক, ভিল মিশ্রিত ঘৃত, কিম্বা তিল দুগ্ধ মিশ্রিত অন্ন দান করিবে। বৈশ্বদেব, সৌম্য খড়্গ মাংস ও উত্তম হবি যদি দান করে, তবে সেই গর্ব্ব রহিত ব্যক্তিকে আমরা আপাদ মস্তককে আশীর্ব্বাদ করি। কোন্ ধন ত্রয়োদশীতে ও মঘাতে আমাদের শ্রাদ্ধ করিবে। কোন্ বংশধর দক্ষিণায়নে আমাদিগকে মধু ঘৃত যুক্ত পায়স দান করিবে?" ০

মহাভারতে কিন্তু ভরতের পুত্র ভূমন্যু, ভূমন্যুর পুত্র সুহোত্র, সুহোত্রের পুত্রহস্তীর কথা লিখিত আছে, এই হস্তী হইতে হস্তিনাপুর হয়। বিষ্ণু পুরাণে ভরতের পুত্র বিতথ; বিতথের একমাত্র পুত্র ভবন্মন্যুর উল্লেখ আছে। ভবন্মন্যুর পুত্র বৃহৎক্ষত্র, বৃহৎক্ষত্রের পুত্র সুহোত্র এবং সুহোত্রের পুত্র হস্তী বলিয়া লিখিত আছে।

* "গয়াপ্রভাসং শ্রীতীর্থং দিব্যং কল খলং তথা॥" ১১

ঐ ২৫ অধ্যায়

শুক্লতীর্থং মহাতীর্থং তীর্থশ্রেষ্ঠা মহানদী॥ ৬৭
দিব্যং ব্রহ্মসরঃ পুণ্যং গয়াশীর্ষা অয়ং বটম্।
দক্ষিণং কোশরঞ্চৈব গোময়ং রূপশ্রীতিকম্॥ ৬৮
কপিলাহ্রদং গৃধ্রবটং সাবিত্রীহ্রদ মেবচ।
প্রভাসনং শীতবনং যোনিদ্বারঞ্চ ধেনুকম্॥ ৬৯
মতঙ্গং কোকিলাবাসং মতঙ্গ হ্রদমেব চ।
পিতৃকূপং কলক্রীতং সপ্তকতীর্থং সুমালিনম্॥" ৭০

(ঐ ২৫ অধ্যায়)

"অনন্তং বৈ ফলপ্রাপ্তি স্তৃপ্তিশ্চৈব সুতাংস্তথা।
পিতৃণাং নাত্রসন্দেহো গয়াযোমঞ্চ যোষিতাঃ॥ ২১

বিষ্ণুপুরাণে।

বিষ্ণুপুরাণে তিনজন গয়রাজার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে একজন ধ্রুব বংশীয় হবির্দ্ধানের পুত্র। দ্বিতীয় স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রতের বংশে যে ভরত জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহারই বংশধরনক্তের তনয়। আর তৃতীয় বৈবস্বত মনুর পুত্র সুদ্যুম্নের আত্মজ। *

বিষ্ণু পুরাণের শ্রাদ্ধপ্রকরণে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি গয়ায় গিয়া শ্রাদ্ধ করে, তাহার জন্ম সফল হয়, এবং তাহার পিতৃগণ পরিতুষ্ট থাকেন। হিমালয়ের পার্শ্ববর্ত্তী কলাপ নামক স্থানের উপবনে পিতৃগণ মনুপুত্র ইক্ষ্বাকুকে এই গীতা

দ্রষ্টব্যা বহবঃপুত্রা যদ্যেকোঽপি গয়াংব্রজেৎ
গৌরীংবাপ্যুদ্বহেৎকন্যাং নীলংবা বৃষমুৎসৃজেৎ ॥ ৩২

* * * * *

পিতৃগাথা তথৈবাত্র গীয়ন্তেব্রহ্মবাদিভিঃ।
যাগীতাপিতৃভিঃ পূর্ব্বং মৈত্রস্তাসীন্মহীপতে ॥ ১১২
কদানঃ সন্ততাবগ্র্যঃ কশ্চিত্তিবিতাস্মতঃ।
যো যোগিভ্যস্ত শেষান্নো ভুবি পিণ্ডান্ প্রদাস্যতি ॥ ১১৩
গয়ায়া মথবা পিণ্ডং খড়্গমাংসং তথা হবিঃ।
কালশাকং তিলাজ্যঞ্চ তৃপ্তয়ে কুসরঞ্চ নঃ ॥ ১১৪
বৈশ্বদেবঞ্চ সৌম্যঞ্চ খড়্গমাংসং পরং হবিঃ।
বিষাণবর্জ্জং শিরসা আপাদাদাশিখামহে ॥ ১১৫
দত্তাচ্ছ্রাদ্ধস্তু ত্রয়োদশ্যাং মঘাসুচ যথাবিধি।
মধুসর্পিঃ সমাযুক্তং পায়সংদক্ষিণায়নে ॥ ১১৬

ব্রহ্মপুরাণ ২২০ অধ্যায়।

* "পৃথোঃ পুত্রো মহাবীর্য্যো জজ্ঞাতেঽন্তর্দ্ধিপালিনৌ।
শিখণ্ডিনী হবির্দ্ধানম্ অন্তর্দ্ধানাদ্ঘ্যজায়ত ॥ ১
হবির্দ্ধানাৎ ষড়াগ্নেয়ী ধিষণাজনয়ৎসুতান্।
প্রাচীনবর্হিষং শুক্রং গয়ং কৃষ্ণং ব্রজাজিনৌ ॥" ২

বিষ্ণুপুরাণ প্রথম অংশ ১৪ অধ্যায় (বংশবাসী সংস্করণ)।

"পৃথুস্তস্যোঽত্তরন্তস্যোনক্তস্তাপি গয়ঃ সুতঃ ॥ ৩৮

২য় অংশ ১ম অধ্যায়।

"তৎপ্রসাদাদিলাপুনরপি সুদ্যুম্নোঽভবৎ ॥ ১১
তস্যাপ্যুৎকল গয়-বিমত সংজ্ঞাস্ত্রয়ঃ পুত্রাবভূবুঃ।"

৪র্থ অংশ—১ম অধ্যায়।

বলিয়াছিলেন যে, আমাদের বংশে সন্মার্গগামী এমন সকল সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, যাহারা গয়ায় গিয়া সমাদরের সহিত আমাদিগের উদ্দেশে পিণ্ড দানে প্রবৃত্ত হয়। আমাদের কুলে এমন কেহ জন্মে, যে ভাদ্র মাসের যথাযুক্ত ত্রয়োদশী তিথিতে আমাদিগকে ঘৃত মধু সংযুক্ত পায়স প্রদান করে। আমাদের বংশে এমন কোন পুত্র উৎপন্ন হয়; সে গৌরী কন্যা বিবাহ, নীল বৃষ-উৎসর্গ অথবা যথাবিধি দক্ষিণাসহ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে।*

শ্রীমদ্ভাগবতে।

শ্রীমদ্ভাগবতে চারিজন গয়রাজার উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে প্রথম গয় ধ্রুব বংশীয় চাক্ষুষ মনুরপুত্র পুরুর পুত্রস্থলে তাঁহার ভ্রাতা উল্মুকের পুত্র বলিয়া কথিত হইয়াছেন। দ্বিতীয় উক্ত বংশীয় হবির্দ্ধানের অন্যতম তনয়। তৃতীয় প্রিয়ব্রত বংশীয় নক্তের পুত্র, চতুর্থ বৈবস্বত মনুর পুত্র সুদ্যুম্ন হইতে জাত। ইঁহাদের মধ্যে নক্তপুত্র গয়ের কথা বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি রাজর্ষি প্রবর বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছেন এবং তাঁহার যশেরও পরিসীমা ছিল না, ভগবান্ বিষ্ণুর অংশ হওয়ায়, তিনি মহাপুরুষত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া, প্রজাপালনাদি রাজধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া, যাগযজ্ঞাদি ধর্ম্মাচরণ করিতেন। তাঁহার এই বিবিধ ধর্ম্ম ভগবানে সমর্পিত হইয়াছিল। এই দুইধর্ম্ম এবং ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞগণের সেবাজনিত ভক্তিযোগদ্বারা তাঁহার বুদ্ধি বিশুদ্ধ হওয়ায়, তাঁহার দেহাভিমান তিরোভূত হয়, সে জন্য তিনি

---

* "গয়ামুপেত্য যঃ ভ্রাতরং করোতি পৃথিবীপতে।
সফলং তস্য তজ্জন্মজায়তে পিতৃতুষ্টিদম্ ॥ ৪

* * * * *

শ্লোকস্তে চাপি পিতৃভির্গীতাগাথা মহীপতে।
ইক্ষ্বাকোর্ধন্যপুত্রস্য কলাপ্যোগবনে পুরা ॥ ১৭
অপিনস্তে ভবিষ্যন্তিকুলে সন্মার্গগামিনঃ।
গয়ামুপেত্য যে পিণ্ডান্ দাস্যন্ত্যস্মাকমাদরাৎ ॥ ১৮
অপি নঃ স্বকুলেজায়াদ্ যোনোদ্দ্যাদ্ভোয়োদশীম্।
পায়সং মধুসর্পিভ্যাং বর্ষাসুচ মঘাসুচ ॥ ১৯
গৌরীং বাপ্যুদ্বহেৎ কন্যাং নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ
যজেতবাশ্বমেধেন বিধিবদ্দক্ষিণাবতা ॥" ২০

বিষ্ণুপুরাণ, ৩য় অংশ ১৭ অধ্যায়।

ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতেন। এইরূপে তিনি চিরস্তিমাবে পৃথিবী পালন করিয়া ছিলেন। পুরাবিদ্‌গণ তাঁহার সম্বন্ধে এই সকল গাথা গান করিয়া থাকেন।

"দানস্বরূপ, মনস্বী, বহুজ্ঞ, ধর্ম্মরক্ষক, শ্রীমান্, সৎসভারপতি, সাধুগণের সেবক, গয়রাজাকে ভগবানের অংশ ব্যতিরেকে আর কে কর্ম্ম দ্বারা অনুকরণ করিতে পারিবে। শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়াপ্রভৃতি যে সকল সাধ্বী দক্ষকন্যার আশীর্ব্বাদ লাভার্থ, তাঁহারা সরিদ্ গণের সহিত পরমহর্ষে যাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন, এবং যিনি নিষ্কাম হইলেও গুণরূপ বৎস দ্বারা প্রভূতবতী যশস্বী যাঁহার প্রজাগণের নিমিত্ত ভূরি ভূরি কল্যান নিজে দোহন করিয়া দিয়াছিলেন, কর্ম্মদ্বারা সেই গয়রাজার কে অনুকরণ করিতে সমর্থ হইবে? যিনি বিরক্তচিত্ত হইলেও, বেদ সকল যাঁহার জন্য বিবিধ কাম দোহন করিয়া দিতেন, রাজগণ সমস্ত দ্রব্য দ্বারা প্রতি পূজিত হইয়া, যাঁহাকে কর প্রদান করিতেন, ব্রাহ্মণগণ পালন দক্ষিণা দ্বারা পূজিত হইয়া, যাঁহার জন্য লোকান্তরে স্বকর্ম্ম ফলের ষষ্ঠাংশ আহরণ করিতেন, কোন ব্যক্তি সেই গয়রাজার ন্যায় কর্ম্ম করিতে পারে? যাঁহার যজ্ঞে প্রচুর সোমপানে যজ্ঞমূর্ত্তি ইন্দ্র অতিশয় মত্ত হইয়া, শ্রদ্ধাবিশুদ্ধ আত্মা ভক্তিযোগে সমর্পিত বন্যফল পূজা দ্রব্যের ন্যায় স্বীকার করিয়া লইতেন, কে সেই গয়রাজার অনুকরণ করিতে পারিবে? যাঁহার প্রীতি হইলে, দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সর্প, তৃণ প্রভৃতি আব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডের সদ্যঃপ্রীতি জন্মে, সেই সর্ব্বাত্মা শ্রীমান্ সাক্ষাৎ প্রীতি স্বরূপ ভগবান্ যে গয়রাজার যজ্ঞে প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন, কে তাঁহার তুল্য হইতে পারে?"

ক "মনোরমৃতমহিষী বিরজাম্নুষা সুতান্।
পুত্রং কৃৎস্নযুতং দ্যুমন্তং ধর্ম্মসারং ধৃতব্রতং।
আগ্নিষ্টোমমতীরাত্রং প্রদ্যুম্নং বিদ্মিমুল্মুকং
উল্মুকোঽনয়ৎ পুত্রান্ দুষ্মিণ্যাং ষড়্‌ভ আত্মবান্
কবিং সুপ্রতিমং তদ্বদভিজিতং ধর্ম্মসারথিং।" ১৩

শ্রীমদ্ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ ১৩ অধ্যায়,

"ঋষির্ব্বিজ্ঞানাক্ষবিদ্বরীয়ান্ বিদ্বরাসীত যট্ সুতান্।
বৃহিষদং পয়ং নরং সবনং গয়মেব চ।" ৭

(৪র্থ স্কন্ধ ২৫ অধ্যায়)

"সক্কাদৃতিপ্রভো [illegible] অবধারিতদারবা

অমরকোষ। ৬

খ সাক্ষাৎ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—
সত্ত্বতঃ কলা আত্মবস্ত্বাদিনাম্নঃ সদংশুভবাং লোকঃ॥ ৭ ৮

ব্রহ্মনারদ সংবাদে যাঁহারা ভগবানের যোগমায়া বিদিত আছেন, তাঁহাদের উল্লেখ প্রসঙ্গে পরব্রহ্মারও নাম আছে।

সর্ব্বৈঃস্বধর্ম্মৈঃ প্রজাপালন পোষণ প্রীণনোপলালনানুশাসন লক্ষণে নেত্যাদিনা চ ভগবতি মহাপুরুষে পরাবরে ব্রহ্মণি সর্ব্বাত্মনার্পিত পরমার্থ লক্ষণেন ব্রহ্মবিচ্চরণানুসেবয়োপাদিত ভগবদ্ভক্তিযোগেনচাভীক্ষ্ণশঃ পরিভাবিত বিশুদ্ধমতিরুপরতানা অন্যা আত্মনিস্বয়মুপলভ্যমান ব্রহ্মাত্মানুভবোঽপি নিরভিমান এবাবনিমকুতপৎ। তস্তেমাগাথাঃ পাণ্ডবেয়পুরারিদ উপগায়ন্তি ॥ ৮

পরংমৃপঃ কঃপ্রতিযাতি কর্ম্মভির্হবির্ভিরগ্নিস্তনুভির্মখৈগোপ্তা।
সমাগতশ্রীঃ সদসস্পতিঃ সতাং সৎসেবকোঽন্যো ভগবৎকলামৃতে ॥ ৯
যমভ্যসিঞ্চন্ পরয়ামুদাসতীঃ সত্যাশিষোদমকন্যা সরিদ্ভিঃ।
যজ্ঞপ্রজানাং দুদুহেধরাদিবো নিরাশিষ্যে গুণবৎসমুতোধা ॥ ১০
ছন্দাংস্তু কামস্য চ যস্য কামানুদুদুহুরাজহ্রুরথোবলিং নৃপাঃ।
প্রত্যঞ্চিতা যুধিধর্ম্মেণ বিপ্রাযদাশিষাং ষষ্ঠমংশং পরেত্য ॥ ১১
যজ্ঞাধ্বরে ভগবান ধ্বরাত্মা মঘোনিমাদ্যাতুরু সোমপীথে।
শ্রদ্ধাবিশুদ্ধাচল ভক্তিযোগসমর্পিতেজ্যা ফলমাজহার ॥ ১২
যৎ প্রীণনাদ্বর্হিষি দেবতির্য্যঙ্ মনুষ্য বীরুত্তৃণমাবিরিঞ্চাৎ।
প্রীয়েতসদ্যঃ সহবিশ্বজীবঃ প্রীতিস্বয়ং প্রীতিমগাদ্যথস্ত ॥" ১৩

(৫ম স্কন্ধ ১৫ অধ্যায়)

মহাভারতোক্ত অমূর্ত্তরয় তনয় পয়ের চরিতের সহিত ইহার ঐক্য দেখা যায়।

"মাসং পুমান্ সভবিতা মাসং স্ত্রীতবপোত্রজঃ।
ইত্থং ব্যবস্থারাকামং সুদ্যুম্নোঽবতুমেদিনীং ॥ ১২
আচার্য্যান্তু গ্রহাৎকামং লব্ধাপুংস্ত্বং ব্যবস্থয়া।
পালয়ামাসজগতীং নাভ্যানন্দন্ সুতং প্রজাঃ।
তৎস্তাৎ কবোগয়োরাজন্ বিমলস্তু ত্রয়ঃ সুতাঃ।
দক্ষিণাপথরাজানো বভুবুর্ধ্মবৎসলাঃ।১৩

৯ম স্কন্ধ ১ম অধ্যায়।

* "বেদাস্তুবন্ত পরমন্ত হি যোগমায়াং
মুহুংভবন্ত ভগবানব দৈত্যবর্য্যঃ।
পত্নীমনোঃ স চ মনুশ্চ তদাত্মজাশ্চ
প্রাচীনবর্হিষভুরন্ত ঋতব্রতেশ্চ ॥ ১২
ইক্ষ্বাকুমৈল মুচুকুন্দ বিদেহগাধি
রঘুম্বরীষ সগরা পরবাহযাত্তাঃ।
যাক্ষাত্রনর্ক শতধন্বনৃগন্তিদেবা
গোবতোদশিরসূর্দ্ধরয়ো দিলীপঃ ॥১৩

শ্রীমদ্ভাগবতে পুণ্যস্থল সকলের মধ্যে গয়শীর্ষেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।৩

দেবীভাগবতে।

দেবীভাগবতে যে অষ্টোত্তর শত দেবী পীঠের কথা আছে, তন্মধ্যে গয়ার কথাও উল্লিখিত হইয়াছে। গয়াপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম মঙ্গলা। এই অষ্টোত্তর শত পীঠ যে যে স্থানে সতীর ছিন্ন অঙ্গপতিত হইয়াছিল, তাহা কথা নহে, অন্যান্য মুখ্য পীঠস্থান সকলও ইহার অন্তর্ভুক্ত।*

সৌবর্ণ্যতক্ষ শিবিদেবল পিপ্পলাদ
সারস্বতোদ্ধব পরাশরভূরিষেণাঃ।
যেঽন্যে বিভীষণ হনূমদুপেন্দ্রদত্ত
পার্থাকিষেণ বিদুরশ্রুতদেববর্ষ্যাঃ ॥" ৩৪

(২য় স্কন্ধ ৭ম অধ্যায়।

এইরূপ মতুবতঃ নত পুত্র হইবেন।

৩ অথদেশান্ প্রবক্ষ্যামি ধর্ম্মাদি শ্রেয়প্রাবহান্ ॥ ২২
সর্ব্বপুণ্যতমোদেশঃ সৎপাত্রং যত্রলভ্যতে।
বিদ্বং ভগবতোযত্র সর্ব্বমেতচ্চরাচরং।
যত্রহব্রাহ্মণকুলং তপোবিদ্যাদয়ান্বিতং।
যত্র যত্রহরের্চ্চা স্যদেশঃ শ্রেয়সাং পদং ॥ ২৩
যত্রগঙ্গাদয়োনদ্যঃ পুরাণেষু চ বিশ্রুতাঃ।
সরাংসি পুষ্করাণীনি ক্ষেত্রাণ্যর্হাশ্রিতান্যুত।
কুরুক্ষেত্রং গয়শিরঃ প্রয়াগঃ পুলহাশ্রমঃ।
নৈমিষং ফাল্গুনং সেতুঃ প্রভাসোঽথ কুশস্থলী ॥ ২৪
বারাণসী মধুপুরী পম্পাবিন্দুসরস্তথা।
নারায়ণাশ্রমোনন্দা সীতারামাশ্রমাদয়ঃ ॥ ২৫
সর্ব্বে কুলাচলাবাজন্ মহেন্দ্রমলয়াদয়ঃ।
এতেপুণ্য তমাদেশা হরেরর্চ্চা শ্রিতাশ্চরে ॥ ২৬
এতান্ দেশান্ নিষেবেত শ্রেয়স্কামোঽভীক্ষ্ণশঃ।
ধর্ম্মোহত্রেহিতঃ পুংসাংসহস্রাধিকলোদয়ঃ ॥" ২৭

৭ম স্কন্ধ ১৩ অধ্যায়।

* "মায়াপুর্য্যাং কুমারীস্যাৎ সন্তানেললিতাধিকা।
গয়ায়াংমঙ্গলাপ্রোক্তা বিমলাপুরুষোত্তমে ॥ ৬৪

* ৩ ৩ ৩

ইমাশ্চাষ্টশতানি স্যুঃ পীঠানিযোনমেজয়ঃ।
তৎসর্ব্ব কান্তরাধ্যো দেবাস্তৎপরিকীর্ত্তিতাঃ ॥৮৩
সর্ব্বাদেব্যঙ্গভূতানি পীঠান্যেকধিতাধিত।
অন্যান্যপিত্রসঙ্গেন যানিমুখ্যানি ভূতলে ॥"৮৫

(দেবীভাগবত, ৭ম স্কন্ধ, ৩০ অধ্যায়।)

তন্ত্রোক্ত সতীর অঙ্গপাত হইতে উদ্ভূত; পীঠস্থান সমূহের মধ্যে গয়ার উল্লেখ নাই, অতএব ইহা মুখ্য পীঠ সকলের অন্তর্গত।

শ্রীবিভূতিনাথ দাস।

মীরাবাঈ।

ভারতের রাজ্ঞী মীরাবাঈ ১৫৭৩ বিক্রম সম্বতে রাজপুতনার চোকড়ী নামক কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মেড়তিয়ার সুপ্রসিদ্ধ রাঠোর রত্নসিংহের কন্যা এবং যোধপুর স্থাপনকারী রাও যোধাজীর পৌত্রী ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের অনন্যভক্ত ছিলেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ একটী গল্প বলা হয়। পাঠকদিগের অবগতির নিমিত্ত তাহা নীচে দেওয়া হইল।

যখন তিনি বালিকা মাত্র ছিলেন, তখন জনৈক সাধু তাঁহার পিতৃগৃহে অতিথি হন। এই সাধুর কাছে একটী শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি ছিল, মীরাবাঈ পিতার সহিত সাধুর সেবাদি করিতে তাঁহার কাছে গিয়া, ঘটনাক্রমে সেই মূর্ত্তি দেখিতে পান। মীরাবাঈ সাধুর নিকট মূর্ত্তির নাম জিজ্ঞাসা করিলে সাধু বলিলেন ইহা গোবর্দ্ধনগিরিধারী গোপালের মূর্ত্তি। তখন মীরাবাঈ সাধুকে বলিলেন যে মূর্ত্তিটী আমাকে দিয়া দিন, আমি ইহার পূজা করিব; সাধু কিন্তু মীরার এই কথায় সম্মত হইলেন না, তিনি তৎক্ষণাৎ রত্নসিংহজীর গৃহ ত্যাগ করিয়া নিকটস্থ গ্রামে গিয়া একজন গৃহস্থের বাটীতে অতিথি হন। এ দিকে মীরা শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিলাভ বিষয়ে নিরাশ হইয়া আহার নিদ্রা সমস্ত ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতে লাগিলেন। ছয়দিন অনাহারে মীরার দেহ অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িল দেখিয়া, রত্নসিংহ অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন, তিনি সাধুর নিকট গিয়া মীরার অনশনব্রতের কথা জানাইয়া মূর্ত্তিটী মীরাকে দিতে প্রার্থনা করিলেন। মীরার কথা শুনিয়া সাধুর হৃদয় একটু দয়ার্দ্রীভূত হইল সত্য কিন্তু তিনি মূর্ত্তিটী দিতে সম্মত হইলেন না, তবে বলিলেন যে শ্রীকৃষ্ণজী যদি তাঁহাকে এ বিষয়ে স্বপ্ন দেন তাহা হইলে তিনি মূর্ত্তিটী মীরাকে দিবেন। অগত্যা রত্নসিংহ হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু এদিকে ভক্তের দুঃখ দেখিয়া ভগবানের আসন টলিল। সেই দিন রাত্রেই সাধুর স্বপ্ন হইল এবং তিনি প্রতিজ্ঞানুসারে স্বয়ং গিয়া মূর্ত্তিটী মীরাবাঈকে দান করিলেন এবং মীরাকে শ্রীকৃষ্ণের মহাভক্ত জানিয়া মনে মনে নমস্কার করিলেন। মীরাও মূর্ত্তি পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তদবধি সকল সময়ই মূর্ত্তিটীকে পূজা করিতেন।

উপরোক্ত গল্পটী ছাড়া আমরা মীরাবাঈএর বাল্যে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের আর একটী প্রমাণ পাই। তুলসীদাসজীকে মীরাটে পত্র লিখিয়া ছিলেন তাহাতে লিখিয়াছেন বোলপনেতে মীরা কীনো গিরধর লাল মিতাই' অর্থাৎ আমি বাল্য-কাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণের ভক্তি করিয়া আসিতেছি। ইহা ছাড়া মীরাবাইর শৈশবের বিষয় আর কিছু জানা যায় না।

আনাজ পনের ষোলবৎসর বয়সে তিনি ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাণা সঙ্গাসিংহের পুত্র ভোজরাজের সহিত বিবাহিত হন এবং তদবধি তিনি চিতোর নগরীতে অবস্থান করেন। প্রবাদ আছে যে তিনি পিতৃগৃহ ত্যাগ করিবার সময় শ্রীকৃষ্ণের সেই সাধু প্রদত্ত মূর্ত্তিটী সঙ্গে লইয়া যান। চিতোরে গিয়াও তাঁহার জীবনে কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না, তিনি যেমন পিতৃগৃহে অধিকাংশ সময় শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া অতিবাহিত করিতেন সেখানেও তিনি সেই রকম করিতে লাগিলেন।

মীরা শ্রীকৃষ্ণজীকে কিভাবে পূজা করিতেন তাহা একটু বিশদভাবে বলা আবশ্যক। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আপনার পতি মনে করিতেন এবং সেই ভাবেই অনুপ্রাণিত হইয়া গীত ভজন আদি করিতেন। তিনি ভোজরাজকে একদিনও পতি ভাবেন নাই; অতএব তিনি যখন কয়েক বৎসরের মধ্যে মরিয়া যান তখন তিনি তাহার জন্য তিলমাত্র দুঃখিতা হন নাই। পতির মৃত্যুর পর মীরা-বাঈ আরও অধিক সময় শ্রীকৃষ্ণের পূজায় ব্যয় করিতে লাগিলেন এবং অধিক উৎসাহের সহিত সাধু সেবা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সাধুসেবা এবং শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তির সমক্ষে নৃত্যগীত তাঁহার দেবর বিক্রমাজীতের চক্ষে ভাল ঠেকিল না, তিনি মীরাবাঈকে ভজন পূজন হইতে নিরস্ত করিবার জন্য নানাবিধ পীড়ন করিতে লাগিলেন।

অবশেষে উৎপীড়নের মাত্রা এত অধিক বৃদ্ধি হইল যে মীরাবাঈ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অনেক ভাবিবার পর তিনি গোস্বামী তুলসীদাসজীকে একখানি পত্র লিখিয়া দিলেন। পত্রখানি ও মর্ম্মার্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"হে সুখনিধান, দুঃখহরণ তুলসীদাসজী, আমি আপনাকে বার বার প্রণাম করিতেছি, আপনি আমার দুঃখ রাশি হরণ করুন। আমি সাধু সঙ্গ এবং ভজনাদি করি বলিয়া আমার আত্মীয়-স্বজনগণ অত্যন্ত ক্লেশ দেন। আমি শৈশব হইতে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম করিয়া আসিতেছি, এখন তাহা কেমন করিয়া

ত্যাগ করিতে পারি? আপনি আমার পরম পিতার ন্যায় মাননীয়, এখন আমার কি করা উচিত তাহা বুঝাইয়া লিখিবেন"।

গোস্বামীজী নিম্ন লিখিতভাবে ইহার উত্তর দেন:—"যে ব্যক্তি রাম এবং সীতায় ভক্তি নয় (বিরোধ করে) তাহাকে বৈরীর ন্যায় ত্যাগ করিবে। প্রহ্লাদ পিতা, বিভীষণ ভ্রাতা, ভরত মাতা, বলি গুরু এবং ব্রজবনিতাগণ নিজ নিজ পতি ত্যাগ করিয়াছিল, কিন্তু তাহা সমস্তই মঙ্গলকারী হইয়াছিল। যে আত্মীয় স্বজন রাম ভক্ত নহে তাহাদের লইয়া কি হইবে যে অঞ্জন লেপন করিলে চক্ষু কাটিয়া যায় তাহা লাগাইয়া কি হইবে? যাঁহারা রামভক্ত তাঁহাদিগকেই পূজ্য এবং পরম হিতৈষী জানিবে"।

তুলসীদাসজীর এইরূপ পত্র পাইয়া মীরাবাঈ চিতোর ত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন এবং তদনুসারে একদিন রাত্রে চিতোর ছাড়িয়া মেড়তিয়ায় গমন করেন। মেড়তিয়ারও তাঁহার যেমন ভাল লাগিল না, তজ্জন্য তিনি বৃন্দাবন গমন করেন এবং সেখানে কিছুদিন থাকিয়া দ্বারকায় গমন করেন। অবশেষে কিছুদিন দ্বারকায় থাকিয়া তিনি সেইখানেই প্রাণত্যাগ করেন। হিন্দী ভাষার সুপ্রসিদ্ধ কবি এবং বিদ্বান ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র মহাশয়ের মত যে মীরাবাঈ ১০২০ সম্বত এবং ১৬৩০ সম্বতের মধ্যবর্ত্তী কোন সময় মারা যান।

মীরাবাঈ কয়েকখানি কবিতাগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, প্রত্যেক কবিতা পাঠ করিলেই তাঁহার অগাধ কৃষ্ণপ্রেমের কথা জানা যায়। তাঁহার গ্রন্থসমূহের ভাষা রাজপুতানায় হিন্দী এবং ব্রজের হিন্দী মিশ্রিত হইয়া সৃষ্ট হইয়াছিল। নমুনা স্বরূপ তাঁহার একটী কবিতা নীচে দেওয়া গেল।

'জো মৈ এয়সা জানতী রে প্রীতি কিয়ে দুঃখ হোয়।
নগর ঢ়ঁঢোরা ফেরতীরে প্রীত করো মত কোয়ে'॥

'যদি আমি জানিতাম যে প্রীতি করিলে দুঃখ হয় তাহা হইলে নগরে ঘোষণা করিয়া দিতাম যে কেহ প্রীতি করিও না।'

এই ক্ষুদ্র উদাহরণ হইতেই বুঝা যায় যে মীরাবাঈ একজন বড় কবি ছিলেন এবং তিনি যত বড় কবি ছিলেন তার চেয়ে বড় ভক্ত ছিলেন।

মায়ের ডাক।

(১)

ধ্বংসের করাল ছায়ার তরঙ্গ
ঘনায়ে আসিছে, করি মহারঙ্গ,
শিহরি আমার উঠিছে যে অঙ্গ,
তবুও সকলে ঘুমায়ে রবে ?

(২)

চারিদিকে অই উঠে হাহাকার,
অন্নবিনা সবে শবের আকার,
বসন বিহনে প্রেতের আচার,
দেখিয়াও কেন না জাগ তবে ?

(৩)

পল্লীর প্রাঙ্গণে কেবলি জঞ্জাল,
ঘরে ঘরে দেখ শুধুই কঙ্কাল,
মহামারী তার পাতিয়াছে জাল,
বিনাশ করিতে সন্তানে মোর।

(৪)

বিধবার অশ্রু পড়ে দিনরাত,
ফুকারি কাঁদিছে যতেক অনাথ,
পুত্র হারা কাঁদে শিরে হানি' হাত,
তবুও না ভাঙ্গে ঘুমের ঘোর ?

(৫)

নিশিতে আলোক জ্বলেনাক আর,
জমাট বাঁধিয়া রহে অন্ধকার,
চারি দিকে উঠে মশক-ঝঙ্কার
চর্ম্ম চটিকার পাখার ধ্বনি।

(৬)

পেচকের সেই কর্কশ ভীষণ
আরাব করিছে, ভীতিউৎপাদন,
মাঝে মাঝে তার ব্যথিত ক্রন্দন
ভাসিয়া আসিছে, তাইত শুনি।

(৭)

পল্লীর পুকুরে নাহি চরে হাঁস,
নাহিক তথায় কুমুদবিকাশ,
শৈবালেতে ঘেরা তার চারি পাশ,
কলেবর পূর্ণ কর্দ্দমে তার।

(৮)

জলাভাবে তাই আমার সন্তান,
দিনে দিনে সবে করিছে প্রয়াণ,
মহামারী করি' বদন ব্যাদান
গ্রাসিছে, কতই বলিব আর।

(৯)

জলনিগমের পথ পাওয়া ভার,
ভরিয়া উঠিছে গভীরতা তার,
বদ্ধজলে পড়ি' পত্র অনিবার,
পচিয়া দুর্গন্ধ বিস্তার করে।

(১০)

ধান্য-লক্ষ্মী গেছে আমায় ছাড়িয়া,
পাট দিনে দিনে উঠিছে বাড়িয়া,
যাহা কিছু পণ্য নিতেছে ঝাড়িয়া,
বিদেশীরা আসি', প্রত্যেক ঘরে।

(১১)

বাঁশঝাড় আর আমের বাগানে
ছাইয়া ফেলিছে যেখানে সেখানে,
একহাত ভূমি নাহি কোন স্থানে,
যেথায় নিশ্চিন্ত যাতায়ন রয়।

(১২)

পড়িছে ভাঙ্গিয়া দেব-আয়তন,
শৃগাল কুক্কুর-আবাস এখন,
ঘরবাড়ী ভগ্নস্তূপে মগন,
রহে তাহে চর্ম্মচটক চয়।

(১৩)

গাহেনাক কেহ কীর্ত্তনের গান,
চণ্ডীর চরিত মনসা ভাষান,
রামায়ণ আর ভারতের স্থান,
'আহা উহু'রবে পূরিছে শুনি।

(১৪)

সমাজ শৃঙ্খলা দূরে গেছে চলি,'
পল্লীতে পল্লীতে শুধু দলাদলি,
মানুষ নাহিক, তবুও কেবলি,
ঘন ঘন উঠে কলহধ্বনি।

(১৫)

এইত রে দশা জননীর তোর,
তবুও নাহিক ভাঙ্গে ঘুমঘোর,
বিচিত্র স্বপনে হইয়ে বিভোর,
না জানি কি ছবি আঁকিছ মনে।

(১৬)

স্বপনে বলিছ ভারত জননী,
আর শুনিতেছি স্বরাজের ধ্বনি,
পাঞ্জাবী মাদ্রাজী ভাই ভাই গণি',
হইতেছে চীনি' যতেক জনে।

(১৭)

কেবা সে পাঞ্জাবী? কেবা সে মাদ্রাজী?
যাপিল ভ্রাতার মেধা চাহি' খাদি,
যবদ্বীপে যেতে রয়েছে সে বাদী',
বে দিতেছে তুমি নাহিক হেথ?

(১৮)

কে সেই পঞ্জাবী ? যে করে লুণ্ঠন,
তোমার মাতার অঙ্গের ভূষণ ?
কে সেই মাদ্রাজী ? তোমার যে জন
মুখের গরাস কাড়িয়া লয় ?

(১৯)

ভারত তোমার নহেক জননী,
কেন মিছে তারে ডাকরে বাছনি,
'বন্দেমাতরম' যার মন্ত্র-ধ্বনি,
সেই বঙ্গ আমি জননী তোর।

(২০)

পঞ্জাবী মাদ্রাজী নহে তোর ভাই,
তোর ভাই আছে দেখ্ তোর ঠাঁই,
জীর্ণ শীর্ণ হয়ে রয়েছে সবাই,
দেখ্ চেয়ে ভাঙ্গি ঘুমের ঘোর।

(২১)

দেশ বিদেশের লোক করি' জড়,
কিসের স্বরাজ আজি তুমি গড় ?
কাজ কি স্বরাজ্যে তোর এত বড়,
ক্ষুদ্র বুকে মোর পাতলা তায়।

(২২)

আপনার ভাই লইয়া সকলে
আপন ভগিনী লয়ে দলে দলে,
পল্লীর প্রান্তরে পাদপের তলে,
তাহায় প্রতিষ্ঠা কর না হায়।

(২৩)

দূর করে দাও পল্লীর জঞ্জাল,
ছিঁড়িয়া ফেলগো যতেক শৈবাল,
তুলিয়া কর্দ্দম করি' তাল তাল,
পুকুরের জল নির্ম্মল কর।

(২৪)

জলপ্রণালীর করগো উদ্ধার,
যতেক জঞ্জাল কর পরিষ্কার,
আবার বিমল সমীর সঞ্চার
হউক, পল্লীর হৃদয়' পর।

(২৫)

পাট চাষ সবে কম করে দাও,
ধান্যের চাষেতে শকতি লাগাও,
বিদেশী আসিলে সবারে তাড়াও,
একমুষ্টি শস্য নালয়ে যায়।

(২৬)

তুলার চাষেতে মন দাও দেখি,
ঘরে ঘরে আন চরখা চরখী,
অনাথ বিধবা আর যত দুখী
আপনার অন্ন করুক তা'য়।

(২৭)

তাঁতী যুগী জোলা যত তাঁত পাতি',
বুনিতে থাকুক বস্ত্র দিবারাতি,
নব উৎসাহে উঠ সবে মাতি',
বসনের লাজ ঘুচায়ে দাও।

(২৮)

শিল্পী যারা আছে শিল্পে দিকমন,
ভাস্কর, ছুতার কর্ম্মকারগণ,
নব নব দ্রব্য করুক গঠন,
দেশে দেশে তাহা লইয়া যাও।

(২৯)

সমাজশৃঙ্খলা ফিরে আসে যা'তে,
সবাই মিলিয়া মন দাও তা'তে,
শান্তির হিল্লোল বহিবে তাহাতে,
আনন্দ সলিলে মগন র'বে।

(৩০)

তা' বলি সমাজ চুরমার করি,'
ভাঙ্গিয়া ফেলনা নব পথ ধরি ;
পিতৃপিতামহ-পথের উপরি
চলিলে, মঙ্গল নিশ্চয় হ'বে।

(৩১)

মাতৃভাষা তরে কর যতন,
গ্রামে গ্রামে পাঠশালার স্থাপন
করি, কর সবে জ্ঞান বিতরণ,
এইত তোমার স্বরাজ জানি।

(৩২)

ভাই ভগ্নী সব লইয়া আপন,
এ স্বরাজ তুমি কর স্থাপন,
ধ্বংসের আতঙ্ক হবে নিবারণ,
শুনহ মায়ের আহ্বান-বাণী।

বাঙ্গালী।

পুরাণ প্রসঙ্গ।

(শান্তিপুরস্থ "বঙ্গীয় পুরাণ-পরিষদের" চতুর্দ্দশ বার্ষিক অধিবেশন সভায় ১৬ আশ্বিন, ১৩২৯ সাল) লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

হিন্দুর নিকট বেদের যেমন প্রামাণ্য, পুরাণেরও সেইরূপ প্রামাণ্য। হিন্দুশাস্ত্র সমূহের মধ্যে বেদ মূল, তারপর স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাখা প্রশাখা। সুতরাং পুরাণের কথা আলোচনা করিতে হইলে, অতি সাবধানে, বিশেষ বিবেচনার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। দেখিতে হইবে অজ্ঞতা বশতঃ কোথাও যেন ঋষি-সিদ্ধান্তের বিপরীত কথা বাহির হইয়া না পড়ে। পুরাণ ব্যাখ্যার যোগ্যতা আমার নাই; সে বিষয়ে আমি একেবারেই অনধিকারী। তথাপি পুরাণ-সম্বন্ধে একটা কিছু বলিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া, যখন কিছু বলিতেই হইবে, তখন ঐ বিষয় অর্থাৎ পুরাণ-সম্বন্ধে যে সকল কথা শ্রবণগোচর হইয়া থাকে, তাহার কিছু সমালোচনাও তৎসহ নিজের বিবেক যাহা বলে, তাহা প্রকাশ করা বোধ হয় অসঙ্গত না হইতে পারে।

"পুরাণ" বলিলে আমরা কি বুঝি? সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত প্রভৃতি পঞ্চলক্ষণযুক্ত সৃষ্টি, স্থিতি, লয় তত্ত্বপ্রকাশক বিবরণ বিশিষ্ট পুরাতন কাহিনীর নামই "পুরাণ", ইহা পুরাতন বলিয়াই "পুরাণ।" আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হিন্দু শাস্ত্র সমূহের মধ্যে বেদ মূল; স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাখাপ্রশাখা। মূল হইতে শাখাপ্রশাখা, পত্র পুষ্প, পৃথক নহে; মূলেরই পরিণতি মাত্র! এক বীজের মধ্যেই পত্র পুষ্প, শাখাপ্রশাখা, কাণ্ডমূলাদি বৃক্ষের সমস্ত অংশই নিহিত আছে। সুতরাং মূল, শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প এই সমস্ত অংশই বৃক্ষ; কেবল মূলও বৃক্ষ নহে, কেবল শাখাপ্রশাখাও বৃক্ষ নহে, কেবল পত্র পুষ্পও বৃক্ষ নহে। কিন্তু মূল হইতে এই শাখাপ্রশাখাই শোভন ও সুন্দর। বৃক্ষের এই অংশেই ফুল ফোটে, ফল ধরে,—এই অংশের আশ্রয় থাকিয়াই নানাবিধ বিহঙ্গদল কল-কাকলীতে মুগ্ধ করে,—আতপ-তাপ-তপ্তজীবগণ এই অংশেরই ছায়াতলে উপবেশন করিয়া ক্লান্তি দূর করিয়া তৃপ্তি লাভ করে! এক্ষণে হিন্দুধর্ম্মরূপ মহাবৃক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আমরা এইরূপ

সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, হিন্দু ধর্ম্মের মূল বেদে, শাখাপ্রশাখা পত্র পুষ্প পুরাণ তন্ত্রাদির মধ্যে। পুরাণ সমূহ বেদেরই ব্যাখ্যাবিবৃতি। পুরাণ বর্ণিত বিষয় সমূহের ভিতর দিয়াই অরূপের স্বরূপ নির্ণয় হইয়া থাকে,—বাক্যমনের অতীত, ধ্যান ধারণার অতীত নির্ভ্যবস্তুকে সাক্ষাৎ করিবার কৌশল কল্পিত হইয়া থাকে। এই পুরাণবর্ণিত ধর্ম্মতত্ত্বের মধ্যেই, হিন্দুর উত্থান পতনের ইতিহাস, হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্মের ইতিহাস, হিন্দুর সাধন সিদ্ধির ইতিহাস, লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। প্রাচীন হিন্দুর বর্ত্তমান বংশধর আমরা সে ইতিহাসের সন্ধান রাখি না, সে ইতিহাসের অনুশীলন করি না, সে ইতিহাসের মহিমা বুঝি না। তাই আমরা হিন্দু বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও, আপনাকে আপনি ভুলিয়া গিয়াছি, বিশ্বের জনকোলাহলের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছি, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল প্লাবনে আজ ডুবিতে বসিয়াছি। হিন্দুর এমন একদিন ছিল, যখন ক্রিয়াকর্ম্মে পুরাণপাঠ হইত, লোকে আগ্রহ সহকারে পৌরাণিক-অমৃত কথা প্রাণ ভরিয়া শ্রবণ করিত। তখন পৌরাণিক চরিতাদর্শই হিন্দুর জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের আদর্শ ছিল। এমন এক সময় গিয়াছে, যখন পারলৌকিক মঙ্গল-কামনায় দেশের বিত্তশালী ব্যক্তিগণ উপযুক্ত ব্যক্তিদ্বারা পুরাণের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করাইয়া লোক শিক্ষার সহায়তা করিতেন। সমাজের জনসাধারণের মধ্যেও তখন শ্রবণ ভরিয়া পুরাণ শ্রবণের আগ্রহ ছিল; কারণ তখন পৌরাণিক ধর্ম্মে লোকের শ্রদ্ধা ছিল, বিশ্বাস ছিল। এখন বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির জন্য পুরাতন আদর্শ উপেক্ষিত, তাই লোকের মতিপ্রবৃত্তি পরকালের দিকে আর তত বিশ্বাসযুক্ত নহে। এখন ইহকালই সর্ব্বস্ব, তাই ইহকালের সুখবর্দ্ধক বিলাস-ব্যসন, ধন-দৌলত, মান-সম্ভ্রম লইয়াই সকলে ব্যস্ত; সুতরাং পুরাণের পঠন-পাঠন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আর পূর্ব্বের মত নাই। তাই সমাজ ক্রমেই পুরাণের সহিত অর্থাৎ পুরাতনের সহিত সম্বন্ধ শূন্য হইতেছে। নূতন মোহে মুগ্ধ হইয়া, কোন এক কাল্পনিক সুখের সন্ধানে ছুটিতেছে। হিন্দু সমাজের স্থিতি ও গতির পক্ষে এই ভাবের প্রবাহ একেবারেই অনুকূল নহে।

"ধৃ" ধাতু হইতে ধর্ম্মশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "ধৃ" ধাতুর অর্থ ধারণ করা। অতএব যাহা মানব সমাজকে ধারণ করে, রক্ষা করে, পোষণ করে, তাহাই মানবের ধর্ম্ম। এই যে লোকরক্ষাকর ধর্ম্ম, ইহা কখনই সার্ব্বভৌমিক হইতে পারে না। কারণ সকল ভূমি, অর্থাৎ সকল দেশ একই প্রকারের শীতোষ্ণাদি ভৌতিক নিয়মের অধীন নহে। কোন দেশ উষ্ণ প্রধান, কোন দেশ শীত

প্রধান, আবার কোন দেশ নাতিশীতোষ্ণ। সুতরাং ঐ সকল বিভিন্ন প্রাকৃতিক নিয়মাধীন স্থানের মানবও বাহ্যবিষয়ে বিভিন্ন প্রকৃতির হওয়াই স্বাভাবিক। অন্তর বা মনোরাজ্যও বাহ্য প্রকৃতির প্রভাবাধীন, দেশের প্রাকৃতিক বিষয় নিপতেই মানব পুরুষ-পুরুষানুক্রমে বদ্ধ হইয়া পড়ে, এবং পুরুষানুক্রমিক বদ্ধতাজনিত সংস্কারই তাহাকে অন্যজন হইতে পৃথক করিয়া পরিচিত করে। এই পার্থক্যের প্রকৃতিও প্রবৃত্তিই তাহাদের মানসিক বিশিষ্টতা। সুতরাং সংসারে কেহ ভোগী, কেহ ত্যাগী, একের পক্ষে যাহা পাপ, অন্যের পক্ষে তাহা পুণ্য। একদেশের লোককে বাঁচিতে হইলে পশুহনন না করিলে চলে না, কারণ সেদেশেই তথাকার প্রকৃতির উপযোগী খাদ্য, পশু লোমের বস্ত্র ও পশু চর্মই পরিধেয়। সে দেশে অহিংসা, হিংসাকেই ধর্ম্মের আসন ছাড়িয়া দিয়াছে। আবার অন্যদেশে কৃষিজাত শস্যসম্ভারই জীবন ধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয়; কৃষিজাত তন্তুনির্ম্মিত বা সূত্রনির্ম্মিত বস্ত্রই পরিধানের উপযোগী; সে দেশে গোহত্যা মহাপাপ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং এই দুই ভূমির অর্থাৎ দেশের লৌকিক ধর্ম্ম এক নহে—পৃথক। একে অন্যের ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে বাঁচে না; ফল প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।* লৌকিক ধর্ম্মের ভিত্তির উপরেই পারলৌকিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং পারলৌকিক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইলে, লৌকিক ধর্ম্মকে একেবারে উপেক্ষা করিলে চলে না; বরং রক্ষা করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই কারণে সকল দেশের পারলৌকিক ধর্ম্মের সহিত লৌকিক ধর্ম্ম মিশিয়া গিয়াছে। এমন ভাবে মিশিয়াছে যে, পৃথক করিবার আর উপায় নাই; এটিকে অন্যটি হইতে পৃথক করিতে গেলে, অন্যটি অঙ্গহীন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। সকল দেশের সকল জাতির মধ্যেই কিছু আর্য্য বিশেষত্ব ও কিছু বিশিষ্টতা আছে। সেই বিশিষ্টতার ব্যাখ্যানকল্পে যে যে দেশেই পুরাণ সমূহ রচিত বা সঙ্কলিত হইয়াছিল; এবং তার সাক্ষ্যে ছিল পুরাতন কাহিনী, আর আধিভৌতিকতত্ত্বের মনোজ্ঞ চিত্র। সৃষ্টির পূর্ব্বে কি ছিল কেন ও কেমন করিয়া সৃষ্টি হইল, কে সৃষ্টি করিল, সৃষ্টজীবের বিকাশ ও পরিণতি, আধিভৌতিকের পুরাতন তত্ত্বকে ভিত্তি করিয়া, তার উপর মানবের ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুখদুঃখ স্থিতি পরিণতির বিবরণ বিশিষ্ট, সুন্দর অথচ সুদৃঢ় সৌধনির্ম্মাণ করা হইয়াছিল।

---

*"বৃহন্নারদীয়পুরাণ" ২২শ অধ্যায়, ১৭শ শ্লোকের অনুবাদ,—"যাহারা যে দেশে বাস করে তাহারা সেইদেশের আচার প্রতিপালন করিবে। যে ব্যক্তি তাহা না করে, তাহাকে পতিত বলিয়া বহিষ্কৃত জানিবে।" এই আচারই লৌকিক ধর্ম্ম।

ইহা পুরাতনের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই ইহার নাম দেওয়া হইয়াছিল "পুরাণ"। পুরাণের সংখ্যা দুই একখানি নহে, অনেক। মহাপুরাণই অষ্টাদশ খানি। বিষ্ণুপুরাণে মহাপুরাণগুলির এইরূপ নাম ও পর্য্যায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা ১ম ব্রহ্মপুরাণ, ২য় পদ্মপুরাণ, ৩য় বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ শিবপুরাণ, ৫ম ভাগবতপুরাণ, ৬ষ্ঠ নারদীয়পুরাণ, ৭ম মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ৮ম অগ্নিপুরাণ, ৯ম ভবিষ্যপুরাণ, ১০ম ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ১১শ লিঙ্গপুরাণ, ১২শ বরাহপুরাণ, ১৩শ স্কন্দপুরাণ, ১৪শ বামনপুরাণ, ১৫শ কূর্ম্মপুরাণ, ১৬শ মৎস্যপুরাণ, ১৭শ গরুড়পুরাণ, ১৮শ ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ। বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতোক্ত মহাপুরাণসমূহের নাম ও পর্য্যায় একই। ভাগবতে কেবল প্রত্যেক মহাপুরাণের শ্লোক সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। বৈষ্ণব ভাগবতের মতে এই অষ্টাদশ মহাপুরাণের শ্লোকসংখ্যা চারি লক্ষ।

তারপর উপপুরাণ। তা'র সংখ্যাও অষ্টাদশ বলিয়া কথিত হইয়াছে। কূর্ম্মপুরাণোক্ত উপপুরাণ গুলির নাম এই,—আদি, নৃসিংহ, স্কন্দ, শিবধর্ম্ম, আশ্চর্য্য, নারদীয়, কপিল, বামন, ব্রহ্মাণ্ড, বরুণ, সাম্ব, কালিকা, মহেশ্বর, সৌর পরাশর, মারীচ, ভার্গব। এস্থানে নাম ১৭শটী মাত্র প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে; কারণ ৯ম সংখ্যক উপপুরাণের নাম লিখিত হয় নাই। কিন্তু এই কূর্ম্মপুরাণে মহাপুরাণগুলির যে নামের তালিকা আছে, তাহাতে শিবপুরাণ ও বায়ুপুরাণের নাম থাকায় সংখ্যায় ১৯শ খানি পাওয়া যায়। কিন্তু অন্যত্র এই দুখানিই মহাপুরাণরূপে গণিত হয় নাই; কোথাও শিবপুরাণ মহাপুরাণের মধ্যে কোথাও বায়ুপুরাণ মহাপুরাণের মধ্যে গণিত হইয়াছে; সুতরাং বিষ্ণু ও ভাগবত-পুরাণের সহিত মিলাইয়া এই কূর্ম্মপুরাণোক্ত বায়ুপুরাণকে মহাপুরাণের তালিকা হইতে উপপুরাণের তালিকাভুক্ত করিলেই মহাপুরাণ ও উপপুরাণের সংখ্যা অষ্টাদশখানি করিয়া হয়। ভাগবত পুরাণে, বিষ্ণুপুরাণে ও কূর্ম্মপুরাণে কল্কিপুরাণের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

এই পুরাণ পরিচয়ে অবগত হওয়া যায় যে, একস্থানে যাহা মহাপুরাণ বলিয়া গণিত হইয়াছে, অন্যত্র তাহাই উপপুরাণের অন্তর্গত বলিয়া কথিত হই-য়াছে। যেমন শিবপুরাণ ও বায়ুপুরাণ। বিষ্ণুপুরাণ ও কূর্ম্মপুরাণে অনুক্ত "বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ" নামে একখানি পুরাণে ১৮শ সংখ্যক করিয়া মহাপুরাণ ও উপ-পুরাণের যে নামের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে নারদীয় ও বামন পুরাণের নাম উপপুরাণের তালিকায় আছে, কিন্তু নৃসিংহ ও বায়ুপুরাণের নাম মহাপুরা-ণের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং এক স্থানে যাহা মহাপুরাণের অন্তর্গত,

অন্যত্র তাহাই উপপুরাণের মধ্যে গণিত। পুরাণ ও উপপুরাণের সংখ্যা ১৮+১৮ খানি করিয়া কথিত হইলেও নানাপুরাণোক্ত নামের তালিকা পাঠে জানা যায় যে, পুরাণ উপপুরাণের সংখ্যা ৩৬ খানি নহে, আরও অধিক।

ভাগবত পুরাণ দুইখানি। একখানি শ্রীমদ্ভাগবত, অপর খানি দেবী ভাগবত। বৈষ্ণব সম্প্রদায় শ্রীমদ্ভাগবতকেই মহাপুরাণ বলিয়া বিবেচনা করেন। অপরপক্ষে শাক্ত সম্প্রদায় শ্রীমদ্দেবী ভাগবতকেই মহাপুরাণরূপে আদর করেন। এ সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য অপেক্ষা কোন শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতের মন্তব্যই দেওয়া যোগ্য, এজন্য শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়, তাঁহার সম্পাদিত "দেবী ভাগবত" গ্রন্থের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন, এখানে তাহাই উদ্ধৃত হইল।

পণ্ডিত মহাশয় বলিতেছেন,—"দেবী ভাগবত ভগবান বেদব্যাসের অনুপম লেখনী প্রসূত অন্যতম মহাপুরাণ। সম্প্রদায় বিশেষে দেবীভাগবতকে নাম শ্রীমদ্ভাগবত এবং প্রচলিত শ্রীমদ্ভাগবতের নাম বিষ্ণুভাগবত। বৃহদ্ধি টীকাকার নীলকণ্ঠ ভট্ট দেবীভাগবতকেই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এই সাম্প্রদায়িক ভাবের অনুবর্ত্তন করি নাই। শাস্ত্র তাৎপর্য্য যথা শক্তি হৃদয়ঙ্গম করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, দেবী ভাগ ও শ্রীমদ্ভাগবত উভয়ই মহাপুরাণ,—নামের জন্য কিছুই আসিয়া যায় না। এই পুরাণদ্বয়ের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যে মত ভেদ পরিদৃষ্ট হয়, তাহার মীমাংসার আভাস মাত্র আমরা এস্থানে দিতেছি। সকল পুরাণের সর্ব্ববিষয়ের তত্ত্ব এই শ্রীভিক্রমে সুধীপাঠকগণ করিয়া লইতে পারিবেন। বিরোধ ও মীমাংসা মূল অবলম্বন—অধিকারীভেদ এবং আপেক্ষিক চিত্তশুদ্ধি। যে ব্যক্তি মাতৃভাবে পরমেশ্বরের উপসনার অধিকারী, এই দেবীভাগবত তাহার সমাধানের অবলম্বন। মাতৃভাবে উপসনা হইতে কিরূপে মুক্তিলাভ করা যায়, তাহা করিয়া এনিষ্ঠ হইতে হয়, এই উপদেশ সংক্ষেপে, বিস্তারে, আলোচনায়, দেবীভাগবতে সাদ্যন্ত বিজড়িত। আর যিনি মাতৃভাবে পরমেশ্বরের উপাসনার অধিকারী নহেন,—কিন্তু মধুরভাবে তাঁহার উপাসনার অধিকারী, তাঁহার অসাধারণ অবলম্বন শ্রীমদ্ভাগবত। ০ ০ ০ বিবিধ অধিকারীর চিত্তশুদ্ধি যে উপায়ে সাধিত হয়, তাহার উপদেশও ঐ বিবিধ গ্রন্থে আছে।"

বাস্তবিকই তর্করত্ন মহাশয়ের মীমাংসা যে যুক্তিযুক্ত, তাহাতে আর কোন সংশয়ই থাকিতে পারে না।

আমাদের দেশের লোকের সংস্কার যে, সমস্ত পুরাণগুলিই মহর্ষি বেদব্যাসের

রচিত। এই বিশ্বাস কতখানি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা বিচার্য্য। "বিষ্ণুপুরাণ" ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে পরাশর কহিলেন,—"পুরাণার্থ বিশারদ ভগবান বেদব্যাস, আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পশুদ্ধির সহিত পুরাণ সংহিতা রচনা করিলেন। বেদব্যাসের সূতজাতীয় লোমহর্ষণ নামে বিখ্যাত অপর একজন শিষ্য ছিলেন। মহামুনি ব্যাস তাঁহাকে পুরাণ সংহিতা অধ্যয়ন করাইলেন। লোমহর্ষণের ছয় জন শিষ্য। তাঁহাদের নাম,—সুমতি, অগ্নি বর্চ্চা, মিত্রয়ু, শাংশপায়ন, অকৃতব্রণ ও সাবর্ণি। কাশ্যপ বংশীয় অকৃতব্রণ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন, ইঁহারা লোমহর্ষণ হইতে অধীত মূল সংহিতা অবলম্বনে, প্রত্যেকে এক এক খানি পুরাণ সংহিতা রচনা করেন। হে মুনে! ঐ চারি সংহিতার সার গ্রহণ করিয়া আমি এই পুরাণ সংহিতা রচনা করিয়াছি। ব্রাহ্মপুরাণ সমুদয় পুরাণের আদি বলিয়া কীর্ত্তিত।"

এখানে আমরা পাঁচখানি পুরাণ সঙ্কলনকার পাঁচ ব্যক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইতেছি। ১ম মহর্ষি বেদব্যাস একখানি পুরাণ সঙ্কলন করেন। ব্রাহ্মপুরাণ যখন সকল পুরাণের আদি, তখন মহর্ষির পুরাণের নাম "ব্রাহ্মপুরাণ"ই হইতে পারে। তা'রপর ঐ পুরাণ মহর্ষি বেদব্যাস, অন্যতম শিষ্য রোম হর্ষণকে অধ্যয়ন করাইলেন। রোমহর্ষণের ছয়জন শিষ্যের মধ্যে তিন জন আবার পৃথক পৃথক তিন খানি পুরাণ সংহিতা করিলেন। তা'রপর পরাশর কহিতেছেন, "ঐ চারি সংহিতার সারগ্রহণ করিয়া আমি এই বিষ্ণুপুরাণ সংহিতা রচনা করিয়াছি।" এবং অন্যত্র বলিতেছেন, "আমি তোমার নিকট যে পুরাণ বলিতেছি, ইহার নাম বিষ্ণুপুরাণ। ইহা পদ্মপুরাণের শেষে রচিত হইয়াছে।" তবেই দেখা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মপুরাণ ব্যতীত অন্যপুরাণগুলি মহর্ষি বেদব্যাসের দ্বারা সঙ্কলিত নহে। তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যগণ কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিবিধ পুরাণ উপপুরাণ সমূহ রচিত ও লোকসমাজে প্রচারিত হইয়াছে। এবং "পদ্মপুরাণ" বিষ্ণুপুরাণের পূর্ব্বে সঙ্কলিত হওয়ায় জানা যাইতেছে যে, রোমহর্ষণের শিষ্যত্রয়ের রচিত তিনখানি অন্যতমই "পদ্মপুরাণ।"

উপপুরাণসমূহ যে মহর্ষি বেদব্যাসের, রচিত নহে পরবর্ত্তী সময়ে পৃথক পৃথক ব্যক্তিকর্ত্তৃক রচিত, তাহা "কূর্ম্মপুরাণ" প্রথম অধ্যায় পাঠ করিলেই অবগত হওয়া যায়। তাহাতে লিখিত আছে,—"মুনিরা এই অষ্টাদশ পুরাণ শ্রবণ করিয়া সংক্ষেপে অন্যান্য উপপুরাণ লিখিয়াছেন।"

কালক্রমে পুরাণগুলির যে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, অর্থাৎ কোথাও

কিছু পরিত্যক্ত বা কোথাও কিছু নূতন সংযুক্ত করা হইয়াছে, তাহাতে অবিশ্বাস করা যায় না। এইরূপ পরিবর্ত্তনের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন পুঁথির ভিন্ন ভিন্ন পাঠ দেখা যায়। দু'দশটা শ্লোক নহে, স্থানে স্থানে অধ্যায়কে অধ্যায় নূতন রচনা করিয়া যোগ করা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ আমরা স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ড গ্রহণ করিতে পারি। স্কন্দপুরাণ ২৩২ অধ্যায়ে দান, পাঠ, শ্রবণাদির ফলশ্রুতি এইরূপ,—"রেবাচরিত সর্ব্বপাপের ভূষণ। যে মানব এই উত্তমচরিত্র লিখাইয়া দ্বিজাতিকে দান করে, নর্ম্মদার অখিল তীর্থের স্নান দানে যে ফল, তাহারও নিঃসংশয়ে সেই ফল হইয়া থাকে। * * * এই আপনাদিগের নিকট নর্ম্মদা চরিত কীর্ত্তন করিলাম।" ইত্যাদি সুতরাং এই স্থানেই রেবা বা নর্ম্মদা খণ্ড শেষ হইল। প্রত্যেক গ্রন্থই এইরূপ ফলশ্রুতিরপর শেষ হইয়া থাকে। যেখানেই প্রদেশ হইতে সংগৃহীত পুস্তকের সমাপ্তিও এইখানেই। কিন্তু বাঙ্গালাদেশের পুস্তকে ইহারপর সত্যনারায়ণের ব্রতকথা, চারিটি অধ্যায় লিখিত হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয় এই উপন্যাস মূল গ্রন্থের সহিত রচিত হয় নাই। পরবর্ত্তী সময়ে বাঙ্গালার কোন ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত এই উপখ্যান রচনা করিয়া পুস্তকের শেষে যোগ করিয়া দিয়াছেন। স্থান ও পাত্রাদির নামও বঙ্গের নিজস্ব। যেমন, স্থান "কাশীপুর, আর নাম "লীলাবতী" ও "কলাবতী"।

কোন কোন পুরাণের শ্লোক সংখ্যাতে ও মতান্তর দেখা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের ১২শ স্কন্ধ ১৩শ অধ্যায়ে ও দেবীভাগবতের ১মস্কন্দ ৩য় অধ্যায় মহাপুরাণ সমূহের শ্লোক সংখ্যা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে পদ্মপুরাণের শ্লোক সংখ্যা ৫০ হাজার; কিন্তু দেবী ভাগবতের মতে পদ্মপুরাণের শ্লোক সংখ্যা ৫৫ হাজার। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে অগ্নিপুরাণের শ্লোক সংখ্যা ১৫ হাজার ৪শত; কিন্তু দেবী ভাগবতের মতে অগ্নিপুরাণের শ্লোক সংখ্যা ১৬ হাজার। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে স্কন্দপুরাণের শ্লোক সংখ্যা ৮১ হাজার ১ শত এক, কিন্তু দেবী ভাগবতের মতে স্কন্দপুরাণের শ্লোক সংখ্যা ৮১ হাজার। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, পুরাণাদির মধ্যে অনেক কথা মূলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছেন,—"পুরাণ" অর্থে আদৌ পুরাতন পশ্চাৎ পুরাতন ঘটনার বিবৃতি। সকল সময়েই পুরাতন ঘটনা ছিল, এ জন্য সকল সময়েই পুরাণ ছিল। বেদেও পুরাণ আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে গোপথ ব্রাহ্মণে, আশ্বলায়ন সূত্রে, অথর্ব্ব সংহিতায় বৃহদারণ্যকে, ছান্দোগ্য উপনিষদে, মহাভারতে, রামা-

গ্রন্থে মানবধর্ম্ম শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই পুরাণ প্রচলিত থাকার কথা আছে। কিন্তু ঐ সকল কোন গ্রন্থেই বর্ত্তমান কোন পুরাণের নাম নাই।"

বাস্তবিকই সকল সময়ে সকল জাতির মধ্যেই "পুরাণ" বা পুরাতন কাহিনী থাকে; সুতরাং তখনও ছিল, এখনও আছে। কিন্তু যখন আর্য্যহিন্দুর "পুরাণ" সংকলিত হয় নাই, তখন তাহার কোন বিশেষ নাম ছিল না; পুরাণ, পুরাণই ছিল। বেদব্যাস যেমন বেদ সঙ্কলন করেন, তেমনই একখানি পুরাণও সঙ্কলন করিয়া তাহার কোনও একটা বিশেষ নাম দিয়াছিলেন। আমরা বিষ্ণুপুরাণের মতানুযায়ী তাহাকে "ব্রাহ্মপুরাণ" নামে অভিহিত করিতে পারি। তা'র পর ঐ পুরাণকে আদর্শ করিয়া যতপুরাণ উপপুরাণের সংগ্রহ হইয়াছে সকলই মহর্ষি বেদব্যাসের নামে চলিয়া গিয়াছে। তাই পুরাণ পাঠের পূর্ব্বে নারায়ণাদির সঙ্গে বেদব্যাসকেও স্মরণবন্দনের রীতি আছে।

আজকা'ল একশ্রেণীর পণ্ডিত-মহাশয়গণ সৌরজগতের সমস্ত বিসয়েরই জন্মপত্রিকা বাহির করিবার জন্য মস্তিষ্ক সঞ্চালন করিতেছেন। সুতরাং এই সকল পণ্ডিত দিগের নিকট হিন্দুর বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, তন্ত্র কিছুই বাদ যায় নাই। বিলাতের একজন এই শ্রেণীয় পণ্ডিত (wison) বলেন, পদ্মপুরাণ খ্রীষ্টীয়-১৩শ হইতে ১৬শ-শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়াছিল; এবং বিষ্ণুপুরাণ খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। অর্থাৎ বিষ্ণুপুরাণের বয়স সহস্র-বৎসর ও পদ্মপুরাণের বয়স চারিশত বৎসর মাত্র! এ হিসাবে পদ্মপুরাণকে চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী গ্রন্থ বলিতে হয়! উপরে বিষ্ণুপুরাণ হইতে যে উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, "ইহা (অর্থাৎ বিষ্ণুপুরাণ) পদ্মপুরাণের শেষে রচিত হইয়াছে।" উইলসন সাহেব বলিতেছেন, বিষ্ণুপুরাণ পদ্মপুরাণের পূর্ব্বে রচিত। আমরা এখন কাহা'র কথা বিশ্বাস করিব? উইলসন সাহেবের মতানুসারে পদ্মপুরাণের বয়স যদি ৪শত বৎসর মাত্র হয় এবং বিষ্ণুপুরাণের বয়স সম্বন্ধে যদি তাহার নিজের কথা বিশ্বাস করিয়া, তাহাকে পদ্মপুরাণ হইতে কনিষ্ঠ বলিতে হয়, তাহা হইলে বিষ্ণুপুরাণকে ইংরেজ রাজত্বের দু'শত বৎসর পশ্চাৎবর্ত্তী সময়ে সংকলিত গ্রন্থ বলিতেই হইবে! ভরসা করি কেহই বিষ্ণু-পুরাণের উক্তি উপেক্ষা করিয়া উইলসন সাহেবের অনুবর্ত্তী হইবেন না।

এইরূপ বয়স নির্ণয় সম্বন্ধে বিদেশীয় পণ্ডিতগণের গবেষণার একটী হাস্যকর উদাহরণ, এখানে আনুষঙ্গিক হইলেও দিতে হইল। ইহাতে বুঝিতে পারিবেন, ইহাঁদিগের মত কিরূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বিগত বৈশাখ মাসে অর্থাৎ

এপ্রেল মাসের শেষে, আমেরিকার এক পণ্ডিত সভায় পৃথীবীর বয়স সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। একজন পণ্ডিতের মতে পৃথিবীর বয়স, ৭কোটি বৎসর ও ১৫কোটিবৎসরের মাঝামাঝি! ন্যূনপক্ষে ৮কোটি বৎসর! খুব সূক্ষ্ম হিসাব বটে! আর একজন পণ্ডিত আবার ইঁহাকেও পরাস্ত করিয়াছেন! তিনি বলেন, পৃথিবীর বয়স ৮০ লক্ষ বৎসর হইতে ১৭০ কোটি বৎসর! কোথায় ৮০ লক্ষ অর্থাৎ এককোটি বৎসরও পূর্ণ নহে; আর কোথায় ১৭০ কোটি বৎসর! কি অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য!

যাহা হউক বিদেশীয় পণ্ডিতেরা যে কোন কারণেই হউক, এদেশের সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া, সে ভাষায় রচিত শাস্ত্র সমূহের আলোচনায় আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা কি করি? আমাদের দেশ, আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের ভাষা, আমাদের শাস্ত্র, আমরা সে সকলের কোন সংবাদই রাখি না, সংবাদ রাখা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনাও করি না। সুতরাং আমরা এখন ছেলেগুলির জন্য সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া, তাহাদিগকে ইংরেজী স্কুলে পাঠাই। তথায় তাহারা বিদেশী ভাষার সঙ্গে বিদেশী হাব-ভাব, প্রথা-পদ্ধতি ও শিক্ষা লাভ করে, তাই এখন আমাদের সমাজে যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের কাছে বেদ চাষার গান, পুরাণ সকল গল্পিকাদেবীর গালগল্প, তন্ত্রসমূহ মদ্যপায়ী লম্পটের উক্তি! ঐ সকল বিষয় নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিবার শক্তিও নাই, প্রবৃত্তিও নাই! আছে কেবল অন্ধ অনুবর্ত্তিতা পরের কথা প্রতিধ্বনি করিয়া বিদ্যাপ্রকাশের বৃথা চেষ্টা! আমরা এখন আমাদের দেশকে ভুলিয়াছি, জাতিকে ভুলিয়াছি,—পিতৃপিতামহের স্মৃতি নিকেতন শান্তিনিকেতন—আনন্দ নিকেতন হইতে আমাদের মনকে সরাইয়া একেবারে সাগর পারে প্রেরণ করিয়াছি। পারলৌকিক ও ইহলৌকিক সর্ব্ব প্রকার শুভাশুভের ভার পরের হাতে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে নিদ্রা যাইতেছি। নিজের ভাষা—মাতৃভাষার প্রতি অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক, পরের ভাষায় পণ্ডিত সাজিতেছি,—দিবানিশি পড়াপাখীর মত বুলি কপ্‌চাইতেছি,—নিজের ভাবার সঙ্গে পরের ভাষা মিলাইয়া খিচুড়ি ভাবার সৃষ্টি করিতেছি! নিজের জাতি ভাই হইতে দূরে যাইয়া—তাহাদের সহিত সম্বন্ধ বর্জ্জন করিয়া, পরের সঙ্গে ঘনিষ্টতা করিতেছি,—পরের সঙ্গে প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ পাতাইতেছি,—পরের পদসেবায় গৌরব অনুভব করিতেছি। আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের শাস্ত্র, সব বিসর্জ্জন দিয়াছি, কেননা ও সকল পূর্ব্ব পুরুষের কুসংস্কারমূলক অসভ্যতার

সাক্ষাৎ নিদর্শন। আমাদের মধ্যে এসকল পরিবর্ত্তন বৈদেশীক ভাবপ্রবাহেরই প্রকৃষ্ট পরিচয়। আমরা ভাবে আত্ম বিক্রয় করিয়াছি অনেকদিন আত্মনাশের উদ্যোগ করিতেছি। কিন্তু বাস্তবিক আত্মনাশই কি এ পুরাতন জাতির চরম পরিণতি।

যখন ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন ভগবান আপনি আপনাকে সৃজন করিয়া, সাধুদিগের পরিত্রাণ, অসাধুদিগের বিনাশ, এবং ধর্ম্মের সংরক্ষণ করিয়া থাকেন। সুতরাং আমাদিগের নিরাশ হইবার কারণ নাই। এইরূপ ভগবান শরীর গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার শক্তি নানা ভাবে প্রকাশ হইয়া পড়ে, অনেকের মধ্যেই ভগবানের প্রেরণা আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারই বলে মানব আবার আত্মরক্ষার আয়োজন করে। অধঃপতিত ভারতবর্ষেরও আজ সেইদিন উপস্থিত হইয়াছে—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উষার আভায় প্রাচীদেশ রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। এখন চারিদিকেই জাগরণের স্পন্দন অনুভূত হইতেছে, প্রাণের স্পন্দন নানাভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে, ভারতবর্ষ তাহার যুগযুগান্তরের সাধনলব্ধ জ্ঞানের সন্ধানে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। শান্তিপুরের এই "পুরাণ-পরিষৎ" প্রতিষ্ঠার মূলেও সেই প্রাণপ্রদ স্পন্দনই কার্য্য করিতেছে। এখানেও সেই সূর্য্যোদয়ের অরুণ আভাই উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে! আর্য্য হিন্দু সভ্যতার ইতিহাসের আলোক, এই আত্মবিস্মৃত জাতির চক্ষে প্রতিফলিত করিয়া ধর্ম্মে, কর্ম্মে, জ্ঞানে, গৌরবে, তাহাকে উন্নত ও মার্জ্জিত দৃষ্টি বিশিষ্ট করিবার জন্যই এই পুরাণ-পরিষদের উদ্যোগ আয়োজন। এই আয়োজনের উপর ভগবানের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক!

বর্ত্তমানে এই "পুরাণ-পরিষৎ" কেবল পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থাই করিয়াছেন। আমার বোধ হয়, কেবল এইরূপ দু'একখানি পুরাণের পরীক্ষা গ্রহণেই পরিষদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, হইতে পারে না। পরিষৎ কর্ত্তৃক পৌরাণিক গবেষণার ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই জন্য প্রথমেই ভারতবর্ষে প্রচলিত পুরাণ ও উপপুরাণ সমূহের মূল, তাহার টিকা, বা কোন প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদ, এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক পণ্ডিতদিগের দ্বারা সংগৃহীত ও প্রকাশিত পুরাণাদির সংগ্রহ সর্ব্বাগ্রেই প্রয়োজন। পুরাণ-পরিষদের যদি এইরূপ নিজস্ব সংগ্রহশালা না থাকে, তাহা হইলে পরিষৎকে নানাবিষয়ে নানাবিধ অসুবিধা ভোগ করিতে হইবেই! তা'রপর পরিষদের প্রচার বিভাগ থাকাও প্রয়োজন। পৌরাণিক গবেষণা মূলক প্রবন্ধাদি প্রচারের ব্যবস্থা এই প্রচার বিভাগেরই নির্দ্দিষ্ট কার্য্য

হওয়া উচিত। এই দুই ব্যবস্থার পর পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হইলে, তাহা শোভন ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইতে পারে। এই নিয়মে পুরাণ-পরিষদের কার্য্য চলিলে, পরিষদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে আর কোন বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইবে বলিয়া বোধ হয় না। যে মহাশক্তির শক্তি পাইয়া অতি ক্ষুদ্র পরমাণু হইতে বৃহৎ হইতে বৃহত্তম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত পরিচালিত ও পরিপালিত হইতেছে, সেই মহাশক্তির শক্তি লাভে সমর্থ হইয়া "পুরাণ-পরিষৎ" জয়যুক্ত হউক!

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঘরের ডাকাত।

(১)

"রাম সিং দাঁড়াও, বাক্সটী রাখ, আমি যেন কি ভুল করেছি" এই কথা বলিয়াই কিরণবাবু তাঁহার হাতের গড়গড়ার নলটী টেবিলের উপরে রাখিয়া চট্ করিয়া বাক্সটী খুলিয়া, অনেকগুলি সরকারী লেফাপার মধ্য হইতে একটী লাল টুক্‌টুকে চতুষ্কোণ লেফাপা বাহির করিলেন এবং বাক্সটী বন্ধ করিয়া আফিসে লইয়া যাইতে আদেশ দিলেন।

খামখানার উপরে "চিনিবে কি" সুস্পষ্ট সুন্দর বাঙ্গালা অক্ষরে এবং প্রাপকের নাম ও ঠিকানা বড়ই কাঁচা ইংরেজী অক্ষরে লেখা ছিল। এতদ্ব্যতীত প্রেরিকার নাম কিম্বা ঠিকানা কিছুই উপরে ছিল না। কিরণবাবু ২।৩ বার বিশেষ মনোযোগের সহিত চিঠিখানার লেখার প্রতি লক্ষ্য করিয়াও, চিঠিখানি কাহার নিকট হইতে আসিয়াছে ধরিতে পারিলেন না। তখন অতি সন্তর্পণে খামটী খুলিয়া, চিঠিখানার নিম্নভাগে "তোমারই সুষমা" এই নামটী পড়িয়া লজ্জায় জিভ্ কাটিলেন ও অনুচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন, হায় কি লজ্জা! আমার স্ত্রীর অক্ষর চিনিতে পারিলাম না, সুষমা শুনিতে পাইলে কি বলিবে? তৎপর ২।৩ বার চিঠিখানা পাঠ করিলেন; চিঠিতে লেখা ছিল "৮ পূজার বন্ধ নিকটবর্ত্তী, আমার সাথ যাও, বাড়ী যাওয়া কালে অবশ্য আমাকে লইয়া যাইও।"

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছি যে, সেদিন কিরণবাবু ১২-১৫ মিনি-

চৈত্র সময়ে আফিসে গিয়াছিলেন; আফিসের আমলা উকিল বাবুর এই নূতন ধরণের বিলাস দেখিয়া ও তাহা টুক্‌টুকে খাসের তলা শুনিয়া, পথের দিকে—চাহিয়া চাহিয়া অনেক কাণা ঘুষা করিয়াছিল, এবং বাবুর আর্দালী রাম সিং যাহা যাহা গিয়া বাবু কি করিতেছেন জানিবার জন্য উঁকি ঝুঁকি মারিয়াছিল।

(২)

বাবু কিরণশঙ্কর চৌধুরীর বয়স ২৮ বৎসর। বর্ণ শ্যাম শরীরের গঠন মাঝারি-গোছ ও মুখের আকৃতি বেশ সুন্দর। মুখখানিতে সর্ব্বদাই যেন হাসি লাগিয়া রহিয়াছে; কি অধীন, কি উপরওয়ালা কিম্বা সমান, পাইক সকলের সঙ্গেই হাসি মুখে আলাপ করিতেন, কাহাকেও উঁচু কথাটী বলিতেন না। কেহ তেমন কসুর করিলে, মিষ্ট কথায় তাহাকে তাহার ভুল বুঝাইয়া দিতেন; তেমন অপরাধ করিলেও তাহার বিরুদ্ধে উপরে লিখিতে এবং তাহার সুনায্য জীবিকার উপরে আঘাত করিতে তাঁহার কলম উঠিত না।

তিনি এক বৎসর যাবৎ হরিগঞ্জে বেশ সুনাম ও সুখ্যাতির সহিত মুন্‌সেফী করিতেছেন। তাঁহার বাড়ী ছাতক গাঁয়ে। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় রামশঙ্কর চৌধুরী ফতাবের কালেক্টরীর সেরেস্তাদার ছিলেন। কিরণবাবুর ৩ বৎসর বয়সের সময়ে তাঁহার পিতামাতা উভয়েই প্রায় এক সময়ে স্বর্গগত হন। গ্রামে প্রচার ছিল যে, সেরেস্তাদার বাবুর খুব টাকা, তিনি বড় ধনী। কিন্তু তিনি টাকা যে কোথায় রাখিয়াছিলেন কেহই জানিত না, মৃত্যুর অনেক পূর্ব্বে হঠাৎ তাঁহার পক্ষাঘাত হওয়ায় তাঁহার একমাত্র সন্তান কিরণকে, বাড়ী-ঘর, জায়গা-জমি ও টাকা সম্বন্ধে তাহাকেও কিছু বলিয়া যাইতে পারেন নাই।

সেরেস্তাদার বাবুর সংসারে তাঁহার স্ত্রী যোগমায়া, ঝি শ্যামাসুন্দরী, চাকর রামদাস ও বাড়ীর সরকার হরকিশোর দত্ত এবং যোগমায়ার কনিষ্ঠা বিধবা-ভগিনী মহামায়া ব্যতীত আর কেহ ছিল না। মহামায়া শিশু কিরণকে সর্ব্বদা কোলে কোলে ও চোখে চোখে রাখিত এবং শৈশবের যত আব্দার ও বায়ুধর অত্যাচার সহ্য করিত। কিরণ তাঁহাকে মাসী বলিয়া না ডাকিয়া, মা বলিয়া ডাকিত ও তাহাকে মাসী বলিত। তখন অনেক সময়ে যোগমায়া হাসিয়া বলিত, "বোন, তোর ছেলে মেয়ে নাই, কিরণকে আমি তোকে দিয়া যাইব, কিরণই তোর ছেলে"। বিধাতার ইচ্ছায় যোগমায়ার ভবিষ্যৎবাণী সত্যে পরিণত হইল।

(৩)

ভগিনী ও ভগ্নীপতির পীড়ার টেলিগ্রাফ পাইয়া সেরেস্তাদার বাবু ও তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যুর প্রায় ২ ঘণ্টা পূর্ব্বে কিরণবাবুর মাতুল হরেন্দ্র বাবু আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহার আসার অব্যবহিত পরেই তাহার ভগ্নী যোগমায়া অতি স্ত্রীঘরে মহামায়ার হাতে কিরণের ভার দিয়া, স্বামীর পায়ের ধূলি নিজ হাতেই কপালে ও বুকে মাখিতে মাখিতে ও মুখে দুর্গা দুর্গা বলিতে বলিতে এ জীবনের মত চক্ষু বুজিলেন। হরেন্দ্রবাবু একজন পাশকরা বহুদর্শী বড় ডাক্তার। মহামায়া ও শ্যামাকে উচ্চরবে কাঁদিতে নিষেধ করিয়া তিনি নিজে প্রাণপণে সেরেস্তাদার বাবুর চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাকে কথা কহাইবার জন্য নানাপ্রকার ঔষধ ব্যবহার ও বিবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন, কিন্তু তাঁহার এত যত্ন চেষ্টা ও ঔষধ ব্যবহারের কোন ফল হইল না। নাড়ীর গতি ক্রমশঃই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে একবার মাত্র অতি অস্পষ্ট ভাষায় "মা" এই শব্দটী মাত্র উচ্চারণ করিয়া তিনি দেহত্যাগ করিলেন। বাড়ীতে কান্নাকাটির ধুম পড়িয়া গেল। পরদিন প্রাতঃকালে হরেন্দ্র বাবু তাহার বিধবা ভগিনী মহামায়া, সরকার, চাকর ও শ্যামার উপরে কিরণ ও সংসারের সম্পূর্ণ ভার দিয়া তাঁহার নিজের কার্য্যস্থল শ্রীহট্টাভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

অতঃপর ২৫ বৎসর কাল চলিয়া গিয়াছে। এই সুদীর্ঘ সময় মধ্যে শ্যামার আদর-যত্ন ও সেবা-তৎপরতা এবং মহামায়ার মাতৃবাৎসল্য ও স্নেহের গুণে, পিতৃমাতৃহীন কিরণবাবু একদিনের জন্যও সেই অভাব বুঝিতে পারে নাই।

মহামায়া যে শুধু কিরণবাবুর মা ছিলেন এমন নয়, তিনি এই ক্ষুদ্র পরিবারটীর প্রত্যেকেরই এবং প্রতিবেশী প্রায় সকলেরই মাতৃস্থানীয়া ছিলেন। তিনি জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে আত্মীয়, অনাত্মীয় সকলকেই রোগের সময়ে ঔষধ ও পথ্য দিতেন, অনশনে ও বিনিদ্র-নেত্রে প্রাণ দিয়া খাটিতেন, অভাবের সময়ে অর্থানুকূল্য করিতেন এবং দুঃখ ও শোকের সময়ে, তাঁহাদের শোকদগ্ধ জ্বালাময় হৃদয়ে শান্ত্বনারূপ সুশীতল শান্তি বারি সেচন করিতেন, তাঁহার সুমধুর অমৃতোপম উপদেশে, মাতৃ-বাৎসল্যে ও সুনিপুণ নেতৃত্বে এই ক্ষুদ্র বাড়ীটি মুনিজন-সেবিত তপোবনসদৃশ হিংসাদ্বেষ ও অসূয়া পরিশূন্য হইয়াছিল, এযে অন্যের জন্য প্রাণ দিত এবং সকলেরই একমাত্র লক্ষ্য ছিল, কিরণের পারীরিক, মানসিক ও বৈষয়িক উন্নতির দিকে।

এদিকে হরেন্দ্রবাবুর ঐকান্তিক যত্ন, চেষ্টা, উদ্যোগ এবং স্নেহপূর্ণ তত্ত্বাবধান

কিরণবাবু একে একে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলি পরীক্ষা বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া প্রায় এক বৎসর যাবত হরিগ্রামে মুন্সেফী করিতেছেন।

(৪)

"এক মাসের বিদায় লইয়া বৈশাখ মাসের ১০ তারিখের মধ্যে নিশ্চয় বাড়ী পৌঁছিও" হরেন্দ্র বাবুর এরূপ জরুরী তার পাইয়া ৩ বৎসর পরে ১০ই বৈশাখ অপরাহ্নে কিরণবাবু বাড়ী পৌঁছিলেন। তিনি বাহির বাড়ীতে পা দিয়াই বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। প্রথম প্রথম এই বাড়ী কি তাহার নিজের, না অপরের তাহার কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। সরকার মহাশয় কিম্বা অন্য কাহাকেও বাহির বাড়ীতে না দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বাহির বাড়ীটা একবার দেখিয়া লইলেন। দেখিলেন বাড়ীর পূর্ব্ব দিকে যেখানে পূর্ব্বে সামান্য জঙ্গল ও মাঠ ছিল তথায় একটী সুন্দর পুকুর, পুকুরের পশ্চিম পাড়ের মধ্যস্থানে একটী বাঁধান ঘাট, পুষ্করিণীর উত্তর পাড়ে একটী পাকা পায়খানা। পাকা ঘাটের দু'ধারে সুরভি পুষ্পের দু'খানি পুষ্পোদ্যান। অন্দর বাড়ীর চতুর্দ্দিক চুণকাম করা সমুচ্চ প্রাচীরে ঘেরা এবং প্রাচীরের উপর দিয়া (অন্দর মহলে) একটী সুন্দর সুপ্রশস্ত একতালা দালানের শীর্ষদেশ দেখা যাইতেছে। বাহির বাড়ীটী খুব পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন।

কিরণবাবুকে এরূপভাবে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বাহিরে ঘোরা ফেরা করিতে দেখিয়া মহামায়া দ্রুতপদে আসিয়া তাহাকে লইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল ও বলিল, বাবা, তুই এরূপভাবে পরের ছেলের মত বাহিরে বাহিরে ঘুরিতেছিলি কেন? একটু বিশ্রাম কর্, তারপর খা, আমি তোর চিঠি পাইয়া খাবার সব পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছি। আর পথের দিকে চাহিতেছি। দেখ্ শ্যামা, বাবার আমার মুখ খানা শুকাইয়া গিয়াছে, ৩ বৎসরের পরিশ্রমে, অযত্নে ও অনিয়মে চোখ বসিয়া গিয়াছে ও গলার হাড় আল্‌গা হইয়াছে। কিরণবাবু বলিলেন, মা, তোমরা এ বাড়ীটী অমরাবতীর ন্যায় এমন সুন্দর করে করিলে, আমাকে ত এ সম্বন্ধে একটুও লিখ নাই? মহামায়া বলিল, বাবা, তোকে কি সব কথাই জানাইতে আছে? মা সর্ব্ব-মঙ্গলার ইচ্ছা থাকিলে, হয়তঃ আগামী ১৭ই বৈশাখ বাড়ীতে মা আসিবে, অতএব তোর মামার পরামর্শে আমরা বাবা, মার আগমনের পূর্ব্বেই বাড়ীটী সাজাইয়া রাখিয়াছি। কিরণবাবু তাঁহার মার কথার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া চুপ করিলেন এবং আহার ও বিশ্রাম করার পর তাঁহার মা ও শ্যামার অনুরোধে তাহাদের সঙ্গে ভিতরবাড়ীটী দেখার

জন্য বাহির হইলেন। শ্যামা বলিল, বাবা, কিরণ এই যে ঘাট বাঁধান খিড়কীর পুকুরটী দেখিতেছ, ইহা আমাদের বাড়ীর পিছনের আগেকার ডোবাটী, আর ঐ দেখ দেওয়ালের গায়, বাহিরে মেয়েদের জন্য একটী পাকা পায়খানা তৈয়ার হইয়াছে। কিরণবাবু একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, মাসী তোমরা ত আর এই তিন বৎসরে কম কর নাই।

(৫)

১৩ই বৈশাখ দুপুর বেলা হরেন্দ্রবাবু সপরিবারে পৌঁছিলেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক জিনিষপত্র আসিল। তিনি আসার পরেই যেন কি এক অভিনব বৈদ্যুতিক ভাবের উদ্দীপনায় সকলেই উৎফুল্ল ও আনন্দিত হইল। সরকার হরকিশোর দত্ত ও পুরাতন ভৃত্য রামদাসের, এমন এক মুহূর্ত্তের জন্যও অবকাশ নাই। ইহারা প্রাণপণে দিনরাত খাটিয়া হরেন্দ্রবাবুর আদেশ তামিল করিতেছে। কিরণবাবু বুঝিলেন বাড়ীতে বিবাহ, এবং বিবাহ যে তাঁহার নিজের এবং ১৭ই বৈশাখই যে বিবাহ হইবে তাহাও বুঝিতে বাকি রহিল না, কিন্তু কোথায়, কাহার সহিত বিবাহ হইবে বুঝিতে পারিলেন না এবং লজ্জায় মুখ খুলিয়া কাহাকে জিজ্ঞাসাও করিতে পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে ১৭ই বৈশাখ আসিল, বাড়ীতে কাজকর্ম্ম, গান-বাজনা ও খাওয়া-দাওয়ার ধুম পড়িয়া গেল। কোনরূপ বিশৃঙ্খলতা, অসাময়িকতা বা গোলযোগ নাই সবই সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইতে লাগিল।

মধ্যাহ্ন সময়ে পুরোহিত ঠাকুর কিরণবাবুকে আভ্যুদয়িক মন্ত্র পড়াইতেছেন, হরেন্দ্রবাবু তথায় একখানা চৌকির উপরে বসিয়া, তথাকার ও অন্যান্য স্থানের কাছে পর্য্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করিতেছেন, এমন সময়ে পুরোহিত ঠাকুর কিরণবাবুকে তাঁহার মার নাম উচ্চারণ করিতে বলিলে কিরণবাবু একটুও ইতস্ততঃ না করিয়া অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিলেন, "মহামায়া"। এ নাম উচ্চারণ করা মাত্রই হরেন্দ্রবাবু চমকিয়া উঠিলেন ও বলিলেন, কিরণ-করিস্ কি এ যে তোর মাসীর নাম, তোর মার নাম যোগমায়া, এই কথা বলিতে, হরেন্দ্রবাবুর গলা ভার হইল, চোখ ছল ছল করিতে লাগিল। তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে এই দুর্ব্বলতাটুকু সারিয়া লইয়া বলিলেন, পুরোহিত ঠাকুর, নিতান্ত ছোট বেলায় তাহার মা স্বর্গগতা হওয়ায় তার মার কথা মনে নাই, মহামায়াকেই সে মা বলিয়া জানে। আপনি মন্ত্র পড়ান, আমি তাহার মাতৃকুলের নাম বলিতেছি। রাত্রি ৮ টার সময়ে সুনামগঞ্জনিবাসী স্বনামধন্য দেওয়ান রাধাকিশোর মজুমদার মহাশয়ের

একমাত্র কন্যা সুষমাসুন্দরীর সঙ্গে কিরণবাবুর শুভ পরিণয়ক্রিয়া দেওয়ান বাবুর নিজ বাড়ীতে বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইল।

কুশণ্ডিকার রাত্রে কিরণবাবু সাদরে সুষমার চিবুক ধরিয়া, তাঁহার মুখ খানা তুলিয়া প্রণয়-মধুর বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল তোমার নামটী কি? সুষমা প্রথম তাহার নিজের সরম মাখা আরক্তিম মুখ-খানিতে ঘোম্‌টা টানিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, পরে কিরণবাবুর হাস্যোদ্দীপক প্রশ্নে স্থির থাকা কঠিন দেখিয়া একটু মৃদু হাসিয়া বীণবিনিন্দিত মধুর স্বরে বলিল, কেন? আপনি কি সম্প্রদানের সময় আমার নাম শুনেন নাই?

কিরণ। হাঁ শুনিয়াছি, এখন মনে নাই।

সুষমা। তবে কি আপনি সে সময়কার সব কথাই ভুলিয়া গিয়াছেন?

কিরণ। না, সে সব কথা ভুলি নাই। কেবল তোমার নামটী তেমন মনে পড়ে না।

সুষমা। আমার নাম সুষমাসুন্দরী,

কিরণ। বেশ্ সুন্দর নামটী ত তোমার! তুমি লেখাপড়া জান?

সুষমা। বাঙ্গালা লেখাপড়া সামান্য শিখেছি।

কিরণ। ইংরেজী কিছুই শিখ নাই?

সুষমা। না, এ পর্য্যন্ত ইংরেজী শিখিতে কেহ বলে নাই।

কিরণ। আমার অনুরোধে ইংরেজীতে অন্ততঃ নাম লেখা শিক্ষা করিও।

সুষমা। অনুরোধ না বলিয়া আদেশ বলিলেই যথেষ্ট হইত।

কিরণ। আচ্ছা, এ সম্বন্ধে আদেশ দিলাম, পালন করিও।

সুষমা। যথাসাধ্য পালন করিতে চেষ্টা করিব।

তৎপর কিরণবাবু সুষমার হস্তাক্ষর দেখিতে চাহিলে সুষমা তাঁহাকে তাহার হস্তাক্ষর দেখাইল। কিরণবাবু অক্ষর দেখিয়া খুব্ খুসী হইলেন।

(৬)

বিবাহের ৭ দিন পরে হরেন্দ্রবাবু কিরণবাবুর সঙ্গে সাংসারিক ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে কি আলাপ করিতেছেন এমন সময়ে ডাকপিয়ন কিরণবাবুকে একখানা টেলিগ্রাফ দিয়া গেল। কিরণবাবু তাড়াতাড়ি ইহা পাঠ করিয়া তাহার মামার হাতে দিলেন।

হরেন্দ্র। কিরণ, তোর বিদায়ের আর কতদিন বাকি আছে?

কিরণ। আজ লইয়া সাতদিন।

হরেন্দ্র। তবে জজ সাহেব পরশু দিন তোকে কাযে যোগ দিতে লিখে কেন ?

কিরণ। ইহার মর্ম্ম ত কিছু বুঝিলাম না।

হরেন্দ্র। বোধ হয় কোন বিশেষ কাজ পড়িয়াছে। হাজির হওয়াই উচিত।

কিরণ। আপনি ও মার অনুমতি পাইলে আগামী কল্যই রওয়ানা হইব।

কিরণবাবু যথাসময়ে তাঁহার কাজে হাজির হইলেন। হরেন্দ্রবাবু ও মহামায়ার অনুমতি পাইয়া সুষমাকে বৈশাখ মাসের ২৮শে তারিখে তাহার পিত্রালয় লইয়া গেল। মহামায়া সপ্তাহে সপ্তাহে সুষমাকে পত্র লিখিত ও তাহার পত্রোত্তর পাইত, কিন্তু সুষমা তাহার স্বামীর নিদেশমতে ইংরেজী নাম ও ঠিকানা শিক্ষা করার জন্য ৩।৪ মাস কিরণবাবুকে কোন চিঠি লিখে নাই। ইংরেজী নাম ও ঠিকানা শিক্ষা হওয়া মাত্রই আমাদের পূর্ব্ব-কথিত লাল্ টুক্-টুকে চতুষ্কোণ লেফাপাতে সে তাহার স্বামীর নিকটে প্রথম পত্র লিখে।

আমরা বিশেষ অনুসন্ধানে জানিয়াছি যে, কিরণবাবু সেদিন সুষমার পত্রের কি উত্তর দিবে, কিরূপ কাগজে ও কি বর্ণের লেফাপায় চিঠি লিখিবে একথা ভাবিয়া অনেক সময় অযথা অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অনেক চিন্তার পর পেন্সিলটী হরিদ্রা বর্ণের খামে, সবুজ রঙের নোট্ পেপারে "আমি অবশ্য ৺পূজার বন্ধের সময়ে তোমাকে লইয়া বাড়ী যাইতে ভুলিব না।" লিখিয়া পত্রখানা তাঁহার বিশ্বাসী চাকর দিয়া তখনই ডাকঘরে পাঠাইয়া তাঁহার চিন্তা-ক্লিষ্ট মাথা শীতল হওয়ার পর আফিসে গিয়াছিলেন।

পূজার বন্ধের দুদিন পূর্ব্বে ঠিক্ এক সময়েই কিরণবাবু তাঁহার মা ও মামার চিঠি পাইলেন। উভয় চিঠিতেই পূজার বন্ধ হওয়া মাত্রই সুনামগঞ্জ হইতে বধূকে লইয়া বাড়ী যাওয়ার কথা লেখা ছিল। পূজার বন্ধ হওয়ার পরই কিরণবাবু তাঁহার আর্দ্দালী হরি সিং ও চাকর জগবন্ধুকে লইয়া নৌকা যোগে সুনামগঞ্জের দিকে রওয়ানা হইলেন। নৌকা পালভরে তীব্র বেগে ছুটিয়াছে। সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছে, দেবালয়ে সর্ব্বশেষ শঙ্খ, ঘণ্টা ও কাঁশর ধ্বনি নদী বক্ষে ও নদী সৈকতে ক্ষীণ প্রতিধ্বনি তুলিয়া সান্ধ্য সমীরে বিলীন হইতেছে, এবং পশ্চিমাকাশের লোহিত-রাগ ধীরে ধীরে নৈশ তিমিরে ঢাকা পড়িতেছে, আর ৪টী বাঁক মাত্র উত্তীর্ণ হইলেই দেওয়ান বাবুর ঘাটে পৌছান যায়, মাল্লারা প্রাণপণে দাঁড় টানিতেছে এবং গলা মিলাইয়া দাঁড়ের তালে তালে উচ্চস্বরে

ভাটিয়ান রাগিণীতে গান ধরিয়াছে, এমন সময়ে বিদ্যুৎ গতিতে ৯ খানা ছোট ছোট ডিঙ্গি সম্মুখ ও পশ্চাৎ দিক হইতে আসিয়া কিরণবাবুর নৌকার নিকটবর্ত্তী হইল। প্রত্যেক ডিঙ্গিতেই ৩ জন লোক। প্রায় লোকগুলিই দোহারা গোছের শ্যামবর্ণ ও হৃষ্ট পুষ্ট। প্রত্যেকের মুখেই লম্বা দাড়ি, মাথায় টুপি এবং হাতে একটী ঠেঠা, কেবল একটী লোকের গায়ের রং ফরসা এবং হাতে ঠেঠার পরিবর্ত্তে বাঁশীর মত কি একটী ছিল। তাহাকে ডাকাতদিগের নেতা বলিয়া বোধ হইল। তাহার ইঙ্গিতে ডাকাতেরা নিজ নিজ ডিঙ্গি খুব শীঘ্রই কিরণবাবুর নৌকার সঙ্গে বাঁধিয়া সকলেই প্রায় এক সময়ে নৌকায় উঠিল এবং সবলে মাঝি ৩ জনের হাত পা বান্ধিয়া নৌকার মধ্যে প্রবেশ করিল। চাকর জগবন্ধু ও আর্দালী হরিসিং ইহাদিগকে বাধা দিতে উদ্যত হইলে কিরণবাবু ইহাদিগকে নিষেধ করিয়া, শান্ত গম্ভীর স্বরে ডাকাতদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি চাও?" অগ্রগামী লোকটী বলিল, আমরা টাকা চাই, আপনার নিকটে যে টাকা আছে তাহা পাইলে আমরা আপনার জিনিষপত্র কিছুই লইব না এবং আপনাকে কিম্বা আপনার লোকজনকে কিছুই বলিব না, এবং যাত্রাকালে আপনার মাঝি-মাল্লাদের বন্ধন খুলিয়া দিয়া যাইব। কিরণবাবু বিনা আপত্তিতে ট্রাঙ্কের চাবি দিলে পর ডাকাত সর্দ্দার ট্রাঙ্ক খুলিয়া টাকা ও নোটে ৫০০৲ টাকা বাহির করিয়াবাবুর সাক্ষাতে রাখিল, ও জিজ্ঞাসা করিল, আর কোথাও টাকা আছে কি? কিরণবাবু বলিলেন, না, আর কোথাও টাকা নাই, বিশ্বাস না হয় অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পার। ডাকাত সর্দ্দার আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বাঁশীতে ফু দিলে পর ডাকাতগণ টাকা সহ একে একে নিজ নিজ নৌকায় উঠিল। এবং প্রত্যাবর্ত্তন কালে মাঝি ও মাল্লাদের বন্ধন খুলিয়া দিল। তাহার পর ইহাদের ডিঙ্গিগুলি মুহূর্ত্ত মধ্যে নৈশ অন্ধকারে কোথায় মিশিয়া গেল।

(৭)

রাত্রি অনুমান ৯ টার সময়ে মুনসেফবাবুর নৌকা দেওয়ান বাবুর ঘাটে পৌঁছিল। সংবাদ পাওয়া মাত্র দেওয়ান বাবুর মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্র ব্রজেন্দ্রকিশোর ও রমেন্দ্রকিশোর আসিয়া তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া বাড়ীতে লইয়া গেল। কিরণবাবু তাঁহার শ্বশুর মহাশয় ও শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে বিনীত ভাবে প্রণাম করিলেন। অন্তঃপুর হইতে পুনঃ পুনঃ হুলুধ্বনি পড়িতে লাগিল

এবং পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যে বাড়ীটা নীরব ও ঘুমন্ত ছিল, ইহা এখন সজীব ও সরব-মুখর হইয়া উঠিল।

কিরণবাবু এপর্য্যন্ত কাহাকেও ডাকাতের কথা বলেন নাই, তাঁহার দপ্তর মহাশয় পরম্পরায় একথা শুনিতে পাইয়া, আহারের পর কিরণবাবুকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, ডাকাতি বলিতে যাহা বুঝায়, তেমন কিছু হয় নাই। ডাকাতেরা আমার নৌকাতে উঠিয়া ভয় দেখাইয়া, আমার নিকট হইতে মোট ৫০০৲ টাকা চাহিয়া লইয়াছে মাত্র, একথা শুনিয়া দেওয়ান বাবু রাগে গড় গড় করিতে লাগিলেন, তাঁহার চক্ষু দিয়া অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। তিনি তাঁহার বিশ্বাসী ও প্রাচীন চাকর দীনবন্ধুকে বলিলেন, হেমা কোথায়? সে বিনীত ভাবে বলিল, বড় বাবু সন্ধ্যার পরে বামাকে লইয়া সুবর্ণগঞ্জ বাজারে গিয়াছিলেন এখনও ফিরেন নাই। দেওয়ানবাবু কড়স্বরে বলিলেন, 'এ ডাকাতিতে হেমা নিশ্চয়ই আছে। আমি তাহাকে কালই বাড়ী হইতে তাড়াইব ও এ অভ্যাস পরিত্যাগ না করিলে ত্যক্য পুত্র করিব'।

রাত্রি ১২টার সময়ে হেমেন্দ্রকিশোর বাহির-বাড়ীতে পৌঁছিয়াই নিজের বাবুর আসার সংবাদ পাইয়া বরাবর তাঁহার নিকটে গেল ও তাঁহাকে বক্ষে আলিঙ্গন করিল। হেমেন্দ্রের তাৎকালিক মিষ্ট কথা ও বিনয়-মাখা ব্যবহারে কিরণবাবু পরম প্রীতি লাভ করিলেন ও একিবারে গলিয়া গেলেন এবং দেওয়ান বাবুর মত এমন আচারনিষ্ঠ বহুদর্শী ও পুত্রবৎসল পিতা যে কেন তাঁহার এরূপ বিনয়ী ও অমায়িক জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপরে এমন জঘন্য কলঙ্ককালিমা প্রক্ষেপ করিতেছেন, তাহার কারণ কিছুই খুঁজিয়া পাইলেন না। কিরণবাবু দেখিলেন, হেমেন্দ্রের দাড়ি গোপ কামান, এবং মুখখানা হাসিমাখা, তিনি আরও বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন যে, তাহার বৃদ্ধ ও বহুদর্শী পিতার এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার, এরূপ নির্ম্মম নির্য্যাতন এবং এবম্বিধ অসহনীয় ভর্ৎসনাতেও তাহার মুখে কোনরূপ গ্লানি কিম্বা বিষাদের কালিমা-রেখা পড়ে নাই। কিন্তু হঠাৎ তাহার চক্ষু দুটীর প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই মুনসেফ বাবুর শরীর শিহরিয়া উঠিল, প্রাণ কাঁপিতে লাগিল, এবং তাঁহার মনে পড়িল এমন চোখ ও এমন চাহনি যেন তিনি কোথায় দেখিয়াছেন। যাহা হউক অনতিবিলম্বে তিনি নিজকে প্রকৃতিস্থ করিয়া বলিলেন, রাত্রি অধিক হইয়াছে চলুন শুইগে।

(৮)

শুইবার ঘরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, খাটের নীচে একখানা ছোট

চৌকিতে সুষমা পানের রেকাবটী কাছে লইয়া চুপটী করিয়া বসিয়া রহিয়াছে, ও এক হাতে তাহার সম্মুখস্থ উজ্জ্বল বাতিটী আরও উজ্জ্বল করিয়া দিতেছে। কিরণবাবু ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই সুষমা উঠিয়া দাঁড়াইল ও মুখের ঘোম্‌টা আরও টানিয়া, ভয়কুণ্ঠিত হৃদয়ে ও অতি হীনভাবে তাহাতে তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিতে লাগিল "ওগো আমায় ক্ষমা কর, আমি না জানিয়া এ অপরাধ করিয়াছি, এতটা হইবে জানিলে এবং আমাদের ঘরেই যে কাল সাপ আছে বুঝিতে পারিলে, আমি কখনও আসিতে অনুরোধ করিতাম না।" কিরণবাবু সাদরে তাহার চিবুক ধরিয়া তাহাকে বিছানায় লইয়া গেল এবং অতি কোমল করে সস্নেহে তাহার মুখ ও চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিল, সুষু, এ তোমার ভুল, ইহা তোমার কিম্বা অন্য কাহারও দোষ নয়, ইহা বিধাতার ইচ্ছা। তখন সুষমা রেকাব হইতে কিরণবাবুর মুখে ২টী পান (খিলি) দিয়া, আবেগ ভরে তাঁহার পা দুখানা তাহার কোলের উপরে টানিয়া লইয়া হাত বুলাইতে বুলাইতে সাশ্রু নয়নে, কাঁদ কাঁদ স্বরে, ডাকাতেরা দেখিতে কেমন, ইহারা কি কি রাখিয়াছিল, নৌকায় উঠিয়া কি করিয়াছিল, ইত্যাদি ছোট ছোট প্রশ্নে তাঁহার নিকট হইতে একে একে সব কথা বাহির করিয়া লইয়া একটী সমুচ্চ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগের সহিত বলিল, এ সব আমার বড় বৌ-এর কাজ। বাবা তাহাকে এ কথা লইয়া কত বকিলেন, কত নির্য্যাতন করিলেন এবং তাহাকে ত্যাজ্য পুত্র করিবেন বলিয়া কত শাসাইলেন, তবু তাহার এ অভ্যাস গেল না। আজ বাবা যেরূপ রাগিয়াছেন, না জানি বাবা কার প্রাণে কি অনর্থই ঘটান।

কিরণ বাবুর প্রাতঃ ভ্রমণের অভ্যাস ছিল। পরদিন অতি প্রত্যুষে হাত মুখ ধুইয়া ছড়িটী লইয়া বেড়াইতে বাহির হইবেন, এমন সময়ে হেমেন্দ্র হাসিয়া বলিল, দাঁড়ান, আমিও সঙ্গে যাইতেছি। উভয়ে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তায় আর এক মাইল গেলে পর কিরণবাবু বলিলেন, অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি, ঐ দেখুন সূর্য্য উঠিতেছে, আর একটু পরেই গরম পড়িবে, চলুন এখন আমরা ফিরি। হেমেন্দ্র বলিল, আর একটু গেলেই নদী পাওয়া যাইবে, তখন নদীর ধার দিয়া বেশ সোজা রাস্তায় ও বেশ আরামে আমরা বাড়ী পৌঁছিতে পারিব। কিরণ বাবু স্বীকৃত হইলেন। প্রায় পোয়া মাইল যাওয়ার পর, তাঁহারা নদীর ধারের রাস্তা ধরিয়া বাড়ীর দিকে রওনা হইলেন।

এই পথটী তেমন পরিষ্কার ও সমতল নয় মাঝে মাঝে উঠতি নামতি ও

ঝোপ আছে। পথের পার্শ্বে লোকালয় যাত্র নাই। কিরণ বাবু আগে আগে চলিয়া একটী নামতিতে নামিয়াছে, হেমেন্দ্র একটী বড় ঝোপের আড়ালে থাকাতে কিরণবাবুর নিকট হইতে তাহাকে দেখা যায় না। এমন সময়ে ভীমকায়, কৃষ্ণবর্ণ একটী লোক হাতে এক খানা দা নিয়া উপরের ঝোপ হইতে লাফ্ দিয়া কিরণ বাবুর সাম্নে পড়িল ও ভীমবেগে তাহাকে আকর্ষণ করিয়া মাটীতে ফেলিয়া বুকে উঠিয়া বসিল। কিরণবাবু আক্রান্ত হইয়াই চীৎকার করিলেন। সেই চীৎকার শুনিয়াই হেমেন্দ্র দৌড়িয়া আসিয়া বাঘের মত লাফ্ দিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িল ও তাহাকে সজোরে কিরণবাবুর উপর হইতে অপসৃত করিল। কিরণবাবু মুক্ত হইয়াই ঐ লোকটীর হাত হইতে দাটা ছিনাইয়া লইল এবং তাহারা উভয়ে প্রায় এক ঘণ্টা কাল ঐ ডাকাতটীর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করার পর, তাহারা তাহাদের চাদর দিয়া তাহার হাতে পায় দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া ফেলিল, এবং নাসিকা ও গণ্ডদেশে রজ্জুবদ্ধ ষাঁড়ের ন্যায় তাহারা তাহাকে ছড়ি দ্বারা তাড়না করিতে করিতে দেওয়ান বাবুর সাক্ষাতে উপস্থিত করিল।

এই আকস্মিক ঘটনাতে দেওয়ান বাবু যন্ত্রমুগ্ধের ন্যায়, যুগপৎ হর্ষ-বিষাদে অভিভূত হইয়া বিস্ফারিত নেত্রে একবার হেমেন্দ্রকিশোর ও কিরণ বাবুর ধূলা ও কর্দ্দম-মাখা শরীর এবং বিশৃঙ্খল বেশ ভূষার দিকে, আবার যমকিঙ্কর সদৃশ কৃষ্ণকায় লোকটীর দিকে বিশেষ মনোযোগের সহিত দৃষ্টিপাত করিলেন। হেমেন্দ্রকিশোর তাহার পিতার সম্মুখে একটী মোটা ও লম্বা খুঁটিতে ঐ লোকটীকে দৃঢ় ভাবে বন্ধন করিয়া দুহাতে দেওয়ান বাবুর পা জড়াইয়া ধরিয়া বাষ্পনয়নে, নতশিরে, কম্পিত কলেবরে ও ভাঙ্গাভাঙ্গা স্বরে বলিতে লাগিল, বাবা, আমি গত সন্ধ্যায় আমার ভুল বুঝিতে পারিয়াছি। আজ আমি তোমার নিকটে মুক্তকণ্ঠে আমার দোষ সব স্বীকার করিব। আমি আমার জীবনে এই প্রথম ভুল করিয়াছি, তুমি কি আমার এ অপরাধ ক্ষমা করিবে না? আমি তোমার পুত্রের উপযুক্ত নই। আমি কাপুরুষ, কুলাঙ্গার ও ভোমার বংশের কলঙ্কস্বরূপই বটি। আমার এই প্রথম অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাকে ত্যাজ্যপুত্র কর, তাহাতে আমার একটুও ক্ষোভ কিম্বা দুঃখ নাই। বাবা, তুমি ও মা আমার সজীব দেবতা। ইহা হইতে আমার বড় দেবতা পৃথিবীতে কেন স্বর্গেও আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। তুমি ক্ষমা করিয়া আমাকে তোমার পায় স্থান দিলেও তোমাদের সেবা করার অধিকার প্রদান করিলে, আমার নিষ্কৃতি আছে, নতুবা আমার মত পাপীর নরকেও স্থান নাই।

আমি ডাকাতের দলে মিশিয়া অনেক ডাকাতিতে উপস্থিত রহিয়াছি, কিন্তু কোন দিন আমি নিজে কিম্বা আমার দলের কোন লোক ভুলক্রমেও কাহাকে হত্যা কিম্বা অপমানিত করে নাই। এ পর্য্যন্ত আমি নিজে ডাকাতি-লব্ধ একটী পয়সাও গ্রহণ করি নাই, ডাকাতদিগের খরচ বাদে আমরা এপর্য্যন্ত যাহা পাইয়াছি, তাহাই আমার নিজ হস্তে গরীব ও দুঃখীদিগকে বিতরণ করিয়াছি! গত সন্ধ্যার ডাকাতিতে আমার চক্ষু ফুটাইয়াছে, আজ দুই বৎসর যাবৎ তোমার অজস্র গালিবর্ষণে, অত্যাচার ও ভয় প্রদর্শনে যাহা হয় নাই, কল্যকার ঘটনা তাহা করিয়াছে। সত্য বলিতেছি বাবা, গত সন্ধ্যায় আমি পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়াছি এবং বুঝিয়াছি যে অসৎকার্য্য, সাধুতার আবরণে প্রচ্ছন্ন থাকিলেও অসৎই থাকে এবং পরিণামে বিষময় ফলোৎপাদন করে। কিরণবাবুর টাকা-গুলি আমার হাতে আসার পরই আসি না কেন, আমার মনে এক অভিনব চিন্তার উদয় হইয়াছিল, সেই সময় হইতে ঐ জ্বালায় ও অনুতাপানলে আমার হৃদয় হুতাশনের ন্যায় মহিয়া রহিয়া নিঃশেষে দগ্ধ হইতেছে। কোথাও শান্তি পাইতেছি না, কাহাকেও মুখ দেখাইতে ইচ্ছা করিতেছে না। আমার বোধ হইতেছে যে, যে চুণ-কালী মাখা কলঙ্ক-রেখার কৃষ্ণদাগ আমার বদনমণ্ডলে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা তোমার ক্ষমারূপ অমৃত-নিষেক ব্যতীত সম্ভবতঃ কিছুতেই বিদূরিত হইবে না।

কিরণবাবুর টাকাগুলি আনিয়াছি গ্রহণ করুন। আজই আমার দল ভাঙ্গা-ইয়া দিব। আর কখনও ইহারা ডাকাতি করিবে না। ডাকাতের সর্দ্দারের নিদর্শনস্বরূপ বন্দুকটী কিরণবাবুর সাক্ষাতেই সুরমা নদীতে বিসর্জ্জন করিয়াছি। ঐ যে লোকটী তাহাকে আমি চিনি না, পূর্ব্বে তাহাকে আমি কখনও দেখি নাই। আজ আমি উপস্থিত না থাকিলে সে আজ কিরণবাবুকে প্রাণে মারিত। আমরা ইহাকে বিশেষভাবে প্রহার করিয়াছি, আপনি তাহাকে ইচ্ছানুরূপ শাস্তি প্রদান করুন। আমার বিশেষ অনুরোধ যে, এখানে একটী পুলিশ ষ্টেসন স্থাপন করার জন্য আপনি শীঘ্র উপরে লিখুন। অচির কাল মধ্যে মাধবপুর নামগঞ্জে পুলিশ-ষ্টেসন স্থাপিত না হইলে, চোর-ডাকাতের উপদ্রবে এখানকার লোকের ধন, প্রাণ ও মান সম্ভ্রম কখনও নিরাপদে থাকিবে না।

হেমেন্দ্রকিশোরের সনির্ব্বন্ধ কাতর প্রার্থনায় ও কিরণবাবুর বিনীত অনুরোধে দেওয়ানবাবু হেমেন্দ্রকে ক্ষমা করিয়া ভবিষ্যতে সন্ধ্যার পরে কোথাও

তাহার বিনানুমতিতে যাইতে নিষেধ করিলেন। ধৃত ডাকাতটিকে বিশেষ ভাবে শারীরিক শাস্তি দিয়া এবং ভবিষ্যতে এরূপ করিলে পুলিশে দেওয়া হইবে এরূপ ভয় প্রদর্শন করিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

(৯)

ঐ দিন ৪টার সময়ে কিরণবাবু সুষমাকে লইয়া বাড়ী পৌঁছিলেন। বিজয়া দশমীর দিন প্রাতে হরেন্দ্রবাবু, মহামায়া, কিরণবাবু ও বাড়ীর সরকার হর-কিশোর দত্তের সাক্ষাতে বলিলেন, কিরণ, তুই তোর সংসার সম্বন্ধে কিছুই জানিস্ না, ও কোন খবর রাখিস্ না। পাছে তোর শিক্ষায় ব্যাঘাত ঘটে, মনে কোনরূপ অভিমান আসে, এজন্য এপর্য্যন্ত তোকে কিম্বা মহামায়াকে এ সম্বন্ধে কিছুই বলি নাই। বিধাতার ইচ্ছায় তোর নিজের ও তোর সংসারের যে গুরু-ভার আজ প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে অযাচিতভাবে আমার হস্তে অর্পিত হইয়াছিল, তাহা হইতে আমার মুক্ত হওয়ার সময় আসিয়াছে। যে পবিত্র ব্রত আমি গ্রহণ করিয়াছিলাম, এবং যাহার সর্ব্বাঙ্গীন পবিত্রতা ও নিষ্কলঙ্কতা রক্ষা করার জন্য আমি এই সুদীর্ঘ ৩০ বৎসরকাল নিজের সুখ, সম্মান, স্বাস্থ্য ও বৈষয়িক উন্নতির দিকে এক নিমেষের জন্যও তাকাই নাই, আজ সেই সর্ব্বনিয়ন্তার ইচ্ছায় আমার সেই সর্ব্বজীবনব্যাপী ব্রত সসম্মানে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। জনরব উঠিয়াছিল, তোর বাবা মৃত্যুকালে অনেক টাকা রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সে টাকা যে কোথায় এ সম্বন্ধে সরকার মহাশয় কিম্বা অন্য কেহই কিছু বলিতে পারে নাই। আমি তাঁহার বাক্স অনুসন্ধানে নোট বেহে ৫খানা বহিতে ২৫ হাজার টাকা জমা দেখিলাম। ঐ টাকা হইতে ৫ হাজার টাকা আনিয়া বেশী সুদে খাটাইয়া ১৫ হাজার টাকা করি। ঐ টাকা হইতে তোর বাড়ী নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী খনন, ও বিবাহে পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় গিয়াছে, বাকী ১০ হাজার টাকার নোট, এবং বিশ হাজার টাকার এই ৩০ বৎসরের সুদে মূলে ৪৫ হাজার টাকা-চেকের বহি দিতেছি, গ্রহণ কর। তোর পড়ার সম্পূর্ণ ব্যয় আমার কর্ত্তব্যবোধে আমি নিজেই বহন করিয়াছি।"

"বাবা, এখন তুই তোর সংসারের ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে মুক্তি দে। তোর সরকার, চাকর ও ঝির মত কৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসী লোক আমার চক্ষে পড়ে নাই। তাহাদিগকে কখনও ছাড়িও না, কেহ কর্ম্ম করিতে অক্ষম হইলে পেনসন দিয়া বিদায় দিও, অথবা আজীবন তাহার গ্রাসাচ্ছাদন দিও। আমার আর সময় নাই, আজই আমি কাশী রওয়ানা হইব। কিরণবাবু কাতর ভাবে

কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "বাবা ৩০ বৎসর পূর্ব্বে যে আমি পিতৃ মাতৃ বিয়োগে নিরাশ্রয় হইয়াছিলাম সে সময়ের কথা আমার স্মরণ নাই, আপনাদের স্নেহ-মমতায় আমি একদিনের জন্যও সে অভাব বুঝি নাই। আমি আপনাদের আশ্রয়ে যে শান্তিতে ও সুখে দিন কাটাইতেছি, আমার বাবা মার আশ্রয়েও বোধ হয় তেমনটী হইত না। আপনার কর্ত্তব্য আপনি সম্পন্ন করিয়াছেন, আপনার প্রতি আমারও ত কর্ত্তব্য আছে, পূর্ব্বে আমাকে আমার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে অনুমতি দিন, তৎপর আপনি কাশী যাইতে পারিবেন।"

"হরেন্দ্রবাবু বলিলেন, "বাবা, আমাকে আর বৃথা বাধা দিস্ না, আমার মন আর সংসারের নাই, কোন্ দিনই কাশী চলিয়া গিয়াছে। এই দেখ আমি টিকেট কিনিয়া আনিয়াছি। আজ রাত্রেই আমি রওয়ানা হইব।" মহামায়া, হরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে যাইতে চাহিলে তিনি বলিলেন "না বোন্, তোমার কাজ এখনও অনেক বাকি আছে, যখন সময় হইবে তখন আমি নিজেই তোমাকে লইয়া যাইব।"

সাশ্রু নয়নে কিরণবাবু বলিলেন, যখন আবশ্যক পড়ে আমাকে তার করিবেন, আমি যাইব। আর আমার বিশেষ আবশ্যক পড়িলে, আমিও আপনাকে তার করিব. আপনার খরচ বাবত এখন ১০০০৲ টাকা দিলাম, আর প্রতি মাসে ১০০৲ টাকা দিব। হরেন্দ্রবাবু এ সম্বন্ধে কি বলিতে চাহিলে কিরণবাবু জোড় হাতে বাধা দিয়া বলিলেন, আমি কোন সময়েই আপনার কথায় অবাধ্য হই নাই, আমার এ সম্বন্ধে হাজার পাপ হইলেও আমি আপনার একথা শুনিব না। হরেন্দ্রবাবু বলিলেন, "বোন্, আমি এত টাকা লইয়া কি করিব"? কিরণবাবু বলিলেন, "আপনি খরচের অতিরিক্ত টাকা দীন-দুঃখীকে দান করিবেন।" হরেন্দ্রবাবু, তাহার আগিনেয়ের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া টাকা গ্রহণ করিলেন এবং অপরাহ্ণ ৫টার সময়ে সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সপরিবার কাশী রওয়ানা হইলেন। কিরণবাবু তাঁহার সঙ্গে গয়া পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন।

শ্রীশ্যামাচরণ দত্ত।

ইরাক্।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

৪

ইরাকের ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ে বাঙ্গালীর সংখ্যা নগণ্য। যাঁহারা ব্যবসায়ে কথঞ্চিৎ সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে গুজরাটী আর পার্শী-রাই প্রধান। বাঙ্গালীদের মধ্যে একমাত্র মিঃ গাঙ্গুলীর নাম করা যাইতে পারে। ইনি রুড়কী ইঞ্জিনীয়ারীং কলেজ হইতে বি-ই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইরাকের শাসন যন্ত্রের অংশরূপে পরিণত হয়েন। পরে চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া কল কব্জা মেরামত ও তৈয়ারের এক কারখানা বাগদাদ সহরে খুলিয়া বসেন। সম্প্রতি ইঁহার বাৎসরিক লভ্যের পরিমাণ অর্দ্ধলক্ষেরও উপর। ইঁহার সাফল্যের প্রধান কারণ দেশের বর্ত্তমান অবস্থা। আমাদের দেশও যেমন বিগত কতিপয় বর্ষ যাবৎ আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত কল কব্জার প্রতিষ্ঠায় ও উন্নতি বিধানে মনোনিবেশ করিয়াছে, ইরাকও তেমনি নিজের গঠন কার্য্যে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছে। তদ্ব্যতীত এই সুদর্শন যুবার পরিশ্রম, সহিষ্ণু সুস্থ-সবল দেহ, উৎসাহ, কার্য্যদক্ষতা, বুদ্ধি আর অমায়িক ব্যবহারও তার উন্নতির পক্ষে কম সহায়তা করে নাই। ইনি অতিশয় মিশুক, সকল সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে সমানভাবে ও সহজে মিশিতে পারেন।

মুছাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী রূপে কিছু দিন আমি সেখানকার বাজারের অভাব ও অন্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া আমাদের দেশের কি কি মালের কাটতি হইতে পারে তাহার এক তালিকা করিয়াছিলাম। তালিকাটি আমার সঙ্গে নাই, তবে যতগুলি জিনিষের নাম আমার মনে আছে তাহা আমি এখানে উল্লেখ করিতেছি। লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবেন এই সমস্ত জিনিষ আমাদের দেশে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয় মূল্যও অপেক্ষাকৃত সুলভ।

যথা—নানাবিধ সাবান, গন্ধদ্রব্য, বুরুষ, খেলনা, খেলিবার সরঞ্জাম, বিলাতের মাজন, নানাবিধ ঔষধ, চা, মশলা, বোতাম, চিরুণী, রেশমী ও পশমী কাপড়, ছোট খাট কল কব্জা, তালা চাবি ইত্যাদি।

ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ শিক্ষা সাপেক্ষ। আবার সেই সঙ্গে পাঁচজনের সহায়তাও কম আবশ্যক নহে। তথাপি যদি এদেশে একটা বেশ বড় কোম্পানী গঠন করিয়া সে দেশে উল্লিখিত জিনিষপত্র সরবরাহ করিবার ভার গ্রহণ করে তবে খুবই লাভবান হইতে পারে। আমাদের দেশ হইতে ইরাকের দূরত্ব কম। মাল পাঠাইবার খরচাও তদনুপাতে কম হইবে। আর আমাদের দেশের শ্রমজীবী সুলভ হওয়ায় উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যও অপেক্ষাকৃত কম হইবে। সুতরাং প্রতিযোগিতায় আমাদের পরাস্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম।

এখন আমাদের দেশে যেরূপভাবে কল-কব্জার প্রতিষ্ঠা হইতেছে তাহাতে আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে দেশের মাল যাহাতে বিদেশে কাটে তাহার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে। ইংরেজ, মার্কিণ, জাপানী প্রভৃতি ব্যবসায়িবৃন্দ কিরূপে নিজেদের বাজার প্রস্তুত করে তাহা অনেকেই জানেন। দেশে বিদেশে ঘুরিয়া, কমিশন পাঠাইয়া, কমিটী গড়িয়া, বাজারে বাজারে নিজেদের মাল যাচাই করাইয়া তাহাদের মাল বিক্রয় করিবার বন্দোবস্ত করে। তাহাদের যে সমস্ত গুণের জন্য জগতে তাহারা উন্নতি লাভ করিয়াছে, সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না; আকৃষ্ট হয় তাহাদের সাজ-পোষাক প্রভৃতি বাহ্যাড়ম্বরের দিকে। আবার আমাদের কেহ কেহ তাহাদের কোন গুণই দেখিতে পান না। ইহা হইতে একদেশদর্শিতার পরিচয় আর কি হইতে পারে? পৃথিবীর উন্নত জাতিসমূহ গৌরীশঙ্করের শৃঙ্গে আরোহণ করিতে, মেরু প্রদেশে যাইতে, সাগরের অতল তল হইতে রত্ন আহরণ করিতে, আকাশে উড়িতে ইত্যাদি আরও কত কি করিতে চেষ্টা করিবে তখন আমাদের কেহ বা তাহাদিগকে বাহবা দিব, কেহ বা কারণে অকারণে গালি পাড়িয়া মনের ঝাল মিটাইব, আর কেহ বা হাঁ করিয়া চাহিয়া দেখিব মাত্র।

আমার বিবেচনায় ইরাকে ভারতের বাণিজ্য বিস্তার লাভ করিতে পারে। কিন্তু তজ্জন্য প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। যে দেশে বাণিজ্য বিস্তার করিতে হইবে সর্ব্বাগ্রে সে দেশের ভাষা শিখিয়া দেশবাসীর সঙ্গে মিলিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

দেশের শিক্ষিত ও উন্নতিকামী ব্যক্তিবৃন্দ আমার কথাগুলি ভাবিয়া দেখিবেন কি?

(ক্রমশঃ)

শ্রীব্রহ্মদাস গোস্বামী।

কর্ম্মবীর টাটার জীবন কথা।

(ভূমিকা)

(২)

ক্রমশঃ রেলওয়ে, টেলিগ্রাম ও সমুদ্রে ব্যবহারোপযোগী বন্দর, সকলের নিকট সুপরিচিত হইয়া উঠিল। বোম্বাই, কলিকাতা ও মাদ্রাজের মধ্যে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড প্রস্তুত হইল। ইণ্ডোইয়োরোপিয়ান ও লোহিত সমুদ্রের মধ্যে টেলিগ্রাফের কাজ বেশ চলিতে লাগিল। নব-নির্ম্মিত খাল দ্বারা প্রাচ্যের সহিত বাণিজ্য যানে জলপথে বাণিজ্য করার পথ সুগম হইয়া উঠিল এবং সর্ব্বপ্রথম সুয়েজ খাল নির্ম্মাণ-কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য হইল। তখনও শ্রমজীবির সংখ্যা বেশী সস্তা ছিল বটে কিন্তু অপেক্ষাকৃত দলবদ্ধ ও সুদক্ষ। যান্ত্রিক কারিকর অধিক সংখ্যায় দেখা যাইতে লাগিল। সর্ব্বোপরি দুইটী দ্রব্য উৎপাদনকারি (ম্যানুফ্যাকচারিং) বেলাও হইয়া উঠিল। যাহা এক সময় সামান্য গ্রাম সদৃশ ও নগরের প্রান্তভাগ ছিল মাত্র, টরেন্টো ও পারদে উহা কলকারখানা সংক্রান্ত লোক দিগের সুন্দর বাসস্থানে পরিণত হইল। প্রায় শতাব্দীর এক তৃতীয়াংশ কাল শেষোক্ত স্থানে গভর্ণরের আবাস ভবন প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন ও স্বাস্থ্যপ্রদ জায়গা মাদ্রাজের হিলে স্থানান্তরিত হইল। অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীও তথায় আপনাদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিলেন। পেজ্ডাম ও গিবস নামক দুইটী মনোরম রাস্তা সেইখানে প্রস্তুত হইল। অল্পকাল মধ্যে কার্পাস শিল্পের এত দূর ক্রমোন্নতি হইল যে, মোটাকাপড় প্রস্তুত বিষয়ে ল্যাঙ্কেসায়ার এক প্রকার ভারতীয় শিল্পের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। কেবল এক বোম্বায়েই প্রায় ৪৯টী কল চলিতে লাগিল। অল্প সময়ের মধ্যেই এই অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। এই কার্পাস শিল্প সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এরূপ অপ্রতিহত প্রভাবে উন্নতিশীল হইয়া উঠিল যে, উহা প্রথম উদ্ভাবকদেরও স্বপ্নের অগোচর ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল।

মানব-জীবনে যেরূপ জোয়ার ভাটা আছে সেইরূপ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে মিঃ টাটার বিপুল সম্পদেও জোয়ার ভাটা আরম্ভ হইল। সেই সময়ের

তাঁহার জীবনাবসানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, তিনি ক্রমাগত শিল্প-প্রতিষ্ঠায় নূতন ক্ষেত্র অন্বেষণে ব্যাপৃত ছিলেন এবং বলা বাহুল্য তিনি তাঁহার ও স্বদেশের উপকারার্থে শুধু যে সেই ক্ষেত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা নহে, উহার অনুশীলনে আপনার জীবন পাত করিয়া গিয়াছেন। যখন দেশে স্বদেশী-আন্দোলনের নবযুগ আবির্ভাবের বহুপূর্ব্বে অনেক তথাকথিত স্বদেশসেবকের মনে দেশহিতৈষণা অপেক্ষা, তাহার হৃদয়ে স্বদেশের মঙ্গল সাধনেচ্ছা জাগরূক হইয়াছিল। যখন ধীরে ধীরে তিনি কার্পাস শিল্প সম্বন্ধীয় নানারকম সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে লাগিলেন, তখন তাহার মনে এই ধারণা জন্মিল যে, ভারতের অভ্যন্তরে এই শিল্পের যে আশ্চর্য্য শক্তি নিহিত রহিয়াছে, সময়ের গতি অনুসারে উহা আপনিই ফুটিয়া উঠিবে। অল্পে অল্পে এই শিল্প বিস্তারের চেষ্টা করিলে ভবিষ্যতে উহা উন্নতির চরম সীমায় উঠিবে।

এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি "স্বদেশী মিল" নামে বোম্বাইয়ে একটী কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করিলেন। মাঞ্চেষ্টারের মত মিহি সূতা ও উৎকৃষ্ট কাপড় প্রস্তুত করা তাহাদের তখনকার সঙ্কল্প ছিল, কারণ তখন প্রায় মোটা কাপড় ও সূতা এ দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। কাজে কাজেই ল্যাঙ্কেসায়ারের এই সূক্ষ্ম দ্রব্যের আমদানী বন্ধ করিয়া, ইহার সহিত প্রতিযোগিতা করিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতে লাগিলেন। উপযুক্ত সংখ্যক লোকজন, কর্ম্মচারী, আবশ্যকীয় মূলধন ও বিপুল অধ্যবসায়ে সুসজ্জিত হইয়া তাঁহার মনে দৃঢ় প্রত্যয় হইল যে, সুদূর অতীতের মত আবার ভারত একদিন ভবিষ্যতে আপনার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইবে, এবং প্রচুর পরিমাণে বিদেশে জিনিষও রপ্তানি করিতে পারিবে। যে দিন এ দেশের প্রাচীন তন্তুবায়কুল, এই সুচারু-শিল্পের উৎপাদন করিয়া, স্বদেশে ও বিদেশে আপনাদের সুযশ বিস্তার করিয়াছিল, ভারতবর্ষের সে অতীত সৌভাগ্যের দিন, আশামাধার সে সুখস্বপ্ন তাঁহার মানসচক্ষে প্রতিভাত হইয়া উঠিল।

নানা বিষয়ের পরীক্ষা ব্যাপারে তিনি মুক্তহস্তে অজস্র অর্থ ব্যয় করেন। প্রাচীন বণিকজা প্রভৃতকারগণদিগের মধ্যে যখন ব্যবসাবিষয়ে নানা-মত স্থৈর্য্য উপস্থিত হইল, তখন তিনিই দৃঢ়তা সহকারে তাহাদের মনের নিরাকরণ করেন। তিনিই অফুরন্তোদ্যমে মূলধন যাহা প্রচলন করেন, তাহাতে পুরাতন পদ্ধতি পরিবর্ত্তন হইয়া, কার্পাস শিল্প-ব্যবসায়ে যুগান্তর উপস্থিত হয়।

তাঁহার আয়াসলব্ধ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভবিষ্যবাণী সফলতা লাভ করিয়াছে। এই নূতন শক্তির সুকার্য্যতার স্বদেশজাত নানা প্রকার কার্পাসের উন্নতি-বিধানার্থ ও বিশদীয় পদ্ধতি-অনুসারে চাষের জন্য বিশেষ করিয়া পরীক্ষা আরম্ভ হইল। মিঃ টাটা এ বিষয়েও তাঁহার সহযোগী কলওয়ালাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন। তাঁহার তৃতীয়বারের উদ্যমেও কার্পাস শিল্পের উন্নতির জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে সময় চীনদেশে যে সকল সূতার গাঁইট রপ্তানি হইত, এ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন ও সমস্যা উপস্থিত হইল।

প্রধান প্রধান "নেভিগেশন কোম্পানী"গুলি একত্র হওয়ায়, হঙ্‌কঙ্‌ ও সাংহাইয়ে সূতা রপ্তানীকারকদিগের মহা অনিষ্ট সাধিত হইল। প্রতিযোগিতার অভাবেই কোম্পানীগুলি একত্র হইবার সুযোগ পাইয়া বসিল। জলপথে মাল্‌প্রেরণের যে এফচেটিয়া ব্যবসায় ছিল, মিঃ টাটা একাই উহা বিনষ্ট করিয়া দেন। তিনি কতকগুলি জাপানী জাহাজ দ্বারা জাপান হইতে রেলওয়ে ও কয়লা আনাইতে এবং ফিরিবার পথে এ দেশ হইতে কার্পাস ও সূতা পাঠাইতে বিশেষ মনোযোগী হন। ভারতীয় তুলার জন্য জাপান তখনও চীনের বাজারে প্রতিযোগী হইয়া দাঁড়ায় নাই। নিজ দেশেই জাপান উহা প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করিত। ভারতীয় কার্পাসের আমদানীও সামান্যই ছিল। এই ভাবে জাপানী জাহাজ কোম্পানী বেশ সুন্দর ভাবে মাল আমদানী ও রপ্তানীর কাজ করিতে লাগিল। এই ব্যবসায়টি যথেষ্ট বিপদসঙ্কুল ও অসীম সাহসের পরিচায়ক। কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্যে অকুতোভয়তা মিঃ টাটার চরিত্রের একটি প্রধান বিশেষত্ব, কি করিয়া অতঃপর স্বার্থপর "কলওয়ালাদিগের" প্রতিকূল সহানুভূতির অভাবে, তাঁহার এই সুধন্যজনক প্রচেষ্টার বিনাশ সাধন ঘটে, সেই সকল ঘটনা পশ্চাৎ সবিস্তার বর্ণিত হইবে। অতঃপর বৈজ্ঞানিক গবেষণা মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া, উহাদ্বারা ভারতীয় শিল্পের উন্নতি বিধানের জন্য মিঃ টাটা বিশেষ মনোযোগী হন, এবং ইহার জন্য তিনি প্রায় ত্রিশলক্ষ টাকা ব্যয় করেন। এইরূপ তাঁহার স্বদেশ-হিতৈষণা ক্রমে ক্রমে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া উঠে এবং তখন হইতে তাঁহার সময় ও মনোযোগ দুইটী বিরাট ব্যয়সাধ্য কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য কেন্দ্রীভূত হইয়া উঠে। এই মহৎ কাজের জন্য তাহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। সেই দুইটী কাজ আর কিছুই নহে, ভারতীয় খনিজ বিমিশ্র লৌহ হইতে (পিগ) লৌহ ও ইস্পাত নিষ্কাষণ এবং ইলেক্ট্রিসিটীর সাহায্যে মনের শক্তিদ্বারা উপকার সাধন করা। হায়! যদিও প্রায় অকালেই মিঃ টাটার অমূল্য জীবন অনন্তের কোলে মিশিয়া

গেল, তথাপি বিবিধ শিল্পের পথপ্রদর্শক ও আকৃতিম বন্ধু হিউজলী বলিয়া চিরকালের জন্য ভারতবর্ষের শিল্পেতিহাসে তাঁহার নাম সুবর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে। পরলোকগত মিঃ টাটার জীবন-সৌরভে ভারতবর্ষের ভবিষ্যদ্বংশধর-গণের চিত্ত চিরকাল বিমুগ্ধ রহিবে।

ভূমিকা সমাপ্ত।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত।

কো জাগর্ত্তিবা।

আজ মা জ্যোৎস্নালোকোদ্ভাসিত রাত্রিতে বাঙ্গালার দ্বারে দ্বারে করাঘাত ক'রে ক'রে ডেকে বেড়াচ্ছেন "কো জাগর্ত্তিবা," কিন্তু কৈ কেউ ত' তাঁর ডাকে উত্তর দিলে না; কেউ ত' তাঁর আহ্বানে পথে ছুটে গিয়ে তাঁর আহ্বান গেয়ে তাঁকে গৃহে তুলে নিয়ে এলো না। অথচ বাংলা আজ মা'কে চায়, সে চায় মাকে নিজের গৃহে অচলা ক'রে বাঁধতে, নিজের গৃহে আনিয়া হর্ষে, পুণ্যে, সুখে, শান্তিতে, ধনে, ধান্যে পূর্ণ ক'রে রাখবার জন্যে।

মা আজ স্বর্গ থেকে মর্ত্ত্যে নেমে এসে সন্তানের গৃহে স্থান পাবার জন্যে নৈশস্তব্ধতাপূর্ণ নীরব মহানগরীর পথে পথে, অরণ্যসমাকীর্ণ কর্দ্দমাক্ত পল্লীর অলিতে গলিতে ডেকে বেড়াচ্ছেন, "কো-জাগর্ত্তিবা"; কিন্তু হায়, আজ তাঁর সন্তান তাঁকে দ্বারে পেয়েও হারাতে বসেছে; মা' আজ স্বেচ্ছায় তাদের দ্বারে অতিথি—সন্তানের দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ ক'রে তাঁকে তাঁর বিস্তীর্ণ স্নেহমাখা বক্ষেরপরে টেনে নেবার জন্যে, তবু কিন্তু মূর্খ অলস সন্তান তাঁর নিদ্রার ঘোরে অচৈতন্য। মা' ডেকে ডেকে ফিরে যান, অথচ তা'র জ্ঞান হয় না, নিদ্রা ভাঙ্গে না, চোখ মেলে চেয়ে দেখে না। কাণ পেতে আহ্বান শোনে না! হায়-রে বাংলা, এই তোমার আরাধনা—এই তোমার মাতৃপূজা?

হে সুপ্ত নিদ্রাভিভূত বাংলা! তুমি চাও যাকে তোমার গৃহে অধিষ্ঠিত ক'রতে! কিন্তু নিদ্রার ঘোরে স্বপ্নে বিভোর থাকলে ত' মা তোমার গৃহে

আস্‌বেন না ; তাঁকে আন্‌তে হ'লে চাই সাধনা, চাই উপাসনা, চাই হৃদয়ভরা প্রেম, আন্তরিক ভক্তি, প্রাণ দিয়ে মায়ের পূজা কর্‌তে হবে ; অশ্রুসিক্ত হৃদয়ের মূর্ত্তীভূত বেদনারাশির কথা মাকে জানাতে হবে, রাত্রি দিন ধরে মুক্ত আকাশের তলে মুক্ত আঙ্গিনার উন্মুক্ত দ্বারের সাম্‌নে মায়ের আগমনের পথ চেয়ে ব'সে থাক্‌তে হবে, তবেই ত মাতার রক্তকমলচরণযুগলের মধুর নূপুর-নিক্কনে তোমার জীর্ণ কুটীরখানি মুখরিত কর্‌বেন ; তোমার বিষাদ অন্ধকারে আচ্ছন্ন শূন্যকক্ষের মাঝে হর্ষের দীপ্তোজ্জ্বল আলোখানি স্বহস্তে জ্বালিয়ে দেবেন ! আর সেই আলোকেই তুমি দেখ্‌তে পাবে তোমার করুণাময়ী স্নেহময়ী জননীর হাসিমাখা, বাৎসল্যমাখা, মধুর কমনীয় মুখখানি—যার প্রদীপ্ত প্রভার কিরণসম্পাতে তোমার জীবনের সব দুঃখ, দুর্দ্দশা, দারিদ্র্য মুহূর্ত্তে দূর হ'য়ে যাবে।

তাই বলি, হে বাংলা, হে সুপ্তবীর্য্য হৃতশক্তি দুর্ব্বল বাঙ্গালী ! সর্ব্বাগ্রে দূর ক'রে ফেল তোমাদের দেহের জড়তা—মনের জড়তা—হৃদয়-দৌর্ব্বল্য—অন্তরের সামর্থ্যহীনতা,—তার পর সুষুপ্তি ঘোর ভেঙ্গে জেগে উঠে চোখ মেলে চেয়ে দেখ সমগ্র বিশ্বটাকে, তার অণুপরমাণুকে বেশ স্পষ্ট সরলভাবে জ্ঞানের চক্ষে, জাগ্রত নয়নের তীক্ষ্ণদূরদর্শী দৃষ্টি দিয়ে ; তারপর মায়ের পূজা আরম্ভ ক'রো, মাকে ডেকো, সাধনা করো, সিদ্ধি নিশ্চয়ই হবে, ফল পাবেই পাবে। মায়ের পূজা পুষ্প-বিল্বদলে নয়, অগুরু চন্দন, গঙ্গোদকে নয় ; মায়ের প্রকৃত পূজা হয় অশ্রুসিক্ত হৃদয়ের ভক্তি ও প্রেমের পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে, মায়ের সে মহাপূজার গঙ্গোদক ভক্তের তপ্তাশ্রু আর তা'র পুষ্পাঞ্জলি ও উপকরণ হৃদয়ের পবিত্র প্রেম, আর একাগ্রতা। তেমন ক'রে পূজা কর্‌তে পারলে মা' যে সেই ভক্তপূজারী সন্তানের কাছে দাসী।

নইলে তোমার এ মাতৃপূজা নিষ্ফল। নইলে ব্যর্থ তোমার রোধন, ব্যর্থ তোমার পূজার আয়োজন, ব্যর্থ তোমার ভোগ নৈবেদ্য ; মা' স্বর্গে থেকে এসে, আবার যেমনি স্বর্গেই চ'লে যাবেন, তেমনি উপবাসী থেকে কেবল সারা রাত্রি সন্তানের প্রাণে প্রাণে ব্যর্থ চীৎকার ক'রবে। "কো জাগর্ত্তিব্যা।"

শ্রীসুকুমার ভাদুড়ী।

রূপের দুলালী।

প্রজাপতি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তৃতীয় একটী কর্ম্মও ইহাদের দ্বারা সম্পন্ন হয়; সেইটী, প্রজাপতির মধু-পানের সময় তাহার পায়ে যে ফুলের রেণু জড়াইয়া যায়, পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে পরিভ্রমণের কালে সেই ফুলের রেণুগুলি অন্য স্ত্রীফুলের গর্ভকোষে পতিত হইয়া সেইটীকে ফলে পরিণত করিতে সহায়তা করে। এইভাবে একটী প্রজাপতি প্রত্যহ পরোক্ষভাবে সহস্র সহস্র ফুলের ফলোৎপাদন করিতেছে।

ফুলের মধু খাওয়া ও দিব্যি আনন্দে ঘুরপাক খাওয়া প্রজাপতির একমাত্র কার্য্য হইলেও তাহাদের দ্বারা যে আমরা যে কিছুমাত্র উপকৃত হই না, বলিতে পারি না। প্রথমতঃ ফুলের ফলোৎপাদনে প্রজাপতি মস্ত সহায়; দ্বিতীয়তঃ গুটিপোকা প্রজাপতি-রূপ ধরিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে সূক্ষ্ম রেশমী সূতা উপহার দিয়া যায়। অবশ্য রেশমী গুটিপোকা এক শ্রেণীর প্রজাপতিমাত্র। তাহা হইলেও এক শ্রেণীর পোকাও যে আমাদের ব্যবহারের জন্য এমন একটী উৎকৃষ্ট দ্রব্য নিজের চরকায় বিনা খরচে কাটিয়া আমাদিগকে উপহার দিয়া যায় ইহা কি আমাদের কম সৌভাগ্যের কথা! বোধ হয় এই দ্রব্যটী এভাবে উৎপন্ন না হইলে আমাদের দেশের উড়ানী-উড়ানো বাবুদের ষোল আনা সৌন্দর্য্যই মাঠে মারা পড়িত।

প্রজাপতি-জীবনের বিশেষত্ব পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, হয়ত মেঘের ঢাকা পড়িয়া সূর্য্য কিছুক্ষণের জন্য লুক্কায়িত আছে এবং মেঘের মলিন ছায়া আসিয়া ধরণীর গায়ে লাগিয়াছে, অমনি প্রজাপতি খেলা সাঙ্গ করিয়া বিষণ্ণভাবে গাছের ডালে বসিয়া আছে; যেই আবার সূর্য্য প্রকাশিত হইল, অমনি প্রজাপতি রঙ্গিন পাখা কাঁপাইয়া সোনালী আলোকসমুদ্রে সাঁতার দিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। প্রজাপতির এইভাব একান্ত বিস্ময়কর।

প্রজাপতির এই আনন্দপূর্ণ জীবনের উৎপত্তি কোথায় তাহা একবার খুঁজিয়া দেখা যাক।

প্রজাপতি Lepidoptera প্রাণীপর্য্যায়ভুক্ত ; ইহারা আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত :—(১) Butterfly প্রজাপতি, (২) Moth পতঙ্গ।

প্রজাপতির শরীর তিন ভাগে বিভক্ত—মাথা, বুক ও উদর। ইহাদের মাথার দুই দিকে বিস্তৃত ও গুচ্ছ দুইটী চক্ষু আছে। প্রত্যেক চক্ষুই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু চক্ষুর একত্র সংবদ্ধ সমষ্টিমাত্র ; এজন্য ইহাদের দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রখর। ইহারা এক সঙ্গে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারে। প্রজাপতির মাথার কিছু ভাগে লম্বা একটী শুঁড় আছে। সেটী প্রজাপতির মধুপান-যন্ত্র। ইহার নীচেই ওষ্ঠ ও মুখগহ্বর। প্রজাপতির বক্ষ দেশটী তিন ভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক ভাগে দুইটী করিয়া পা ; মোট প্রজাপতির পা ছয়টি। এই বক্ষদেশের সহিত প্রজাপতির চারখানি ডানাও সংযুক্ত পাখাগুলি সূক্ষ্ম ক্ষুদ্র পক্ষতলা আঁইস দ্বারা নির্ম্মিত। এই পাখা চারটীর উপর ভর করিয়া প্রজাপতি অনায়াসে বাতাসের উপর উড়িয়া বেড়ায়। ইহাদের সম্মুখের পাখা দুইটী অপেক্ষা পশ্চাতের পাখা দুইটী কিঞ্চিৎ বড়। প্রজাপতির উদরভাগটী কতক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের সমষ্টিমাত্র।

প্রজাপতির শুঁড়টী খুব দীর্ঘ ও বক্রভাবে অবস্থিত ; কেবল মাত্র ফুলের মধুপানের সময় উক্ত শুঁড়টী দীর্ঘ ভাবে ফুলের রসকোষের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দেয়।

প্রজাপতির স্ত্রী পুরুষ নির্ণয় করা বিশেষ কষ্ট সাধ্য নহে। প্রজাপতির পক্ষ চারটি আঁইসযুক্ত, কিন্তু স্ত্রী প্রজাপতির শরীরেও আঁইস বিদ্যমান থাকে এবং ইহাদের উদরভাগটী কিঞ্চিত মোটা হইয়া প্রান্ত দেশটী কিঞ্চিত ক্ষুদ্র ও সরু উঁচের হয়। স্ত্রী প্রজাপতির পাখায়ও একটু স্বতন্ত্রতা আছে। অধিকাংশ স্ত্রী প্রজাপতির পশ্চাতের পক্ষ দুইটিতে স্বতন্ত্র দাগ বিদ্যমান থাকে।

স্ত্রী প্রজাপতি জীবনে একবার মাত্র সন্তান প্রসব করে, এবং সন্তান প্রসবের অল্পকাল পরেই ইহারা মরিয়া যায়। পুরুষ প্রজাপতিটী যৌনসম্মিলনের অত্যল্পকাল পরেই প্রাণত্যাগ করে, তাহাদের এই মিলন ২৪ঘণ্টা স্থায়ী হয়।

প্রজাপতির জন্মবিবরণ বড়ই বিস্ময়কর। স্ত্রী-প্রজাপতি কোন বৃক্ষের পত্রের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম পাড়িয়াই মরিয়া যায়। যাহাতে এই শিশুগুলি ভাবী সন্তানের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, তদ্রূপ পত্রেই প্রজাপতি ডিম পাড়িয়া থাকে। এই ডিমগুলি ১০।১৫ দিনের মধ্যে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত

হইলে খোসা বা আবরণ বিদীর্ণ করিয়া ছোট ছোট পলু কীট বাহির হয়। এই কীটগুলি বাহির হইয়াই আশ্রয়দাতা পত্রটীকে প্রথম খাইতে আরম্ভ করে; এই সময় ইহাদের ক্ষুধা এত প্রবল থাকে যে, যাহা পায় তাহাই খাইয়া সাবাড় করে। এইরূপ খাইয়া ইহারা যখন বেশ মোটা হইয়া উঠে তখন ইহাদের শরীরের খোলস ফাটিয়া গিয়া নূতন খোলস প্রস্তুত হয়। এই ভাবে তিন চার বার খোলস বদলাইয়া পলু পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন আর ইহাদের আহারের প্রয়োজন হয় না। ইহারা সর্ব্বাঙ্গ এক নূতন চামড়ায় আবৃত করিয়া পুত্তলি অবস্থায় নিস্পন্দভাবে পড়িয়া থাকে। কীটের এই অবস্থাকে মৌন বা সুসুপ্তাবস্থা বলে। এই অবস্থায়ই ইহাদের চামড়ার ভিতর ভাবী প্রজাপতির সমস্ত অবয়বাদি জন্মিতে থাকে। এই সময় পক্ষ উদ্গত হয়; শুঁড়, পদ ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি যথাযথ ভাবে নির্ম্মিত হয়।

কোন কোন জাতীয় প্রজাপতির পলু মৌন বা সুসুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে মুখের লালা দ্বারা স্বীয় দেহের চতুর্দ্দিকে একটী ঘর নির্ম্মাণ করে। রেশম, এণ্ডি, মুগা এই শ্রেণীর পলু কীটের দ্বারা তৈয়ার হয়। এই রেশমের কক্ষে অনেকদিন সুসুপ্ত থাকিবার পর মৌন কীটগুলি যখন বহিরাবরণ ছিন্ন করিয়া পূর্ণ প্রজাপতি রূপে বাহির হয়, তখন সে স্বীয় রচিত কারাগারের মধ্যে নিজকে অবরুদ্ধ দেখিতে পায়, এবং সে কয়েকদিনের ক্রমাগত চেষ্টায় সেই রেশমের গুটি ছিন্ন করিয়া পলায়ন করে।

পলু অবস্থায় সমস্ত প্রজাপতিই গাছ পালা ও শস্যের সবিশেষ অনিষ্টকারী। প্রজাপতি অবস্থায় পরিণত হইয়া ইহারা বেশীদিন বাঁচে না। যে কয়দিন বাঁচে ফুলের মধু ও ঘুরপাক খাইয়াই জীবন কাটায়।

কোন পোকারই নিঃশ্বাস লইবার নাসিকা নাই। ইহাদের শরীরের দুই পার্শ্বে অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র থাকে, এই ছিদ্রগুলি দ্বারা ইহাদের শরীরের ভিতর বায়ু প্রবেশ করে। এই ছিদ্রগুলি বন্ধ করিয়া দিলে কিম্বা ছাই প্রভৃতি লাগিয়া বন্ধ হইয়া গেলে পোকা কিম্বা প্রজাপতি অচিরাৎ প্রাণত্যাগ করে।

কতকগুলি কীট আছে, যাহার সাধারণ নাম মাজরা কীট (মজ্জাভুক কীট) এই কীটগুলি প্রজাপতির পলুরই নামান্তর। মাজরা কীট বৃক্ষাদির বড় অনিষ্টকারী। প্রজাপতি উড়িতে উড়িতে হয়ত আক গাছের আগায় ডিম পাড়িয়া গেল, সেই ডিম হইতে পলু উৎপন্ন হইয়া সেগুলি আকগাছের অভ্যন্তরে ঢুকিতে

থাকে, এবং বৃক্ষের অভ্যন্তরের মজ্জা বা রস খাইয়া ফেলে, তদ্দ্বারা বৃক্ষটীর একেবারে সর্ব্বনাশ হয়। বেগুণগাছের ডাঁটায় ও আকগাছের অভ্যন্তরে এইরূপ কীট দেখা যায়।

কতকগুলি প্রজাপতি যে আমাদের শস্যেরও অনিষ্টকারী তাহা বলাই বাহুল্য। পক্ষপাল এক শ্রেণীর পতঙ্গমাত্র।

প্রজাপতি মৌমাছির মত সঞ্চয়ী নহে, কাজ-কর্ম্মেও মৌমাছির মত তাহাদের আগ্রহ নাই। মৌমাছি সঞ্চয়ী এবং জাতি, সমাজ ও গৃহাদি নির্ম্মাণের বিশেষ পক্ষপাতী। মৌমাছির অপত্যস্নেহও প্রবল। Mission বা সম্মিলিত দল বাঁধিয়া কাজ করিতেও ভালে। মৌমাছি দক্ষশিল্পী, গৃহনির্ম্মাণ বিদ্যা বিশারদও ভাল 'ইঞ্জিনিয়ার'। ইহারা স্থান নির্ব্বাচন করিয়া বৃক্ষের এমন স্থানে মধুচক্র নির্ম্মাণ করে যেখানে ঝড়-বৃষ্টির ভয় নাই। ইহারা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, এবং ইহাদিগকে উত্যক্ত করিলে প্রতিশোধ দিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। মৌমাছির এই কয়টী গুণ ক্ষুদ্র পিপীলিকায়ও পরিদৃষ্ট হয়।

প্রজাপতির এই সমস্ত গুণ কিছুই নাই। ইহারা বাসা বাঁধে না, সঞ্চয় মধুও সঞ্চয় করে না। ইহারা আলোক-সমুদ্রে আনন্দে সন্তরণ করিয়া বেড়াইতে ভালবাসে। কখন কখন সামান্য মধু পান করে।

ক্ষুদ্র পাতায় কিম্বা মাটির মধ্যে ক্ষুদ্র একবিন্দু কীট—যাহার এক ইঞ্চ পরিমিত স্থান অতিক্রম করিতে বহুক্ষণের প্রয়োজন হয়—সেই কীট এই প্রজাপতিতে পরিণত হইয়া বিশ্ব-আনন্দের স্পন্দন রূপে আলোকে, বাতাসে, পুষ্পে, পত্রে, সুদূর আকাশে স্বচ্ছন্দে পরিভ্রমণ করে! আনন্দের আলোকে ও সৌন্দর্য্যে যে সে আত্মহারা! রূপের অপরিসীম গর্ব্ব যেন তাহার শরীরে, মুক্ত প্রাণের সজীবতা যেন তাহার অন্তরে প্রদীপ্ত!

কীটদেহের এই বারম্বার পরিবর্ত্তন ও জীবনের অবস্থার ক্রমোন্নতি দেখিয়া হৃদয়ে এই বিশ্বাস স্বতঃই বদ্ধমূল হয় যে, ক্রমোন্নতি সর্ব্বজীবের অবশ্যম্ভাবী ফল এবং আমরাও কি তবে ক্রমাগত দৈহিক পরিবর্ত্তন দ্বারা জীবনের ঊর্দ্ধ স্তরে পৌঁছিতেছি? তবে এ আশা নিশ্চয় সফল হইবে, দুঃখপূর্ণ মানব-জীবনের পরমানন্দ অভিব্যক্তি সুনিশ্চিত।

ইহাদ্বারা জীবের ক্রমবিকাশ বা অভিব্যক্তিবাদ পরীক্ষিত সত্য বলিয়া মনে হয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।

হইয়াছেন। ১৯১৫ খৃঃ অব্দের শেষভাগে পানামা প্রদর্শনীতে ধর্ম্ম মহাসভার প্রতিভাশালী বক্তা হইয়াছিলেন। ইঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধর্ম্ম ব্যাখ্যায় কালিফোর্ণিয়াবাসিগণ মুগ্ধ ও চমৎকৃত হন, মনোহর বেদান্তকথা শুনিয়া তথাকার সাময়িক পত্রিকাদিতে বিশেষ প্রশংসা বাহির হয় এবং তদ্দেশীয়গণ বলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের পর আমেরিকা এরূপ বাগ্মিতা ও সুললিত ব্যাখ্যা শুনে নাই। কেহ কেহ ইঁহার উপদেশাবলী স্ব স্ব জীবনে প্রতিফলিত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। তিনি আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ মহাসভার সহকারী সভাপতিরূপে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে দুইটী গবেষণা পূর্ণ বক্তৃতা দান করেন।

স্বামী প্রকাশানন্দ মহারাজকে তাঁহার গুণমুগ্ধ স্বদেশবাসী তাঁহার সম্মানোচিত অভ্যর্থনা ও সাদর স্বাগতম্ দিবার নিমিত্ত একটী অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করিয়াছে। তিনি যেরূপ সনাতন ধর্ম্মের নিমিত্ত আজ সপ্তদশবর্ষব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন তাহার জন্য তিনি ভারতের সর্ব্ব সাধারণের পক্ষ হইতে শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি পাইবার উপযুক্ত পাত্র। তিনি বিদেশে থাকিলেও ভারতবাসীর দুঃখ ও দৈন্যে সদা ব্যাকুল থাকিতেন; তাঁহার কয়েকখানি পত্র হইতেই কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, পাঠক তাহা হইতেই তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিবেন।

"এদেশে মঠের প্রচারকার্য্য ভারতবর্ষের কল্যাণের নিমিত্ত, সকল বিষয়ের Result হঠাৎ দেখা যায় না, সময়সাপেক্ষ; তুমি দুঃখ করিয়া লিখিয়াছ আমি ভারতবাসিদিগকে এদেশে আনিয়া শিক্ষা দিবার চেষ্টা পাইনা কেন? তাহার কারণ আমাদের Sufficient fund নাই; হিন্দু মন্দির নির্ম্মাণের নিমিত্ত Sanfransisco Vedanta Society একাধিক লক্ষটাকা ধার করিয়া Is encumbured with its own debt। যাহা হউক যদি ভগবান দিন দেন তাহা হইলে দেখিবে আমাদের হৃদয়ের ব্যথা ও আকাঙ্ক্ষা কোথায়? ভারতের দীন দুঃখীর জন্য আমাদের প্রাণ ব্যাকুল কি না? মুখের কথা কি কেবল ভাষার প্রকাশ করিলে কি হইবে এ কথা স্মরণ রাখিও। এদেশে আসা Luxury নয়, কি কষ্ট করিয়া ও স্বার্থত্যাগ করিয়া এদেশে আসিতে হয় ও কার্য্য করিতে হয় এদেশে না আসিলে বুঝিতে পারিবে না।"

অন্য পত্রে বঙ্গদেশের এক অধিবাসীকে অনাথ আশ্রম প্রসঙ্গে লিখিতেছেন "তোমাদের অনাথ আশ্রম বেশ চলিতেছে ও উত্তরোত্তর উন্নতি করিতেছে শুনিয়া সুখী হইলাম। আমাদের কি একটা দোষ জান, আমরা সকলেই

Leader হইতে চাই, তাই আমাদের দেশের Organisation টিকে না, Organisationএর মূলমন্ত্র Obedience ও unselfishness; যে দিন আমরা আমাদের স্বার্থ গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়া "work for work's sake and not for our own name" শিক্ষা করিব সেই দিন আমাদের দ্বারা মহৎ মহৎ কার্য্য সাধিত হইবে। যে দিন তোমাদের অনাথাশ্রম ভারতবর্ষের একটী আদর্শ স্থানীয় হইবা দাঁড়াইবে সে দিন তোমাদের ভিতর কেহই আপনার নামের আকাঙ্ক্ষা করিবেন না; দেখ নাই কি কর্ম্মবীর আমাদের পূজনীয় আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ কি অদ্ভুত কার্য্যসমূহ করিয়াছিলেন, কিন্তু এক দিনের জন্যও তাঁহার কার্য্যে আমি বা আমার বুদ্ধি ছিল না, স্বার্থের জন্য বা নিজের নামের জন্য কিছু মাত্র স্পৃহা ছিল না, অথচ তাঁহার অপেক্ষা কে মহৎ কার্য্য করিয়াছেন ও যশঃলাভ করিয়াছেন! অথচ তিনি নাম স্বার্থ বা কর্ত্তাভাব কাকবিষ্ঠাবৎ দূরে ফেলিয়া দিয়া দীনবেশে সামান্য সন্ন্যাসীর বেশে মঠে পাছতলায় বসিয়া থাকিতেন, তাঁহাকে আদর্শ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে শিখ এবং অহংবুদ্ধিকে ধীরে ধীরে নাশ করিতে শিখ; জীবন ধন্য হইয়া যাইবে।

শ্রী—

খোন্দকার সাহেব।

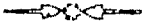

(১)

মোহনপুর গ্রামের হরিশঙ্কর সান্যাল তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত-ভ্রাতা মতিশঙ্করকে কন্যার বিবাহে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিলে যখন মতি সম্মতি প্রকাশ করিলেন, তখন হরিশঙ্কর তাহাতে খুব সন্তুষ্ট হইয়া বাড়ী আসিলেন বটে,—কিন্তু খোন্দকার আমির আসরাফ সে কথা শুনিয়া মুখখানি গম্ভীর করিলেন।

হরিশঙ্কর বলিলেন, "কাকা সাহেব, দাদা যখন বললেন তিনি বিয়েতে আসবেন, তখন আমি তো কোনো ভাবনার কারণ দেখ্‌ছি না,—আপনি কি আর কিছু—"

খোন্দকার আমির আসরাফ বাধা দিয়া বলিলেন,—"বাবা সে যথার্থ কথা কি? আমি তোমার-চেইতে পৃথিবী বেশী দেখিছি,—মতিকেও আমি জানি।"

মতিশঙ্কর এবং হরিশঙ্কর মোহনপুর গ্রামের জমিদার; তাঁহাদের প্রকাণ্ড বাড়ী। পৈত্রিক বাসস্থানীর বিভিন্ন অংশে তাঁহারা থাকেন। উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য।

খোন্দকার আমির আসরাফ হরিশঙ্কর ও মতিশঙ্করের পিতৃব্য। হরি এবং মতির পিতা সহোদর ভাই ছিলেন, তাঁহারা আমির আসরাফকে সহোদর ভ্রাতার ন্যায় দেখিতেন। আমির আসরাফ তাঁহাদের উভয়ের অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন,—পাশাপাশি বাড়ী।

এখন হরি ও মতির পিতা জীবিত নাই। মতিশঙ্করের বয়স ৪৭ বৎসর এবং হরিশঙ্করের বয়স ৩৭ বৎসর। আমির আসরাফকে উভয়েই 'কাকা সাহেব' বলিতেন,—তাঁহার বয়স প্রায় ৭৫ বৎসর।

হরিশঙ্কর সাংসারিক কার্য্যে খোন্দকার আমির আসরাফের পরামর্শ না লইয়া কিছুই করিতেন না,—তাঁহার গৃহস্থালীর সমস্ত কার্য্যেই "কাকা সাহেব না করেন"।

এবার হরিশঙ্করের কন্যা মায়া দেবীর বিবাহ।

(২)

তখন ১৭১৯ খৃষ্টাব্দ ; একাদশ মোগল সম্রাট্ রফিউদ্দীন দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত।

প্রাচীন মোহনপুর গ্রাম যেখানে ছিল, আধুনিক জেলা-বিভাগে সেই স্থানটী বর্ত্তমান পাবনা জেলার মধ্যে পড়িয়াছে, পাবনা সহর হইতে পূর্ব্বদিকে যমুনা-নদী পর্য্যন্ত যে সরকারী রাস্তা চলাই, শিবপুর প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া সুপ্রসিদ্ধ ভারেঙ্গা গ্রামের দিকে চলিয়া গিয়াছে, মোহনপুর সেই রাস্তার পূর্ব্ব অংশ হইতে তিন ক্রোশ উত্তর।

খোন্দকার আমির আস্‌রাফ অনেক মুসলমানের ধর্ম্ম-গুরু এবং হিন্দু জন-সাধারণের শ্রদ্ধা-ভাজন ; তিনি সংসারে নির্লিপ্ত। পৃথিবীতে তাঁহার নিজের আত্মীয় বলিতে কেহই ছিল না, কিন্তু এমনি ছিল তাঁহার চরিত্র-প্রাধান্য যে তাঁহার ব্যবহার দেখিলে বোধ হইত যেন সমস্ত পৃথিবীটা কেবল তাঁহারই আত্মীয়-স্বজনে পরিপূর্ণ। তাঁহার সাংসারিক অভিজ্ঞতা কি প্রকারে হইল তাহা কেহ জানিত না, কেহ কেহ হয়ত জানিলেও তাহা তাঁহাদের স্মরণ হইত না ; তথাপি কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কেহই সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার অভিমত না লইয়া কোন কাজ করিত না। দিনের মধ্যে তাঁহারা অনেক সময়েই 'বন্যার ঘোষের জন্য আজ কি পথ্য ব্যবস্থা দরকার,' "নিমাই সরকারের বাড়ীর বিয়েতে কত লোক খাওয়ানা উচিত' ইত্যাদি শ্রেণীর বিবেচনা করিতে ও পরামর্শ দিতেই কাটিয়া যাইত। খোন্দকার সাহেব অনুজ্ঞা করিলে বুঝি জোকে আগুনেও প্রবেশ করিতে পারিত,—তা' হিন্দু হৌক আর মুসলমান হৌক। সেই গ্রামের এবং নিকটস্থ স্থানের লোক যেনো বিষয় বিচার-মীমাংসার প্রার্থী হইলে তাহারা দিল্লীর বাদসাহ বা বাংলার নবাবের কাছে যাইত না,—তাহারা যাইত মোহনপুরের খোন্দকার সাহেবের কাছে। তিনি না হইলে দেশে কে বিচার করিবে ?

তথাপি এককালে খোন্দকার আলি আস্‌রফের নাকি ছিল দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, আর তাঁহারই সাহায্যে হরিশঙ্কর ও মতিশঙ্করের পিতা বিস্তীর্ণ ভূ-সম্পত্তি সুশৃঙ্খলা-মত শাসন করিতে পারিয়াছিলেন। সে অনেক দিনের কথা, এখন কিন্তু প্রকাশ্য দৃষ্টিতে খোন্দকার সাহেব নিতান্তই নিরীহ শ্রেণীর লোক। 'আগেকার' খোন্দকার সাহেবকে যাঁহারা জানিতেন, তাঁহাদেরও কাছে তাঁহার পূর্ব্ব-প্রতাপ যেন একটা জনশ্রুতির মধ্যেই গিয়াছিল।

(৩)

হরিশঙ্করের একমাত্র কন্যা মায়াদেবী ছিল খোন্দকার সাহেবের 'অন্ধের যষ্টি'।

এই মাতৃহীনা বালিকাটী ব্যবহার-জনিত সম্পর্কে খোন্দকার সাহেবের 'নাত্‌নী'। 'দাদা সাহেব' বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার আহারের সময় কাছে না থাকিলে আহার হইবে না,—তাঁহার মাথা 'ধরিয়াছে,' মাথায় 'হাত বুলিয়ে' দিতে হইবে,—এই সকল বিষয় লইয়া দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিত।

আত্মীয় বিহীন, দেবতুল্য বৃদ্ধ খোন্দকারের সেবায় নিবিষ্টচিত্তা বালিকা কন্যাকে দেখিয়া সরলপ্রকৃতি হরিশঙ্করের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিত।

আবার কতদিন বালিকা মায়ার সঙ্গে বৃদ্ধ আমির আস্‌রাফ বসিয়া এমন ভাবে গল্প করিতেন যেন মনে হইত দুইটী নিতান্ত সমবয়স্ক ব্যক্তিই অত্যাবশ্যক সাংসারিক বিষয়াদি সম্পর্কীয় পরামর্শ করিতেছে।

বৃদ্ধের গণ্ডদেশ মাঝে মাঝে অশ্রু-প্রবাহে ভাসিয়া যাইত।

* * * * * * *

খোন্দকার সাহেবের ক্ষুদ্র একখানি 'একতালা' ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ। জনপ্রবাদ যে, তাঁহার নিকট নাকি অনেক সঞ্চিত অর্থ ছিল; সমস্ত অর্থটাই ঘরের মধ্যে মৃত্তিকা প্রোথিত আছে, কি অপর কোন ভাবে ব্যবস্থিত আছে, ইহা লইয়া গ্রামের 'পাঁচ জন' মধ্যে-মধ্যে একটু চিন্তাও করিত।—হায়! কার হাতে শেষটায় এই ধন-ভাণ্ডার গিয়া পড়ে।

এই চিন্তান্বিত দলের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন হরিশঙ্করের জ্যেষ্ঠতাত-ভ্রাতা মতিশঙ্কর।

* * * * * * *

খোন্দকার হরিশঙ্কর ও মতিশঙ্কর উভয়কেই সমভাবে স্নেহ করিতেন; কিন্তু এই ভ্রাতৃদ্বয় যখন পৈত্রিক সম্পত্তি লইয়া কলহ করেন, আর সেই কলহের সুযোগে যখন মতিশঙ্কর বয়ঃকনিষ্ঠ হরিশঙ্করের উপর অবিচার করিবার চেষ্টা করেন, তখন খোন্দকার ক্রুদ্ধ হইয়া মতিকে অন্যায় কার্য্য হইতে বিরত করিয়াছিলেন। খোন্দকার সাহেবের ভয়ে মতি হরির বিশেষ কোন অনিষ্ট করিতে পারেন নাই। কিন্তু মতিশঙ্কর সেই হইতে হরির উপর গোপনে প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

তাহার উপর যখন হরিশঙ্করের বালিকা কন্যা মায়াদেবী খোন্দকার সাহেবের সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল, তখন যতিশঙ্কর সেই গোপন প্রতিশোধ দিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন,—এমন ভাবে, যে এ-বিষয়ে তাঁহার যে কোন কু-অভিপ্রায় আছে তাহা যেন কেহ জানিতে না পারে।

যতিশঙ্করের মনে হইল খোন্দকার যাহাতে তাঁহার সমস্ত পাকিতে না পারে তাহাকে যেন হরিশঙ্কর নিশ্চয়ই গোপনে সেই চেষ্টা করিতেছে।

কিন্তু যতিশঙ্করও খোন্দকারকে ভয় করিতেন।

(৫)

হরিশঙ্করের দুইটী পুত্র, তাহারা হরিশঙ্করকে যথারীতি ভক্তিশ্রদ্ধা করিত। হরিশঙ্করের একমাত্র সন্তান মায়াদেবী,—যতির সাধ্বী স্ত্রী দয়াময়ী দেবী তাহাকে নিজ সন্তানতুল্যই দেখিতেন; তাঁহার নিজের তো কন্যাসন্তান নাই।

যতিশঙ্কর বিপত্নীক,—কন্যা-বিবাহ-ব্যাপারে দয়াময়ী দেবীই বাড়ীতে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী।

জ্যেষ্ঠভ্রাতা যতিশঙ্করও মায়াকে স্নেহ করিতেন,—কিন্তু এবার তাঁহার ঈর্ষাপ্রবৃত্তি স্নেহকে পরাজিত করিল।

০ ০ ০ ০ ০

মায়ার বিবাহ স্থির হইয়াছে গোবিন্দপুরের জমীদার ও কায়স্থকুলের দেবপ্রসাদ বাগচীর পুত্রের সহিত।

বিবাহে যতিশঙ্কর উপস্থিত থাকিবেন বলিয়া হরিশঙ্করকে আশ্বাস দিয়াছেন বটে,—কিন্তু তার পর সেই রাত্রিতেই তিনি গ্রামের গোমস্তা নিত্য ওরফে গুপী-খুড়ো'র সঙ্গে কি কি সব পরামর্শ আঁটিতে আরম্ভ করিলেন।

গুপী-খুড়ো বিজ্ঞভাবে বলিলেন,—"বাবাজি, তুমি আশ্চর্য্য ব'লছো,—আমি আগেই জানি এ মেয়েটা 'অথান্ত' খায়। বুড়োর কটা টাকার লোভে হরি-শঙ্কর যে এত দূর... ... .

যতিশঙ্কর বলিলেন,—"হাঁ, খুড়ো, আমিও আগেই বুঝেছি; কিন্তু আমার সঙ্গে যেমন তা-তো জানেন, আমি কিছু ব'ললে শেষটায়"—

খুড়ো বলিলেন,—"শেষটায় 'হিতে বিপরীত' হবে এই তোমার বোধ হয়,—কিন্তু এতেই যে কি 'হিত' হবে তাও একবার দেখা চাই। এর একটা প্রতিবিধান—"

মতি উৎসাহ সহকারে বলিলেন,—"প্রতিবিধান সামাজিক শাসন ; হিন্দু-সন্তান হ'য়ে মুসলমানের সঙ্গে ব'সে একত্র ভোজন ক'রলেও সে মেয়ের যদি বিয়ে নির্ব্বিঘ্নে হিন্দু সমাজেই হয়, তা' হ'লে আপনাদের থাকা না-থাকা একই কথা।"

গুপী খুড়ো বলিলেন,—"আমরা হরিশঙ্করকে জানি না ; আমাদের সমাজের নেতা তুমি, কারণ তুমি তার জ্যেষ্ঠ। তুমি নাকি কথা দিয়েছ যে—"

মতি বলিলেন,—"আজ্ঞে হাঁ ; হরি এসে ধ'রলে, আর গৃহিণীরও ঐ মেয়েটার ওপর ভারি টান ; তাই ব'লেছি আমি বিয়েতে উপস্থিত থাকব। কিন্তু সামাজিক হ'লো না, আপনাদের পাঁচজনার মত না নিয়ে সামাজিক হোতে কি ক'রে হবে ?"

তাহাপর ক্রমশঃ পাড়ার ভারতরত্ন ঠাকুর্দ্দা, বিদ্যালঙ্কার ঠাকুর প্রভৃতি অনেকে আসিয়া জুটিলেন।

ভারতরত্ন নস্যের সদ্ব্যবহার করিতে করিতে বলিলেন,—"সামাজিক ভোজ হ'তেই পারে না, ধর্ম্ম-কর্ম্ম কি একেবারে রসাতলে যাবে নাকি ?"

বিদ্যালঙ্কার বলিলেন,—"এ বিবাহে সামাজিক ভোজ অসম্ভব।"

ওপাড়ার টেনু ঘোষের জ্যাঠাই মা আর বিশু শিকদারের মাসী আসিয়া বলিয়া গেল তাহারা স্বচক্ষে হরিশঙ্কর আর মায়াকে খোন্দকার গৃহে 'অথাদ্য' ভোজন করিতে দেখিয়াছে।

* * * * *

পরামর্শের পর অনেক রাত্রিতে সভা ভঙ্গ হইল।

(৫)

খোন্দকার সাহেবের শরীরটা ক-দিন ভাল নাই। বয়স হইয়াছে ; সর্দ্দি, কাশী, মাথাধরা প্রায় লাগিয়াই আছে, তার উপর হরিশঙ্করের কন্যার বিবাহ,—হরি যে নিতান্তই 'ছেলেমানুষ,' সমস্ত ব্যবস্থা খোন্দকার সাহেব নিজেই দেখিতেছেন।

বিবাহে কত লোকের ভোজন হইবে তাহার হিসাব, ঘি ক্ষীরের জন্য ময়রাকে বলা, ছেলেদিগকে মধুরের জন্য 'আগাম' অর্থ প্রদান, লোকজন যোগাইয়া কদলীপত্র সংগ্রহের চেষ্টা,—সমস্তই খোন্দকার নিজে করিতেছেন।

* * * * *

আর তিন দিন বিলম্ব আছে।

মায়া আসিয়া খোন্দকার সাহেবকে বলিল,—"দাদা সাহেব, আজ শরীর কেমন ?"

শয্যা-শায়িত খোন্দকার সাহেব ধীরে ধীরে বলিলেন,—"আর কেন দিদি! এই তোর বিয়েটা হ'য়ে গেলেই আমার ছুটী।"

মায়ার মুখ লাল হইল ; বলিল,—"যান!'

"যাব তো' বটেই, তবে তোর বিয়ের আগে নয়।"—খোন্দকার এই কথা বলিতেই মায়ার চক্ষুতে জল আসিল।

তারপর মায়া বলিল,—"মাথাটায় একটু হাত বুলিয়ে দি, দাদা সাহেব ?"

খোন্দকার বলিলেন,—"বেশ।" তার পর চোখ বুজিয়া খোন্দকার বলিলেন,—"আজ যেন তুই সেবা কচ্ছিস্, তুই শ্বশুর বাড়ী গেলে কে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে রে, বুড়ি ?"

মায়াকে খোন্দকার কখন কখন "বুড়ি" বলিতেন।

কথা কয়টী বলিতেই খোন্দকারের চক্ষুতে জল আসিল।—মায়া মুখ ফিরাইল।

খোন্দকার আবার বলিলেন,—আচ্ছা, ভাবনা নেই। তুই যেদিন শ্বশুরবাড়ী যাবি সে দিন না হয় আমিও শ্বশুরবাড়ী যাব। সেখানে সেবা-শুশ্রূষার ত্রুটী না হবারই তো কথা।"

মায়া এ কথাটী একেবারেই বুঝিতে পারিল না,—তাই এবার হাসিয়া ফেলিল ; বলিল,—"কি ব'কছেন, দাদা সাহেব ? আপনার আবার শ্বশুর বাড়ী।"

"পাগলি আমার বুঝি আর শ্বশুরবাড়ী থাকতে নেই রে ?" এবার খোন্দকার একটু হাসিলেন, যদিও তাঁহার চক্ষুর কোণে জল।

* * * * *

সৌম্য মূর্ত্তি, শুভ্র শ্মশ্রু-কেশ, গৌরবর্ণ, দীর্ঘায়তন দেহ, শয্যাশায়ী খোন্দকার সাহেবকে দেখিয়া মায়ার মনে হইল,—"শুনেছি, আকাশে দেবতা থাকেন, তাঁদের চেহারা কি এই রকম নাকি ?"

(৬)

বিবাহের পর দিন বাসরভোজনের নিয়ম,—বরপক্ষীয় এবং কন্যা পক্ষের সমাজের ব্রাহ্মণদিগকে সে দিন 'ভোজন' করাইতে হইবে।

হরিশঙ্করের বাড়ীতে প্রায় পাঁচশত ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ।

আর সে দিন এই বিবাহ উপলক্ষে প্রায় সাত-আট শত মুসলমান 'ভোজন' করিবে,—তাহার বন্দোবস্ত হইতেছে খোন্দকার সাহেবের গৃহ-সংলগ্ন বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে।

০ ০ ০ ০

মহাসমারোহে বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

মতিশঙ্করের গৃহিণী দয়াময়ী ভিতর-বাড়ীতে সমস্ত ব্যবস্থা করিতেছেন, আর মতিশঙ্কর স্বয়ং বাহিরের ব্যবস্থা দেখিতেছেন।

দয়াময়ী তাঁহার স্বামীকে এই বিবাহ-ব্যাপারে উপস্থিত দেখিয়া একটা পরিত্রাণের নিঃশ্বাস ফেলিলেন,—"আঃ, বাঁচলুম; কি ভয়টাই হ'য়েছিল।" দ্বিগুণ উৎসাহে স্নেহশীলা রমণী মায়ার বিবাহের ব্রাহ্মণ-ভোজনের জন্য রন্ধন কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

হরিশঙ্করের চক্ষু-দুটী আনন্দে অশ্রুসিক্ত হইল।

বহির্বাটীতে খোন্দকার সাহেবের দৃষ্টিতে 'সন্দেহ'।

০ ০ ০ ০ ০

আজ ব্রাহ্মণ ভোজন।

বরপক্ষীয় ও কন্যাপক্ষীয় অনেক ব্রাহ্মণ হরিশঙ্করের বাড়ীর বৈঠকখানায় ও বহিঃ-প্রাঙ্গণে 'সামিয়ানার' নীচে উপবিষ্ট। বেলা প্রায় সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর।

ভিতর প্রাঙ্গণে চন্দ্রাতপের নীচে তাঁহাদের ভোজনের 'স্থান' হইয়াছে।

হরিশঙ্কর আসিয়া ধীরে ধীরে মতিশঙ্করকে বলিলেন,—"দাদা, ভোজনের 'স্থান' হ'য়েছে; এখন এঁদেরকে উঠ্‌তে ব'ললে হয়।"

মতিশঙ্কর অজ্ঞতার ভাণ করিয়া বলিলেন,—"কি ব'লবো ভাই! উঠ্‌তেই বা বলি কি ক'রে? এদিকে যে ওপীখুড়ো আর ন্যায়রত্ন ঠাকুরদ্দা কি সব ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসেছেন।"

হরিশঙ্করের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি আবার ধীরে ধীরে বলিলেন,—"ফ্যাসাদ আবার কি? আর আপনি তো আগে কিছু বলেন নি?"

মতিশঙ্কর মিথ্যা করিয়া বলিলেন,—"আমি আগে ওর বিন্দুবিসর্গও জান্‌তে পাই নি,—এইমাত্র শুন্‌লুম।" তারপর আবার বলিলেন,—"আর আমি একাই তো 'নয়াত' নই, বাঁচলুম কথা না শুনে ভাই"—

কথা হইতেই স-শরীরে গুপীখুড়ো আর ন্যায়রত্ন ঠাকুর্দা সেখানে আসিয়া উপস্থিত।

গুপীখুড়ো ধীর ভাবে বলিলেন,—"আরে, শুধু 'দাদো' আর 'ভাই' এ কথায় তো সামাজিক কাজ হয় না। আমরাও পাঁচজন তো আছি, আমাদের একটা খবর"—

ন্যায়রত্ন আর বিদ্যালঙ্কার বলিলেন,—"সেথদিনি!"

গুপীখুড়ো বলিলেন,—"এরূপ অপরাধে"—

তখন ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর মধ্যে কোলাহল আরম্ভ হইয়াছে।

নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় ভীত ভাবে হরিশঙ্কর বলিলেন, "আমার অপরাধ"—

এবার গুপীখুড়ো স্পষ্ট উত্তর দিলেন,—"তোমার জাতিপাত হ'য়েছে; তোমার গৃহে ভোজন ক'রলে সমস্ত ব্রাহ্মণের জাত যাবে, বুঝেছ?"

তখন সভাস্থ সকলেরই প্রস্থানপর অবস্থা।

০ ০ ০ ০ ০

সহসা কে বলিল,—"জাত যাবে বৈ-কি?"

পশ্চাৎ ফিরিয়া গুপীখুড়ো দেখিলেন স্বয়ং খোন্দকার আমির আলি; তাঁর সঙ্গে দশ জন মুসলমান লাঠিয়াল।

খোন্দকার বলিলেন,—"গুপী দা, আপনার জাত তো যাবেই,—তা ন্যায়রত্ন খুড়ো আর বিদ্যালঙ্কার ভায়ারও যাবে।—মতিশ্বর, তোমাকে আমার কিছুই বল্‌বার নেই।"

সকলে স্তম্ভিত।

হরিশঙ্করের বহিঃপ্রাঙ্গণ তখন তের সাত শত লাঠিয়াল কর্ত্তৃক বেষ্টিত।

০ ০ ০ ০ ০

খোন্দকার সাহেবের শ্বেত শ্মশ্রু-কেশও যেন ক্রোধে কম্পিত হইতেছিল। কেহ তাঁহাকে আজ ৪০ বৎসরের মধ্যে এমন অবস্থায় দেখে নাই,—এ সেই 'আগেকার' খোন্দকার সাহেব।

রুগ্নশরীরে, কম্পিতপদে তিনি আসিয়াছেন; প্রাঙ্গণস্থ চৌবাচ্চার উপরে বসিলেন,—"দেখুন, আপনাদের সকলের কাছে আমার একটা বিনীত নিবেদন আছে। আজ এই বিবাহ উপলক্ষে হরিশঙ্কর তাঁর বাড়ীতে আপনাদের ভোজনের ব্যবস্থা ক'রেছেন, আর আমার বধূমাতা দয়াময়ী দেবী,—মতিশ্বরের ব্রাহ্মণী,—স্বয়ং রন্ধন ক'রেছেন। শুনলেম আপনারা এখানে ভোজন ক'রতে

আপনাদের জাতি নষ্ট হবে। তা' হ'লে অনুগ্রহ ক'রে গাত্রোত্থান করুন, আমার বাড়ীতেও ভোজন-ব্যবস্থা হ'য়েছে, কলিমুদ্দীন সেখ স্বয়ং প্রধান পাচকের কার্য্য ক'রেছে।—উঠুন, গুপীনা,' তারপর খুড়ো; ওঠো বিশ্বম্ভর ভায়া, আর বিলম্ব কেন? আমার আজ কি সৌভাগ্য যে আপনাদের সেবা করবার সুযোগ হ'লো!"

সকলেই চুপ।—চতুর্দ্দিকে লাঠিয়ালগণ, যাহাদেই পালাইবার পথ নাই।

খোন্দকার সাহেব আবার বলিলেন,—"যদি আপনারা না ওঠেন তবে আমার এই লাঠিয়ালেরাই আপনাদিগকে আমার বাড়ী যাবার পথ দেখিয়ে নেবে অগত্যা; এত বেলায় তো আর আপনাদের কাউকে অনাহারে রাখা চলে না?"—তারপর বলিলেন, "কইরে, কে আছিস্?"

ভীম রবে খোন্দকার লাঠিয়ালগণকে ডাকিলেন, এমন উচ্চহুঙ্কারে ডাকিলেন যেন সেই চেঁচায় অতিথ্যে তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী ছিঁড়িয়া যাইবার মতন হইল। তখন প্রায় শত শত লাঠিয়াল বাড়ীর চতুর্দ্দিক হইতে হুড়া দাড়িল।

অতিশয় নীরব। তাঁহার মনে হইতেছিল ভূ-পৃষ্ঠ সেই মুহূর্ত্তে দ্বিধা হইয়া গেলে তাঁহার আজ কি পরিত্রাণ হইত।

৭)

গুপীপুড়ো প্রমুখ ব্রাহ্মণ বৃন্দ ও বন্যাত্রীর দল যথাসম্ভব সহাস্য মুখে কলিমুদ্দীনের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া ভোজনে মনোযোগ দিলেন।

যাইবার পথে গুপীপুড়ো হরিপদ্দরকে বলিতেছিলেন,—"দেখ হরি, এও কি একটা কথা! ভোমাদের বাড়ীতে ভোজন হবে না। এ একটা কথাই নয়। মতির মেয়ের বিয়ে, মতির ব্রাহ্মণী রান্না ক'রেছেন; খাবে না? দেখি, কে না খায়?'

শ্যামবন্ধু, বিশ্বম্ভর প্রভৃতি বলিলেন,—"দেখাদিনি!

এ দিকে উভয় পক্ষীয় ব্রাহ্মণ পাঁচ ছয় শত, আর খোন্দকার সাহেবের পক্ষীয়ে প্রায় এক হাজার মুসলমানের ভোজন হইল।

সকলে বলিল, 'বুড়ির' বিয়েতে যেমন ভোজন হ'লো এমন আর কখনো হয় নি।"

* * * * *

আজ রাত্র, শ্বশুর-গৃহে যাইবে।

খোন্দকার সাহেবের শরীরটা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কয়েক দিনের অত্যধিক পরিশ্রমে, সে দিনের উত্তেজনায়,—তাঁহার গলা দিয়া রক্ত পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে।

মায়া যাত্রার পূর্ব্বে 'কাকা সাহেবের' সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তার সঙ্গে আজ পিতা হরিশঙ্কর আর জ্যেষ্ঠভ্রাতা মতিশঙ্কর।—বৃদ্ধের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল।

মতিশঙ্কর বলিলেন,—"কাকা সাহেব, আমাকে মাফ ক'রবেন না? আমি আপনার 'মা' যাচ্ছেন,—আমি এমন অধম যে"—

খোন্দকার মৃদুহাস্যের সহিত বলিলেন,—"বাবা, তোমার মাফ তো অনেক আগেই ক'রেছি—"

মতিশঙ্কর বলিলেন,—"কাকা, আমাকে যদি আপনি মুখে বলুন দিতে—"

হরিশঙ্কর নির্ব্বাক্ ভাবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন।

খোন্দকার বলিলেন,—"তোমরা দু'টী ভাই যে আমার এসেছ, আমার কাছে তোমরা উভয়ই—"! বৃদ্ধ তখন আর কিছুই বলিতে পারিলেন না।

একটু পর যত্ন-কৃত মৃদুহাস্যের সহিত খোন্দকার মায়াকে বলিলেন,—"মুক্তি, তোর বিয়ে হ'য়ে গেল; এইবার আমার ছুটী, কেমন রে? আমার মুক্তি আর শ্বশুরবাড়ী নেই?"

মায়াকে তখনই যাইতে হইল।

তাহার শ্বশুর মহাশয় আসিয়া বলিলেন,—"যাত্রার শুভ মুহূর্ত্ত উত্তীর্ণ হ'য়ে যায়!"

শীর্ণ হস্ত উত্থিত করিয়া বৃদ্ধ খোন্দকার মায়াকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।—সেই নির্ব্বাক্ আশীর্ব্বাদ বৃদ্ধের সমস্ত হৃদয়কে যেন আশ্রয় করিয়া মায়াকে বলিতেছিল,—তোমার শ্বশুরগৃহ, স্বামীর গৃহ আলোকিত কর।"

* * * *

সহাস্যবদনে 'ঘর ক'নে' যাত্রা করিল। বাদ্যোদ্যমে গ্রামপথ মুখরিত হইল।

হঠাৎ একটা গোলযোগ।

হরিশঙ্কর আর মতিশঙ্কর গিয়া দেখেন খোন্দকার মহাশয় মুখে দুগ্ধফেন অবস্থায় শয্যা লইতেছেন—তাঁহার দৃষ্টি প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায়। * * * *

ঘটিশঙ্কর বলিলেন;—"তবে, ভাই আজ আমরা বাস্তবিকই পিতৃহীন।" তাঁহার ভ্রাতা তখন অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। তখনও পল্লীপ্রান্ত হইতে বাদ্য-ধ্বনি শোনা যাইতে ছিল।

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক।

প্রতীক্ষায়।

(১)

সকল বিলিয়ে দিয়ে জীবনের পথে আজ একেবারে দেউলিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছি। দেবার আর কিছুই নেই; পাবার আশাও নিরাশার ঘন তিমিরে ডুবে পড়েছে। জীবন-বীণার স্বর্ণোজ্জ্বল সুরগুলি একে একে বিস্মৃতির শূন্যতটে নীলাঞ্চলের চির-চঞ্চল স্রোতে ঢেকে পড়েছে। বেসাতির শূন্য হাটে তাই আজ একা, কর্ম্মহীন ভিখারীর মত একেবারেই নিঃসম্বল হয়ে দাঁড়িয়েছি। তাই বলে আপনার বোঝা তো কিছুমাত্র কমেনি। দেওয়া নেওয়া নিয়েই জগৎ সংসারের সকল কারবার; কিন্তু তার পশ্চাতে শূন্যতার এই সীমাহীন সৃষ্টি—বেদনার অফুরন্ত ভাণ্ডার কে এমন স্তরে স্তরে সাজিয়ে রেখেছে। মানুষ স্বেচ্ছায় এ দুঃখ বরণ করে নেয়নি। ইহা বেদনার আবরণে মানুষের সকল শূন্যতা পূর্ণ করে দেয়। মানুষ বড় জোরে ইহা ঠেলে ফেলে দিতে চেষ্টা করে, তত জোরে ইহা মানুষের মনে অক্ষুণ্ণ আধিপত্যের সাফল্য বিস্তার করে। মানুষের চেষ্টা কতক পরিমাণে সফল হইলেও অতর্কিতে কখন সে মনের শূন্য সিংহাসনে আধিপত্য বিস্তার করে, তা' বিচার-বুদ্ধির অনধিগম্য। যুক্তি-তর্কের বলে অনেক কাজই মানুষের সহজসাধ্য মনে হয়, কিন্তু অতর্কিত মনের বিরুদ্ধে তার সকল যুক্তি, সকল অভিযোগ ব্যর্থতার পরিতাপমাত্র বহন করে। মানুষের মন নিয়ে কাজ করা চলে, কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন মনের নিষ্ঠুর পাগলামী কতক্ষণ সহ্য হয়? মানুষ যখন চিন্তার রাজ্য ছাড়াইয়া অতীন্দ্রিয় রাজ্যে আপনাকে হারিয়ে ফেলে, তখন সতর্ক মন যে বিশ্বাসকে একেবারেই ফাঁকি দিয়া বসে। চাই না বলিয়া জোর করিয়া মন ও বুদ্ধির বিপরীত কার্য্যকরী সঙ্কল্প অনেকেরই মনে জাগে, কিন্তু অন্তরাজ্যে সে অনুভূতি মোটেই কার্য্যকরী হয় না। কাজেই মানুষ

দেউলিয়া হইবার মুখেও স্বীয় সঙ্কল্প ও বিশ্বাস নিঃসম্বলের ধনের মত আঁকড়াইয়া রাখিতে চায়। মানুষ ভিল তিল করিয়া যে ইচ্ছাকে স্বীয় প্রতিমূর্ত্তির অনুরূপ করে গড়ে তুলেছে, বেসাতির শূন্য হাটেও সে সেই স্বপ্নের নেশায় তন্ময় থাকে।

(২)

ধ্যানের মূর্ত্তি একদিনে গড়ে না, প্রেমের মূর্ত্তি গড়াও মানুষের বহু যুগ তপস্যার ফল। যুগে যুগে মানুষ যে নূতন করে জন্ম নেয়, সেই সঙ্গে তার সাধনার সঞ্চিত ফলটুকুও সঙ্গে করে আনে। মানুষ এক জীবনেই আপনার করে উঠতে পারে না; বহু যুগের যোগ্য তাকে টেনে আপনার করে দেয়। ক্ষণিকের দেখায় মানুষ যে পাগল হয়, সে কি একমাত্র চোখের নেশা? কেবল মাত্র রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শের বহির্দিক মাত্র? তৃপ্তি যেখানে ফুরিয়ে যায় ক্ষণিক উত্তেজনার আবেগ সেইখানে লাঘব হয়। কিন্তু অতৃপ্তির বন্যা যেখানে নিমিষের জন্যও হ্রাস হয় না, দুঃখ-বেদনার আঘাতেও প্রতিরোধ ঘটে না, জন্ম মৃত্যুর ব্যবধানেও ব্যাহত হয় না, বিক্ষত হৃদয়েও মন্দীভূত হয় না; অতীন্দ্রিয় বৃত্তির অলৌকিক শক্তি ব্যতিরেকে ইহা কি কখনো সম্ভব?

(৩)

মানুষ অনাদি কাল ধরেই জন্ম মৃত্যুর এই বিচ্ছিন্ন ধারায় ভেসে এসেছে। তাই বলে মনের তো কোন পরিবর্ত্তন ঘটেনি। সেই চিরন্তন আশা উদ্যম, ভালবাসা ঠিক একরূপই আছে। মানুষের কার্য্যধারার বিচিত্রতা অনেক হয়েছে বটে, চিন্তার স্বতন্ত্রতাও বিশিষ্ট রূপে পরিবর্ত্তিত হয়েছে কিন্তু অন্তরের মানুষ যেমন ছিল, ঠিক তেমনি আছে।

মানুষকে বিশ্লেষণ কর, মানুষের আত্মা আছে কি নাই তার সম্বন্ধে অস্তি নিয়ে অনেক বিচার বিতর্ক চলে। মানুষের জীবন প্রবাহের প্রথম উদয় থেকে শেষ পর্য্যন্ত একচুলও বদলায় নি'। মানুষের আশা, উৎসাহ, কার্য্যকরী প্রখরতা যুগে যুগে এক বলে' প্রতিপন্ন নাও হতে পারে; কিন্তু দেহের সংমিশ্রিনে ও সঞ্চালনে এই কার্য্যকরী শক্তির বিকাশ ঘটেছে তা সকল কালেই এক। মানুষ নিজকে শ্রেষ্ঠ ও গরীয়ান করে তুলেছে সে একমাত্র তার বিচিত্র কার্য্যশক্তির পরিচায়ক। মানুষ বড় হয়েছে কিন্তু বিভিন্ন হয় নি'। মানুষ অতীতকে জয় করেছে সঞ্চিত বলের সাহায্যে কিম্বা অতীতের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হইয়া বাধাকে বিধ্বস্ত করিয়া চলিয়াছে। মানুষ Simple man

হইলেও মানুষই হইয়া চলিবে। মানুষের আশা উদ্যম ও প্রাণের বস্তুর বিনিময় পূর্ব্ববৎই চলিবে। কল্পনা সাধন বলে মানুষের অনেক বৃত্তিই নিস্তেজ হয় ও পূর্ব্ব আবেগ মৃদু হয়, এমন কি বিলুপ্ত হয়েছে বলেও ধারণা জন্মে, কিন্তু মানুষের প্রকৃত বস্তুর কিছু মাত্রে বৈলক্ষণ্য ঘটে না।

মানুষ আশা নিরাশায় প্রফুল্ল ও কাতর হয়; সংযম—সাধনায় অনেক বস্তুর উপরই তাহার প্রভুত্ব জন্মে—কিন্তু মানুষের প্রকৃত রূপ সত্যকার ছবি, বরাবর একরূপই থাকে।

(৪)

আমিও এই চিরন্তন ধারার ভিতর দিয়ে ভেসে এসেছি, কিন্তু একটী রূপ একটী ছবি মানস-নেত্রে চির মুদ্রিত ছিল। জন্ম-মৃত্যুর ব্যবধানেও তাহা মুছে: যায়নি অমৃতের আখরে বোধ হয় তা' মুদ্রিত ছিল। লাবণ্যের ধারার মত অঙ্গে অঙ্গে তার অতৃপ্তি চিরকাল জড়িয়ে ছিল, কাজেই হারায় নি'। চোখে না দেখেও স্বপ্নের ঘোরে তার ছবি চকিতের মত দেখা দিত। স্বপ্নের জাল বুনে সে যেন এতকাল অন্তরের রহস্য-সায়রে ডুবে ছিল। যখন ঘুম ভেঙ্গে দেখা হলো চেয়ে দেখি তুমি সেই অন্তরের চিন্ময়ী মূর্ত্তি—এতকাল কি আবরণেই যে তুমি লুকিয়ে ছিলে? জন্ম মৃত্যুর বিচ্ছেদ পার হ'য়ে আবার দেখা দিলে? অনন্ত-কাল এই ভাবেই তো' ভেসে এসেছি। কখনো তুমি কাছে, কখনো মৃত্যুর আড়ালে, কখনো নিকটে, কখনো সুদূরের অন্তরালে, আবার হঠাৎ দুই জনে চির-পরিচিতের মত হাত ধরাধরি করে চলেছি। কিন্তু অতৃপ্তি চিরকাল নিকট দূরে সমভাবে বিরাজ করেছে। এই অতৃপ্তির শেষ কি কোন কালেই হবে না? ভোগের ক্ষুধা মিটে যায়, কিন্তু অমৃতের তৃষ্ণা যে মিটে না, এত জীবনে এত ভাবে পেয়েও জীবনের তৃষা যে বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নি'। যতকাল তুমি আছ, তৃষ্ণাও ততকাল বিরাজ করবে। তুমি অনন্তের সঙ্গী কাজেই তৃষ্ণাও অনন্ত।

এই অনন্তের পথ আর কত দূর? একি ফুরাবে না? কতকাল এই পথে পথে ঘুরাবে পথের শেষ না হলে তোমাকে পাবারও যে শেষ নাই। পথ শেষ হলে তোমাকে যখন পাব, সেইতো পূর্ণ মিলন—আনন্দের গোলক। সেখানে তুমি আমি দুই সত্তা এক হয়ে বিলীন হয়ে যাবে না তো? অভিন্ন রূপের শান্তি যে কোথায় তা তো জানি না। সত্তা যদিও থাকে থাক, তৃপ্তি, আনন্দ একত্র মিলে যে এক অপরূপ ধারণ করে। সে তৃপ্তির বিশেষত্ব, সে আনন্দের অনির্ব্ব-

চরিতার্থতা, সে স্থানের চিন্ময় উপভোগ যে কি তা' আমার ধারণারও অতীত। তবে তোমাকে পাব—সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের অতীত স্থানে কোন অনির্ব্বচনীয় মনের অধিকারী রূপে, অমৃতময় রূপের জ্যোতি নির্ঝর সঙ্গীত রূপে, অপরাপ সৌন্দর্য্যের পরম তৃপ্তিরূপে তোমাকে পাব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।

দ্বারকা তীর্থ।

দ্বারকা তীর্থ বহুদূরে বোম্বাই প্রদেশের কচ্ছ উপসাগরের উপরে। ইহা ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের এলাকায় নহে, স্বাধীন বা অর্দ্ধ স্বাধীন নৃপতির রাজ্য। সে অনেক দিনের কথা, আমি তখন বৃন্দাবনে। সেখানে কতিপয় যাত্রী যাত্রী দেখিলাম, উহারা দ্বারকা যাইতেছে। তখনই মনে মনে স্থির করিলাম আমায় এইবার দ্বারকা যাইতে হইবে। একবার আমি মুলতান গিয়াছিলাম সেখানে প্রহ্লাদপুরী দেখিবার জিনিষ। মুলতান হইতে করাচী যাওয়া যায়। করাচী একটী বৃহৎ বন্দর। করাচীতে প্রচুর পরিমাণে ফল পাওয়া যায়। তা' আমরা দেখিয়া চিনিতেও পারি না। শস্তশালিনী বাঙ্গলা ফলের দেশ নহে। করাচীতে গিয়া কয়দিন পরে দেখিলাম, একখানি জাহাজ দ্বারকা হইয়া পোরবন্দর ও তৎপরে সিংহলদ্বীপে যাইবে। আমি সেই জাহাজে দ্বারকা যাত্রা করিলাম। করাচী হইতে জাহাজে দ্বারকা তিন দিন। তিন দিন কি খাইব তাই বিষম বিষয়। আমার সঙ্গে ষ্টোভ ছিল, লুচি ও মোহনভোগের আয়োজন করে লইলাম। আর করাচীবন্দর হইতে নানাবিধ ফল লইয়া যাত্রা করিলাম। সঙ্গে কয়েক বোতল লেমনেড্ ও সোডা লইতে ভুলিলাম না। করাচী একটা শ্রেষ্ঠ বন্দর। এখান হইতে পৃথিবীর নানা দেশে জাহাজ যাতায়াত করে। জাহাজটি বৃহৎ, উহাতে বাজার, মিঠাইর দোকান প্রভৃতি আছে। অন্যান্য যাত্রী কয়েকজন সাহেব ও বোম্বে যাত্রী কয়েকজন পশ্চাবী ব্রাহ্মণের সঙ্গে আলাপ হইল। সাহেবেরা বোম্বাই হইতে অন্য জাহাজে চড়িয়া যাইবেন, তাঁহারা

সেখানে কৃষি ব্যবসা করেন। উহাদের মধ্যে বঙ্গীয় রেভিনিউ বোর্ডের সিনিয়র মেম্বর সেভেজ সাহেবের পুত্র একজন।

আমরা এতদূর আসিয়া পড়িয়াছি ভাই পঞ্জাবীদের সঙ্গে খুব খাতির দেখিয়া, তাঁহারা মনে করিলেন আমরা একদেশবাসী। দিন রাতই সমভাবে জাহাজ চলে, সমুদ্র তখন ভয়ঙ্কর ক্ষেপা নহে, তাহা হইলেও আমার সামুদ্রিক পীড়া (Sea sickness) হইয়াছিল। এ অবস্থায় লেমনেড সোডা ও ডাব নারিকেল উপকারী। Sea sicness হইলে জাহাজের ডাক্তার ঔষধ দিয়া থাকেন। আমার সঙ্গেও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ছিল, কিন্তু তাহা কাজে লাগিল না. Sea sickness হইলে আমি ট্রাঙ্ক হইতে ঔষধ বাহির করিয়া লইতে অপারগ হইয়া পড়িয়াছিলাম। করাচী হইতে যাত্রা করিলে অনেকেই বলিয়াছিলেন নূতন লোকের সমুদ্র-রোগ হয়। করাচী বড় সুন্দর স্থান—পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি বলিয়া বড় দুঃখ হইল। ইহা ছাড়া আমি করাচীতে আর একবার গিয়াছিলাম, উহা গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে সৈন্য সংগ্রহ ব্যাপার লইয়া। আমি ছিলাম সরকারের তরফ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিবার কর্ত্তা। তজ্জন্য সরকার বাহাদুরের খরচায় ও তদ্বিরে আমায় করাচী যাইতে হইয়াছিল, —কতকগুলি বাঙ্গালী সৈন্য লইয়া, এবং আমার সহিত তখন একজন কাপ্তান (Captain) সাহেব ছিলেন। এই কাপ্তানকে লইয়া আমি সমগ্র বঙ্গদেশ ও ভারতের নানাস্থানে সৈন্য—সংগ্রহার্থ গমন করিয়া সভা করিয়াছি।

আমার Sea sickness হইলে পঞ্জাবী বন্ধুরাই আমার যত্ন করিয়াছিলেন; তাঁহাদের কিন্তু সকলের এ ব্যারাম হয় নাই। সমুদ্রটা বড় সুন্দর, ইহার সৌন্দর্য্য যাহারা না দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইতে পারা কষ্টকর। তারপর সমুদ্রে সূর্য্যের উদয় ও অস্ত এক অতি সুন্দর ব্যাপার, সহসাই আমার সমুদ্র-পীড়া সারিয়া গিয়াছিল। জাহাজে বসিয়াই আবার সূর্য্যের উদয়াস্ত দেখিয়া অপার আনন্দ লাভ করিতাম। তখন মাঘ মাসের শেষ বা ফাল্গুনের প্রথম, এ সময় দেশে বেশ শীত থাকে, কিন্তু সমুদ্রে শীতমাত্র নাই, অথচ গরমও নহে। বেশ সুস্থ বোধ করিয়াছিলাম। প্রাতে যখন সূর্য্য উঠিত, তখন আমরা সেদিকে জাহাজে গিয়া বসিয়াছি, রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই পূর্ব্বদিকের সমুদ্রটা রক্তবর্ণ হইয়াছে, ইহার পর ক্রমে গাঢ় রক্তাভ হইয়াছে সেই জলটা। যেন সমুদ্র ভেদ করিয়া কি একটা বৃহৎকায় আরক্ত রাক্ষসরূপী জিনিস, সমুদ্র ও আমাদের জাহাজটাকে গ্রাস করিতে উঠিতেছে। ক্রমে জলটা যেন অগ্নিবর্ণ হইয়া উঠিল,

দেখিতে দেখিতে একখানা প্রকাণ্ডকার স্বর্ণ থালা যেন নীচ হইতে মাথায় করিয়া লইয়া উঠিতেছে। বুঝি বা আমাদিগকে কোন্ রাজ্যে গ্রাস করিতে আসিতেছে। ক্রমে যখন বেলা হইতে লাগিল তখন থালাটীও ছোট হইয়া এবং বলমাইয়া উপরে উঠিতে লাগিল। তারপর দিবসের তাড়নায় থালাখানা বেগে দৌড়াইতে লাগিল, ইহাই আমাদের সূর্য্যদেব—রবিঠাকুর। রবির অস্তগমন আরও সুন্দর। যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিল তখন আমাদের পশ্চিম দিকটা লাল হইয়া পড়িল. আমরা তাহার দিকে গিয়া দেখি সমুদ্র যেন হাত বাড়াইয়া সূর্য্যদেবকে টানিয়া আপন কোড়ে লইয়া যাইতেছেন। সূর্য্যদেবও সমুদ্রের বন্ধুতার আকর্ষণে একটু একটু করিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। সমুদ্র ও সূর্য্যের খেলা কিবা শোভাময় ও চমৎকার। ক্রমে সূর্য্য জলের সঙ্গে মিশিল, তার পর নীচ হইতে কে যেন সূর্য্যরূপী থালাখানা টানিয়া লইতেছে, হঠাৎ সূর্য্যদেব টুপ্ করিয়া জলে ঝাঁপ দিল। আহা, ইহাই নাকি রবির আত্মহত্যা। আমরা ভাবিলাম যে আমাদের এই অপূর্ব্ব দৃশ্য সম্মুখ হইতে সরাইয়া লইল। আরো কেন যে ও আমাদের দেখা কিছু কাল দেখিতে পাইলাম না। সূর্য্য আপনিই যেন জলের মাঝে লাফাইয়া পড়িয়া ডুবিয়া গেল, এখানে সমুদ্রের জয়লাভ হইল সূর্য্যই পরাস্ত হইলেন, তারপর রাত্রে, জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে পাটীর মত সমুদ্রের শান্ত বারি আর তাহার মধ্যে মাঝে মাঝে সমুদ্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউগুলিতে চাঁদের আলো পড়িয়া যে তাহাতে ও সুবর্ণরশ্মি, আহা কি সুন্দর শোভা বিকীরণ করিতেছিল!

সমুদ্রের উপর দিয়া ঢেউ খেলাইতে খেলাইতে চলিয়াছে, চারিদিকে যেন আকাশটা জলের নীচে নাবিয়া পড়িয়াছে, আর কিছুই দেখা যায় না। মাঝে মাঝে উড্ডীয়মান মৎস্যগুলি দলবদ্ধ হইয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে উড়িয়া গিয়া জলের ভিতর জলেই পড়িতেছে। ইহাদের যে পক্ষ আছে তা দিয়া বেশী দূর উড়িয়া যাইতে পারে না। কেবল জল হইতে জলের উপরেই লাফাইয়া কিছু দূর গিয়া জলে পড়িয়াই ডুবিতেছে। ইহাদের পক্ষ তেমন শক্তিশালী নয়। ইহারাও একটা আনন্দে খেলিবার জন্য উঠিতেছে, পড়িতেছে। কখন বা জলের উপর দিয়াই দৌড়িয়া যাইতেছে। সমুদ্র ব্যতীত এরূপ মৎস্য আর কোথাও দেখা যায় না। আমরা যে কয়দিন জাহাজে ছিলাম সে কয়দিন বৃষ্টি হয় নাই, মাঝে মাঝে আকাশে মেঘ উঠিয়াছিল মাত্র। আমার ষ্টেজ ছিল, আমার ব্রাহ্মণদের সঙ্গেও ষ্টেজ ছিল। ষ্টেজে বসিয়া একত্রই রুটি, তোমাভোগ

হইত। আমরা ভাল খাবার জল করাচী হইতে আনিয়াছিলাম। যদিও জল প্রচুর ছিল, কিন্তু এবিষয় সাবধান হইয়া পড়িয়াছিলাম বলিয়া শেষ দিন জলের অভাব বোধ করিয়াছিলাম। তখন লেমনেডে কাজ করিয়াছে। জাহাজের জল দিয়া স্নান ও হাত-মুখ ধুইতাম, অনেককে পরিমাণ মত দিত, আমি বাঙ্গালী বলিয়াই বোধহয় জাহাজের লোকেরা যাহা চাহিতাম তাহাই দিত।

যে দিন দ্বারকা আসিয়া পৌঁছিলাম তখন কিছু বেলা আছে। জাহাজ থামিলেই দেখি ছোট ছোট নৌকা লইয়া লোক জাহাজে আসিতেছে। অনেকে তাহাদের নৌকা ভাড়া করিলেন। এই নৌকাগুলি সমুদ্রে যাইতে পারে না, সমুদ্রতীর বাহিয়া ও সমুদ্রের খাল দিয়া চলিয়া থাকে। বৃন্দাবন হইতে আসিবার সময় কোন মহান্তের নিকট হইতে দ্বারকাবাসী কোন বাঙ্গালী মহান্তের নিকট পত্র আনিয়াছিলাম আর করাচী হইতে কোন মহাজনের নিকট হইতে দ্বারকায় কোন মহাজনের নিকট পত্র আনিয়াছিলাম। দ্বারকায় আসিয়া ভাবনায় পড়িলাম, কোথা যাই? অবশেষে স্বদেশী—বাঙ্গালী মহান্তের নিকটই যাওয়া সাব্যস্ত করিলাম। মহাজন আমার স্বদেশী নহে, সুতরাং তাহার সঙ্গে আমার অপর ভাষায় আলাপ করিতে হইবে। এমন কি সে হয়ত ইংরাজী জানে না, আবার একটা অভিনব বিপদে পড়িতে হইবে ভাবিয়াই বাঙ্গালী গৃহে যাওয়া মনস্থ করিয়া কুলীর সন্ধান করিতেছি কুলী আসিয়া কহিল আমাকে গো-গাড়ীতে চাপিয়া মহান্ত গৃহে যাইতে হইবে। অবশেষে একখানা গো-গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিলাম। সন্ধ্যার সময় বাঙ্গালী মোহন্ত মন্দিরে উপনীত হইলাম। মোহন্ত আমাকে বাঙ্গালী জানিয়া যথেষ্ট আপ্যায়িত করিয়া তাঁহার গৃহে স্থান দিলেন। নামাহ্নিক করিলাম। তাঁহার মন্দিরে গিয়া; মন্দিরে কৃষ্ণ বিগ্রহ। এখানে কৃষ্ণ একাকী,—রাধিকা নাই। রাধিকা ছিলেন বৃন্দাবনে, কৃষ্ণ পলাইয়া আসিয়া এখানে রাজা হইয়াছিলেন। এখানে যাঁহারা তাঁহার সখী ছিলেন তাঁহাদের একজনকে বামে বসাইয়া দিলে চলিত কিন্তু শ্রীরাধার সঙ্গে তখন হয়ত শ্রীকৃষ্ণের আরও একটা বিবাদ বাধিয়া যাইবে তাই আর নূতন ব্যবস্থা হইয়া না। এখানকার মতগুলি মন্দির সবগুলিতেই এই ভাব। বিরাট আয়োজনে মোহন্তের দেবারম্ভে আরতি হইয়া গেল। পূর্ব্ব বাঙ্গালার কোন জেলায় এই মহান্তের বাড়ী, স্কুল মাষ্টারী করিতেন এখানে তিনি বড় লোক। পদার্পণ করিয়াই তাঁহার মন্দির ও আসবাব দেখিয়াই

বুঝিতে পারিয়াছি। দেখাশুনি হইয়া গেলে উপাদেয় খাদ্যে জলযোগ করিলাম। ইহার পর মহান্তের সঙ্গে নানা বিষয় আলাপ হইল। মহান্তের ভৃত্যই আমার পরিচর্য্যা করিয়াছিল। একজন ভৃত্য সর্ব্বদা আমার কাছেই ব্যস্ত থাকিত। রাত্রি দশ টার সময় উপাদেয় আহার্য্যে উদরপূর্ণ করিলাম। ইহার মধ্যে ঘৃত, মোহনভোগ বাদে আর সবই দুগ্ধ দ্বারা প্রস্তুত মিঠাই। ছানার তৈরি এখানে পাওয়া যায় না। এদেশীয়েরা ছানা প্রস্তুত করে না বা করিতে জানে না। দুগ্ধ এখানে প্রচুর পাওয়া যায় ও তাহা খুব সুলভ। মহান্তের দুগ্ধ কিনিতে হয় না। তাঁহার প্রায় এক সহস্র গরু। তিনি নিজে দুগ্ধ রাখিয়া অতিথিকে দুগ্ধ অন্যান্য মন্দিরে দিয়া থাকেন ও সাধুদিগকে বিতরণ করেন।

বাঙ্গালীরা বাদলা ছাড়িয়া যে যেখানে আছেন তাঁরা বেশ প্রতিপত্তি করিয়াই আছেন। এই যে বাঙ্গালী মহান্ত এখানে যখন আসিয়াছিলেন, তখন তিনি নিঃসম্বল ছিলেন, অধুনা তিনি এখানে বড় লোক। তিনি এখানে ধর্ম্মোপদেষ্টা, তিনি একজন চিকিৎসক, রোগীকে বিনা মূল্যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দেন, আর কাহারো মামলা মোকদ্দমায় উত্তম পরামর্শ দাতা। বিপদে পড়িয়া অনেক লোকই তাঁহার এখানে আসে। তিনি তাদের যথাসম্ভব সাহায্য করেন। প্রায় সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট দরবার হয়। কচ্ছ মহারাজ তাঁহাকে ভূমি দান করিয়াছেন ও দেবমন্দির প্রস্তুতে সহায়তা করিয়াছেন। এজন্যই সব লোকেই তাঁহাকে ভালবাসে। বুদ্ধিবলে তিনি বড় হইয়াছেন। এখানে কতকগুলি বাঙ্গালী সাধু আছেন, ইহা ছাড়া মাসে মাসে বাঙ্গালী তীর্থযাত্রীও আসিয়া থাকেন। এই মহান্ত বিপদগ্রস্ত বাঙ্গালীকে সহায়তা যথেষ্টই করেন। বাঙ্গালী তীর্থযাত্রীরা অনেকে হয়ত তাঁহার খবরও রাখেন না। জাহাজ হইতে নামিয়া পাণ্ডা পাইয়াছিলাম। আমি পাণ্ডাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, আমি বাঙ্গালী মহান্তের নিকট যাইতেছি সুতরাং কেহ আমাকে আর পীড়াপীড়ি করিও না। এ অঞ্চল কচ্ছ রাজের রাজ্য, দ্বারকা কচ্ছ উপসাগরের উপরেই। কচ্ছরাজের এই মহান্তের উপর বেশ কৃপা দৃষ্টি আছে। দেশের লোকগুলা সরল ও ধার্ম্মিক বলিয়া বোধ হইল। প্রাতে নিদ্রোত্থিত হইয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে বসিয়া ইতিকর্ত্তব্য চিন্তা করিতেছি, কি করিব। এমন সময় মহান্তের পাণ্ডা আসিয়া হাজির। পাণ্ডা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি এ তীর্থে কি করিব? আমি প্রথমে তীর্থপ্রাপ্তে হেতু শ্রাদ্ধ করিয়া দেবদর্শন করিব জানাইলে তিনি তাহারই আয়োজন করিতে

চলিয়া গেলেন। ইহার পর কচ্ছ রাজ্যের একজন কর্ম্মচারী আসিয়া আমার নাম ধাম লিখিয়া লইয়া গেলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাহারা যে আমার নাম লিখিয়া লইয়া গেলেন উহা আমাদেরই সুবিধার জন্য। কখন কোথায় কি বিপদে পড়ি বা কোথায় কাহাকে বিপদগ্রস্ত করি ইহা দেখিবার জন্যই এই নাম লিখিয়া লওয়া। এখনকার দিনে হইলে হয়ত বাঙ্গালী বলিয়া আমার উপর আরও কড়াকড়ি হইত। হয়ত বা সন্দেহ করিয়া তাড়াইয়াও দিত। আমি চলিয়া গেলে আমিনাবাদ রাজ সরকারের ইহাই নিয়ম। কচ্ছ রাজ্যের পুলিশ ও সৈন্যগণ সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া কাজ করে। এখানে যে কচ্ছরাজ্যের কাছারী আছে তাহার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা দেওয়ানী, ফৌজদারী মামলার বিচার করেন, পুলিশ প্রভৃতি বিভাগগুলিও তাহারই হাতে। কচ্ছ, রাজপুতনা অপেক্ষা সমধিক উর্ব্বরা, প্রায় বাঙ্গালারই মত। এখানে লোকেরা মাথায় পাগড়ী বাঁধে, কোন কোন লোকেরা কানে আংটী দেয়, অনেকে মাথায় বড় চুল রাখে। দাড়ী গোঁফ ত আছেই, কেহ দাড়া কেলিয়া গোঁপ রাখে, কেহ বা উভয়ই ফেলিয়া দেয়।

যে সময়ে পাণ্ডা আসিতেছে, আমি তাহার সঙ্গে গিয়া তীর্থপ্রাপ্তি শ্রাদ্ধ করিলাম। সমুদ্রে স্নান করা বিধি। আমি সমুদ্রের ঢেউ লইতে পারিলাম না। ঢেউ বেশ ঠাণ্ডা যেন গাত্রীয় রক্ত পড়িয়া যায়। কিন্তু ফোঁসাইয়া ফোঁসাইয়া বিরাটকায় ঢেউগুলি একটার পর একটা কোথা হইতে আসিতেছে? আমার পক্ষে ঢেউ লওয়া অসম্ভব মনে করিয়া সমুদ্রকে প্রণাম করিয়া মাথায় সমুদ্রজল দিয়াই কাজ সারিলাম। শ্রাদ্ধ করিয়া প্রধান দেবমন্দির দর্শন করিতে গেলাম। ওঃ কি বৃহৎ মন্দির; এত বড় মন্দির ভারতে বিরল। মাদ্রাজ প্রদেশে মাদুরায় ও ত্রিচিনপল্লী রাজ্যে শ্রীরঙ্গম্ এমনই আকারের মন্দির দেখিয়াছি। ইহা যেমন বড় তেমনি অত্যন্তপ্রাচীন। দেবসেবায় বার্ষিক বহু অর্থ ব্যয় হয়। দেবতার নামে মৌজিক বহু লোক ভুক্ত হয়। হিন্দু রাজা-রাজওয়াড়াদের এখানে আবার ঘাটী আছে। তাহাদের গৃহে দেব বিগ্রহ আছে। ভারতের সব দেশীয় লোক এখানে পাওয়া যায়। এখানকার লোকগুলি অলস, খাওয়ার জন্য কাহারো ভাবনা নাই বলিলেই হয়। সকলেই অলস হইয়াছে, যে কোন জিনিষে পয়সা পাইবে বলিলেই উপাদেয় আহার পাওয়া যায়। মধ্যাহ্নাহারের বেশ সুবিধা আছে। বিকালে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বৈষ্ণবদিগের প্রসাদের ব্যবস্থা আছে, কপর্দ্দকশূন্য কেহ কখনো থাকে না। বেলা ১০ হইতে ১২টা পর্য্যন্ত

দলে দলে স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা ঘটী হাতে করিয়া মন্দিরের দিকে ছুটিতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণের জয় ধ্বনি করিয়া বড় আনন্দে তাহারা আসার করে। ইহা একটা দেখিবার জিনিষ।

মন্দির হইতে গৃহে আসিয়া দেখি, বেলা তখন ১টা। সকলে আহার করিয়াছে। আমার জন্য সব প্রস্তুত, আমি আসিলে ব্রাহ্মণ ভাত চড়াইবে। দিল, যথা সময়ে আহার করিলাম, প্রচুর দধি, দুগ্ধ। এখানকার লোকেরা মৎস্য-মাংসাদি আহার করে না। এমন কি স্পর্শ করিলেও অপবিত্র হয়। প্রচুর দধি, দুগ্ধ ঘৃত পাইলে মৎস্যাশী বাঙ্গালীরও মাছ ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা হয়। আহারান্তে বিশ্রাম করিলাম, নিদ্রা আসিল না। গৃহস্বামী মহান্ত আমাকে ধর্ম্ম গ্রন্থ পড়িয়া ধর্ম্ম কাহিনী শুনাইতে আসিলেন। ধর্ম্মের ধার বেশী কি ধারি তথাপি অনিচ্ছাসত্ত্বেও শুনিতে হইল। কেবলই কৃষ্ণ, রাধা ও কৃষ্ণের দ্বারকার রাজা হওয়ার ইতিবৃত্ত। যেখানকার বিবরণ ঘরে বসিয়া শুনিয়া থাকি, আজ সেই দ্বারকার ঐতিহাসিক ধর্ম্মবিবরণ সে স্থানে বসিয়া কে না শুনিতে চায়?

কিছু বেলা থাকিতে মহান্তের লোক লইয়া সমুদ্রতীরে ও সহরে বেড়াইতে বাহির হইলাম। এখানে শীত বেশী নাই, গ্রীষ্মকালেও গ্রীষ্মের প্রকোপ বেশী হয় না। আমি যখন সমুদ্র দেখিতে আসিলাম, তখন দেখি সমুদ্র নব বেশ ধারণ করিয়া নীল পট্টবাস পরিধান করিয়াছে। অনেকে এখানে আসিয়া সমুদ্রের পূজা করেন। আমারও সমুদ্রের এই নবোৎফুল্লিত বেশ দেখিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। নীলকণ্ঠ সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃতের বদলে হলাহল তুলিয়া পান করিয়াছিলেন, তাই তো সমুদ্রের এত মান, এত অভিমান। সমুদ্র তাই গভীর অহঙ্কার হৃদয়ে লইয়া হুহুঙ্কারে মেদিনী ভাসাইতে চাহিয়া আবার নীরবে ফিরিয়া যাইতেছে। হায় সাগর, তোমার এ অভিমান, পৃথিবী বিধ্বংস-কারী কামনা, কেন? চিরকাল সংগ্রাম করিয়া দেখিলে এখন শান্ত হও না কেন? বড় সুন্দর স্থান, তাই মথুরা ত্যাগ করিয়া মহাযোগী শ্রীকৃষ্ণ এখানে আসিয়া বিশাল রাজ্য স্থাপন করিয়া রাজা হইয়াছিলেন।

আমাদের বেড়াইয়া আসিতে রাত্রি হইয়াছিল। আসিয়া দেখি, দেবারতি শেষ হইয়াছে, আমরা দ্বারকাধীশের মন্দিরের আরতি দেখিতে গিয়াছিলাম। সে এক বিরাট কাণ্ড, বহু লোক বহু প্রকার বাদ্যযন্ত্র লইয়া তালে তালে নাচিয়া বাদ্য করিতেছিল। সে এক অভিনব আনন্দ, সকলেই যেন ধর্ম্মমদে উন্মত্ত। মাঝে মাঝে আনন্দ-রোল, হরিধ্বনি। আমার বোধ হয় হরি ইহাদের হৃদয়াসন

অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। ইহারাই সুখী, ইহারাই আনন্দ-মদিরা পানে বিভোর হইয়া ভগবৎ সকাশে পঁহুছিতেছে। ছাই আমাদের বিলাস, ছাই আমাদের কৃত্রিম ভক্তি। ইহারা যেন স্বর্গ দ্বারের সোপান প্রস্তুত করিয়া আপনারাই তাহাতে আরোহণ করিবার আয়োজন করিতেছে। সুতরাং হরি আমাদের নহে, তাহাদেরই। এখানে রাজার মিউনিসিপ্যালিটী আছে, পথ ঘাটে আলোর বন্দোবস্তও আছে। আমি গৃহে আসিয়া পঁহুছিলে গৃহস্বামী আমার জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন, যথা সময়ে আহার করিলাম।

প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখি পাণ্ডাজী আসিয়া উপস্থিত। আজ বেট দ্বারকায় যাইবার কথা। বেট দ্বারকা সমুদ্রের মাঝে একটা দ্বীপ, সেখানেও মন্দির ও কৃষ্ণ মূর্ত্তি। বৃহৎ নৌকায় পাল ভরে যাইতে হয়। আমার এখানকার পাণ্ডাকেও লইয়া গেলাম। নৌকায় কত ভাড়া দিয়া গিয়াছিলাম মনে নাই। অনেকগুলি যাত্রী লইয়া প্রত্যহ কয়খানা নৌকা প্রাতে যাত্রা করিয়া ৮টা, নটার সময় পঁহুছাইয়া দেয়; সেখানে গিয়াও তীর্থকার্য্য করিতে হয়। বেট দ্বারকায়ও মন্দিরাভ্যন্তরে সেই কৃষ্ণমূর্ত্তি। এখানে গোপী তালাও আছে। এই পুকুর গোপীগণ স্নান করিয়া পবিত্র করিয়া গিয়াছেন বলিয়াই ইহার নাম গোপী তালাও হইয়াছে। গোপীগণ কৃষ্ণবিরহে রাধিকার আদেশে কৃষ্ণপ্রাপ্তির আশায় দ্বারকায় আসিয়াছিলেন, পরে তাঁহাকে বেট দ্বারকায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বেট দ্বারকায় এই পুকুর কৃষ্ণাদেশে স্নান করিয়া তাঁহাদের চরণ রেণু রাখিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই এই পুকুর গোপী তালাও নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া পবিত্র করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তীর্থযাত্রীরা এখানে সর্ব্বাগ্রে স্নান করিয়া দেবদর্শন করে, গোপী তালাওয়ের পবিত্র মৃত্তিকা দিয়া তিলক করে। এই গোপী তালাওয়ের মাটী দেশেও ক্রয় করিতে পাওয়া যায়, বৈষ্ণবগণ ইহা-দ্বারা তিলক কাটে। এই গোপী তালাওয়ের মাটীকে গোপী মাটী বা গোপী চন্দন কহে। বেট দ্বারকায় গিয়া আমরা খিচুড়ী প্রস্তুত করিয়াছিলাম, পরে মন্দির হইতেও প্রসাদ আসিয়াছিল। ইহা ক্ষুদ্র একটী গ্রাম, এখানে লোকের বাড়ী ঘর এবং দোকানপাটও আছে। ইহার চতুর্দ্দিকেই সমুদ্র, মাঝে গ্রাম ও মন্দির। এখানে ফসল বিশেষ হয় না। সমস্ত জিনিষই দ্বারকা হইতে আসে। কোন ধনী ব্যক্তিও এখানে নাই। স্থানটী বড় পবিত্র ও মনোরম, ইচ্ছা হইয়াছিল সে দিন সেখানে থাকিয়া যাই কিন্তু পাণ্ডাজী তাহাতে রাজী

হইলেন না। বেট দ্বারকা বড় স্বাস্থ্যকর স্থান; বার মাসই সমুদ্রের হাওয়া বহিতেছে। এ প্রদেশে যত হিন্দু দেখিলাম প্রায় সবই বৈষ্ণব। বিকালে সেই বৃহৎ নৌকাযোগে দ্বারকা যাত্রা করিয়া সন্ধ্যার সময় আসিয়া পৌঁছিলাম। যে নৌকায় বেট দ্বারকা যাতায়াত করিলাম উহা পাল ভরে চলে, সন্ধ্যার সময় গৃহে গিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম, পূর্ব্ব দিনের মত প্রচুর আহার হইল। শীঘ্র আহার করিয়া নিদ্রা গেলাম। ক্লান্তিবশতঃ আর কিছু করিতে ইচ্ছা হইল না। ভগবানকে ডাকিয়া লইয়া সে দিনের পালা সাঙ্গ করিলাম।

পরদিন পেটের গোলযোগ হইল, এত অধিক দুগ্ধ ও দুগ্ধ দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যাহারের অভ্যাস নাই, তাই এমন হইয়াছে। মহান্তের নিকট হইতে ঔষধ লইয়া খাইলাম, পেট ভাল হইল। অনেক বেলায় একবার বেড়াইতে বাহির হইলাম। এখানকার লোকেরা আমার সহিত বড় ভাল ব্যবহার করিয়াছিল; ইহারা ধার্ম্মিক বলিয়াই সরল। এখানে যাতায়াতের যান এক মাত্র গো-যান কয়েকখানা একা গাড়ী আছে। এখানে একটী নদী সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছে, সেই নদীর অপর পারে এখানকার মন্দিরাধ্যক্ষ প্রায় সকলেরই গরু ও গোয়াল আছে। তথায় চাকরেরা গরু লইয়া বাস করে ও প্রাতে গো-দোহন করিয়া দুগ্ধ লইয়া মন্দিরে আসে, এক এক জনের এত গরু আছে যে, তাহা দেখিয়া মহাভারতীয় যুগের বিরাট রাজার গো-গৃহের কথা মনে হয়। এখানকার সকল লোকেই স্বাধীন ভাবে দুগ্ধ ও দুগ্ধ দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যাদি ভোজন করিতে পারে, তজ্জন্য ইহাদের চেহারাও বিরাট।

আমি চলিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মোহান্তজী ছাড়িয়া দিতে চাহেন না, আরো কয়দিন থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। আমি তাঁহার অনুরোধে আর দুই দিন রহিলাম। মোহান্তজী ইংরেজী জানেন, সংস্কৃতেও কিছু অধিকার আছে। তিনি উচ্চ ইংরেজী স্কুলের নিম্নশ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন। তিনি কথক, সুবক্তা। আমি এখান হইতে পুনরায় করাচী যাইব কি অন্য পথে যাইব তাই ভাবিতেছিলাম। পরে হাঁটা পথে গো-যানে যাওয়াই স্থির করিলাম। ভাওনগরের (ভবনগর) একজন সে দেশীয় উকিল দ্বারকা তীর্থে আসিয়াছিলেন, মহান্তজী আমাকে তাঁহার সঙ্গী করিয়া দিলেন, আমি সেই সঙ্গে গো-যানে যাত্রা করিলাম। এখানকার গো-যান বেশ সুন্দর ছইওয়ালা, তাহাতে শুইয়া যাওয়া চলে। সমুদ্রের পাশ দিয়া পথ, তাহাদের সুদামাপুরী হইয়া ভাওনগর আসিতে হয়। পথে গ্রাম ও লোকালয় আছে, মাঝে মাঝে বন-

সকলও আছে। এই পথে পূর্ব্বে বড় ডাকাতের ভয় ছিল, এখন আর তেমন ভয় নাই। সুদামাপুরী বেশ একটী সহর, এখানে তুলার কল আছে। অন্য ব্যবসায়ীদের বাড়ীও আছে। ইহারাও লোক ভাল। পথে আসিতে আমাদের কোন বিপদ ঘটে নাই। ভাওনগর আসিয়া সেই উকিলের গৃহে দুই তিনদিন অবস্থান করিলাম। যাঁহারা দ্বারকা যাতায়াতে জাহাজে যাইতে না চান তাঁহারা বোম্বে হইয়া ভাওনগর হইতে সুদামাপুরী হইয়া হাঁটিয়া বা গো-যানেতে যাতায়াত করিতে পারেন। আমি বড় আনন্দে এ সকল স্থান দেখিয়া অন্যত্র যাত্রা করিলাম। দ্বারকা যাইতে হইলে গুজরাটের উপর দিয়াই কচ্ছ প্রদেশে দ্বারকা যাইতে হয়। দ্বারকা আনন্দ ময় স্থান। এমন আনন্দ জীবনে আর কোথাও পাই নাই। এখানে যে সকল বাঙ্গালী আছেন সবই উদাসীন—বৈরাগী গৃহস্থ বাঙ্গালী একজনও নাই, সুতরাং তাঁহাদের উচ্চাদর্শের সঙ্গে আমার ন্যায় হীনাদর্শ জীবনের ও মানসিক ভাব বিনিময় কিরূপ হইয়াছিল বুঝিতেই পারেন। তথাপি বিদেশ বিভূঁই, স্বজাতি, স্বদেশী বলিয়া পরস্পর মিলিতাম, নিরক্ষর, নিম্ন শ্রেণীর লোকের সঙ্গে সেইগুণেই মিলিয়াছি, স্বদেশ, স্বজাতিপ্রেম বিদেশে এমন করিয়াই মানুষকে মুগ্ধ করে।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মজুমদার শাস্ত্রী।

অতীতের স্বপ্ন।

বর্ত্তমানের ঘুমের ঘোরে স্বপন দেখি অতীতের,—
হৃদয়-আকাশ ছায় যে আঁধার শোক-মেঘে।
উজল আলোর মধুরিমা যায় ডুবে সেই বসন্তের ;—
কাল বোশেখের ঝড় গরজে ভীম বেগে।
পত্র-ঝরা শীর্ণ মলিন শুষ্ক কুলের গাছ সম—
মূল পাতা মোর ঝ'রে গেছে আজ কোন ক্ষণে ;
বসন্তেরি স্নিগ্ধ-মধুর দক্ষিণ-মলয়টুক সম—
অতীত স্বপন উঁকি মারে মোর মন-কোণে।

শ্রীসুকুমার ভাদুড়ী।

গয়ার কথা।

ব্রহ্মগয়া।

(৫)

মার্কেণ্ডেয়পুরাণে

মার্কণ্ডেয়পুরাণে কেবল সুহোত্রের পুত্র গয়েরই উল্লেখ দেখা যায়।*

শ্রাদ্ধপ্রকরণে লিখিত আছে যে, গৌরীসুত ও গয়াশ্রাদ্ধ পিতৃগণের অনন্ততৃপ্তি প্রদান করিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে পিতৃগণ মহীপতি ঐলের উদ্দেশে যে গাথা-গান করিয়াছিলেন, ব্রহ্মবাদিগণ সেই পিতৃগাথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সে গাথা এইরূপ,—"আমাদের মধ্যে কাহার এরূপ অবাগ্ পুত্র জন্মিবে, যে যোগী-দিগের ভুক্তাবশিষ্ট অন্নদ্বারা ভূমিতলে আমাদিগকে পিণ্ড প্রদান করিবে, অথবা গয়ায় পিণ্ড দানে তৃপ্তি জন্মাইবে, কিম্বা গণ্ডার মাংস, উত্তম হবি, কালশাক, ত্রিশাক্য, তিল মিশ্রিতান্ন দ্বারা একমাসিকী তৃপ্তিবিধানে সমর্থ হইবে? বৈশ্বদেব, সৌম্যগণ্ডার মাংস, শ্রেষ্ঠহবি, বিশেষতঃ শৃঙ্গবিহীন গণ্ডারমাংস প্রাপ্ত হইলে, আমরা সূর্য্যস্থিতি পর্য্যন্ত তৃপ্তিলাভ করি। মঘা নক্ষত্র যুক্ত ত্রয়োদশী তিথিতে যথাবিধিশ্রাদ্ধ এবং দক্ষিণায়নে মধুঘৃতযুক্ত পায়স প্রদান করিলেও আমাদের তৃপ্তি জন্মে।" †

---

* "সুহোত্রস্যত্রয়ঃপুত্রা উৎকলো বিনতোগয়ঃ।
পুরুষত্বে মহাবীর্য্যা যজ্বিনঃ পৃথুলোচনঃ॥" ১৫
(মার্কণ্ডেয় পুরাণ ১১১ অধ্যায়)।

† "অনন্তাং বৈ প্রযচ্ছন্তি তৃপ্তিং গৌরীসুতস্তথা।
পিতৃণাং নাত্রসন্দেহো গয়াশ্রাদ্ধঞ্চপুত্রক॥ ৮
* * * * *
পিতৃগাথাস্তথৈবাত্র গীয়ন্তে ব্রহ্মবাদিভিঃ।
যাগীতাঃ পিতৃভিঃ পূর্ব্বমৈলস্যাসীন্মহীপতেঃ॥ ৩০
কদানঃ সন্ততাব্যগ্রঃ কস্যচিদ্ভবিতাসুতঃ।
যো যোগিভুক্ত শেষান্নোভুবি পিণ্ডং প্রদাস্যতি॥ ৩১
গয়ায়ামথবা পিণ্ডং খড়্গা মাংসং মহাহবিঃ

লিঙ্গপুরাণে

লিঙ্গপুরাণেও একমাত্র সুদ্যুম্নের পুত্র গয়েরই উল্লেখ আছে। গয়াপুরী তাহারই অধিকারভুক্ত এবং তাহাতে দেবগণ ও পিতৃগণের অধিষ্ঠানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।৯

বরাহপুরাণে

বরাহপুরাণেও গয়ার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, যে মুনিবর তপোধনবৈভ্য, পবিত্র পিতৃতীর্থ গয়াধামে গিয়া পিণ্ডদানে পিতৃলোকের তৃপ্তি সম্পাদন করিয়া, কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া মহাযোগী সনৎকুমার তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হন. সনৎকুমার রৈভ্যকে কহিয়াছিলেন যে, তুমি বেদে অভিজ্ঞ, এবং গয়াধামে আসিয়া মন্ত্র, ব্রত, জপ ও হোমদ্বারা বহুল পিণ্ডদানে পিতৃলোকের তৃপ্তিবিধান করিয়াছ, অতএব তুমি ধন্যবাদের পাত্র। তাহার পর তিনি বৈভ্যের নিকট বিশালাধিপতি বিশালের উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়া বলেন যে, রাজা বিশাল পুত্র-প্রাপ্তির আশায় ব্রাহ্মণগণের আদেশে পিতৃতীর্থ গয়াধামে আসিয়া পিণ্ডদানে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার পিণ্ডদান শেষ হইলে, তাঁহার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ শ্বেত, লোহিত, ও কৃষ্ণবর্ণ পুরুষের আকারে তাঁহার নিকট আগমন করেন। তাঁহার পিতা বলেন যে, তাঁহার নিজের পিতাও পিতামহ ব্রহ্মহত্যাদি পাপে মগ্ন রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন, ও নরকে বাস করিতেছিলেন, এক্ষণে

কাশশাকং তিলাঢ্যং বা কুসরং বাসতৃপ্তয়ে ॥ ৩২
বৈষ্ণবেষু চ সৌম্যেষু খড়্গা মাংসং পবহবিঃ।
বিধাবর্জ্জ্য খড়্গাস্ত্যা আসূর্য্যঞ্চাস্তবাসহে ॥ ৩৩
দত্তাচ্ছ্রাদ্ধং ত্রয়োদশ্যাং মঘাসুচ্চবখাবিধি।
মধুসর্পিঃ সমাযুক্তং পায়সং দক্ষিণায়নে ॥" ৩৪

মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৩২ অধ্যায়।

৯। পুত্রস্তব মহাভাগ সুদ্যুম্নস্য দ্বিজোত্তমাঃ।
উৎকলাশ্চ গয়শ্চৈব বিনতাশ্চৈব বৈ চ ॥ ২৬
উৎকলস্যোত্তমং রাষ্ট্রং বি. ...স্তপশ্চিমং।
গয়াগয়স্য চাখ্যাতা পুরী পরমশোভনা ॥২৭
দুরাসদং সংস্থিতিমতাং পিতৃণাঞ্চ সদাস্থিতিঃ।

লিঙ্গপুরাণ ৬৫ অধ্যায়।

বিশালের পিণ্ডদানে তাঁহারা নরক হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তার্থ-মাহাত্ম্যে তাঁহারা তিনজনে মিলিত হইয়া নিশ্চয়ই পিতৃলোকে গমন করিতে পারিবেন। পবিত্র গয়াতীর্থের এমনই মাহাত্ম্য যে, ব্রহ্মঘাতীর পুত্র এখানে আসিয়া পিণ্ডদান করিলে, সেও ব্রহ্মঘাতী পিতাকে উদ্ধার করিতে পারে। তাহার পর বিশালের পিতা তাঁহার পিতা পিতামহকে লইয়া সে স্থান হইতে অন্তর্হিত হন। সনৎকুমার আবার বলিলেন যে, এই জন্যই তোমাকে বলিতেছি। দেখ, গয়াধামে আগমন, আসিয়া পিণ্ডদান, ইহা অনেকের ভাগ্যে একবার মাত্রও ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু তুমি এখানে আসিয়া নিত্য নিত্য সেই দুর্লভ কার্য্য করিতেছ, অতএব তোমার কত পুণ্য তাহা কি আর বলিব? তুমি সাক্ষাৎ গদাধর নারায়ণকে দর্শন করিয়াছ, ভগবান্ বিষ্ণু গদাধারণ করিয়া, এই তীর্থে বিরাজ করিতেছেন, এজন্য এই তীর্থজগতে প্রসিদ্ধ তীর্থ পবিত্র। এই বলিয়া সনৎকুমার তথা হইতে অন্তর্হিত হইলে, রৈভ্য গদাপাণি নারায়ণকে স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী ভগবান্ বিষ্ণু গরুড়-বাহনে আবির্ভূত হইয়া, তাঁহাকে বর গ্রহণ করিতে বলিলেন। রৈভ্য জনকাদি সাধুগণের স্থান-প্রাপ্তির জন্য বর প্রার্থনা করিলে, নারায়ণ তাঁহাকে সেই বরই দিলেন। ভগবানের বর-প্রসাদে রৈভ্য দিব্য জ্ঞানলাভ করিয়া, সনকাদি সাধুগণের বাসস্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পবিত্র গয়াতীর্থে গিয়া, যে ব্যক্তি রৈভ্য-নির্দ্দিষ্ট গদাধরের স্তব পাঠ করিয়া পিণ্ডদান করে, সে জগতে বরণীয় হয়।*

---

* "সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

বরপ্রদ উবাচ।

রৈভ্যোঽসৌমুনিশার্দ্দূলঃ শ্রুত্বাসিদ্ধিং বসুংতদা।
স্বয়ং কিমকরোদ্দেব সংশয়ো মে মহানয়ম্॥ ১

বরাহউবাচ।

স রৈভ্যোমুনিশার্দ্দূলঃ শ্রুত্বাসিদ্ধিং বসুংতদা।
আজগাম যযাং পুণ্যাং পিতৃতীর্থে তপোধনঃ॥ ২
তত্রগত্বা পিতৃন্ শ্রুত্বা পিণ্ডদানেন তর্পয়ন্।
ততাপসুমহত্তীব্রং তপঃ পরমদুশ্চরম্॥ ৩
চরন্তস্যততস্তীব্রং তপোরৈভ্যস্য ধীমতঃ।
আজগাম মহাযোগী বিমানেসোঽতিদীপ্তিমান্॥ ৪
ত্রসরেণুসমেশুভ্রে বিমানে সূর্য্যসন্নিভে।
পরমাণু প্রনাশেন পুরুষস্তত্রদীপ্তিমান্॥ ৫

সোঽরবীত্তৈভ্য কিং নার্য্যং তপশ্চরসি সুব্রত।
এবমুক্তঃ দিবোভূমিং সংস্মরন্নাসবেপুমান্ ॥ ৬
তত্রাপি বোদসী ব্যাপ্তং বিমানং সূর্য্যসন্নিভম্।
যুগপদ্বিষ্ণুভবনং ব্যাপ্তং বস্তুং দদর্শনঃ ॥ ৭
ততঃসবিস্ময়াবিষ্টো বৈভ্যঃ প্রণতিপূর্ব্বকম্।
পপ্রচ্ছতং মহাযোগিন্ কোঽভবান্ প্রব্রবীতুমে ॥ ৮

পুরুষ উবাচ

অহং রুদ্রাদ্ববক্ত্রো ব্রহ্মণো মানসঃ সুতঃ।
নামাসনৎকুমারেতি জনলোকে বসাম্যহম্ ॥ ৯
ভবতঃ পার্শ্বমায়াতঃ প্রণয়েণ তপোধন।
ধন্যোঽসি সর্ব্বদা বৎস ব্রহ্মণঃ কুলবর্দ্ধনঃ ॥ ১০

বৈভ্য উবাচ।

নমোঽস্তুতে যোগিবর প্রসীদ,
দয়াং মহৎ পুরুষ বিশ্বরূপে।
কিমত্রকৃত্যং বদযোগিসিংহ
ধন্যোঽহং মুক্তো তি কথং ব্রজাত্ম ॥ ১১

সনৎকুমার উবাচ।

যজস্বমেধৈ বিপুলৈর্বরীয়সী
যদেদবাদাভিরতঃ পিতৃংশ্চ।
শ্রীণাসি যজ্ঞৈরতুলৈস্তথাহোমৈ
র্গয়াং সমাসাদ্য চ সর্ব্বপিণ্ডৈঃ ॥ ১২
শৃণুষ্বচাত্মোনৃপতির্ভুব,
বিশালনামা সপুরং বিশালম্
উবাসধন্যোধৃতিমান্ সপুত্রঃ
স্বয়ং বিশালাধিপতি র্দ্বিজাগ্র্য।
পপ্রচ্ছ পুত্রার্থ মনিত্রহাসি
স্তেব্রাহ্মণাঃ প্রোচুরদীন সত্ত্বাঃ।
রাজন্পিতৃং স্তর্পয়পুত্রহেতো
র্গত্বাগয়ামন্নদানৈরনেকৈঃ ॥ ১৪
ধ্রুবং সুতস্তেঽভিবিতানুপেণ
সুসম্প্রদাতা সকলক্রিতীশঃ ১৫
ইতীরিতেব্রাহ্মণৈঃ সপ্রহৃষ্টো
রাজাবিশালাধিপতিঃ প্রযত্নাৎ।

আগত্যাতেন প্রবরেণ তীর্থে
যথাসুতক্ত্যাথকৃতং পিতৃণাম্।
পিণ্ডপ্রদানং বিধিনা প্রযত্নাৎ
তাবদ্বিয়ত্যুত্তমমূর্ত্তয়স্ত্রীন্ ॥১৬
পশ্যন্সহংসঃ সিতপীতকৃষ্ণা
সুবাচরাজা কিমিদং ভবদ্ভিঃ।
উপেক্ষ্যতে শংসতদর্ব্বমেব
কৌতূহলং মেমনসিপ্রবৃদ্ধম্ ॥ ১৭

সিত উবাচ।

অহং সিতস্তে জনকোঽস্মিতাত
নাম্নাচ বৃত্তেন কুলেন কর্ম্মণা।
অয়ঞ্চ মে জনকো বভ্রুবর্ণো
নৃশংস কৃদ্ব্রহ্মহা পাপকারী ॥ ১৮
অধীশ্বরো নাম পরঃপিতাস্য
কৃষ্ণোবৃত্ত্যা কর্ম্মণা চাপি কৃষ্ণঃ।
এতেন কৃষ্ণেন হতাঃ পুরা বৈ
বহুন্যনেকে ঋষয়ঃ পুরাণাঃ ॥ ১৯
এতৌ মৃদৌ দ্বাবপিপুত্র ঘোরৌ
সবীচি সংজ্ঞং নরকং প্রপন্নৌ।
অধীশ্বরোমে জনকঃ পরোঽস্য
কৃষ্ণঃ পিতাঃ দ্বাবপিদীর্ঘকালম্ ॥ ২০
অহঞ্চ তুল্যেন নিজেন কর্ম্মণা
শক্রাসনং প্রাপিতো দুর্লভং তৎ।
ত্বয়াপুনর্মন্ত্রবিদা ঋষাণাং
পশুপ্রদানেন বলাদ্ বিমোচিতৌ।
মোক্ষাপিতৌ তীর্থ পিণ্ডপ্রদানে
প্রভাবতো ঘোর নরক বিপ্রপিতৃ।
পিতৃন্ পিতামহাংস্ত তীর্থে প্রযত্নাৎ।
শ্রীণয়ামীতি ততোঽহং ব্রহ্মবিদন্ ॥২২
তেনাস্মদ্যুগপদ্ যোগোপায়োঽয়ং তেন দুর্লভম।
তীর্থ প্রভাবাদ্গচ্ছানি পিতৃলোকং ন সংশয়ঃ ॥২৩
অত্রপিণ্ডপ্রদানেন এতৌতব পিতৃ মহৌ।
দুর্গতাবপিসংসিদ্ধৌ পাপকৃদ্বিগতিংগতৌ ॥ ২৪

তীর্থপ্রভাব এষোঽস্মিন্ ব্রহ্মরন্ধ্রাপিতৎস্বতঃ।
পতুঃ পিণ্ডপ্রদানেন ভূয়াদুত্তরং পুনঃ ॥২৫
এতস্মাৎ কারণাৎপুত্র অহমেতৌ বিগৃহ্যবৈ।
আগতোঽস্মিতবক্তুং বৈ দ্রষ্টুং বাস্যায়িনাপ্রভম্ ॥ ২৬
এতস্মাৎ কারণাদ্বৈভ্য ভবান্মধ্যোমধ্যোচ্যতে।
সকৃদ্গয়াভিগমনং সকৃৎপিণ্ড প্রদাপনম্।
দুর্লভং ত্বংপুনর্নিত্যমস্মিন্নেব ব্যবস্থিতঃ ॥২৭
কিমন্যদুচ্যতে বৈভ্য তবপুণ্য মিদং মতো।
যেন সাক্ষাদ্গদাপাণি র্দৃষ্টোনারায়ণঃ স্বয়ম্ ॥ ২৮
ততোগদাধরঃ সাক্ষাদস্মিন্ক্ষেত্রে ব্যবস্থিতঃ।
ততোঽতি বিখ্যাততমং তীর্থমেতদ্দ্বিজোত্তম ॥২৯

বরাহ উবাচ।

এবমুক্ত্বা মহাযোগী তত্রৈবান্তরধীয়ত।
বৈভ্যোঽপিচ গদাপাণে র্হরেস্তোত্রমথাকরোৎ। ৩০

বৈভ্য উবাচ।

গদাধরং বিবুধজনৈরভিষ্টুতং
ধৃতচক্রং সুখিতজনার্ত্তিনাশনম্।
শিবং বিশালাক্ষ সৈন্যমর্দ্দনং
নমাম্যহং হৃতসকলাশুভং স্মৃতৌ ॥ ৩১
পুরাণপূর্ব্বং পুরুষং পুরুষ্টুতং
পুরাতনং বিমলমলং নৃণাং গতিম্।
ত্রিবিক্রমং জগতধরণীং বলোর্জ্জিতং
গদাধরং সহসিনমামি কেশবম্ ॥৩২
বিশুদ্ধভাবং বিভবৈকপালিতং
শ্রিয়াবৃতং বিগতমলং বিচক্ষণম্।
ক্ষিতীশ্বরৈর্বৈ পরিতকিল্বিষৈঃ স্তুতং
গদাধরং প্রণমতি যঃ সুখংবসেৎ ॥ ৩৩
সুরাসুরৈরর্চ্চিত পাদপঙ্কজং
কেয়ূরহারাঙ্গদ মৌলিধারিণম্।
অক্ষৌশযানঞ্চ রথাঙ্গপাণিনং
গদাধরং প্রণমতি যঃ সুখংবসেৎ ॥৩৪
সিতংকৃতে ত্রৈতযুগেঽরুণং বিভুং
তথাঽতীতে নীলবর্ণচ্ছবিং।
কলৌ যুগেঽসিপ্রতিমং ২হেশ্বরং
গদাধরং প্রণমতি যঃ সুখংবসেৎ ॥ ৩৫
বীজোদ্ভবো যঃ সৃজতেচতুর্মুখং
তথৈব নারায়ণ কল্পতোদ্ভবম্।
প্রপালযেদ্রুদ্রবপুস্তথাঽন্তকৃদ্
গদাধরো জয়ত্বচ্ছমূর্ত্তিমান্ ॥ ৩৬

সত্ত্বং রজস্তৈস্তমোগুণান্তর
স্ত্বেতেষু বিশ্বস্ত সমুদ্ভবঃ কিল।
সচৈক এবত্রিবিধো গদাধরো
ধাতুর্বৈর্যাং মম ধর্ম্মমোক্ষয়োঃ ॥২৭
সংসারতোঽস্মার্ণব দুঃখ সন্ততি
র্ব্বিয়োগপক্ষ ক্রমটৈঃ সুভীষণৈঃ।
মজ্জন্তমুচ্চৈঃ সুতরাং মহাপ্লবো
গদাধরো মামুদধৌ তুযোঽতরৎ ॥২৮
স্বয়ং ত্রিমূর্ত্তিঃ ধনিবাহনাত্মনি
রশক্তি তশ্চাস্তনিদং সসর্জ্জহ।
তস্মিন্নলোখাসন নাপভৈরসং
সসর্জ্জযন্তং প্রণতোঽস্মিভূধরম্ ॥৩১
মৎস্যাদিনামানিজগৎসুপ্রসূত্তে
সুরাদি সংরক্ষণ তো কৃপাকপিঃ।
মখস্বরূপেণ স সন্ততো বিভু
র্গদাধরোমেবিদধাতু সদ্গতিম্ ॥৩০

বরাহ উবাচ।

এবং স্তুতস্তদা বিষ্ণুর্ভক্ত্যা বৈভ্যেনধীমতা।
প্রাদুর্বভূব সহসা পীতবাসা জনার্দ্দনঃ ॥ ৩১
শঙ্খচক্রগদাপাণি র্গরুড়স্থো বিয়দ্গতঃ।
উবাচ মেঘগম্ভীর ধীরবাক্ পুরুষোত্তমঃ ॥৩২
তুষ্টোঽস্মি বৈভ্য ভক্ত্যাতেস্তবেনাপি দ্বিজোত্তম।
তীর্থস্নানেনচবিভোক্রহি যত্তেঽভিবাঞ্ছিতম্ ॥৩৩

বৈভ্য উবাচ।

গতিং মেদেহিদেবেশ যত্রতেসনকাদয়ঃ।
বসেয়ুত্তত্র যেনাহং ত্বৎ প্রসাদাজ্জনার্দ্দন ॥ ৩৪

দেব উবাচ।

এবমস্ত্বিতি তেব্রহ্মন্নিত্যুক্ত্বাস্তবরীয়ত।
ভগবানপি বৈভ্যস্তু দিব্যজ্ঞান সমন্বিতঃ ॥৩৫
কণ্যাভূবদেবেন পরিতুষ্টেন চক্রিণা।
জগামযত্রতে সিদ্ধাঃ সনকাদ্যা মহর্ষয়ঃ ॥৩৬
এতচ্চরৈভ্য নির্দ্দিষ্টং স্তোত্রং বিষ্ণোর্গদাভৃতঃ।
যঃপঠেৎ সমমাংশস্থা পিণ্ডদানাদিশিষ্যতে ॥৩৭

ইতি বরাহ পুরাণে আদিভূত বৃত্তান্তে [illegible]

বামনপুরাণে

বামনপুরাণে ফল্গুতীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে যে, গয়াক্ষেত্রে যেরূপ নিত্য শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে পিতৃগণের তৃপ্তি সম্পাদিত হয়, ফল্গুতীর্থ আশ্রয় করিয়াও সেইরূপ শ্রাদ্ধই কর্ত্তব্য।*

কূর্ম্মপুরাণে

কূর্ম্মপুরাণে সুত্যায়ের পুত্র গয়েরই কথা দেখিতে পাওয়া যায়।†

প্রধান তীর্থসকলের মধ্যে গয়ারও উল্লেখ আছে (‡) যে সকল স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকেন, শ্রাদ্ধকল্পে সে সমস্ত স্থানই লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বিশেষভাবে গয়ার এবং ফল্গুতীর্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।§

প্রসিদ্ধ তীর্থসমূহের মধ্যে গয়ার প্রসঙ্গ বলা হইয়াছে যে, গয়া অতি গুহ্যতীর্থ ও পিতৃলোকের অতি দুর্লভ। সে স্থানে পিণ্ডদান করিলে, মনুষ্যের আর জন্ম হয় না। যে ব্যক্তি একবারও গয়ায় গিয়া পিণ্ডদান করে, তাহার পিতৃলোক তাহার দ্বারা উদ্ধার লাভ করেন ও পরম গতি প্রাপ্ত হন। পরমাত্মা রুদ্র

---

* "গয়ায়াঞ্চ যথাশ্রাদ্ধং পিতৃন্ প্রীণাতি নিত্যশঃ।
তথাশ্রাদ্ধং চ কর্ত্তব্যং ফলকীবনমাশ্রিতৈঃ॥"৯০
বামন পুরাণে ৭৬ অধ্যায়।

† ইলাপুত্রত্বং লেভেপুনঃ স্ত্রীত্বমবিন্দত।
উৎকলঞ্চ গয়ঞ্চৈব বিনতঞ্চ তথৈবচ॥ ৯
কূর্ম্ম পুরাণ পূর্ব্বভাগ ২০ অধ্যায়।

‡ "গয়াতীর্থং মহাতীর্থং তীর্থঞ্চৈব মহানদী।
নারায়ণং পরংতীর্থং বায়ুতীর্থমনুত্তমম্॥"৫
ঐ, ঐ, ৩৪ অধ্যায়॥

§ যদিস্যাৎ পাতকোপেতঃ সবর্ণ্ম পরিবর্জ্জিতঃ।
গয়াং যাস্যতিবৈ মোঘঃ সোঽস্মান্সন্তারয়িষ্যতি॥ ১২
এষ্টব্যাবহবঃ পুত্রাঃ শীলবন্তোগুণান্বিতাঃ।
তেষামপ্যেকমেবৈতান্ যত্নেনোঽপি গয়াং ব্রজেৎ॥ ১৩
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ব্রহ্মন্নস্তু বিপশ্চিতঃ।
প্রদত্যাদ্বিধিবৎ পিণ্ডান্ গয়াং গত্বাসমাহিতঃ॥ ১৪
ধন্যাস্তে খলুতেমর্ত্ত্যা গয়াযাং পিণ্ডদায়িনঃ
কুলান্যুদ্ধরতঃ সপ্তসমুদ্ধৃত্যযযুঃ পরম্॥"১৫
কূর্ম্ম পুরাণস্থ উপরিভাগ ৩৫ অধ্যায়।

লোকহিতের জন্য তথায় শিলাতলে পদন্যাস করিয়াছেন, তাহাতে পিণ্ডদান করিয়া পিতৃলোকের প্রীতি সম্পাদন করিতে হয়। গয়ায় গমন করিতে সমর্থ হইয়াও যে ব্যক্তি গমন না করে, তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া পিতৃলোক দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহার অন্যান্য কর্ম্ম করা বৃথা পরিশ্রমমাত্র। গয়া সম্বন্ধে পিতৃগণের গীত গাথা মহর্ষিরা এইরূপ কীর্ত্তন করেন।" বংশের যে কেহ গয়ায় যাইবে, সেই আমাদিগকে উদ্ধার করিবে। আমাদের বংশে জাত কোন ব্যক্তি যদি পাপী ও স্বধর্ম্মবর্জ্জিত হইয়াও গয়ায় যায়, সেও আমাদিগকে উদ্ধার করিবে। সুশীল ও সদ্‌গুণান্বিত বহুপুত্রের কামনা করিতে হয়, কারণ তাহাদের মধ্যে কেহ না কেহ গয়ায় যাইতে পারে।" এই কারণে সকলেই বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রযত্নে গয়ায় গিয়া একাগ্রচিত্তে যথাবিধি পিণ্ডদান করিবে। যে সকল মানব গয়ায় পিণ্ডদান করে, তাহারাই ধন্য। তাহারা পিতৃকুল ও মাতামহকুলের সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার করিয়া নিজে পরম স্থান লাভ করে।*

---

* "বাবাহপর্ব্বতৈশ্চৈব গয়াযাঞ্চ বিশেষতঃ।
বারাণস্যাং বিশেষেণ তত্রদেবঃ স্বয়ংহরঃ ॥৩১
কেদারেক্ষুতীর্থে চ নৈমিষারণ্যএবচ।
সরস্বত্যাং বিশেষেণ পুষ্করেচ বিশেষতঃ ॥" ৩৪

কূর্ম্ম পুরাণ; উপবিভাগ, ২০ অধ্যায়।

"পরংগুহ্যং গয়াতীর্থং পিতৃণাঞ্চাতিদুর্লভম্।
কৃত্বাপিণ্ডপ্রদানন্তুনরোযোজায়তেনরঃ ॥ ৭
সকৃদ্‌গয়াভিগমনং কৃত্বাপিণ্ডং দদাতিযঃ
তারিতা পিতরস্তেন যান্তিব্রহ্মপরমাং গতিম্। ৮
তত্রলোহদণ্ডঃ ঊর্দ্ধং রুদ্রেণ পরমাত্মনা।
শিলাতলে পদংন্যস্তং তত্রপিতৃন্ প্রসাদয়েৎ ॥৯
গয়াভিগমনং কর্ত্তুং যঃ শক্তোনাভিগচ্ছতি।
শোচন্তি পিতরস্তং বৈবৃথাতস্য পরিশ্রমঃ ॥ ১০
গায়ন্তি পিতরোগাথাঃ কীর্ত্তয়ন্তি মহর্ষয়ঃ।
গয়াং যাস্যতি যঃ কশ্চিৎ নোঽস্মান্ সন্তারয়িষ্যতি ॥"

মৎস্যপুরাণে

মৎস্যপুরাণে ধ্রুব-বংশীয় চাক্ষুষমনুর জ্যেষ্ঠপুত্র উরুর ছয় পুত্রের অন্যতম গয়ের উল্লেখ আছে, এবং ইল বা সুদ্যুম্নের পুত্র গয়েরও উল্লেখ দেখা যায়। গয়াপুরী তাঁহারই অধিকারভুক্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে।*

দেবীর অষ্টোত্তর শত নাম ও তীর্থের প্রসঙ্গে গয়ার মঙ্গলার উল্লেখ আছে।†

পিতৃতীর্থ সকলের মধ্যে গয়ার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইয়াছে, তথায় দেব দেব পিতামহ অবস্থিতি করেন বলিয়া লিখিত আছে। তথায় পিতৃগণ এইরূপ গাথা গান করিয়াছেন যে, বহু পুত্র কামনা করা উচিত, কেন না, তাহাদের মধ্যে যদি একজনও গয়ায় গমন করিতে পারে, অথবা নীল বৃষ উৎসর্গ করিতে সমর্থ হয়।‡

পিতৃগণের গীত শ্রাদ্ধগাথায়ও গয়ার উল্লেখ আছে। উক্ত গাথা তাঁহাদের কর্ত্তৃক এইরূপে গীত হইয়াছিল। "আমাদের বংশে কি এমন সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, যে আমাদিগকে সামান্য জলে,—বিশেষতঃ পুণ্যতোয়া নদীতে জলাঞ্জলি

---

* "উরোর জনয়ৎপুত্রান্ ষড়াগ্নেয়ীতনুপ্রভান্
অগ্নিং সুমনসংখ্যাতিং ক্রতুমঙ্গিরসংগয়ম্॥" ৪
মৎস্য পুরাণ ৪ অধ্যায়।

"ইলঃ কিম্পুরুষত্বে চ সুদ্যুম্নইতিচোচ্যতে।
পুনঃ পুত্রত্বয় গতঃ সুদ্যুম্নস্যাপরাজিতম্॥ ১৬
উৎকলো বৈ গয়স্তস্মাদ্বিরিতাশ্বশ্চবীর্য্যবান্।
উৎকলস্যোৎ কলানাম গয়স্তস্তু গয়ামতা॥ ১৭
ঐ ১২ অধ্যায়।

। "গয়ায়াং মঙ্গলানাম বিমলা পুরুষোত্তমে।" ৩৫
ঐ ১৬ অধ্যায়

বঙ্গবাসীর সংস্করণ-মৎস্যপুরাণে 'গয়ায়াং' স্থলে 'গঙ্গায়াং' পাঠ আছে, অনুবাদেও গঙ্গাতীর আছে, তাহা প্রকৃত নহে, উহা 'গয়ায়াং'ই হইবে, দেবী ভাগবতের সহিত ঐ শ্লোকার্দ্ধের মিল আছে, এবং দেবীভাগবতোক্ত অষ্টোত্তরশত পীঠ ও মৎস্যপুরাণের পীঠমালা প্রায়ই এক।

‡ "পিতৃতীর্থং গয়ানাম সর্ব্বতীর্থ বরং শুভম্।
যত্রাস্তে দেবদেবেশঃ স্বয়মেব পিতামহঃ॥৪
তত্রৈবা পিতৃভির্গীতা গাথাভাগ মহীস্থিতৈঃ
শ্রেষ্ঠব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোঽপিগয়াংব্রজেৎ॥ ৫
যজেতবাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ।" ৬
বংশ পুরাণ ২২ অধ্যায়।

দান করিবে? আমাদের বংশে কে কেমন সন্তান জন্মিবে যে, দুগ্ধ, ফল, মূল, অন্যান্য ভক্ষ্য, তিল ও জলাদির দ্বারা প্রতিদিন আমাদের শ্রাদ্ধ আচরণ করিবে? আমাদের বংশে কে এমন সন্তান হইবে, যে বর্ষাকালে মঘানক্ষত্রে ত্রয়োদশীতে ঘৃত, মধুযুক্ত পায়স দান করিবে? আমাদের কুলে এমন কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে কি, যে গণ্ডার মাংস কিম্বা কালশাক দ্বারা সযত্নে এক দিনও আমাদের শ্রাদ্ধ করিবে? কালশাক, মহাশাক, মধু, মুদ্গম, এবং বিষাণ-বর্জ্জিত খড়্গমাংস, এ সকল আমরা সূর্য্যস্থিতিকাল পর্য্যন্ত ভোজন করিয়া থাকি। আমাদিগের কুলজাত কোন্ ব্যক্তি আমাদিগকে গয়াধামে চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহ। কালে শ্রাদ্ধদানে খড়্গ মাংসে যোগিগণকে ভোজন করাইবে? আমাদের বংশে এমন কেহ কি জন্মিবে, যে আমাদিগকে গজচ্ছায়া যোগ কালে শ্রাদ্ধদান করিবে? যাহাতে আমাদের কল্পকাল ব্যাপী তৃপ্তি হইতে পারে। এইরূপ শ্রাদ্ধদাতা সর্ব্বলোকে কল্পান্ত পর্য্যন্ত কামচারী হইয়া সুখভোগে সমর্থ হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। এই পাঁচটি শ্রাদ্ধের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি যে কোন প্রকার শ্রাদ্ধ করিলে, আমাদের অনন্তকাল পর্য্যন্ত তৃপ্তিসাধন হয়, বিশেষ উপচারে শ্রাদ্ধ করিলে যে কত তৃপ্তি জন্মে, তাহা আর কি বলিব? আমাদের বংশে কি এমন সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, যে আমাদিগকে ঔরভ্রাজিন দান করিবে? আমাদের বংশে কি এমন কোন পুরুষসত্তম জন্মিবে, যে আমাদের উদ্দেশে সদ্ব্রাহ্মণকে প্রসূয়মানা গাভী দান করিবে? আমাদের কুলে এমন কেহ কি হইবে, যে আমাদের উদ্দেশে বৃষোৎসর্গ—বিশেষতঃ শুক্ল বা নীল বৃষ উৎসর্গ করিবে? আমাদের বংশে কি এমন সন্তান জন্মিবে, যে আমাদের উদ্দেশে শ্রদ্ধাসহকারে সুবর্ণ, গো, বা পৃথিবী দান করিবে? আমাদের বংশে কি এমন কোন পুরুষসত্তম জন্মগ্রহণ করিবে, যে আমাদের উদ্দেশে কূপ, উদ্যান তড়াগ ও বাপী প্রতিষ্ঠা করিবে? আমাদের কুলে এমন কেহ হইবে কি, যে দেবেশ মধুসূদন বিষ্ণু হরির শরণ লইবে? আমাদের বংশে এমন কোন বিদ্বান ও বিচক্ষণ সন্তান জন্মিবে কি, যে বিদ্বান্‌গণকে যথাবিধি ধর্ম্মশাস্ত্র দান করিবে।*

---

* শতঃপরং প্রবক্ষ্যামি পিতৃভির্যা: প্রকীর্ত্তিতা:
গাথা: পার্থিবশার্দ্দূল কাময়ন্তি: পুরেষকে। ২
অপিভাৎ সকুলেঽস্মাকং যোনোদদ্যাদ্গয়াগতিম্।
নদীষু বস্তুতোয়াসু শীতলাসু বিশেষত: । ৩

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে প্রিয়ব্রত-বংশীয় পৃ[illegible] তনয় নক্তের পুত্র গয়, এবং ঐক্ষ্বাকবংশীয় বেণ পুত্র পৃথুরাজের [illegible] ভার্য্যা [illegible] এই তিনটি গয়ের উল্লেখ আছে।*

অপিস্যাৎ সকুলেঽস্মাকং যঃ শ্রাদ্ধং নিত্যমাচরেৎ।
পয়ো মূল-ফলৈর্ভক্ষ্যৈঃ প্রীয়তেঽনেন বা পুনঃ ॥৪
অপিস্যাৎ সকুলেঽস্মাকং যোনোদদ্যাৎ ত্রয়োদশীম্।
পায়সং মধু-সর্পির্ভ্যাং বর্ষাসু চ মঘাসু চ ॥৫
অপিস্যাৎ সকুলেঽস্মাকং যঃ অজামাংসেন যঃ সকৃৎ।
শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন কালশাকেন বা পুনঃ ॥৬
কালশাকং মহাশাকং মধুমুদ্গমসেরচ।
বিষাণবর্জ্জা যে খড়্গা স্তান্ সূর্য্যাং তদশীবহি ॥৭
গয়াসু দর্শনেবাহোঃ খড়্গামাংসেন যোগিনাম্।
ভোজয়েৎকঃ কুলেঽস্মাকং ছায়ায়াং কুঞ্জরস্য চ ॥৮
আকল্পকালিকী তৃপ্তিস্তেনাস্মাকং ভবিষ্যতি।
দাতাসর্ব্বেষু লোকেষু বান্ধবো ভবিষ্যতি ॥৯
আভূত সংপ্লবংকালং নাত্রকার্য্যা বিচারণা।
যদেতৎ পঞ্চকং তস্মাদেকেনাপি চ যঃ সদা ॥১০
তৃপ্তিং প্রাপ্স্যামচান্তাং কিং পুনঃ সর্ব্বসম্পদা।
অপিস্যাৎ সকুলেঽস্মাকং দদ্যাৎ কৃষ্ণাজিনং যঃ। ১১
অপিস্যাৎ সকুলেঽস্মাকং কশ্চিৎ পুরুষসত্তমঃ।
প্রসূয়মানাং ষোধেনুং দদ্যাদ্ব্রাহ্মণ পুঙ্গবে ॥ ১২
অপিস্যাৎ সকুলেঽস্মাকং বৃষভং যঃ সমুৎসৃজেৎ।
সর্ব্ববর্ণ বিশেষেণ শুক্লনীলং বৃষংতথা ॥ ১৩
অপিস্যাৎ সকুলেঽস্মাকং যঃ কুর্য্যাচ্ছ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
সুবর্ণদানং গোদানং পৃথিবীদানমেবচ ॥১৪
অপিস্যাৎ সকুলেঽস্মাকং কশ্চিৎ পুরুষ-সত্তমঃ।
কুপারাম তড়াগানাং বাসীনাং যশ্চকারকঃ ॥১৫
অপিস্যাৎ সকুলেঽস্মাকং সর্ব্বভাবেন যোহরিম্
প্রদায়াচ্ছরণং বিষ্ণুং দেবেশং মধুসূদনম্ ॥ ১৬
অপিনঃ সকুলেভূয়াৎ কশ্চিদ্বিদ্বান্ বিচক্ষণঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রাণি যোদদ্যাদ্বিধিনা দ্বিজসত্তমঃ ॥"১৭ মৎস্যপুরাণ ২০৪অধ্যায়।

* "গয়োঽপি সুতোনক্তস্তাপি গয়ঃস্মৃতঃ ॥" ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, ৩৪ অধ্যায়ে।
"হবির্দ্ধানোৎ ষড়াগ্নেয়ী ধিষণা জনয়ৎসুতান্।
প্রাচীনবর্হিষং শুক্রং গয়ং কৃষ্ণং ব্রজাজিনৌ ॥" ২৩ ঐ ৬৯ অধ্যায়।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

স্তুতি।

('সেখ সাদী'—মাইকেল মধুসূদন।)

হের ঐ আঁখি দুটী, স্থির স্নিগ্ধ যাহার ঈক্ষণ
উষার কিরণ হতে মৃদুজ্যোতিঃ,—যার মৌনবাণী
বিহ্বল প্রাণের 'পরে নন্দনের প্রেমস্বপ্নখানি ;
চন্দ্র-চ্যুতা নিশা রাণী যেন তার ধেয়ানে মগন
নিশীথের স্তব্ধ বুকে, নক্ষত্রপুঞ্জের তলদেশে,
শিশির-বিধৌত কুঞ্জে, নিষ্কলুষা কুমারীর বেশে !
হের ঐ গুচ্ছে গুচ্ছে আকুঞ্চিত চূর্ণ কেশরাশি
যুগল ললাট বেড়ি' লীলাভরে দুলিতেছে কিবা ;
খণ্ড-মেঘমালা যেন বায়ুভরে হরষ-উদ্দাম :
সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া,গিরি, নিদাঘের স্বর্ণোজ্জ্বল বিভা !
হের ও গোলাপ-পর্ণ,রক্তবর্ণ অধর-দু'খানি,
লক্ষ্য কর কম্পবক্ষ প্রাণোচ্ছ্বাসে উদ্গত-মুকুল ;
চুম্বনের মধু-পাত্র কামার্ত্ত তোমারে দিতে আনি'
বল, কোথা ফোটে আর এর চেয়ে আদরের ফুল ?
মাতায়ে গুঞ্জন-গানে নিদাঘের কুঞ্জবীথিখানি
রৌদ্র-দীপ্ত মধ্যাহ্নের ক্লান্ত যবে ভ্রমে সে আকুল
লভে কি বিরাম-ঠাঁই স্বরগেও এর সমতুল ?
দিকে দিকে বিঘোষিত হবে যবে শেষ তূর্য্যনাদ
মৃত-সঞ্জীবনী-মন্ত্রে উচ্চারিয়া "ঘুমায়ো না আর"
ভূকম্পনে বিকম্পিয়া সর্ব্ব বিশ্ব হবে তোলপাড়
আসমুদ্র দেশে দেশে কল-কল-তরাস-নিনাদ—
স্বপ্নহারা-সুপ্তিলীন তরুণের মুক্ত মৃত্তিকায়
পথ ছাড়ি' দিবে পৃথ্বী জাগিবারে নব-গরিমায়—
বিচার-আসনপ্রান্তে দাঁড়াইবে সর্ব্বজন আসি'
শুনিতে চরম-বাণী ; হে সুষমি ! এই সর্ব্বগ্রাসী
সৌন্দর্য্য তোমারি সম, প্রায়শ্চিত্ত করিবে একাকী
লক্ষ মূর্ত্তি পূজারীর মূর্ত্তিপদে প্রণতির লাগি'
গাঢ় অনুরাগে তারে প্রেমেরি মন্দির মনে আনি,—
কিম্বা পূজিয়াছে বলি' এ হেন প্রতিমা একখানি।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বোষ।

অক্ষয় কুমার পত্রের "জ্ঞানাঙ্কুর" নামকরণ করেন। উভয় বন্ধু "জ্ঞানাঙ্কুর"কে "বঙ্গদর্শন"হইতে স্বতন্ত্র করিবার জন্য দ্বৈভাষিক করিয়া প্রকাশ করেন্। পরে ইহা একভাষী হইয়া প্রকাশিত হয়। জ্ঞানাঙ্কুরের প্রথম পৃষ্ঠা (Title Page) এইরূপ ছিল ;—

JNANKURA.

OR

THE SEED OF KNOWLEDGE.

A monthly Anglo-vernacular Magazine & Review

OF

Literature. Philosophy, Science, History, Biography, Antiquities, Researches, Politics and Commerce.

জ্ঞানাঙ্কুর।

সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসাদি সম্বন্ধীয়

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

প্রথমে দুই সংখ্যা জ্ঞানাঙ্কুর রাজসাহী রামপুর বোয়ালিয়া হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল ; পরে বঙ্কিমচন্দ্র জ্ঞানাঙ্কুরের অধ্যক্ষকে পত্রের মুদ্রাঙ্কন সংস্কারের জন্য অনুরোধ করিলে ইহা

কলিকাতা।

নূতন ভারত যন্ত্রে

শ্রীরামানৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত" হয়।

জ্ঞানাঙ্কুর ও বঙ্গদর্শন।

ইংরাজী ১৮৭২ বাঙ্গালা ১২৭৯ সাল বাঙ্গালার সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই বৎসরের বৈশাখ ও আশ্বিন মাসে জ্ঞানাঙ্কুর ও "বঙ্গদর্শন" যথাক্রমে প্রকাশিত হয়। বঙ্গদর্শন যেমন বাঙ্গালার সমাজ, সাহিত্য-দর্শন-শিল্প ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞান দর্শন করিয়াছিল, জ্ঞানাঙ্কুরও বাঙ্গালায় জ্ঞানের অঙ্কুর ছড়াইয়াছিল। বঙ্গদর্শন যেমন প্রসিদ্ধ ইংরাজী সাময়িক Saturday Review, Blackwood's Magazine, Edinburgh Review প্রভৃতির আদর্শে সৃষ্ট হয়, জ্ঞানাঙ্কুরও ঠিক সেই আদর্শে সৃষ্ট হইয়াছিল। বঙ্গদর্শনে যেমন বঙ্কিম-প্রতিভার সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অন্যান্য লেখকগণের প্রতিভার স্ফুরণ হইয়াছিল, জ্ঞানাঙ্কুরেও তারকনাথ, রমেশচন্দ্র, চন্দ্রশেখর, রামদাস, লোহারাম শিরোরত্ন, দামোদর মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ দাস প্রভৃতির প্রতিভার বিকাশ হইয়াছিল। বঙ্গদর্শনের মত জ্ঞানাঙ্কুরেও সাহিত্য ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, সমালোচনা প্রভৃতি প্রকাশিত হইত। বঙ্গদর্শন ও জ্ঞানাঙ্কুরের তফাৎ এই টুকু ছিল, বঙ্গদর্শন সম্পূর্ণ বাঙ্গালায়, জ্ঞানাঙ্কুরের কয়েক সংখ্যায় দুতিনটী প্রবন্ধ ইংরাজী ও অবশিষ্ট বাঙ্গালায় প্রকাশিত হইত। এক কথায় বঙ্গদর্শন যেমন সুপাঠ্য সুসম্পাদিত, সুপরিচালিত ও আদর্শ সাময়িক, জ্ঞানাঙ্কুরও ঊনবিংশ শতাব্দীর নানা বিষয়ক জ্ঞানবিজ্ঞানময় সুপাঠ্য, আদর্শ সাময়িক সাহিত্য ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র ও জ্ঞানাঙ্কুর।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম সংখ্যা জ্ঞানাঙ্কুর পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন,—"এই [illegible] (জ্ঞানাঙ্কুর) খানির কলেবর দেখিয়া অনেকের ভক্তির অভাব জন্মিবে। মলাটকাগজে মন্দ ছাপা দেখিয়া অশ্রদ্ধা হইবে; কিন্তু যে পরিমানে অশ্রদ্ধা হইবে, ভিতরে পড়িয়া সেই পরিমানে ভক্তি এবং সুখের উদয় হইবে। ইহা যে বাঙ্গালা পত্রের মধ্যে একখানি অত্যুৎকৃষ্ট পত্র তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। লেখকেরা কৃতবিদ্য, চিন্তাশীল এবং লিপিপটু। ভরসা করি পত্র খানি স্থায়ী হইবে। অধ্যক্ষকে আমরা অনুরোধ করি যে পত্রখানি কলিকাতায় ছাপাইবেন। সুন্দরীকে জীর্ণ মলিন বসনাবৃতা দেখিলে যেরূপ কষ্ট হয়, জ্ঞানাঙ্কুর দেখিয়া আমাদের সেইরূপ কষ্ট হইয়াছে।" *

* বঙ্গদর্শন প্রথমবর্ষ ৪৩১।৩২ পৃষ্ঠা।

বাস্তবিকই জ্ঞানাঙ্কুর প্রকৃতই উনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞানাঙ্কুরই ছিল। বঙ্গদর্শন প্রচারের বিজ্ঞাপনে যেরূপ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মনীষীগণ সহিষেচন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া বঙ্গদর্শন প্রচারে সাহায্য করিয়াছিলেন। জ্ঞানাঙ্কুর প্রচারের সময়েও সেইরূপ কলেকজন মহাত্মা পণ্ডিত মনীষীবৃন্দ মিলিত হইয়া বঙ্গসাহিত্য ক্ষেত্রে জ্ঞানাঙ্কুর উড়াইতে তারকনাথও শ্রীকৃষ্ণ দাসকে সাহায্য করিয়াছিলেন। শুদ্ধ মনীষাসম্পন্ন অক্ষয়কুমারের ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, প্রত্নতত্ত্ববিৎ রামদাসের বৈদিক প্রবন্ধ, রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, ঐতিহাসিক উপন্যাস মাধবী কঙ্কন, চন্দ্রশেখরের মসলা বাঁধা কাগজ, বিদ্ধ বিড়ম্বনা প্রসিদ্ধ উদ্ভ্রান্ত প্রেমের এক অংশ কালীবর বেদান্তবাগীশের দার্শনিক প্রবন্ধ, সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ দাসের গীজোর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ History of Civilisation এর অনুবাদ সভ্যতার ইতিহাস, তারকনাথের ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস স্বর্ণলতা প্রকাশিত হয়। স্বর্ণলতাই জ্ঞানাঙ্কুরের গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি করে; আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলিয়াছেন, জ্ঞানাঙ্কুরের এতই প্রচার ও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল যে তাহাতে বঙ্গদর্শনের গ্রাহক সংখ্যার কিছু হ্রাস হয়।"

ইন্দ্রনাথ ও জ্ঞানাঙ্কুর।

জ্ঞানাঙ্কুর প্রকাশিত হইলে তারকনাথ বন্ধু ইন্দ্রনাথকে জ্ঞানাঙ্কুরে লিখিবার জন্য অনুরোধ করেন। ইন্দ্রনাথ সেই সময় দিনাজপুরে মুন্সেফী করিতেছিলেন। বন্ধু তারকনাথের আদেশ মত জ্ঞানাঙ্কুরে প্রকাশের জন্য একটী রচনা পাঠাইয়া দেন; এই রচনাটীই কল্পতরু। কল্পতরু রচনার জন্ম-ইতিহাস ও প্রকাশ সম্বন্ধে ইন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "বন্ধুবর তারকনাথের অনুরোধের ফলে ১২৮০ সালের বৈশাখ মাসের শেষভাগ কি জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রারম্ভে আমি "কল্পতরু" লিখি। আমার বাসার উঠানে ওটীকতক কুলগাছের সম্মুখে দুর্ব্বাঘাস লাগাইয়াছিলাম। অতি সুন্দর দুর্ব্বাবন উৎপন্ন হইয়াছিল; সুশ্যামল, সুদীর্ঘ বাহুল্যে দোগায়মান তেমন দুর্ব্বা আর বুঝি দেখি নাই। প্রত্যহ কাছারী হইতে আসিয়া সেই দুর্ব্বাবনের উপর মাদুর পাতিয়া কবি হৃদয়বিহারী সুকোমল সান্ধ্য সুশীতল সেই দুর্ব্বা মধ্যে বসিয়া, একটী টীনের বাকসের উপর কাগজ রাখিয়া কল্পতরু লিখিয়াছিলাম। কল্পতরু লিখিতে ১৮।১৯ দিন লাগিয়াছিল। কল্পতরু রাজসাহী গেল, শ্রীকৃষ্ণ দাস মহাশয় পুস্তক পাওয়া সংবাদ দিলেন।

তাহারপর তাঁহার সঙ্কট উপস্থিত হইল,—পুস্তক জ্ঞানাঙ্কুরে প্রকাশিত না হইলে তারকনাথ চটিবেন, হয়ত আমিও চটিব; প্রকাশিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বাবুর নিজের অপ্রিয় কার্য্য হইবে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ বাবু "নবযৌ নতস্থৌ" হইলেন। এজন্য আমিও তাগাদা আরম্ভ করিলাম, প্রায় ৪।৬ মাস কি অধিক কাল পরে শ্রীকৃষ্ণবাবু বিনয় পূর্ণ এক পত্রে আমাকে জানাইলেন যে, কল্পতরু উপাদেয় গ্রন্থ বটে, কিন্তু তাহা "ব্রহ্মের" নিন্দাসূচক, কেমন করিয়া তাহা জ্ঞানাঙ্কুরে প্রকাশিত হইতে পারে। আমি কৃতার্থ হইলাম, শ্রীকৃষ্ণ বাবুকে অভয় দিলাম; কল্পতরু ফিরিয়া পাইলাম।" *

রবীন্দ্রনাথ ও জ্ঞানাঙ্কুর।

বিশ্ববরেণ্য কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবি-জীবনের প্রথমযুগে এই জ্ঞানাঙ্কুরেই কাব্য-সাধনা আরম্ভ করেন। জ্ঞানাঙ্কুরই প্রথম তাঁহার কবিতা প্রকাশ করিয়াছিল। তাঁহার "ব্যাকুল" "ভগ্ন হৃদয়" প্রভৃতি কাব্য ও খণ্ড কবিতা সব জ্ঞানাঙ্কুরের চতুর্থ বর্ষ হইতে প্রকাশিত হয়। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানাঙ্কুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু লিখিতে ছিলাম তাহার প্রচার আপনা আপনির মধ্যেই বদ্ধ ছিল। এমন সময় জ্ঞানাঙ্কুর নামে এক কাগজ বাহির হইল। কাগজের নামের উপযুক্ত একটী অঙ্কুরোদ্গত কবিও কাগজের কর্ত্তৃপক্ষের সংগ্রহ করিলেন। আমার সমস্ত পদ্যপ্রলাপ নির্ব্বিচারে তাঁহারা বাহির করিতে সুরু করিয়াছিলেন। * * * প্রথম সে গদ্য প্রবন্ধ লিখি তাহাও এই জ্ঞানাঙ্কুরেই বাহির হয়।" *

* জীবন স্মৃতি ১৬ পৃষ্ঠা।

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী।

---

* বঙ্গভাষার লেখক প্রথম খণ্ড অক্ষয়মোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্কলিত।

বনবালা।

অয়ি রিক্তা, অয়ি মুগ্ধা ওলো পরিচিতা!
বরি তোমা এস বক্ষমাঝে,
চকিতা হরিণী সম মরম-বাহিতা,
কিসে একাকিনী কিগো সাজে?
সোহাগ-ঝরণা তুমি, সুধা মন্দাকিনী
ক্ষুধা জাগে তব মৃদুহাসে;
আকুল চাহনি টানে ওলো গরবিনী!
মম হৃদি তব হৃদি-পাশে।
বিশ্ব যেন রহে চাহি তব মুখ পানে
মুগ্ধ আঁখি, থির অচপল,
নিগড়ে সে চক্রবালে যৌন অভিমানে
নিবিড়তা করে টল মল!
প্রভাতের আলো জাগে তোমার নয়ানে
সন্ধ্যা জাগে বয়ানে তোমার,
নিশীথের বার্ত্তা বহে তোমার পরাণে
বাঁশরীর সুর-পাথারার।
যৌন ভাষা, চিরদিন নির্ব্বাক রসনা
তাই আরো অধিক সুন্দর!
কোন ভাষা, ছন্দঃ পারে করিতে ঘোষণা
নবীনের ভাষা মধুতর?
ওলো শুচি, ওলো মুগ্ধা, ওলো মনোহরা!
তুমি সেই বিশ্বপ্রাণ সুর,
সাধ্য কি এ ভাষাহীন ত্রিতাপিত ধরা
প্রকাশিবে তোমা তরপুর?
বিশ্ব শুক্তি মাঝে রহ মুক্তা সম জাগি'
শুভ্র, শুচি, পূত, নিরমল,

মনে হয় ক্ষুণ্ণ হবে স্পর্শ মম লাগি'
বেদনায় রবে উদাসিনী।
তব জ্যোতি আলোবায়ু কে সহিতে পারে
জানে শুধু জানে মম প্রাণ,
তোমায় ও জ্যোতি মাঝে মম চিদাধারে
রাখ ঢাকি' সারাদিন মান।
তুমি রিক্তা পিকবধূ বেন বন মাঝে
কুহু ডাকে বিশ্ব মাতোয়ারা,
রূপ হীনা পাখে পাখে বসে থাক লাজে
লুকাইতে পরাণের সাড়া!
ছোট নদী চিক্‌মিক্ জলে তরপুর
বিলাইছ আপনা সাগরে,
নিস্তব্ধ যুগের শুপ্ত বাঁশরীর সুর
জাগাইয়া নিশীথ প্রহরে।
ধনী যারা আপনার মহত্ত্ব প্রচারি'
ক্ষুদ্রভাবে করিছে ঘোষণা,
রিক্তা তুমি লুকাইয়া, ক্ষুদ্রতা পাসরি'
কর তুমি জীবন প্রেরণা।
দীনা তুমি তাই তোমা ভালবাসে মন
মুগ্ধ হিয়া উঠে কমকলি,'
তীব্র জ্যোতি যায় শুধু ধাঁধিয়া নয়ন
দীনতায় প্রাণ পড়ে গলি'।
তাই থাকো, রিক্তা থাকো দীনা বিশ্ব মাঝে
চিরদিন ওগো বনবালা,
তোমা চিরকাল জগতের কাজে
ভুলি সব ক্ষোভ, ব্যথা, জ্বালা।

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।

মহাকবি সূরদাস।

চন্দ বরদাই হিন্দীভাষার আদিকবি, তিনি সম্রাট্ পৃথ্বীরাজের সভা-কবি, মিত্র এবং সামন্ত ছিলেন। তিনি ১২০৫ সম্বতের কাছাকাছি কোন সময় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৪৮ সম্বতের কাছাকাছি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার পর কবির আদি অনেক কবি জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু কেহই সূরদাস এবং তুলসীদাসের ন্যায় প্রসিদ্ধ হইতে পারেন নাই।

মহাকবি সূরদাস অনুমান ১৫৪০ বিক্রম সম্বতে দিল্লীর সন্নিহিত সিহী নামক কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সূরদাস একস্থানে নিজের বিষয়ে লিখিয়াছেন যে, তিনি চন্দ বরদাইএর বংশজ ছিলেন এবং তাঁহার পিতার নাম রামদাস ছিল। তিনি সেই স্থানেই লিখিয়াছেন যে, তাঁহার সাতজন ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সকলেই যুদ্ধবৃত্ত্যবলম্বী ছিলেন; কেবল তিনি অন্ধ হওয়ার জন্য এই ব্যবসা অবলম্বন করিতে পারেন নাই। চন্দ বরদাই স্বয়ং বীর এবং যোদ্ধা ছিলেন, অতএব তাঁহার বংশজগণ যে যুদ্ধব্যবসায়ী ছিলেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বলা বাহুল্য যে, সূরদাস ভট্টজাতীয় ছিলেন; কারণ চন্দ বরদাই ভট্টজাতীয় ছিলেন। রামদাস প্রথমে ইসলাম সাহের দরবারে কাজ করিতেন, পরে আকবরের কাছে কাজ করেন। আইন-ই-আকবরীতেও রামদাস এবং তাঁহার পুত্র সূরদাসের নাম পাওয়া যায়।

সূরদাসকে অনেকে জন্মান্ধ বলিয়া থাকেন কিন্তু একথার উপর বিশ্বাস করা যায় না, কারণ তিনি প্রকাশজ্যোতিঃ প্রভৃতির এরূপ সুন্দর বর্ণন স্থানে স্থানে করিয়াছেন যে, তাঁহাকে জন্মান্ধ বলা যায় না। বোধ হয় তিনি বয়স্ক হইয়া অন্ধ হন, তাঁহার অন্ধ হওয়ার সম্বন্ধে একটী গল্প প্রচলিত আছে, সেই গল্পটী হইতেও এই কথারই পুষ্টি হয়। একদা সূরদাস কোন বাগানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, ভ্রমণ করিতে করিতে একটী সুন্দরী যুবতী তাঁহার নয়নপথে পতিত হয়। তাহাকে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত মোহিত হন এবং অনিমিষনেত্রে তাহার মুখের দিকে দেখিতে থাকেন। সূরদাসকে এইরূপ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার দিকে অনিমিষনেত্রে চাহিতে দেখিয়া যুবতী তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল,

"মহারাজ।* আমাকে কিছু আজ্ঞা করুন।" যুবতীর নিকট হইতে এবম্প্রকার কথা শ্রবণ করিয়া সূরদাসের চৈতন্যোদয় হইল এবং তিনি স্বীয় কামীজনোচিত স্থিতির কথা জানিতে পারিলেন। চক্ষুদ্বয়ই এই সকল অনর্থের মূলীভূত জানিয়া তিনি যুবতীকে বলিলেন, "সত্যই যদি তুমি আমার আজ্ঞাপালন কর তাহা হইলে আমার চক্ষুর্দ্বয় বিলম্ব না করিয়া সূচ দ্বারা বিদ্ধ কর"। সূরদাসের আজ্ঞানুসারে যুবতী তাহাই করিলেন এবং সূরদাস তদবধি অন্ধ হইলেন। মোটের উপর সূরদাস যে জন্মান্ধ ছিলেন না, তাহা নিঃসন্দেহ।

হিন্দী সাহিত্যে সূরদাসের স্থান কত উচ্চ তাহা নিম্নের কয়েকটী অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছড়া হইতে বুঝা যায়।

সূর সূর তুলসী শশী, উড়গণ কেশোদাস,
অব কে কবি খদ্যোতসম জঁহতঁহ করত প্রকাশ'।

'হিন্দী সাহিত্যাকাশে সূরদাস সূর্য্যস্বরূপ, তুলসীদাস চন্দ্রস্বরূপ, কেশবদাস, ভূষণ ইত্যাদি কবিগণ নক্ষত্রস্বরূপ এবং আধুনিক কবিগণ খদ্যোতের ন্যায়; তাঁহারা যথাতথা প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

উক্তি পদ কবি গঙ্গকে, উপমাকো বরবীস,
কেশব অরথ গম্ভীরতা, সূর তীনি গুণ দীস।

গঙ্গ কবি উত্তম পদের জন্য, বরবীর উপমার জন্য, কেশব দাস অর্থগাম্ভীর্য্যের জন্য এবং সূরদাস এই তিন গুণের জন্যই প্রসিদ্ধ।

'তত্ত্ব তত্ত্ব সূরা কহী, তুলসী কহী অনুঠী
বচী খুচী কবীরা কহী, অওর কহী সব ঝুঠী।'

সূরদাস তত্ত্বের তত্ত্ব (সার) বলিয়াছেন, তুলসীদাস যাহা বলিয়াছেন তাহা অনুপম, কবীর অতি সামান্য তত্ত্ব লিখিয়াছেন (তাঁহাদের তুলনায়), এবং আর যে, সমস্ত কবি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে কোন তত্ত্ব নাই অতএব তাহা মিথ্যা।'

সূরদাস বালচরিত্র চিত্রণ করিতে এবং গোপীদিগের বিরহ-বর্ণন করিতে অত্যন্ত পটুতা দেখাইয়াছেন। তিনি তাঁহার সমস্ত কাব্য ব্রজভাষা অর্থাৎ ব্রজের হিন্দীতে লিখিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকাবলীর মধ্যে সূরসাগর সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ এবং ইহাই তাঁহার কীর্ত্তি, যতকাল জগতে হিন্দীভাষা থাকিবে ততকাল পর্য্যন্ত তাঁহার নাম জীবিত থাকিবে।

* এতদ্দেশে উচ্চজাতীয় মনুষ্য বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ দিগকে সম্বোধন করিতে মহারাজ শব্দ ব্যবহৃত হয়।

স্বয়ং পুড়িয়া প্রাণত্যাগ করে, অভিমুত দেখে অসঙ্কোচে সহিত প্রীতি করিয়া বন্দী হয়, মৃগ দেখে দুষ্টি পরের সহিত প্রীতি করিয়া বাণাহত হয়। সুরদাস বলিতেছেন দেখ আমি মাধবের সহিত প্রীতি করিয়া যে দুঃখ এক্ষণে তাঁহার বিরহে ভোগ করিতেছি তাহা বলিবার নয়। আমার দুইচক্ষু বহিয়া অনবরত অশ্রুধারা পড়িতে হইতেছে, অতএই বুঝিয়া সও প্রীতি কেমন সুখদ।

মহাকবি সুরদাস ৮০ বৎসর বয়সে গোকুলে কৃষ্ণগুণগান করিতে করিতে পরলোক গমন করেন। যতকাল জগতে হিন্দী ভাষার অস্তিত্ব থাকিবে ততকাল তিনি অমর হইয়া থাকিবেন। হিন্দী সাহিত্যাকাশ হইতে সুরদাস-সূর্য্য অস্ত গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রদীপ্তিতে হিন্দী সাহিত্য চিরকাল আলোকিত থাকিবে।

শ্রীমন্মথনাথ গুপ্ত।

নারীর বন্ধন।

—সেতো চির জীবন পুরুষ জাতির বন্দিনী,
ভক্তি আশা তৃপ্তি সবই বন্ধ ত !!
সৃষ্টি-সময় হ'তে সে যে দাসত্বেরই নন্দিনী;
দাসত্ব তা'র সারা জীবনের ব্রত।

শ্রীসুকুমার ভাদুড়ী।

প্লাবনে !

ওরা তোদের দেশের ছেলে
তোদের আপন ভাই—
ওদের যে সব ভেসে গেছে
নাই দাঁড়াবার ঠাঁই !
ওদের ভেসে গেছে বিছ্না মাদুর
ছেলে মেয়ে গরু-বাছুর
ভেসে গেছে ধানের গোলা
চাল চুলো আর নাই—
নিভে গেছে প্রাণের প্রদীপ
আঁখির রোশনাই !
পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে
নেংটা দিগম্বর—
নয়ন জলে বক্ষ ভাসে
ক্ষুধায় জর্ জর্ ।
কেমন করে' তোদের মুখে
অন্ন রোচে ? ঘুমাস্ সুখে ?
ভাল পরে', ফুর্ত্তি করে'
বেড়াস্ হেসে গেয়ে—
ভালবেসে কোলে টানিস্
নিজের ছেলে মেয়ে ?
ওরা আজি দাঁড়িয়ে আছে
তোদেরই মুখ চেয়ে—
তোদের ভ্রাতা ভগ্নী ওরা—
তোদের ছেলে মেয়ে ।
তোরাই যদি ওদের মত

চ'লতিস্ আজি—লাগত কত
বুঝ্তিস্ তবে কি আঘাতে
পড়্চে ওরা ঘুমে—
বুকটা ফাঁকরা হয়ে গেছে
যক্ত পড়ে চুয়ে!
যে যা' পারিস্ দয়া ক'রে
দেরে ওদের কিছু—
ভাগ্যচক্র নিয়তইয়ে
ঘুর্চে উঁচু নীচু!
গেল আষাঢ়, গেল শ্রাবণ,
শরৎকালে একি গ্রাবন?
তোদেরই মা সুখের স্বপন
কখন্ ভেসে যায়—
একটু আগু একটু পিছু
এইত তুনিয়ায়!

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কবিরত্নাকর।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এতদিন শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন 'সাহিত্যে'র সম্পাদনকার্য্য স্বয়ং দেখিতে পারেন নাই। আগামী মাঘ মাস হইতে 'সাহিত্যে'র সম্পাদনকার্য্য যথারীতি সম্পাদন করিতে থাকিবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাহিত্য ৩২শ বর্ষ, ১০ সংখ্যা।

সাহিত্যের পুষ্টি।*

বর্ত্তমান যুগ বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের বিস্তারের যুগ। এই যুগে ছোট বড় সকল সাহিত্যসেবীই নানা বৃক্ষ হইতে পুষ্প চয়ন ও ফল আহরণ করিয়া জননী বঙ্গভাষার পূজার আয়োজন করিতেছেন। সমগ্র ভারতের ভিন্ন ভিন্ন দেশের ও ভিন্ন ভিন্ন জাতির সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে ভাবসম্পদ্ সংগ্রহ করিয়া তাহারা মাতৃভাষার পূজা অলঙ্কৃত করা হইতেছে। ভাবের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, নব নব ভাবপ্রকাশের সৌকর্য্যার্থে ভাষায় নব নব শব্দ ও শব্দবিন্যাস যোজিত হইতেছে। ফলে বঙ্গভাষা এখন বসন্তের নবপল্লবোদ্গমসমন্বিত তরুর ন্যায় অথবা নববস্ত্রপরিহিতা সর্ব্বাভরণভূষিতা সুন্দরী রমণীর ন্যায় শোভা পাইতেছে।

এই ত দেখিলাম মায়ের শোভা। কিন্তু মাতৃভক্ত সন্তান কেবল মায়ের শোভা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে পারে না। যদি বাহ্য শোভার অন্তরালে আভ্যন্তরিক স্বাস্থ্যসম্পদ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলেই সেই শোভা স্থায়িত্ব ও সুফল হয়, এবং সন্তানের প্রাণে অনাবিল আনন্দ দান করিতে পারে। নতুবা অন্তঃসারশূন্য বহিঃসৌন্দর্য্য ক্ষণস্থায়িনী বিদ্যুল্লেখার ন্যায় একবারমাত্র দর্শকের নয়নে উদ্ভাসিত হইয়া পরক্ষণেই আবার অন্ধকার গর্ভে বিলীন হইয়া যায়; কীটদষ্ট পুষ্পের সৌন্দর্য্যের ন্যায় সে সৌন্দর্য্য অচিরে নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে।

অবশ্য আমি একথা বলিবার স্পর্দ্ধা রাখি না যে, আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্য কেবল মাত্র অসার পদার্থে পরিপূর্ণ; কেন না, তাহা হইলে এত দিন সে সাহিত্যের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হইত। ঘুণে গৃহনির্ম্মাণ করিলে সে গৃহ কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে? বরং ইহাই বলিতে বাধ্য হইব যে, যে সব মনীষা-সম্পন্ন লেখক ও লেখিকা সাহিত্য-সেবায় স্ব স্ব প্রতিভা নিয়োগ করত লেখনী-ধারণ করিয়াছেন, বঙ্গসাহিত্য তাঁহাদের ঋণ কখনও ভুলিতে পারিবে না, কেন না তাঁহাদেরই ঐকান্তিক সেবায় উহা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিশালী হইয়া জগতের

* ত্রয়োদশ সাহিত্য-সম্মিলনে মেদিনীপুর-অধিবেশনে সাহিত্য-শাখায় পঠিত।

সাহিত্যে এক গৌরবময় স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, এত উন্নতি সত্ত্বেও আমাদের সাহিত্যে কতকগুলি দোষ প্রবেশ করিয়াছে এবং কতকগুলি গুণের অভাব আছে; সাহিত্যকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে হইলে একে একে দোষগুলি বর্জ্জন করিয়া গুণগুলি সন্নিবেশিত করিতে হইবে। তাহা না হইলে দোষগুলি ক্রমশঃ প্রসারলাভ করিয়া সাহিত্যের বর্ত্তমান গুণগুলিকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে, ফলে সাহিত্যের নিদারুণ অধঃপতন সংঘটিত হইবে।

প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, সাহিত্যের 'পুষ্টি' বলিলে আমরা কি বুঝিব। অনেকের ধারণা, সাহিত্যের কলেবর যত স্থূল হইবে, অর্থাৎ সেই ভাষায় যত অধিকসংখ্যক গ্রন্থ রচিত হইবে, সেই সাহিত্য ততই পুষ্ট হইতেছে বুঝিতে হইবে, কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। মানব-দেহের পুষ্টির সহিত সাহিত্যের পুষ্টির অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। দেহের স্থূলতাই যে স্বাস্থ্যের লক্ষণ নহে একথা সকলেই জানেন। শরীরের মাংসপেশীসমূহ সুস্থ ও সবল হওয়া চাই, রক্ত বিশুদ্ধ হওয়া চাই, দেহ লঘু, জড়তাবর্জ্জিত এবং কর্ম্মঠ হওয়া চাই, তবেই সেই শরীর পুষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে। পক্ষান্তরে সারহীন স্থূলতা অনেক সময় অসুস্থতারই পরিচায়ক। খাদ্য লঘু অথচ পুষ্টিকর হইলেই তাহা স্বাস্থ্যকর, গুরুপাক খাদ্যে শরীরের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই অধিক হয়। যে সকল উপাদানে সাহিত্যের প্রকৃত গঠন ও পুষ্টি হয়, অনেক সময় সেই সকল মূল্যবান উপাদানের পরিবর্ত্তে অকর্ম্মণ্য অনিষ্টকর আবর্জ্জনা সাহিত্যের শরীরে প্রবেশলাভ করিয়া উহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়া দেয়, এবং সাধারণ অনভিজ্ঞ লোকে মনে করে যে ঐ সাহিত্য সুন্দর পুষ্টিলাভ করিতেছে। এরূপ অবস্থাপন্ন সাহিত্যকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকের তীব্র কশাঘাতে সাহিত্যের অসারগুণ আবর্জ্জনারাশি দূর করিতে হইবে, এবং কৃতবিদ্য, জ্ঞানী ও মার্জ্জিতরুচি সুলেখকগণের ঐকান্তিক চেষ্টায় উহার পুষ্টিকারক উপাদানগুলি ক্রমে ক্রমে সংযোজন করিয়া উহার অঙ্গসৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিতে হইবে। তবেই সাহিত্য উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিয়া জগতে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

আজকাল বাঙ্গালা ভাষায় অনেক পুস্তক লিখিত হইতেছে, তন্মধ্যে উপন্যাসের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই শ্রেণীর ছোট বড় মাঝারি নানা রকমের পুস্তক এত অধিক সংখ্যায় প্রকাশিত হইতেছে যে উহাদের তিতর হইতে পড়িবার মত পুস্তক বাছিয়া লইতে হইলে, 'বাঁধবনে তোর কানা' হইয়া পড়িতে হয়।

অনেক পুস্তকে নূতনত্ব কিছুই থাকে না, কেবল মাত্র অন্য লেখকের লিখিত পূর্ব্ব-প্রকাশিত এক বা ততোধিক পুস্তকের ভাব ও ঘটনার পুনরাবৃত্তি মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ পুস্তক একখানি পাঠ করিলে আরও দশখানি পাঠ করার কাজ হয়। সুতরাং এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচারে আর কিছু হউক আর না হউক, পাঠকপাঠিকাগণের মূল্যবান সময় ও আয়াসলব্ধ অর্থ যথেষ্ট নষ্ট হয়।

প্রধানতঃ দুই তিনটী কারণে পুস্তকের এই অপভ্রংশগুলি সাহিত্যের ঝাঁপার ভাইয়া ফেলিতেছে। নবীন লেখকগণ সাহিত্যের আসরে নাম জাহির করিবার জন্য যাহা খুসী তাহাই লিখিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া বাজারে বাহির করিয়া দিতেছেন, কখনও বা অর্থোপার্জ্জনের আশায় এরূপ করিতেছেন (এ হিসাবে অনেক প্রবীণ লেখকও বাদ যায়েন না)। আবার অনেকে, লিখিবার কিছু থাকুক আর নাই থাকুক, সময় কাটাইবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়া 'সখের সাহিত্যিক' সাজিয়া আসরে নামিতেছেন। এই সকল ধারিত্ব জ্ঞানহীন লেখকের উপদ্রবে সাহিত্যের নাভিশ্বাস হইবার উপক্রম হইয়াছে। ইঁহারা বুঝেন না যে, সমাজের হিতসাধারণরূপ সদুদ্দেশ্য হৃদয়ে না লইয়া সাহিত্য চর্চ্চা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। সদুদ্দেশ্য-বিহীন কর্ম্ম কখনও সৎকর্ম্ম হইতে পারে না। যাঁহার সত্য সত্য দুইটা ভাল কথা বলিবার প্রবৃত্তি বা সামর্থ্য আছে, তিনি কায়মনোবাক্যে তাহা বলিবার চেষ্টা করিবেন; কিন্তু যাঁহার তাহা নাই, তিনি কেন অনধিকারচর্চ্চা করেন? ইহাতে দেশের ও সমাজের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই যে অধিক হয়। যে কাজে আন্তরিকতা নাই, সে কাজ কখনই সুন্দর হইতে পারে না। নিজের প্রাণের আকাঙ্খা ও অনুভূতি দিয়া যে জিনিষটী গড়া হয়, সেটী কেমন সুন্দর হয়! কিন্তু যাহাতে তাহা নাই, তাহা নিতান্তই 'বাজারে' জিনিষ হইয়া পড়ে। অনেকে আত্মীয় বন্ধু, সমাজ ও সংসারের প্রভাব দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া অবাস্তব কল্পনায় বিভোর হইয়া অপ্রকৃত ও অপ্রাকৃত ঘটনাবলীর সমাবেশে কাব্য, উপন্যাস প্রভৃতি রচনা করেন, তাহাতে তাঁহাদের স্ব স্ব জীবনের অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি কিছুমাত্র থাকে না। এরূপ রচনা প্রায়ই উচ্চ অঙ্গের হয় না। এসম্বন্ধে কবিবর হেমচন্দ্রের জীবন-চরিত-লেখক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ কয়েকটী সুন্দর কথা বলিয়াছেন, এ স্থলে তাহা উল্লেখযোগ্য :—

"অনেক কবির জীবনের সহিত তাঁহার রচনার কিছুমাত্র সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কবি থাকিতে পারেন যাঁহার ধর্ম্মে কিছুমাত্র ভক্তি

চিত্তাকর্ষক ঘটনাবলীর সঙ্গে প্রসাদাদি গুণের কথাও বুঝিতে হয়। এই সকল গুণ থাকিলে কাব্য যে শুধু চিত্তাকর্ষক হয়, তাহা নহে, চিত্তোৎকর্ষকও হয়। শুধু বাহ্য সৌন্দর্য্য সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা নহে; তাহার সহিত আন্তর সৌন্দর্য্য না থাকিলে সে সৌন্দর্য্য সৌন্দর্য্যপদবাচ্যই নহে। 'Handsome is that hand some does.' রমণী 'সৌন্দর্য্যগুণান্বিতা' হইয়াও যদি 'পতিব্রতা' না হয়েন, তাহা হইলে তিনি বরনারীপদবাচ্যা নহেন। ধরণীতল শ্যামল-তৃণপল্লব শোভিত এবং মনোহর ফলপুষ্পসমন্বিত-বৃক্ষরাজি বিভূষিত হইয়াও যদি সূর্য্যালোকবঞ্চিত হয়, তাহা হইলে তাহার সে সৌন্দর্য্য একেবারে প্রাণহীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। চক্ষুর্হীন প্রতিমা অথবা প্রাণহীন দেহের সৌন্দর্য্যও এই শ্রেণীর। ব্যঞ্জনে নানাবিধ সুস্বাদু ও সুগন্ধি মসলা এবং ঘৃত দিয়া তাহাকে সুসিদ্ধ ও সুবাসিত করিয়াও যদি তাহাতে লবণ না দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে ব্যঞ্জন অখাদ্য হইয়া পড়ে। সুন্দরী রমণীর অঙ্গে বহুমূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার পরাইয়া দিলে তাহার রূপের ছটায় নয়ন মুগ্ধ হয় বটে, কিন্তু, তাহার সীমন্তে সিন্দুর রেখা না থাকিলে সে সৌন্দর্য্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। সে সৌন্দর্য্যে উজ্জ্বলতা থাকিতে পারে কিন্তু রমণীয়তা নাই, তাহার তাহিকা শক্তি আছে কিন্তু হ্লাদিনী শক্তি নাই। সে সৌন্দর্য্য অন্য দেশের লোকের আদর্শ বা উপভোগ্য হইতে পারে, কিন্তু উহা কখনও সত্ত্বগুণ-প্রধান ভারতবাসীর নিকট আদর্শ বলিয়া পরিগৃহীত হইবে না। তাই বলিতেছি, যিনি আদর্শ সাহিত্যসেবী বলিয়া পরিগণিত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি যেন সাহিত্যের মধ্য দিয়া ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা করেন, যেন খেয়ালের বশে যা' তা' লিখিয়া সময় ও শক্তির অপব্যয় না করেন, যেন মনে রাখেন যে যেমন রোগনির্ণয় ও তাহার দূরীকরণ চিকিৎসকের কর্ত্তব্য, অথবা যেমন ন্যায়বিচারের সহায়তা করাই ব্যবহারাজীবের কর্ত্তব্য, তেমনই পাঠকবর্গের মনের অন্ধকার দূর করিয়া তথায় জ্ঞানের আলোক বিকীর্ণ করত ধর্ম্মভাব আনয়ন করাই সাহিত্যসেবীর কর্ত্তব্য। রামায়ণ-মহাভারতাদি ধর্ম্মগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া নাটক ও উপন্যাস রচনা করিলে এ উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে সিদ্ধ হইতে পারে। এরূপ গ্রন্থ কয়েকখানি রচিতও হইয়াছে।

কাব্যের সৌন্দর্য্য আলোচনা করিতে গিয়া একটী কথা মনে পড়িয়া গেল। বড়ই দুঃখের বিষয়, আজকাল কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের লিখিত উপন্যাসাদিতে 'আর্টে'র দোহাই দিয়া নগ্ন সৌন্দর্য্যের বাস্তবচিত্র উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টা

বহুল পরিমাণে পরিদৃষ্ট হইতেছে এবং অনেক কৃতবিদ্য, এমন কি বর্ষীয়ান পাঠক এই শ্রেণীর চিত্রের সাধুর্য্যে মুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়া উচ্চকণ্ঠে চিত্রকরের জয় ঘোষণা করিতেছেন। বিলাতের কয়েকজন খ্যাতনামা লেখক এই আমদানির প্রবর্ত্তক। কিন্তু যাঁহারা আমাদের জাতীয় সাহিত্যে এই বিদেশী পণ্যদ্রব্যের আমদানী করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন না, ইহা দ্বারা তাঁহারা দেশের কি ভয়ানক অনিষ্ট করিতেছেন। এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া তরলমতি পাঠক-পাঠিকাগণের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যায়,—তাহাদের বাসনা উদ্দীপিত হয় ও নূতন নূতন পাপের চিত্র দর্শন করিয়া তাহাদের সুপ্ত পাপপ্রবৃত্তি জাগরিত হইয়া উঠে। অনেকের মতে, এইরূপ পুস্তক পাঠ ও তজ্জনিত মানসিক উত্তেজনাই আজকাল আমাদের সমাজে (বিশেষতঃ নারীদিগের মধ্যে) প্রায়শঃ অনুষ্ঠিত আত্মহত্যার একটি প্রধান কারণ। শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় তৎপ্রণীত 'দুর্গার মর্ত্ত্যে আগমন' নামক ব্যঙ্গরসাত্মক গ্রন্থে এই শ্রেণীর নগ্নচিত্র সম্বন্ধে কয়েকটী প্রয়োজনীয় কথা বলিয়াছেন। আমরা সে আর তাহা উদ্ধৃত করিলাম না।

অবশ্য ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে হইলে তাহার পাশাপাশি পাপের চিত্রও অঙ্কিত করিতে হয়, এ কথা অস্বীকার করি না। কিন্তু সে স্থলে সর্ব্বদাই লেখকের চেষ্টা হইবে,—ধর্ম্মকে বড় করিয়া দেখাইতে এবং পাপকে সঙ্কুচিত রাখিতে। যদিও সময়ে সময়ে সুযোগ পাইয়া পাপ মাথা তুলিবার চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু তাহার পরক্ষণেই ধর্ম্মের উদ্যত দণ্ডের আঘাতে পাপের মাথা অবনত করিয়া দিতে হইবে। তাহা হইলেই পাঠকপাঠিকার হৃদয়ে কখনও পাপের রেখা অঙ্কিত হইতে পারিবে না। কিন্তু যদি পাপকেই বড় করিয়া দেখান হয়, এবং পাপের পক্ষ অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মের উপর কটাক্ষপাত করিত হয়, তাহা হইলে পাঠকপাঠিকার হৃদয় প্রায়ই পাপের দিকে আকৃষ্ট হয়। এই নিমিত্ত লেখকগণের খুব সতর্ক হইয়া লেখনী পরিচালন করা উচিত।

উপরি-উক্ত শ্রেণীর (নগ্ন সৌন্দর্য্য-উদ্ঘাটনের ও পক্ষপাতী) লেখকগণ তাঁহাদের গ্রন্থে চরিত্রহীনা অথবা অন্য কারণে সমাজপরিত্যক্তা পতিতা নারীদিগের সম্বন্ধে এক আজগবি ব্যবস্থার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর এক দলে ইঁহারা এই সকল পতিতা নারীর দুঃখে এতদূর বিগলিত ও আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন যে, ইঁহাদিগের পক্ষে ওকালতি করিতে গিয়া সমাজের অধীকাংশ ভদ্রমহিলা নরনারীগণের উদ্দেশে কটূক্তি এমন কি অভিশাপ পর্য্যন্ত বর্ষণ করিতে কুণ্ঠিত

হয়েন নাই। ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে? এই সকল ভাগ্যহীনা পতিতা নারী আমাদের একান্ত দয়ার পাত্র, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি কেহ বলেন, এই সকল পতিতা নারী হয়ত অনন্যনীয় ঘটনাচক্র অথবা অদম্য মানব-প্রবৃত্তির বশে কুপথে পরিচালিত হইয়া বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে, অতএব তাহাদিগকে সতী নারীদিগের ন্যায়ই শ্রদ্ধা করিতে হইবে, এমন কি সতীর আসনে বসাইয়া পূজা করিতে হইবে, তাহা হইলে বড় বাড়াবাড়ি করা হয় না কি? প্রবৃত্তিদমন, ইন্দ্রিয়সংযম ও পবিত্র জীবন কি এতই তুচ্ছ জিনিষ? বিগত ফাল্গুন-সংখ্যার 'অলকা' নামক মাসিক পত্রে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এ সম্বন্ধে যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত কথা বলিয়াছেন। যাহা হউক দুঃখের বিষয়, পত্রিকাখানি আমার নিকটে না থাকায় শ্রোতৃবর্গকে তাঁহার উপাদেয় বাক্যাবলি উপহার দিতে পারিলাম না।

বিলাতী নভেলের প্রভাবে ও বিলাতী নভেলের অনুকরণে আরও কয়েকটী দোষ আমাদের কথা সাহিত্যে প্রবেশলাভ করিয়াছে। কে কেমন করিয়া হাসিল বা কাঁদিল, কে পায়ের আগায় ভর দিয়া চলিল আর কে-ই বা গোড়ালীতে ভর দিয়া চলিল, কাহার শিরোপরি কত্ত কেশ কোন ভাবে বিন্যস্ত, কে কোন্ কায়দায় বসিতে, চলিতে ও কথা কহিতে পারে, এই সব খুঁটিনাটি বর্ণনায় বিলাতী নভেলের প্রায় এক তৃতীয়াংশ পরিপূর্ণ থাকে। ইহার দেখা দেখি আমাদের অধিকাংশ গল্পলেখকগণও তাঁহাদের গ্রন্থে এই সব বর্ণনার স্রোত: বহাইতেছেন। ইহাতে কথায় অনেক সময় আসল কথা চাপা পড়িয়া যাইতেছে।

গ্রন্থোক্ত নরনারীগণের কথাবার্ত্তা, হাবভাব ও আচার-ব্যবহারেও বিদেশী ভাবের বাহুল্য পরিদৃষ্ট হয়। আধুনিক এমন পুস্তক খুব কমই লিখিত হইয়াছে, যাহা পাঠ করিলে আমাদের জাতীয় সংস্কার সম্বন্ধে কোন কথা অবগত হওয়া যায় বা তৎপ্রতি আমাদের আস্থা হয়। আবার যাহারা গ্রন্থ লিখেন তাঁহারা প্রায় সকলেই প্রায় নগরবাসী, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোক-প্রাপ্ত। এই কারণে তাঁহাদের গ্রন্থে নাগরিক জীবনের চিত্রই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। আখ্যায়িকায় ঘটনা স্থল প্রায়ই কলিকাতার কোন মেস বা বোর্ডিং; কথায় কথায় চা'এর টেবিল, থিয়েটার ও বায়স্কোপ, মোটর, ট্রাম ও ষ্টীমার, এই সকলের বর্ণনাতেই গ্রন্থ পরিপূর্ণ। যেন এ সকলের বাহিরে আর জগৎ বা জগতের জীব নাই। কিন্তু এই সকলের

ভিতর আমাদের দেশের প্রকৃত প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না। এ গুলি অধিকাংশ সহর বা তৎসন্নিহিত পল্লীগ্রামসমূহে সমধিক প্রচলিত হইলেও এখনও পল্লীগ্রামে এখনও প্রবেশলাভ করে নাই, সুতরাং জাতীয় জীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্রাঙ্কনে এ উপাদানগুলিকে একরকম অস্বাভাবিক বলা যাইতে পারে। রূপকথার রাজপুত্রের প্রাণ যেমন পুষ্করিণীর তলদেশে অবস্থিত বোয়ালমাছের মাথা অথবা কূপমধ্যস্থ ভ্রমরের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল, দেশের প্রাণ সেইরূপ সহরের কোলাহল হইতে বহুদূরে অবস্থিত পল্লীগ্রামের নিভৃত কুটীরে নিবদ্ধ। সাহিত্যের মারফত দেশের ভিতরের খবর দিতে হইলে পল্লীগ্রামে যাইতে হইবে, সহরের ঘোড়া বা বৈদ্যুতিক আলোকের মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না।

আবার বিলাতী বিদ্যেবশতঃ ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব বঙ্গে যে আমাদের গ্রন্থকারগণের ভাবের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, তাহা নহে; তাঁহাদের ভাষাও অল্পাধিক পরিমাণে দেশীয় পরিচ্ছদ পরিবর্জ্জন করিয়া বিলাতী কোর্ত্তাপর বিকশিত (?) হইয়াছে। ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি না থাকিলে আজ কাল কেহ বাঙ্গালা লেখা বুঝিতে পারা যায় না, কেন না, তাহা অনেক স্থলে ঐ ভাষার শব্দসমষ্টির হুবহু তর্জ্জমা। ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ভাব ও ব্যবহারের এরূপ করিয়া মাতৃভাষার পুষ্টিসাধনে কোন দোষ নাই, বরং সাহায্যই করে। তাহা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যেমন ঔষধে ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইলে তাহা গাছগাছড়া পেষণ করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ বিদেশী ভাবকে দেশীয় সাহিত্যের মধ্যে স্থান দিতে হইলে প্রথমে উহাকে দেশীয় সাহিত্যের উপযোগী করিয়া লইতে হয়। সামঞ্জস্যহীনতা ভাষার একটা দিষম দোষ। ভিন্ন ভিন্ন লেখক ভাবপ্রকাশের রীতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, এক পাটী বলিতে পারা যায়, যদি না করা যায়, তাহা হইলে আর এ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু এই অসুবিধা বড়ি যেন, এরূপ দুই রচনা রীতির মধ্যে সামঞ্জস্য ভাষাকে দিনে দিনে তাহার বিশিষ্টতা হারাইতে বসিয়াছে, আমাদের মাতৃভাষার প্রাণ সংহারের উপক্রম হইয়াছে।

কোন কোন লেখক লিখিতে বসিয়া বর্ণশুদ্ধি ও ব্যাকরণশুদ্ধির দিকে আদৌ দৃষ্টি রাখেন না—হাতে যাহা আসে তাহাই লিখিয়া যান। এরূপ করা ঠিক নহে। কেন না, বর্ণাশুদ্ধি ও ব্যাকরণদোষ এবং তৎসদৃশ অন্যান্যদোষগুলি সাহিত্যের জন্মে কুৎসিতরূপ। সেগুলি যত কম থাকে ততই সুন্দর হয়।

আমাদের সাহিত্যকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, এক

কথায়, উহাকে আদর্শ-সাহিত্যে পরিণত করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে উপরিউক্ত দোষগুলির বর্জ্জন করিতে হইবে। কিন্তু কেবল দোষগুলি বর্জ্জন করিয়াই ক্ষান্ত থাকিলে চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে উহার অভাবগুলিরও পূরণ করিতে হইবে। সে অভাব এক আধরকমের নহে—সহস্র রকমের; এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেগুলির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর নহে। সুতরাং সে বিষয়ে সংক্ষেপে দুইচারিটী কথা বলিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

উপরে সাহিত্য সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, তাহা সাহিত্যের একাংশ কাব্য ও আখ্যায়িকাসম্বন্ধেই বলা হইয়াছে। কিন্তু 'সাহিত্য' শব্দটি আরও ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হয়। কাব্য ও উপন্যাস ছাড়া আরও অনেক জিনিষ সাহিত্যের অঙ্গীভূত। সাহিত্যের উন্নতি বলিলে এই সমস্ত বিভাগেরই উন্নতি বুঝিতে হইবে। কাব্য ও উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র, সদ্ভাব সম্বলিত প্রবন্ধ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান, এ সমস্ত বিষয়েরই আলোচনা করিতে হইবে।

সাহিত্যের ভিতর দিয়া নরনারীর প্রাণে ধর্ম্মভাব জাগাইয়া তুলিতে হইবে। ভগবানের ঐশ্বর্য্যবর্ণন, দেবদেবীর মাহাত্ম্যকীর্ত্তন, তীর্থ ও সাধুসঙ্গের গুণব্যাখ্যান, সাহিত্যে সন্নিবেশিত করিতে হইবে। একালের বিলাসিতাপূর্ণ ও ধর্ম্মপ্রবণতা বর্জ্জিত জীবনের চিত্র অঙ্কনে বিরত থাকিয়া সেকালের সরলতাপূর্ণ ও ধর্ম্মপ্রাণ নরনারীর চিত্র অঙ্কিত করিতে হইবে। ভারত-বর্ণিত ভীষ্মপ্রমুখ মহাপুরুষগণের এবং সাবিত্রীপ্রমুখ মহীয়সী নারীদিগের জীবন-কথা সর্ব্বসাধারণের গোচর করিতে হইবে। পুরাণ ও ইতিহাসের সমুদ্র মন্থন করিয়া দেশের প্রাচীন গৌরব-কথামৃত জনসাধারণকে প্রাণ ভরিয়া পান করাইতে হইবে। শক্তিমান লেখকগণের লেখনীনিঃসৃত ওজস্বিনী ভাষা শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণের কর্ণকুহরে বারিদমন্দ্র জলদগম্ভীরস্বরে ধ্বনিত করিয়া তাঁহাদিগকে আধুনিক বিদেশী সংস্কার বর্জ্জন পূর্ব্বক সেকালের দেশীয় সংস্কারের পুনরানয়নে প্রবুদ্ধ করিতে হইবে। আমরা এখন জাগরণে-স্বপনে, শয়নে স্বপনে মাতৃনাম ভুলিয়া বিমাতার শরণাপন্ন হইতেছি, এ কথাটী সকলকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। আমার অগাধ ধনের কথা আমি কিছুই জানিতে পারিলাম না, অথচ অপরের মুষ্টিমেয় ঐশ্বর্য্যের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম,—যদি সে ভুলিয়া একবার আমার দিকে কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করে। ইহা অপেক্ষা শোচনীয় দৈন্য আর কি হইতে পারে?

মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনের সভাপতিরূপে কবিবর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহোদয় তদীয় অভিভাষণে সাহিত্য-পরিষদের সদস্যগণকে উক্ত জেলার স্ত্রী আচারের এবং ব্রতনিয়মের বিবরণ সংগ্রহের চেষ্টা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। আমি বলি, শুধু মেদিনীপুর কেন, বঙ্গদেশের, এমন কি সমগ্র ভারতবর্ষের সকল জেলারই এইরূপ বিবরণ সংগৃহীত হওয়া উচিত। এই উপাদানগুলি জাতীয় সভ্যতার ইতিহাস-নির্ণয়ে যথেষ্ট সহায়তা করে এবং সাহিত্যেরও পুষ্টিবিধান করে। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, সেন মহাশয়ের এই অনুরোধ শুধু কাগজে-কলমেই থাকিয়া যাইবে না,—কার্য্যে পরিণত হইবে। দেশের কৃতবিদ্য ও শক্তিধর সাহিত্যসেবিগণ যদি অগ্রণী এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া উহা সম্পন্ন না করেন, তাহা হইলে আর কে করিবে?

নরনারীর চরিত্রগঠন সাহিত্যের অন্যতম উদ্দেশ্য। গল্পচ্ছলেই হউক বা প্রবন্ধাকারেই হউক, সাহিত্যে এমন সব কথার অবতারণা করিতে হইবে, যাহা পাঠ করিলে পাঠকের চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে। তাহাতে ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় ঘোষিত হইবে, মদ্যপান ও ইন্দ্রিয়াসক্তি প্রভৃতি কদভ্যাসের কুফল প্রদর্শিত হইবে; ভাই-এ ভাই-এ, জ্ঞাতিতে জ্ঞাতিতে বিবাদ ও কথায় কথায় মামলা-মোকদ্দমায় কেমন করিয়া দেশ উৎসন্ন যাইতেছে তাহা দেখাইতে হইবে; সত্যের মহিমা কীর্ত্তিত ও অসত্যের লাঞ্ছনা প্রদর্শিত করিতে হইবে,—যাহা পাঠ করিয়া লোকের মনে সত্যানুরাগ ও অসত্যের প্রতি বিদ্বেষ উদ্রেক হইতে পারে। এক কথায়, সাহিত্যের ভিতর দিয়া সমাজে সুফলের বীজ বপন করিতে হইবে।

সাহিত্য-সমাজের দর্পণস্বরূপ; সুতরাং সমাজের হিতসাধন সাহিত্যের একটী প্রধান উদ্দেশ্য হইবে। দরিদ্র কন্যার পিতার নিকট হইতে অধিকতর বরপণ আদায়, অবলা নিরপরাধী বধূর উপর তাহার শ্বশুরকুলের অত্যাচার নির্য্যাতন,—সমাজের এই সকল উৎকট ব্যাধি যাহাতে সমাজের বক্ষ হইতে অচিরে দূর হয়, সাহিত্য-সেবিগণের সেই চেষ্টায় প্রাণ ঢালিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এই কারণে 'বলিদানে'র মত নাটকের এবং 'মা' ও 'দুই ভাগ্যে'র মত উপন্যাসের আদর হওয়া উচিত। পুরুষের চরিত্র-গঠনের সঙ্গে সঙ্গে নারীরও প্রকৃত শিক্ষাবিধান ও চরিত্রগঠনের প্রয়োজন, এবং সমাজে নারীর স্থান ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক। 'গৃহলক্ষ্মী' 'পতিব্রতা' প্রভৃতি গ্রন্থ, এবং [illegible]

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী ও শ্রীমতী সরযুবালা দেবীপ্রমুখ লেখিকাগণের সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধরাজি এ হিসাবে আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। বিলাস-বহুল বিলাতী সংস্কার বর্জ্জন করত সরলতাপূর্ণ দেশীয় সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিতে পারিলে, এবং নাগরিক জীবনের পরিবর্ত্তে পল্লীজীবনের চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিলে, এ উদ্দেশ্য কতকটা সিদ্ধ হয়। এই জন্য 'বেনের মেয়ে' ও 'স্বর্ণলতা'র মত উপন্যাস এবং 'পর্ণপুটে'র মত কবিতা-পুস্তকের বহুলপ্রচার একান্ত বাঞ্ছনীয়।

আজকালকার অনেক নাটক-নভেলে তরল প্রেমের এত ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন পাঠকের হৃদয়েই উহা ধারণ করিবার স্থান নাই। প্রেমগর্ভ ছোটগল্প ও উপন্যাসে বাজার একরকম ছাইয়া ফেলিয়াছে। এখন আর এরূপ অযাচিত ভাবে এ প্রেম বিলাইয়া কোন লাভ নাই। এখন প্রেমের কথা বলা বন্ধ রাখিয়া ভাতের স্থানে ভাতের কথা বলিবার সময়ে উপস্থিত হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সমাজের প্রধান সমস্যা দুইটি,—অন্নসমস্যা ও বস্ত্রসমস্যা। এই দুইটি সমস্যার সমাধান করিতে পারিলে অন্য সকল সমস্যার সমাধান অপেক্ষাকৃত অনায়াসে হইয়া যাইবে। এ বিষয়ে সমাজ-সাহিত্যিকগণের নিকট হইতে অনেক সাহায্যের আশা করে। এই অনাবৃষ্টি ও অজন্মার দিনে কি উপায়ে লোকে অনিতে শস্য উৎপাদন করিবে, কৃষিতত্ত্ববিষয়ে সে প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে। ওক্ত এক দিকের পরিপ্রেক্ষিতে কি উপায়ে পানীয় জল পাওয়া যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে তাহাদের অবহিত করিয়া দিতে হইবে। কি কি সহজ উপায় অবলম্বন করিলে লোকে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সাধারণ অথচ জীবন রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া স্বাস্থ্যসুখ উপভোগ করত জীবন যাপন করিতে পারিবে, চিকিৎসা-প্রাধান্যবাদীদিগকে সেই সকল উপায় সাহিত্যের মারফত সর্ব্বসাধারণকে বলিয়া দিতে হইবে। ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'স্বাস্থ্য-সমাচার' নামক মাসিক পত্র এবং 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মাইতির প্রবন্ধগুলি এ বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছে।

তাহা ছাড়া, যাহাতে দেশের লোক সুলভে অথচ অল্পায়াসে নিজ নিজ ব্যবহারোপযোগী যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে, তাহার নব নব উপায় উদ্ভাবন করিয়া সাহিত্যের মারফত সকলকে জানাইতে হইবে। কৃষক যাহাতে বর্ষান্তে মহাজনের ঋণদায় হইতে মুক্ত হইয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে;

নিঃস্ব প্রজা যাহাতে অত্যাচারী জমিদারের, এবং ভতোধিক অত্যাচারী তাঁহার নায়েব গোমস্তার কবল কবল হইতে মুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারে; সাহিত্যসেবী তাহারও পথনির্দ্দেশ করিবেন। স্বাস্থ্যকর পূতিগন্ধময় পানাডোবা ভরাট করিয়া এবং মশকের লীলাভূমি বনজঙ্গল কাটাইয়া সেখিয়া তাহার স্থানে কেমন করিয়া স্বাস্থ্যকর খোলা মাঠ বা লাভজনক শস্যক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে পারে, সাহিত্যে প্রসঙ্গক্রমে তাহারও আলোচনা থাকিবে। 'জরণ্যায়ন' ও 'মঙ্গী বৌমা' প্রভৃতি উপন্যাসগ্রন্থ এ কার্য্যে পথপ্রদর্শক।

সাহিত্যে রাজনীতি-চর্চ্চাও কিছু কিছু থাকা আবশ্যক। তবে তাহাতে কোন জাতি বা দেশবিশেষের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ পাওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে। তাহাতে সাহিত্যের মর্য্যাদার হানি হয়। দেশের অবস্থার যথাযথ বর্ণনা করিতে হইবে, এবং তাহার উন্নতিরও উপায় বিধান করিতে হইবে; কিন্তু কাহারও উপর বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে নাই—তাহা ভগবানের অভিপ্রেত নহে।

সাহিত্যকে চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে রঙ্গরসেরও অবতারণা করিতে হয়। কিন্তু সেটার মাত্রা যেন খুব বেশী না হইয়া পড়ে। তাহাতে একটা দোষ এই হয় যে, পাঠকের 'পরমার্থ' ভাল লাগে না।

শেষ কথা,—কাব্যই লিখি, উপন্যাসই লিখি, ছোট গল্পই লিখি আর প্রবন্ধই লিখি, লেখার ভাষাটা সর্ব্বত্রই প্রাঞ্জল, স্বাভাবিক এবং সহজবোধ্য হওয়া আবশ্যক। ভাবের গুরুত্বের তারতম্যানুসারে ভাষারও প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্ত্তন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সর্ব্বশেষে আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। সাহিত্যে গল্প ও উপন্যাসের ভাগ যত বেশী হয়, সাহিত্য ততই লঘু হইয়া পড়ে। সুতরাং লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবীদিগের গল্প ও উপন্যাসের দিকে বেশী ঝোঁক না দিয়া সারগর্ভ প্রবন্ধাদি রচনাতেই প্রধান ভাবে মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য।

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ।

হিন্দুর ঈশ্বরোপাসনা ও স্বরাজবাদ।

"লীলয়াব্যাপি যুষ্মেরং নির্গুণস্য গুণাঃক্রিয়াঃ"।

ভাগবত ৩।৭।২

নির্গুণ ব্রহ্ম লীলাবশে গুণ ও ক্রিয়াযুক্ত হন।

"বদন্তিতৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান্ ইতি শব্দ্যতে"॥

ভাগবত ১।২।১১

সেই অদ্বিতীয় চিৎবস্তুকে তত্ত্বজ্ঞানী "তত্ত্ব" আখ্যা প্রদান করেন। তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই ভগবান্ যা সগুণ ব্রহ্ম।

"অহিন্দু শিক্ষা দেন যে, ভগবান্ আমাহইতে স্বতন্ত্র সত্তা God সকল জিনিষের কারণ। কিন্তু হিন্দু বলেন তাহা নয়; হিন্দু বলেন, ভগবান্ তোমার কারণ নন্ তোমার উপাদান—তুমি ভগবানের ক্ষুদ্র সংস্করণ। ভগবান্ আপনার আধারে আপনি আধেয়রূপে রহিছেন"। অন্য জাতির ঈশ্বর একেশ্বর সগুণ হইতে স্বতন্ত্র কিন্তু হিন্দু ঈশ্বর শুধু একেশ্বর নহেন "একমেবাদ্বিতীয়ম্।" তিনি যেমন স্বতন্ত্র তেমনি অন্তরতন্ত্র, এসম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন :—

"একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষীচেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চেতি॥"

কালীপ্রসন্ন ঘোষ সি-আই-ই মহোদয় এই শ্লোকের এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, তিনি এক অর্থাৎ এই অনন্ত জগতের সর্ব্বত্র তিনি অনন্তভাবে ও অনন্ত শক্তিতে বিরাজমান হইলেও তিনি আপনাতে আপনি সর্ব্বাতিরিক্ত একজন। তিনি দিব্যজ্যোতির্ম্ময় এবং সর্ব্বভূতে অতিগূঢ়রূপে অবস্থিত। তিনি সর্ব্বব্যাপী, সমস্ত প্রাণীর অন্তরাত্মা,—সর্ব্ববিধ কর্ম্মের অধিনায়ক, এবং সকল জীবের আশ্রয়স্থান। তিনি কর্ম্মের সাক্ষী ও চৈতন্যময়; তাহার দ্বিতীয় নাই এবং তিনি উল্লিখিতরূপে সগুণ হইলেও নির্গুণ।

ঈশ্বর সাকারই হউন বা নিরাকারই হউন, সগুণ হউন বা নির্গুণ হউন, কিন্তু ঈশ্বর যে একজন আছেন এবং তাঁহার পূজা আরাধনা দরকার তাহা সকলদেশের সকল সাধু সজ্জনই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কেন না ঈশ্বরই আধ্যাত্মিক জগতের আদর্শ কেন্দ্র। শাস্ত্রে আছে "ঈশ্বরারাধনং মহৎ"। ঈশ্বর আরাধনা দ্বারা ভগবৎ কৃপা লাভ হয়, আত্মার শক্তি বৃদ্ধি পায়, পাপরাশি বিদূরিত হয়, বাস্তবিক ঈশ্বরোপাসনাই সকল উন্নতির মূল। ঈশ্বরোপাসনা ব্যতীত আত্মোন্নতিলাভ সম্ভবপর নহে। তবে স্থান কাল পাত্রভেদে উপাসনার প্রকারভেদ আছে, উদ্দেশ্যেরও বিভিন্নতা আছে।

হিন্দু ধর্ম্মের সঙ্গে অন্য কোন ধর্ম্মের তুলনা হইতে পারে না। অহিন্দুদের একখানি মাত্র ধর্ম্মগ্রন্থ (যেমন খৃষ্টানের বাইবেল, মুসলমানের কোরাণ) পাঠ করিলেই সেই ধর্ম্মের বিষয়, উপাসনার বিষয় জানা যায়, কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মের কথা শুধু একখানি পুস্তকে আবদ্ধ নহে। হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থ অগাধ শাস্ত্রসমুদ্র। সেই সমুদ্র যতই মন্থন করা যায়, ততই হীরা মাণিক পাওয়া যায়, প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটান যায়। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মের বিশেষত্ব শুধু এখানে নহে, হিন্দু ধর্ম্মের বিশেষত্ব—অধিকার-ভেদে, এই অধিকারবাদের কথা আর কোন ধর্ম্মে নাই, আর কাহারও শাস্ত্রে নাই। এই অধিকার বাদই হিন্দুর হিন্দুত্ব, হিন্দুর বিশেষত্ব।

হিন্দু ধর্ম্মে অধিকার ভেদে সোপান আছে, সো-পানের পর সোপান অতিক্রম করিতে হয়, তাই হিন্দুর জাতিভেদ, উপাসনাভেদ, স্থান, কাল, পাত্রভেদ বা শ্রেণীভেদ (বদ্ধ, মুমুক্ষু ও মুক্ত,) ভক্তভেদ, মুক্তি (দেব) ভেদ। উপদেশ-ভেদের তারতম্য ইত্যাদি। গীতায় সেই অধিকার-ভেদ পরিস্ফুট হইয়াছে, গীতার মতে সকাম হতে নিষ্কামে যাইবার উপদেশ রহিয়াছে, কর্ম্ম মার্গের সকাম বা সগুণ আরাধনার পর নিষ্কাম ও নির্গুণ আরাধনার বিধি রহিয়াছে। সহজ হইতে কঠিনে, প্রবৃত্তিমার্গ হতে নিবৃত্তিমার্গে যাইতে হয় ইহাই স্বাভাবিক। তাই গীতায় প্রথম কর্ম্মমার্গের কথা তৎপর জ্ঞানমার্গের কথা অবশেষে ভক্তি বা মুক্তির কথা বিহিত হইয়াছে। গীতায় ভগবানই বলিয়াছেন যে, যাহাদের গীতোক্ত ধর্ম্ম বুঝিবার ক্ষমতা নাই তাহাদের কাছে যেন তাহা বলিয়া তাহাদের বিচলিত করা না হয়।" ইহাতে অধিকার-বাদেরই প্রাধান্য বুঝাইতেছে। এই অধিকারবাদের করুণই—হিন্দু ধর্ম্মে সাকার নিরাকার, সগুণ নির্গুণ, মূর্ত্ত অমূর্ত্ত সকল সাধনারই বিধি রহিয়াছে। আমরা চাই কি? আমাদের লক্ষ্য কি? না—আমরা "অমৃতস্য পুত্রাঃ" আমরা তাঁহাকেই চাই,

ভূমা মহান সচ্চিদানন্দকেই চাই। যেন না "যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি"। তাঁহাকে না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা তৃপ্ত হতে পারি না। তাই ওটা না সেটা নানা পদার্থের ভিতর দিয়া তাঁহাকেই খুঁজিতেছি। সুখের অন্বেষণে সাকার বা নিরাকারের ভিতর দিয়া সেই মহানকেই লক্ষিত ও অলক্ষিতভাবে খুঁজিতেছি। কিন্তু সচ্চিদানন্দকে পাইতে হইলে সৎ হতে হবেই কিন্তু ইহা ত সহজ কথা মাত্র নহে। তাঁহার প্রাপ্তি হইলে প্রথমে কয়েকটী শক্তি অর্জ্জন করা প্রয়োজন। সুতরাং সাধনা চাই। সব ধর্ম্ম [illegible] সেজন্য সকলমতেই সাধনা, ব্রত, উপবাসাদির বিধান আছে [illegible] হইলে নিষ্কামভাবে নির্গুণ নিরাকারকে [illegible] উপাসনা করিতে হবে, দেখা ভাগবতে আছে :—

নির্গুণো সগুণশ্চেতি দ্বিধাপ্রোক্তা মনীষিভিঃ।
সগুণোপাসনা পূর্ব্বং নির্গুণান্তু বিরাগিভিঃ॥

হে মনিগণ! সেই পরব্রহ্মরূপিণী সচ্চিদানন্দময়ী পরাশক্তি দেবীকে ব্রহ্মবাদী মনীষী মহর্ষিগণ সগুণ ও নির্গুণ ভেদে দুইপ্রকার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাহার মধ্যে সংসারাসক্ত সকাম সাধকগণ, তাঁহার সগুণভাব, বাসনা-বিহীন জ্ঞান-বৈরাগ্যপূর্ণ নিষ্কামচেতা যোগিগণ নির্গুণভাব সম্বাশ্রয় পূর্ব্বক আরাধনা করিয়া থাকেন।

আবার শ্রীমদ্ভাগবতে আছে যে—

"অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদস্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্"॥

সর্ব্বভূতে অবস্থিত ঈশ্বররূপী আমাকে যাবৎকাল পর্য্যন্ত আপনার হৃদয় মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অনুভব করিতে না পারিবে তাবৎকাল পর্য্যন্ত মানব স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিয়া প্রতীকাদিতে আমার উপাসনা করিবে।

এক্ষণে সাকার ও পুতুল পূজায় বিদ্বেষীদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, উপরি-উক্ত দুই শ্লোক পাঠ করিয়া তাহাদের এবিষয়ের ভ্রান্তি দূর হইবে ত? অধিক কি স্বয়ং রামমোহন পর্য্যন্ত সাধন অধিকারীদের জন্য এই পুতুল পূজার আবশ্যকতা স্বীকার ও সমর্থন করিয়াছেন। এবিষয়ে বিখ্যাতনামা ৺চন্দ্রনাথ বসুর যুক্তি সিদ্ধ মতের উল্লেখ করিতেছি, "যাহার রূপ বা আকার সর্ব্বরকম অর্থাৎ যাহার রূপের বা আকারের স্থির নির্দ্দেশ হয় না, তিনি প্রকৃত পক্ষে

নিরাকার ; এবং যাঁহার সকল গুণই আছে অর্থাৎ যাহার গুণের স্থির নির্দ্দেশ হয় না, তিনি প্রকৃত পক্ষে নির্গুণ। জগতের জগদীশ্বরের রূপ এবং গুণ যখন অসংখ্য হইতেছে, তখন জগদীশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে হইলে অসংখ্য মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে হইবে। তাহা না হইলে অসীমকে সসীম করা হইবে, অনন্তকে সান্ত করা হইবে এবং জগদীশ্বরের মূর্ত্তি খর্ব্ব এবং অসম্পূর্ণ হইয়া থাকিবে। তাই হিন্দুর ব্রহ্মারূপে বিষ্ণুরূপ, রুদ্ররূপ, গণেশরূপ, কৃষ্ণরূপ, কালীরূপ, মৎস্যরূপ অনন্ত অগণ্যরূপ। যেখানেই মানুষ অনন্ত জগদীশ্বরের অনন্তম খুঁজিয়াছে, সেইখানেই মানুষ অসংখ্য জগদীশ্বর, কোটী কোটী দেবতা নির্ম্মাণ করিয়াছে। তেত্রিশ কোটী দেবতা বা সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শিতা একমাত্র হিন্দুর লক্ষণ, হিন্দু ধর্ম্মের লক্ষণ, হিন্দুত্বের লক্ষণ"। সাকার নিরাকার সম্বন্ধে কালীপদ হরিনাথ বলিয়া গিয়াছেন "নিরে" আকার সংযোগ করিয়া দেখ ঈশ্বর নিরাকার আবার জ্ঞান হইলেই দেখবে "সঁ"তে আকার যুক্ত" মানে সব আকারেই আছেন যিনি, তিনি সাকার"। এজন্যই ২২ কোটী হিন্দুর ৩৩ কোটী দেবতা।

আমরা সাকার নিরাকার উভয়বাদীই বটে। অধম অধিকারীর জন্য সাকার বা মূর্ত্তিপূজার এবং উত্তম অধিকারীর জন্য নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার বিধি শাস্ত্রবিহিত। দুইটী শাস্ত্র-শ্লোকের উল্লেখপূর্ব্বক তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, হিন্দুরা যে মূর্ত্তি গড়ে, সেই মূর্ত্তির ভিতর ঈশ্বরের আবির্ভাব হয় জানিয়াই মনে করে, বাস্তবিক পক্ষে মূর্ত্তিকেই যে দেবতা বা ঈশ্বর ভাবে না, আবাহন ও বিসর্জ্জন বিধি দ্বারাই তাহা বুঝা যায়। অথচ দেববিগ্রহে মন স্থির করিয়া, সেই দেবতাকে ঈশ্বর ভাবিয়া, ঈশ্বরোদ্দেশেই পূজা করিয়া থাকে। ব্যষ্টিদেবতাকে না ভাবিয়া সমষ্টিদেবতাকেই ভাবে। প্রতি 'বেদ-মন্ত্র-শিরে' ঈশ্বরবাচক ওঁকারই সে কথার সাক্ষ্য দিতেছে। অথচ কালী, দুর্গা, গণেশ, কার্ত্তিক প্রভৃতি দেবতার আধ্যাত্মিক অর্থ করিলেও সে কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। গীতা বলিয়াছেন :—

সকাম মানব ভক্তিযুক্ত হয়ে।
নিজ আশা লভিবারে যে মূর্ত্তি পূজয়ে॥
অন্তর্য্যামীরূপে আমি সে মূর্ত্তি পূজনে,
ভক্তিযুক্ত করি আমি তাহাদের মনে॥

(গীতায় বঙ্গানুবাদ)

দেবপূজাদি গৌণ বা অপরাভক্তির লক্ষণ। গৌণ ভক্তি হইতেই পরাভক্তি

ক্রমে ও চিত্তশুদ্ধি, আত্মজ্ঞান লাভ হয়। ক্রমে ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইলে দেবোপাসনা ছাড়িয়া দিতে হয়, প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইলে তাঁহার (ব্রহ্মজ্ঞানীর) আর কোন উপাসনারই আর দরকার পড়ে না। তখন তিনি তাঁহার ভগবানকে সর্ব্বত্রই দেখিতে পান। তাঁহার নিকট "যাহা যাহা নেত্রে পড়ে, তাহাতেই কৃষ্ণস্ফুরে"। তখন সাকার নিরাকার বা সগুণ নির্গুণ লইয়া আর দ্বন্দ্ব থাকে না। ক্রমে "আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং পরমাত্মা স্বরূপকং" এই জ্ঞান উপলব্ধি হইলে তিনি আপনাতে আপনি ডুবিয়া যান। যেমন হইয়াছিল প্রহ্লাদের, যেমন হইয়াছিল শুকদেবের। একদিকে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মভাব, অন্য দিকে স্বরাজ বা কেবলং ভাব তথা। কিন্তু সোঽহং হইলে আর ক্ষুদ্র আমি বা 'অহং' জ্ঞান থাকে না। এই সোঽহং ও ব্রহ্মভাবকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি বলিয়াছেন—

"একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষীচেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চেতি"।

ইহাই হিন্দুর 'একমেবাদ্বিতীয়ম' ব্রহ্মবাদ ও সোঽহং বাদ। কাজেই এই জ্ঞানের উপলব্ধিতে কি আর সাকার নিরাকারের দ্বন্দ্বভাব স্থান পায়? শ্রীরামা-নুজের 'ভাগবতসাহস্র' নামক প্রকাণ্ডগ্রন্থে আছে,—

"এ বিশ্বের একভাষা,—"সর্ব্ব ব্রহ্মময়"
আমরা যে ভাবে থাকি, "সোঽহং" বলয়।
যারা চিত্তে এ বিশ্বকে পূর্ণব্রহ্ম ভাবি,
উপাসনা কর নিত্য ব্রহ্মজ্ঞানে সবই।
যখন দেখিতে পাবে "সর্ব্ব ব্রহ্মময়,"
হইবে তুমি ও সর্ব্ব এক" রসে লয়।

(প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্রম্)

এই প্রকৃত ব্রহ্মবাদ। এতদ্বা নিরাকার ব্রহ্মউপাসনাবাদ অনেকটা বৌদ্ধদের অর্থহীন 'মহাশূন্যতা'-মূলকই হইয়া পড়ে অথবা মহাকবি নবীন সেনের ভাষায় বলিতে যদি যায় যে, সেই নিরাকার উপাসনাটা হয় একটা মহাশৈত্যমূর্ত্তির উপাসনা কিংবা সূর্য্যোপাসক ও পার্শিদের অগ্নি জড় উপাসনা।

উপনিষদ বা শ্রুতি নিরাকার ব্রহ্ম-প্রতিপাদক গ্রন্থ। এই নিরাকার ব্রহ্ম-উপাসনাতেই সোঽহং বাদ আছে। এই সোঽহংবাদের অনুসরণেই ভারতে

স্বরাজবাদের প্রচার হইয়াছে। স্বরাজ শব্দের অর্থ—স্ব (নিজ) রাজ (দীপ্তি পাওয়া) কিপ্, মানে স্বরাট, স্বয়ং দীপ্ত, ঈশ্বর; প্রকৃতিবাদি অভিধান এরূপ অর্থ করিয়াছেন। আমি বলি, তাহা হইলে বৌদ্ধমতে 'যাঁহারা ব্রহ্মভূত মোক্ষী' বা গীতামতে যাঁহারা স্থিতপ্রজ্ঞ, বিজিতাত্মা বা নির্দ্বন্দ্ব (বিষয় বাসনাদি ও সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব রহিত) তাঁহাদেরই প্রকৃত পক্ষে স্বরাট আখ্যা দেওয়া যায়। অথবা—তাঁহারাই সোঽহং বা স্বরাজের প্রকৃত উপাসক। গীতামতে স্থিতপ্রজ্ঞের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ এই—

পীড়িত ইন্দ্রিয়ের থাকে সমস্ত কামনা,
ব্রহ্মদর্শী স্থিতপ্রজ্ঞের নাহি কোন বাসনা
আত্মজ্ঞান লাভ হলে স্থিতপ্রজ্ঞ হয়।
জীবে ব্রহ্মে ভিন্ন বোধ নাহি তার রয়॥

(গীতার বঙ্গানুবাদ)।

আর বিজিতাত্মার লক্ষণ এই—

"শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ সব সহ্য করে।
মান অপমান কিম্বা সমজ্ঞান করে॥
সে আত্মা বিজিতাত্মা প্রশান্তভাব ধরে।
পরমাত্মা সহ সেই সুখে বাস করে"

গীতার এই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংযমবাদের উপরই স্বরাজবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা। এই হিসাবে বলা যায় যে, বেদান্তের বর্ত্তমান সোঽহং-বাদীরা যেমন কপট, আত্মপ্রবঞ্চক বর্ত্তমান স্বরাজবাদীরাও তদ্রূপ আত্মপ্রবঞ্চক, কপট। কেন না—"নিন্দাস্তুতি" সমজ্ঞান করেন যিনি তাঁহার মুখেই উপনিষদের "ব্রহ্ম লাভ" বা তদ্বেষি "সোঽহং" প্রচার শোভা পায়, নতুবা পঙ্গুর গিরি-লঙ্ঘনের ন্যায় তাহা উপহাসজনক শ্রুতিকটু বলিয়াই শুনায়।

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্ব লইয়াই গীতার আরম্ভ। বেদান্তের বেদান্ত গীতাতে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃতিভেদে উপাসনাভেদের কথা ও গীতাতে আছে। ত্রিগুণময়ী মায়ার অতিভূত জীব কখনো নির্গুণ স্বরূপের উপাসনা বা উপলব্ধি করিতে পারে না। বাসনা, কামনা, দ্বেষ, দ্বন্দ্বের অঙ্কুর থাকিলেও নির্গুণ 'অবাঙমানসগোচরে'র ধ্যান ধারণা সম্ভব নহে। ভারতীয় ব্রাহ্মণদের পরব্রহ্মের ধ্যান ধারণা সম্বন্ধে গ্রীক পণ্ডিত মেগাস্থিনিস কি লিখিয়াছেন শুনুন :—"তাঁহাদের (দার্শনিক ব্রাহ্মণ) উপর জ্যোতির্ম্ময়

কিন্তু এই আলোক আমাদের পরিদৃশ্যমান আলোক অথবা সূর্য্য অগ্নির জ্যোতিঃ নহে। তাঁহাদের ঈশ্বর শব্দময়; এই ঈশ্বর স্ফূর্ত্তবাক্য নহেন, তত্ত্বজ্ঞান-লব্ধ বাণীমাত্র।.....এই যে আলোক শব্দ নামে কথিত এবং পরমেশ্বররূপে পরিত। তাহা কেবল ব্রাহ্মণের নিকটই প্রকাশিত হয়; কারণ তাঁহারা অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়াছেন। অহঙ্কার আত্মার আবরণ।"

(প্রাচীন ভারত)।

ইহা অবশ্য গীতার কথারই পুনরুক্তি। গীতা বলিয়াছেন:—

(আত্মা) নিত্য, স্থির, আদি নাই অব্যক্ত কেবল, চিন্তাতে না পায় কেহ, না পায় দর্শন। (২অ)

এরূপ অব্যয়পদ লভে যেই জন।
না লভে জনম সেই তত্ত্ববেত্তাজন॥
চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি যাহা না করে প্রকাশ।
ব্রহ্মপদ তাহা হয় স্বয়ং প্রকাশ॥ (১৫শ অ)

(গীতার বঙ্গানুবাদ।)

আত্মা—"অজ নিত্য, সর্ব্বব্যাপী অতীব পুরাণ"। অজ অর্থ জন্মহীন এবং নিত্য অর্থাৎ মৃত্যুরহিত। জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ এই ষড়টী বিকার সাধারণতঃ দেহেতেই হয়। আত্মার এ সব কিছুই নাই। আত্মা এই ষড় বিকার-রহিত।

"এইরূপ আত্মজ্ঞান জন্মিয়াছে যাঁর,
কিরূপে করেন তিনি কাহার সংহার"।

আবার শ্রুতি বলিয়াছেন—"যিনি আত্মাতে সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন এবং যিনি সর্ব্বভূতে আত্মাকে দর্শন করেন, তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না; কারণ তাদৃগ্‌দর্শনিদিগের তাহার মোহ ও পাপ নষ্ট হইয়া গিয়াছে"।

(প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্রম্)।

জিজ্ঞাস্য করি, বর্ত্তমানের "সোঽহং" বা ব্রহ্মাত্মবাদীদের (অহিংস অসহযোগী) মধ্যে কয়জন এইরূপ আত্মজ্ঞানের রসাস্বাদ অনুভব করিয়াছেন বা কয়জনের আত্মজ্ঞানের প্রসার হইয়াছে? উপনিষদ বলিয়াছেন, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" বলহীন কাহাকে বলা যায়? গীতার তাহার এ শ্লোকের অর্থ এরূপ করা যায় যে—

"যার মোহ অহঙ্কার না থাকিবে আর,
আসক্তি শূন্য হয়ে পরমার্থ বিচার ॥
সুখ দুঃখে সমজ্ঞান নিষ্কাম যে হয়,
তিনিই অব্যয়পদ লভেন নিশ্চয়" ॥ ১৫শ অ।

(গীতার বঙ্গানুবাদ)।

মোট কথা হইতেছে—"সোঽহং" বা "স্বরাজ"-বাদের সাধনা হইতেছে যাইতে নিবৃত্তিমার্গের সাধনা, প্রবৃত্তি থাকিতে নিবৃত্তিমার্গে যাওয়া যায় না। যাহারা চান তাহারা ভ্রান্ত, কপট। 'মুখে এক, কাজে আর' এই নীতিতে অনুসৃত বলিয়াই দেখা যাইতেছে যে, রামমোহন রায়ের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর যাবতীয় সদনুষ্ঠানই অসদনুষ্ঠানে পরিণত হইতেছে। উপনিষদের স্বরাজ সাধনার ভাবটা হইতেছে অনেকটা "মরার আগে, মরে যাওয়া" রকমের। প্রবৃত্তিকে বশে রাখিতে হইবে, দেব-বিজয়ে দিগ্বিজয়ী হইতে হইবে, আত্মজয়ী হইতে হইবে। ব্যষ্টি আত্মাকে বিরাট ব্রহ্মচৈতন্যে লয় করিতে হইবে। ইহাই "সোঽহং" নীতির প্রধান ও প্রথম কথা। (এ ভাব হইয়াছিল শুকদেবের)। তাহার জন্য "অহিংসযোগের" সাধনা চাই। এই অহিংস যোগের' প্রথম প্রচারক ছিলেন ঋষভমুনি। তার পর ইহার পুনঃপ্রচার করেন মহাবীর বা জিন। যিনি আত্মজয়ী তিনিই জিন, তিনিই স্বরাজ বা স্বরাট হইয়াছেন। 'অহিংস অসহযোগের' সাধনা মানে প্রেমের দ্বারা ঘৃণাকে, সহানুভূতি দ্বারা বিদ্বেষকে জয় করা। কায়মনোবাক্যে কাহাকেও ঘৃণা বা আঘাত না করাই হইতেছে 'অহিংসা'। একদিকে যেমন হিংসার সহিত বিয়োগ সাধন, অন্যদিকে আত্মার সহিত যোগসাধন বুঝায়। আর আত্মার সহিত যোগ ও আত্মাতে রমণ করিতে করিতে আত্মারাম (আত্মরাজ) বা স্বরাটই (স্বয়াজ) হওয়া যায়, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অহিংস যোগের গাঁথনা না করিয়াই যাঁহারা বলিতেছেন, 'ব্যক্তিগত স্বরাজ লাভ করিয়াছি" বা 'তত্ত্বমসি সোঽহং' হইয়াছি' তাহারা 'স্বরাজ ও সোঽহং' নামেই কলঙ্ক আসিতেছেন, মহাত্মা গান্ধীর নামে কলঙ্ক আরোপ করিতেছেন। তাঁহারা মুখে বলিতেছেন "ব্যক্তিগত স্বরাজ লাভ করিয়াছি' কিন্তু কার্য্যতঃ হিংসাতৎপরতাই দেখাইতেছেন। তাহা ছাড়া নেতায় নেতায় বিরোধ ও প্রাধান্যের সংগ্রাম চলিতেছে। তুল্য নিন্দাস্তুতি সমজ্ঞান সম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত এ বিরোধ থাকিবেই বটে, আর সত্য বনাম অসত্যের দোহাই রাষ্ট্র হইবেই। বাঙ্গালীর নীতি ইহাও বটে

স্বরাজ বা নির্ব্বাণমুক্তির বাধক। ওটী পোকা যেমন আপন গুটীর মধ্যেই আপনাকে জড়াইয়া রাখে বা আবদ্ধ থাকে, আমাদের আত্মাও নিজকৃত মনোময়কোষে আবদ্ধ থাকে, অথবা বাসনা জালে নিজকে নিজেই জড়াইয়া রাখে। এজন্যই পণ্ডিতেরা উপদেশ দিয়া থাকেন, আগে মনকে লয় কর। জীবন্মুক্তি বা নির্ব্বাণ একার্থবোধক শব্দ। নিঃ (নাই) বাণ অর্থাৎ অভিলাষ যাহার, তাই নির্ব্বাণ। এই নির্ব্বাণ যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনিই স্বরাজ্যে স্বরাট হইয়াছেন।

উপরে যে প্রেমানুভূতি বা আত্মজ্ঞান-সঞ্চারের কথা অর্থাৎ একাত্মানুভূতির কথা বলা হইল, ক্রমে সেই ভাবের বিচারাভ্যাস দ্বারা জীব-জ্ঞান বা দেহাত্মজ্ঞান দূর হইলেই উপলব্ধি হইবে যে, আমিই ব্রহ্ম—অসীম, অনন্ত সর্ব্বব্যাপী। আমিই পশু পক্ষী কীট পতঙ্গরূপ অনন্তদেহ ধারণ করিয়া নানাভাবে নানারূপে ক্রীড়া করিতেছি। আমিই এখন চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র, আমিই জল, স্থল, বায়ু তেজরূপে বিরাজিত। ওঁ তৎ সৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্। আমার মধ্যে জগৎ, জগতের মধ্যে আমি। আমার জন্ম মৃত্যু আদি নাই, অন্ত নাই, ক্ষয় নাই, বৃদ্ধি নাই, সুখ নাই, দুঃখ নাই, স্ত্রী-পুত্র পরিবার নাই, স্বদেশ নাই, বিদেশ নাই। আমিই ব্রহ্মাণ্ডময় প্রসারিত। আমি সর্ব্বভূতাত্মরূপী। আদি মধ্য অন্ত আমি, আমিই সৃষ্টি স্থিতি, লয় ও ধারণ করিতেছি; আমা ছাড়া আর কিছুই নাই, প্রপঞ্চ জগৎ আমার মধ্যেই অবস্থিত। বায়ু যেমন সর্ব্বগামী হইলেও আকাশের মধ্যেই অবস্থান করিতেছে সেইরূপ এই বিশাল প্রকাণ্ড হইলেও আমার মধ্যেই অবস্থান করিতেছে। অস্ত্র আমাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি আমাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল আমাকে আর্দ্র করিতে পারে না, বায়ু আমাকে শুষ্ক করিতে পারে না। আমিই হন্তা, আমিই হত, আমিই চোর, দস্যু, ব্যভিচারী, আমিই সাধু 'সন্ন্যাসী' ব্রহ্মচারী। এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়াই সোঽহং স্বামী ওঙ্কারানন্দ বলিয়া গিয়াছেন যে, ইহাই আমার (সোঽহং ব্রহ্মের) পূর্ণ বিকাশ বা যৌবন অবস্থা, ইহাই ব্রহ্মের সৃষ্টিভাব তারপর সৃষ্টি-জ্ঞান যখন লয় হয়, তখন আমি নির্গুণ সুতরাং সে স্থানে আর কল্পনা নাই। পৃথিবী, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, জীব জন্তু কোথায় বিলীন হইয়া যায়, সকলই লোপ হয়, আমি কেবল "আমি" নির্গুণ চিন্ময় আত্মসত্বিৎ মাত্র, ইহাই আমার বৃদ্ধাবস্থা বা সঙ্কোচাবস্থা। তাহা কিরূপ?

"আকাশমিব নির্লেপাং নিত্যপ্রপঞ্চাং নিরক্ষরাম্"

প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রম্।

কবীর।

সূরদাস এবং তুলসীদাসের জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে যে সকল কবি হিন্দীর পূর্ব্বাবস্থিতিকালে স্বীয় রচনাসমূহ দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভাটকবি চন্দ বরদাঈ, মৈথিল কবি বিদ্যাপতি ঠাকুর এবং কবীর প্রধান। চন্দ বরদাঈ প্রাকৃত মিশ্রিত হিন্দীতে ও বিদ্যাপতি ঠাকুর মিথিলার দিকে প্রচলিত হিন্দীতে কাব্যাদি রচনা করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহারা যে বর্ত্তমান হিন্দীর সূত্রপাত-কারক পরকীয় নহেন তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। কবীরের রচনার সহিত মধ্যকালীন হিন্দীর অনেক বেশী মিল আছে, তজ্জন্য মিশ্রবন্ধুগণ তাঁহাকেই বর্ত্তমান হিন্দীর সূত্রপাতকারক বলিয়াছেন, মিশ্রবন্ধুগণের এই যুক্তি সমীচীন বোধ হওয়ায় আমিও এই মত গ্রহণ করিলাম।

কবীরের জীবনের বিষয় কিছু লিখিতে গিয়া মাইকেলের একটী কবিতার কিয়দংশ স্মরণপথে উদিত হয়, সেই কবিতাংশটী এই—

কে জানে,
কোন কূলে কোন স্থানে জন্মিলা সুমতি।

কবীরদাসজী কোন সময়ে জন্মিয়াছিলেন, বিবাহ করিয়াছিলেন কিম্বা করেন নাই, কোন সময়ে পরলোক গমন করিয়াছিলেন প্রভৃতি কিছুই নিশ্চয়রূপে জানা যায় না অথবা যৎসামান্য যাহা কিছু জানা যায় তাহা অপর্য্যাপ্ত এবং পরস্পর-বিরুদ্ধ। 'কবীর কসৌটী' নামক পুস্তকপ্রণেতার মতে কবীরদাস ১৪৫৫ বিক্রমাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৭৫ বিক্রমাব্দে দেহধারীর চরমগতি লাভ করেন, কোন কবির-পন্থীদিগের মতে তিনি ১২০৫ বিক্রমাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩১০ বৎসর বাঁচিবার পর ১৫০৫ বিক্রমাব্দে মহাপ্রয়াণ করেন এবং কবীরপন্থী বিদ্বানদিগের মতে কবীর দাস ১৪৫৫ বিক্রমাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১২০ বৎসর বাঁচিবার পর ১৫৭৫ বিক্রমাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কবীরদাসজী যে স্বামী রামানন্দের শিষ্য ছিলেন তাহা স্থির নিশ্চিত, রামানন্দ স্বামী ১৪২৫ বিক্রমাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন অতএব তাঁহার শিষ্য কবীরের জন্ম ১৪৫৫ বিক্রমাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে হইয়া থাকাই বেশী সম্ভব এবং 'কবীর কসৌটী'রও এই মত। অতএব ১৪৫৫ বিক্রমাব্দকেই কবীরের জন্মাব্দ

এবং ১৫৭৫ বিক্রমাব্দকেই কবীরের মরণাব্দ মানিলে ভুল হইবে না অথবা খুব কম ভুল হইবে।

কবীরদাস নিজের আদিগ্রন্থে একস্থানে লিখিয়াছেন।

"তু ব্রাহ্মণ মর কাশীকা জুলহা বুঝহু মোর গিয়ানা" অর্থাৎ তুমি ব্রাহ্মণ কিন্তু আমি কাশীর মুসলমান তাঁতি মাত্র, অতএব আমার যে জ্ঞান লাভ তাহা হইতেই অনুমান করিয়া লও। এই লেখা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কবীরের তাঁহার বাড়ী ছিল এবং তিনি বাল্যে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন তবে তাঁহার জন্মদাতা মাতা পিতা মুসলমান ছিলেন না। কবীরের জন্ম সম্বন্ধে লোকমুখে একটী গল্প প্রচলিত আছে, সেই গল্পটী নিম্নে পাঠকদিগের অবগতির নিমিত্ত দেওয়া হইল।

একটী ব্রাহ্মণ বিধবার গর্ভে একটী পুত্র উৎপন্ন হয়, পুত্র উৎপন্ন হওয়াতে বিধবা ব্রাহ্মণী লোকলজ্জাবশতঃ কাশীর লহরকুণ্ড নামক একটী পুষ্করিণীর তীরে পুত্রটীকে ফেলিয়া দেন। বলা বাহুল্য কবীরই এই ব্রাহ্মণ বিধবার গর্ভে উৎপন্ন পুত্র, কবীর যেখানে লহরকুণ্ডের তীরে পড়িয়াছিলেন, সেইখানে নিরু নামক একজন মুসলমান তাঁতি তাহার স্ত্রী নীমার সহিত যাইতেছিল। পথ দিয়া যাইতে যাইতে কবীরের ক্রন্দনে তাহাদের দৃষ্টি কবীরের দিকে আকৃষ্ট হইল ও শিশুটীকে দেখিবা মাত্র নীমার পছন্দ হইল এবং অপুত্রক হওয়াতে নীরু শিশুটীকে গৃহে লইয়া যাইতে আজ্ঞাদান করিলে পর নীমা তাহাকে গৃহে লইয়া গিয়া পুত্রের ন্যায় পালন করিতে লাগিল এবং কবীর নাম দিয়া তাহাকে নিজে পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ করিল।

কবীরের জীবনী-লেখকগণ সকলেই বলেন যে, কবীর বাল্যকাল হইতেই সুশীল, ধর্ম্মপরায়ণ এবং রামভক্ত ছিলেন, বলা বাহুল্য মাত্র উহা তাঁহারা কোন প্রকারপ্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বলেন না; কেবল নিছক অনুমানের উপরই নির্ভর করিয়া বলেন।

স্বামী রামানন্দের শিষ্যদিগের মধ্যে কেবল কবীরই যে কবি ছিলেন তাহা নহে, সেননাই এবং ভবানন্দও উচ্চদরের কবি ছিলেন তবে তাঁহারা কবীর হইতে নিকৃষ্টতর। জনশ্রুতি আছে যে, কবীর নীচজাতীয় ছিলেন বলিয়া স্বামী রামানন্দ কবীরের বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁহাকে শিষ্য করিতে স্বীকৃত হন নাই। কবীরের ধারণা ছিল উপযুক্ত গুরু বিনা মোক্ষ অসম্ভব এবং স্বামী রামানন্দের ন্যায় গোপ্য গুরু দুর্লভ দেখিয়া তিনি কৌশলে রামানন্দের

শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে মনস্থ করিলেন। রামানন্দ স্বামী প্রত্যহ রাত্রিশেষে যে মণিকর্ণিকা ঘাটে গঙ্গাস্নান করিতেন তাহা কবীরের জানা ছিল; তজ্জন্য তিনি একদিন স্বামী রামানন্দ ঘাটের যে দিক দিয়া গঙ্গায় নামিতেন সেই দিকের সিঁড়িতে শুইয়া রহিলেন। রাত্র শেষের স্বামী নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়া নামিতে গিয়া স্বামীজীর পা কবীরের গায়ে ঠেকিল—রামানন্দ মনে করিলেন শবে পা ঠেকিয়াছে তজ্জন্য তিনি কবীরের শরীরে কমণ্ডলু হইতে গঙ্গাজলের ছিটা দিয়া মৃত ব্যক্তির সদ্গতি প্রার্থনা করিয়া বলিলেন "রাম রাম কহ, রাম রাম কহ" অর্থাৎ রাম রাম বল, রাম রাম বল। রামানন্দ এই যে "রাম রাম কহ—রাম রাম কহ" বলিলেন, কবীর তাহাকেই কর্ণে প্রদত্ত গুরুমন্ত্র মনে করিয়া লইলেন এবং রাম রাম জপ করিতে সেইদিন হইতে আরম্ভ করিয়া দিলেন ও কিছুকাল পরে সিদ্ধিলাভ করিলেন।

কবীরদাস বিবাহ করিয়াছিলেন কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে, কেহ কেহ বলেন লোঈ নামক এক জন স্ত্রী তাঁহার সহিত বাস করিত বটে, তবে কবীর তাহাকে বিবাহ করেন নাই। জনৈক কবি বলিয়াছেন "বূড়া বংশ কবীরকা উপজে পুত কমাল" অর্থাৎ কমাল পুত্র উৎপন্ন হওয়াতে কবীরের বংশ ডুবিয়া গেল. ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে কমাল নামে কবীরের একটী পুত্র ছিল। অনেকে বলেন, কমাল কবীরের ঔরসজাত পুত্র ছিল না; লোঈ তাহাকে কুড়াইয়া পাইয়া পালন মাত্র করিয়াছিল—কমাল কবীর কিম্বা লোঈ কাহারও ঔরস বা গর্ভজাত পুত্র ছিল না, কিন্তু আমার মনে হয় একথা নিতান্ত অসার, কারণ কমাল যদি কবীরের ঔরসজাত পুত্র না হইতেন তাহা হইলে কবি কদাচ 'উপজে পুত কমাল' এবং 'বূড়া বংশ কবীরকা' এইরূপ বলিতেন না। অতএব কমাল যে কবীরের পুত্র ছিলেন তাহা বোধ হয় না বলিলেও চলে, তবে কমালের মাতাকে কবীর বিবাহ করিয়াছিলেন কি না এবং লোঈই তাহার মাতা ছিলেন কি না তাহা বিচারসাপেক্ষ। যে কবীর জগৎকে ন্যায় এবং ধর্ম্মের পাঠ পড়াইতেই আসিয়াছিলেন এবং বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত রামভক্ত ছিলেন, তিনি যে পরস্ত্রীতে অথবা তাঁহার সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ স্ত্রীতে পুত্র উৎপন্ন করার ন্যায় নীতি এবং ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা কোন ক্রমেই বিশ্বাস করা যায় না এবং যদি বা এরূপ করিতেন তাহা হইলে ইহা সুনিশ্চিত ভাবে বলা যাইতে পারে যে, আজ ভারতের যত্র তত্র কবীরের লক্ষ লক্ষ শিষ্য দেখা যাইত না। লোঈ কবীরের সহিত

বাস করিতেন এবং তিনিই কমালকে পালন পালন করিয়াছিলেন। অতএব কবীর যে লোঈকেই বিবাহ করিয়াছিলেন তাহাই অধিক সম্ভব।

কবীরপুত্র কমালও পিতার ন্যায় একজন কবি ছিলেন—কবীরের ধার্ম্মিক সিদ্ধান্তসমূহের সহিত তাঁহার ধার্ম্মিক সিদ্ধান্তসকল মোটেই মিলিত না, তজ্জন্য তিনি আজীবনকাল পিতার সিদ্ধান্তসমূহ খণ্ডন করিতেই অতিবাহিত করেন, তাই একজন রসিক কবি বলিয়াছেন "বূড়া বংশ কবীরকা উপজে পুত কমাল"। শুনা যায় কমাল পুত্র ব্যতীত কবীরের কমালী নামে একটী কন্যাও ছিল।

কবীরদাসজী অত্যন্ত সত্যবাদী, অতিথিপরায়ণ এবং সদাচারী ছিলেন—এক কথায় বলিতে গেলে একজন মহাপুরুষের মধ্যে যেসকল গুণের বিদ্যমানতা আবশ্যক কবীরের মধ্যে সে সকল গুণই ছিল। এসম্বন্ধে লোকমুখে একটী গল্প প্রচলিত আছে—তাহা সত্য হউক অথবা অসত্য হউক, কবীর যে সদ্‌গুণসমূহের খনিস্বরূপ ছিলেন তাহা গল্পটী হইতে খুব ভাল করিয়া বুঝা যায়। গল্পটী এই—

একদিন বিশ পঁচিশ জন ফকির কবীরের গৃহে অতিথি হইলেন, কবীর সাধারণ গৃহস্থ মাত্র ছিলেন—একসঙ্গে বিশ-পঁচিশ জন অতিথিকে ভোজনাদি করাইবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না, তজ্জন্য তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। গৃহিণী লোঈ কবীরকে চিন্তিত দেখিয়া এবং চিন্তার কারণ বুঝিতে পারিয়া কবীরকে করজোড়ে বলিলেন "প্রভো! যদি আজ্ঞা করেন ত আমি এখনি একজন শেঠপুত্রের নিকট হইতে আবশ্যকোপযোগী টাকা চাহিয়া আনি—রাত্রিকালে গোপনে তাহার সহিত দেখা করিব বলিলেই সে অনেক টাকা দিয়া দিবে কারণ সে মূঢ় আমার রূপে মুগ্ধ।" কবীর লোঈএর কথা শুনিয়া যেন অকূল পাথারে কূল পাইলেন, তিনি পরের কথাগুলির বিষয় কিছুই না ভাবিয়াই বলিলেন "যাও, যত শীঘ্র পার টাকা লইয়া আইস।" পতির আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র পতিপরায়ণা লোঈ শেঠপুত্রের নিকট টাকা চাহিতে চলিয়া গেলেন।

টাকা লইয়া লোঈ ফিরিয়া আসিলে পর কবীর অভিথিদিগকে ভোজনাদি করাইয়া সন্তুষ্ট করিলেন, সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া ফকিরগণ কবীরকে এবং লোঈকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। এদিকে রাত্রি উপস্থিত হইল—কবীরের দিনের বেলার সমস্ত কথা মনে পড়িয়া গেল। তিনি লোঈকে ডাকিয়া বলিলেন "লোঈ! তুমি শেঠপুত্রের সহিত রাত্রিকালে গোপনে দেখা করিবে বলিয়া টাকা আনিয়াছিলে কিন্তু কৈ রাত্রি ত উপস্থিত তুমি এখনও তাহার নিকট গেলে না? সতীভ্রেষ্ঠা লোঈ কবীরের এই কথা

কবীর দ্বৈতবাদী ছিলেন না, তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই কথা সর্ব্বদা সহিত্ত মনে করিতেন এবং প্রচার করিতেন। হিন্দু অথবা মুসলমান যে কোনটি তিনি সত্যের বিরুদ্ধে কোন কথা দেখিতেন, তাহা একাকার করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিতেন না, এবং তিনি নিজের মত-স্বাতন্ত্র্য রক্ষা হিন্দু এবং মুসলমান উভয় ধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষেই উন্মুক্ত রাখিয়াছিলেন। তিনি মূর্ত্তি পূজার ঘোর বিরোধী ছিলেন, তবে ভগবানের অবতার হওয়ার বিশ্বাস করিতেন এবং তিনি শব্দাবলী নামক গ্রন্থের একস্থানে নিম্নোক্ত সত্যলোকবাসী প্রভুর দূত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

কবীরের নামে যে সকল গ্রন্থ প্রসিদ্ধ তাহা কবীরের লিখিত নহে, কবীর কবিতা এবং ভজনাদি রচনা করিয়া গাইয়া যাইতেন এবং তাঁহার শিষ্যেরা তাহা তখনই কণ্ঠস্থ করিয়া লইতেন পরে তাহা তাঁহাদের মরনের পর তাঁহার শিষ্যগণ-কর্ত্তৃক সংগৃহীত হয়। কবীরের রচিত বিভিন্ন গ্রন্থের মোট পাঁচখানি গিয়াছে, তন্মধ্যে বীজক গ্রন্থে কবীরপন্থীগণ অত্যন্ত আস্থা স্থাপন করিয়া থাকেন। তাঁহার রচিত ভজনাদি উত্তরভারতের হিন্দী-ভাষী অঞ্চলে সাধারণতঃ গীত হয় এবং লোকে তাহা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত শুনে। তাঁহার নীতি-কথা গুলি মর্ম্মস্পর্শী এবং তাঁহার ভাষা বেশ ভাল।

সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, মগহরে মরিলে নরকে যাইতে হয় কিন্তু যে ধর্ম্মের প্রচারক কবীর তাহা মানিবেন কেন? তিনি মৃত্যুর সময় কাশী হইতে মগহরে চলিয়া যান এবং সেইখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। কথিত আছে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার শব লইয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয়, হিন্দুগণ বলেন—কবীর হিন্দুর পুত্র না হইলেও তাঁহার মন হিন্দু ছিল এবং তিনি রামভক্ত ছিলেন; অতএব আমরা তাঁহাকে দাহ করিব। মুসলমানেরা বলিলেন—কবীর কদাচ হিন্দু ছিলেন না, কারণ তিনি 'খুৎপরস্ত' (মূর্ত্তিপূজক) ছিলেন না। হিন্দু ও মুসলমানে যখন এই প্রকার বাক্‌বিতণ্ডা হইতেছিল তখন কেহ কবীর দাসের শবের আচ্ছাদনবস্ত্র খুলিয়া দিয়ে দেখা গেল যে, শব আদি কিছুই নাই, কেবল কতকগুলি ফুল পড়িয়া আছে। হিন্দু এবং মুসলমানেরা পরস্পর সেই ফুল অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক বণ্টন করিয়া লইলেন—অর্দ্ধেক ফুল হিন্দু কাশীতে মহাসমারোহে দাহ করিলেন এবং অপর অর্দ্ধেক ফুলকে মুসলমানেরা মগহরীভি কবর দিলেন। যে কবীর ভারতবর্ষে হিন্দু এবং মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী-দিগকে একতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যু

কালে হিন্দু এবং মুসলমান যে ঘনিষ্ঠ হওয়া, ইহাদের অভিপ্রেত ছিল না। কবীর হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একতা স্থাপন করিতে ১৫০ বৎসর প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সফল হন নাই, যেমনকার সেইখানেই পড়িয়া রহিল।

শ্রীমন্মথনাথ গুপ্ত।

কবিতা-সুন্দরী।

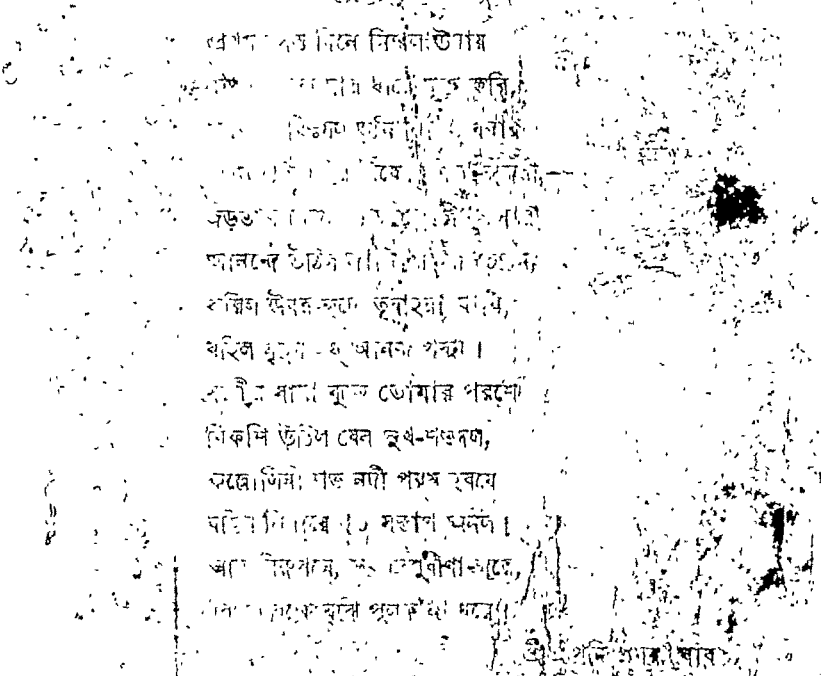

আশীর্ব্বাদ

(১)

"এ ছোকরাই বে খুড়োর আশ্রিত, ব্যাপার কি ?"

"ব্যাপার কিছু নয় বাবা। এই সকালে একটু বেড়াতে এসে এ একটী"

"দেখ আজ আমায় সুপ্রভাত বলতে হবে। আ মোটর ষ্টার্ট দিতে বল বসুন। ওকে সুদ্ধ তাহাকে নিয়ে যা।"

"থাক্ থাক্ জ্যাঠা। এতটা আমি নিজের ইচ্ছে অনিচ্ছে ব্যস্ত হ'য়ে কেন করি ?

"না, না, আপনি বেড়াবেন বই কি ? বসিয়ে রইলুম।"

"এই যে ছুটি। তা এক কাজ কর, তুই ওকে নিয়ে যা। তোমার আপত্তি করবেন।"

"ঠাকুরপুকুর আজ তোমাদের ফোটের মিটিন্ হবে। তোমরা কি যাবে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তা বাবা তোমরা তো ভদ্রলোক সকলেরই। তোমরা একটি কাজ করে সংকল্প তোলাই। একটু ইতিহাস ঘেঁটে আমার ভোলানাথ।"

"তা—তো—পড়বেই—তা—তো—পড়বেই—"

"আ, তাই তো উচিত বাবা। তোমরা ধনীর দুলাল চাইবে বুঝে বাবা। সুবিধে তো আমাদের কোনো ভোমরা ফেলে দেবে ?"

"আমি তা দিতে হবে বৈকি। আমি আ ক্ষতি তোমরা ফেলে দেবে।"

"কি ভোমরা আর একটা কথা বলে যাবে না।"

"তুমি আমি ক্ষতি তোমরা"

"সম্ভব হয় রাখব বৈকি।"

"ছিদে রাইসের ঘরে আমার তো বাস গঠাতে হ'ল। একখানা ঘ- চবেছি, তার দেওয়াল শেষ হ'য়ে গেছে, বাকী কেবল চাল ছাওয়া। ছি বেটা বেশ ভাল ঘরামী। তাকে কত খোসামুদি করছি তা বেটা কিছুতেই কাজে লাগ্‌ছে না। কেবলই বলে, আমি আগে থেকে অনেকের কাজ হাতে নিয়েছি, সেগুলো না সেরে কি করে আপনার কাজে হাত দিই? দেখ বাবা ছোটলোক বেটার আস্পর্দ্ধা। বেটার ষোল আনা দেমাক হ'য়েছে। দাওনা ঐ বেটার উপর মোটা টেক্‌সো ফেলে জব্দ করে। তোমাদের দয়াতেই এই গ্রামে বাস, তোমাদের খেয়েই মানুষ। এখন তোমরা থাকতে যদি গ্রাম ছেড়ে যেতে হয় তাই তোমরা দেখ।

"শুনেছি কতগুলো ছোটলোকের বড়ই আস্পর্দ্ধা হ'য়েছে।"

"সে কথা আর বলো না। সেবারে তোমার বিয়ের সময় তোমাদের বাড়ী গুর্খা একদিন করে বেগার খেটে দিয়ে গেছে, কিন্তু ঐ ছিদে বেটা কিছুতেই যায় না। বলে, একদিন বেগার খাটলে আমার ছেলেপিলে না খেয়ে মরে যাবে। শুনেছ বেটার আস্পর্দ্ধার কথা। জমীদার—তার যদি একদিন না বেগার খাটতে পাইলে তা হ'লে তেমন প্রজার দরকার কি?"

"আচ্ছা থামুন, বেটাকে জব্দ করে দিচ্ছি।"

"শুনেছ, বেটা আবার স্বদেশী হ'য়েছে? জন কতক ছোঁড়ার পরামর্শে বাড়ীতে তাঁত বসাচ্ছে।"

"ওঃ, বেটাকে আবার 'গান্ধী'তে পেয়েছে নাকি? আচ্ছা যাদু, বেটাকে দেখা যাচ্ছে।"

হ্যাঁ বাবা, খুব মোটা টেক্‌সো চাপিয়ে দাও বেটা গড়িয়ে পড়বে এখন।"

(২)

স্বায়ত্ত-শাসনের প্রথম সোপানস্বরূপ ভারত গবর্ণমেণ্ট যখন 'ইউনিয়ন-বোর্ড' গঠনী সৃষ্টি করিলেন তখন হাওড়া জেলার শ্যামপুকুর গ্রাম একটী কেন্দ্রস্থান হইয়া গেল। ইউনিয়ন-বোর্ডের সভ্যগণ দেশের লোকের রাস্তা ও গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক মনোনীত হইয়া পথ-ঘাটের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন, পুষ্করিণী খনন করিবেন, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন ও দেশে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। এই হইল তাঁহাদের কার্য্য। এই সমস্ত কার্য্যের জন্য অর্থের প্রয়োজন ও তাহাই দেশের লোকের নিকট হইতে তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে।

সেই জন্য ট্যাক্সের সৃষ্টি। সভ্যগণ এক সঙ্গে বসিয়া প্রথমে আয়-ব্যয়ের টাকা নির্দ্ধারণ করিবেন।

নটবর রায় শ্যামপুকুরের জমীদার। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র গুণধর পিতার আসনে বসিয়া জমীদারী চালাইতে লাগিলেন। ইউনিয়ন বোর্ডের সৃষ্টির পর দেশের লোকের দ্বারা গুণধর সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া পরে সভ্যগণের দ্বারা বোর্ডের সভাপতির পদ প্রাপ্ত হইল।

ট্যাক্সের তালিকা প্রস্তুত হইয়া প্রত্যেক গ্রামে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইল। গ্রামবাসিগণ তালিকা দেখিয়া অবাক্। তাহাদের চৌকীদারী ট্যাক্স যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা প্রত্যেকেরই প্রায় তিন চার গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। অনেকে আপনা আপনি আপত্তি করিতে লাগিল, কিন্তু সভায় কোন আপত্তি পৌঁছিল না।

শ্যামপুকুরের সাধারণ দুই চার ঘর ছাড়া সমস্ত বাসিন্দাই গরীব ও অশিক্ষিত। তাহারা জমীদার বাবুর নিকট যাইয়া আপত্তি করিতে সাহসী হইল না। ছিদামের ট্যাক্স পড়িয়াছে চারি টাকা। সে ছাড়িবার পাত্র নয়। সে বাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল "হুজুর আপনি তো আমার অবস্থা সবই জানেন। আমি গোরু আনি, বেচে খাই। চার টাকা টেক্সো কেমন করে দিব?"

"কোন আপত্তিই খাটিবে না, তোকে দিতেই হবে। তুই বেটা গোরু এক টাকা উপার্জ্জন করিস, তাহলে চার টাকা কেন দিতে পারবিনি?

"তাতে হুজুর, মাস ছয়েক গোরু এক টাকা উপায় করি আর বাকীর সাধারণ মতের মত উপায় হয়, তাও আবার সব দিন নয়। সে উপায়ে কি হবে হুজুর, আমরা খেতে যে ছটী প্রাণী।"

"কোন কথা শুনতে চাই না, তোকে দিতেই হবে।"

"আপনি বিবেচনা করে দেখুন আমি কোথা থেকে দিব। আমার ঘটী বাটী বা ছিল, ছেলেটার অসুখের সময় সমস্তই—হাতে পায় মহাজনের কাছে বন্ধক পড়েছে। এর উপর টেক্সো দিতে হ'লে আধ পেটা না খেয়ে দিতে হবে। তার এক রকম হ'তো কিন্তু ঐ ছোট্ট ছেলেটিকে না খেতে পেলে যে মরে যাবে হুজুর। হুজুর দয়া করুন, আমার টেক্সো মাপ করে দিন, আমি কিছুতেই দিতে পারব না।"

"না দিতে পারিস, তোর স্থাবর অস্থাবর ক্রোক করে আদায় করব।"

ওপাশের আচরণে হিদায়েত অত্যন্ত বিরক্তিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সে বলিয়া ফেলিল—"আচ্ছা তাই সে বেন হুজুর"—বলিয়াই সে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

ক্রোধে ওপাশের তারা দুইটা জ্বল জ্বল করিয়া উঠিয়া উপযুক্ত শাস্তি দিবার নিদর্শন দেখাইয়া দিল।

প্রাতঃকালে না মাল-বাড়ি করিয়া কেহ পরিষারের বাউটা, বাজু, বাটী, বন্ধক দিয়া টাকা আদায় দিতে লাগিল। সকলেই চোখের জলের সহিত ইউ-হিদ্দ বোডের পায়ে টাকা উপহার দিতে লাগিল।

হিদায়েত সাহেব দিবার কোন উপায়ই স্থির করিতে পারিল না। আদায়-কারী প্রত্যহই তাহাকে তাগাদা করিয়া যায়, কিন্তু সমস্তই বৃথা। তাহার উপর নোটিশ করা হইল যে, যদি সে এক মাসের মধ্যে টাকা জমা দিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি নীলাম করা হইবে। হিদায়েত কাঁদিয়া কাটিয়া পুনরায় ওপাশের নিকট আসিয়া বলিল—'হুজুর, কোন রকমে মোট টাকা জোগাড় করতে পারছি না। আপনি না হয় আমায় চার টাকা করে দিন, আমি বেচে সব শোধ দিব।'

ওপাশ তাহাতে রাজী হইল না।

হিদায়েত বহু একবার অনুরোধ করিল যে, তাহার উপর দয়া করিয়া ট্যাক্স রদ না করিলে অন্ততঃ দুই কমাইয়া দিলে সে কিছুতেই দিতে পারিবে না।

ওপাশ অত্যন্ত চটিয়া উঠিয়া বলিল—'তুই বেটা পাজি বজ্জাত। চার টাকা ট্যাক্স তোর কিছুতেই বেশী নয়, তুই কেবল পেজমো করছিস্।

"হুজুর আপনিই বিবেচনা করুন—আমার মহাজন ইরান রায়, তাঁর কাছে আমার সব বন্ধক, তাঁর টেক্সো এক টাকা, আর আমার চার টাকা, এটা কি ঠিক হয়েছে হুজুর?"

মুখের উপর অত বড় সত্য কথাটা বলিতে হিদায়েতের কোনরূপ দ্বিধা না হওয়ায় ওপাশের আগুনের মত দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া তাহাকে অপমানসূচক কর্কশ ভাষা করিতে করিতে তাড়াইয়া দিল।

হিদায়েত বাড়ী ফিরিয়া মনে মনে যুক্তি করিতে লাগিল যে কোন উপায়ে চারটাকা জোগাড় করিয়া দেওয়া যায় কি না। কিন্তু কোন পথই সে দেখিতে পাইল না। একবার ইচ্ছা করিল যে, ছেলেমেয়েদিগকে চারদিন উপবাসে রাখিয়া

ঐ টাকা পরিশোধ করিবে, কিন্তু সে কথায় তুচ্ছ অশ্রু আপনা হইতেই তাহার চোখ বহিয়া গড়াইয়া পড়িল। সে একবার অশ্রুপূর্ণ নেত্রে উপর দিকে চাহিয়া বলিল—"কেন আমায় এত গরীব করে পাঠিয়েছিলে ঠাকুর?" তখনি তাহার মনের মধ্যে যেন কি একটা শক্তি জাগিয়া বলিয়া দিল—ছেলেদের না খাইয়ে আমি টেক্সো দিতে পারব না; তা'তে আমার যা হয় হউক।

নোটিশের নির্দ্ধারিত দিন গত হইবার পর একদিন বোর্ডের চাপরাশী ও আদায়কারী তাহার স্থাবর-অস্থাবর নীলাম করিতে আসিল। তাহারা ছিদামকে ডাকিয়া হুকুম করিল—"তোমরা সব এক কাপড়ে বেরিয়ে যাও।" ছিদাম কোন কথা না কহিয়া নাবালক পুত্রকন্যাগণের হাত ধরিয়া ও স্ত্রীকে লইয়া বাড়ীর বাহির হইয়া আসিল। তাহার মুখে কোন কথা নাই, কেবল অবাধ অশ্রু চোখ ফাটিয়া বাহির হইতেছে। হাজার দুঃখ হইলেও এ যে তাহার নিকট রাজ-অট্টালিকা। কত সুখ-দুঃখের স্মৃতি ঐ গৃহের প্রত্যেকটির সঙ্গে যে জড়িত। তাহাতে আজ ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে—সে নিজেকে কিছুতেই বোধ দিতে পারিল না।

কখন বোর্ডের লোকেরা তাহার গোলপাতার ঘর ভাঙ্গিয়া তাহার সম্পত্তি সমস্ত বাহির করিয়া আনিল। অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে ছিদামের একখানি কাস্তে, একটা আধ-ভাঙ্গা ঘটি, গোটা কয়েক হাঁড়ী কলসী, খান কতক চাটাই ও কয়েকখানা মাত্র ছেঁড়া কাঁথা ও বালিস। ভট্টাচার্য্য খুড়ো বহুক্ষণ দেখিবার জন্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি একটু সহানুভূতি দেখাইয়া ছিদামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলিলেন—কি করবি ছিদে, কপালে যা ছিল তাতো হ'ল। আর দুঃখু করে কি হবে! এখন কি করবি কোথায় যাবি?"

কোথায় যাব তার ঠিকানা নেই, তবে যে ছোকরা বাবুরা আমায় তাঁত বসাবার জন্যে বলেছিলেন তাদের একবার সন্ধান করবো। তাঁরা দেশের লোকের দুঃখু বুঝে, তাঁরা দেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছে। তাঁদের কাছেই ঠিক পরামর্শ পাব।" বলিয়া সে আর বিলম্ব না করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। তখন চাঁদা সংগ্রহে বহির্গত ভলেণ্টিয়ার দলের দূরাগত সঙ্গীত শোনা যাইতেছিল—

"কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ।"

শ্রীপঞ্চানন ঘোষ।

শৈলতট-সুন্দরী।

(১)

তাহার নাম কেহ জানিত না।

পর্ব্বত-প্রান্ত দিয়া নদী বহিয়া যাইতেছে,—নদীর মধ্যে একটী ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য দ্বীপ। দ্বীপের উপর প্রাসাদ,—তাহারই মধ্যে বাস করে "শৈলতট-সুন্দরী"।

তাহার মুখ কেহ দেখে নাই,—সে দেখিতে কেমন তাহা কেহ জানে না; তবুও তাহাকে লোকে বলে "শৈলতট-সুন্দরী"।

নদী বহিয়া যাইতেছে,—দূরে ঐ 'কমলতট' জনপদ, 'কমলতট' প্রাসাদ।

পরস্রোতা প্রবাহিণীর ধারে শস্যক্ষেত্র; বৎসরের ঋতু পর্য্যায়ে নিয়মিতরূপে ফলিতেছে। বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রে কখনও হরিত ধান্যের, কখনও বা সরিষা, মটর প্রভৃতি শস্যের শীর্ষদেশ নীল, স্থির আকাশের নীচে বায়ুভরে আন্দোলিত হইতেছে। কৃষকগণ শস্যক্ষেত্রে বিচরণ করে,—পুলকিত মনে, যথাকালে শস্য কাটিয়া তাহা সংগ্রহ করে।

নদীর মধ্যে দ্বীপ,—তাহার চারিদিকে পুষ্পোদ্যান, দ্বীপস্থ ক্ষুদ্র সরোবরে কুমুদ-কহ্লার, সমস্ত দ্বীপটী বৃক্ষরাজির শ্যামল শোভায় মণ্ডিত।

কিন্তু সেই দ্বীপ নীরব, নিস্তব্ধ—সেখানে কি 'মানবজীবনধারী' কোন জন-প্রাণী বাস করে?

—সেই স্থানেই বাস করে শৈলতট-সুন্দরী।

* * * * *

নদীর সলিল-প্রবাহ দূরে ঐ কমলতট-প্রাসাদের পাদদেশ ধৌত করিয়া,—প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যান-প্রদেশের সন্নিকট দিয়া চলিয়াছে, নদীর ঊর্ম্মিরাশি কখন-কখন প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে উছলিত হইয়া পড়িতেছে। প্রাসাদের উৎসব-উল্লাসের অন্তরাল হইতে রাজপুরুষগণ, বীরপুরুষগণ সেই দৃশ্য দেখিয়া থাকেন,—কেহই জানে না, "কে" থাকে শৈলতট-প্রাসাদে।

নদীর প্রান্তদেশ দিয়া সুন্দর রাজপথ চলিয়া গিয়াছে,—কমলতট-প্রাসাদ

পর্য্যন্ত! নদীপথে যাত্রিক-সম্ভার বহন করিয়া কত নৌকা দূরে যায়, কত নৌকা চক্ষুর্হইয়া চলিয়া যায়,—কমলতট-প্রাসাদ পর্য্যন্ত।

কিন্তু বহুদিন কি কেহ দেখিয়াছে,—কে এই নীরব-দীপ-বাসিনী সুন্দরী!—সুরক্ষ-বেষ্টিত শৈলতট-প্রাসাদের মর্ম্ম-নীরহইতে কোন দিনই তো সে মুখ উঁকি করে নাই,—মুক্ত গবাক্ষ-সমীপে একদিনও তো কেহ তাহাকে দণ্ডায়মানপর দেখে নাই।

* * * *

কেবল প্রত্যূষে, অতি প্রত্যূষে যখন ক্বচিৎ কোন কৃষক শস্য-ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়,—রাত্রিসমাগমে সমস্ত পৃথিবী শুভ্র চন্দ্রকিরণে ভাসিয়া যখন কদাচিৎ কোন কৃষক দিনের পরিশ্রমের পর ক্লান্ত হস্ত গুটীকৃত করিতে থাকে,—তখন তাহারা যেন 'সাহানা' সুনিতে পায়! সেই সঙ্গীত-ধারা শৈলতট-দ্বীপ হইতে বাহির হইয়া দেশ, আকাশ, বায়ু, জল,—তাহার স্নিগ্ধ, মধুর তানে মাতাইয়া তোলে। সেই অবাধ সঙ্গীত কম্পিত নদীবক্ষে প্রতিধ্বনিত হইয়া কমলতট-প্রাসাদকেও জাগ্রত করিয়া তোলে।

বিস্ময়াবিষ্ট শ্রোতা তখন অর্দ্ধ-পরিস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠে,—"ঐ যে, ঐ সুন্দরী!"

(২)

শৈলতট-প্রাসাদের নীরব কক্ষে সে একাকিনী বসিয়া, সে ঐ মৃদুভাবে বসিয়া সে কি-এক অদ্ভুত 'ইন্দ্রজাল' রচনা করিতেছে, তাহা সুধু এই ভূমণ্ডলকেই বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত।

কে-যেন তাহার কর্ণে অস্ফুট অথচ দৃঢ় স্বরে বলিয়া রাখিয়াছে,—পূর্ব্বে কিছুতেই নয়, কমলতট-জনপদের দিক শৈলতট-সুন্দরীকে তাকাইতে নাই, তাহা হইলেই "সেই ভীষণ অভিসম্পাত"!

কি সেই "অভিসম্পাত" তাহা সে জানে না,—কেহ তো তাহাকে কিছুতে কিছু বলে নাই; আর পৃথিবীর কোন্ জিনিষেই বা তাহার প্রয়োজন, যে কিছুর দিকে নাই বা তাকাইল?

তাই অজ্ঞাতে হইতে সে কেবল 'তাল' বুনিতেছে,—ইন্দ্রধনুর বিচিত্র সুষমা সংগ্রহ করিয়া সে একাকিনী তাহার বিচিত্র কারুকার্য্যে নিবিষ্টচিত্ত।

বহির্জগতের কোন জিনিষের উপর তাহার দৃষ্টি নিহিত হইতে পারে,—তাহার দৃষ্টি কক্ষমধ্যেই সীমাবদ্ধ!

মনুষ্য, নদী, জনপদ, বৃক্ষ, রাজপথ যে সব প্রকৃত 'রূপ' সহজ ভাবে তাহাকে দেখিতে নাই,—সে দেখিবে খালি 'ছায়া' খালি 'প্রতিরূপ'।

তাহাকে কিছুরই 'মূর্ত্তি' দেখিতে নাই,—সে দেখিবে কেবল 'প্রতিমূর্ত্তি'

—সমস্ত বর্ষব্যাপী তাহার এই একমাত্র কার্য্য।

তাহার সম্মুখে এক প্রশস্তায়তন, মসৃণ দর্পণ, এমন ভাবে তাহা তাহার কক্ষমধ্যে সন্নিবিষ্ট যে বহির্জগতের দর্শনীয় পদার্থগুলি তাহার মধ্যে সহজেই 'প্রতিনিহিত' হইতে পারে।

এমনি করিয়া বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যায়—পৃথিবীর ঋতুপর্য্যায়, আর প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন, চলৎশীল জগতের দৈনন্দিন কার্য্যপরম্পরা কিছুই স্বাভাবিক দৃষ্টিতে সে দেখিতে পায় না; সে দেখে ঋতুপর্য্যায়ে পরিবর্ত্তনশীল পৃথিবীর,—সমগ্র ক্রিয়ারত জগতের,—প্রতিবিম্ব, খালি প্রতিবিম্ব! সেই দর্পণের ভিতর, আর কোথাও নয়। সেই মুকুর-প্রতিবিম্বিত দৃশ্যমান জগতের চিত্রগুলিই তাহার নানা বর্ণে রঞ্জিত, ঐন্দ্রজালিক রচনার বিচিত্র সূত্র।

দর্পণমধ্যে সে প্রতিবিম্বিত দেখিতে পায় কমলতট-জনপদগামী রাজপথ, কোথাও সরলভাবে কোথাও বক্রগতিতে চলিয়া গিয়াছে, নদীবক্ষে তরঙ্গরাশি কোথাও চক্রাকারে ঘূর্ণিত হইতেছে, স্থলপথে গ্রাম্য কৃষক অবাধ উল্লাসে গতাগত করিতেছে,—লোহিত-পরিচ্ছদপরিহিতা গ্রাম্য কুমারী শৈলতটপ্রদেশ হইতে দূরস্থিত পণ্যবিপণীর দিকে অগ্রসর হইতেছে।—সমস্তই দর্পণে প্রতিবিম্বিত।

সেই দর্পণমধ্যেই সে দেখিতে পায় জীবনের বহু প্রাণস্পর্শী দৃশ্য!—পল্লী বালিকাগণ আনন্দের উচ্ছ্বাসে একত্র দলবদ্ধা; নিকটস্থ ধর্ম্মরাজক বীথিপথে মন্দিরপথে প্রস্থানপর; কুঞ্চিতকেশ রাখাল বালক; দীর্ঘকেশ, বিচিত্র পরিচ্ছদধারী বীর সন্তান। ঐ তো তাহারা নিকটস্থ রাজপথ দিয়াই চলিয়াছে, কতজন বুঝি কমলতট-জনপদের দিকেই যাইতেছে,—ঐ তো কমলতটের প্রাসাদশীর্ষ দর্পণমধ্যে প্রতিবিম্বিত।

সে যেন কোন এক লুপ্তজগতের স্বপ্নচিত্রিত অতীত কাহিনী! তখন বীরপুরুষ অসিহস্তে যুদ্ধ করিতেন,—আর্ত্ত, শরণাপন্নকে উদ্ধার করিবার জন্য, রমণীর জীবন ও ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য, নিজের প্রাণ বিপন্ন করিয়াও জগতে

মানবীর মহত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য। বীরের জীবন-বর্ম্ম তাহার আকাঙ্ক্ষিতা দেবীর পবিত্র নাম-রত্নে সুরক্ষিত খাকিত, তাহার দেহাচ্ছাদনের উপর সেই ভাগ্যবতী রমণীর বাস্তবিক বা কল্পিত প্রতিকৃতি চিত্রিত থাকিত,—চিত্রের সন্নিকটে বীরের আত্মমূর্ত্তি অঙ্কিত থাকিত,—বীরমূর্ত্তির নিষ্প্রভগর্ব্বের দীপ্ত উন্নাস।—আহা! কত ভাগ্যবতী সেই রমণী যাহার জন্য এমন বীরপুরুষ আত্মজীবন অবহেলা করিতে পারেন।

প্রাসাদ-অবরুদ্ধা শৈলতট-সুন্দরী সে দিন দর্পণমধ্যে দেখিল এমনি কত বীরপুরুষ অশ্বারোহণে একত্র চলিয়াছে,—দুইজন একসঙ্গে, তাহাদের পশ্চাতে আর দুইজন, এইরূপ ভাবে।

কোথা হইতে দীর্ঘসুপ্তি-মুক্ত 'মানবজীবন' একবার তাহার হৃদয়মধ্যে আজ সর্ব্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিল,—হায়, শৈলতট-সুন্দরী! 'তাহার' জন্য তো কোন বীরপুরুষ এমনি শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-পরিপূর্ণ প্রণয়-অর্ঘ্য লইয়া বীরগর্ব্বে অগ্রসর হইতেছে না!

তথাপি আবার বিচিত্র 'ইন্দ্রজাল' রচিত হইতে লাগিল, আবার দর্পণে প্রতিবিম্বিত বিচিত্র সূত্রে তাহা গ্রথিত হইতে লাগিল।

একদিন,—ও কি? মৃতদেহ সৎকারের জন্য ঐ যে জনসংঘ কমলতটের নিকটস্থ শ্মশানভূমির দিকে যাইতেছে, পরলোকগত আত্মার অনন্তপথ প্রকাশ সুব্যবস্থাবিধায়ক কি ঐ সঙ্গীত নিদ্রালস ধরণীকে জাগ্রত করিতেছে! অবরুদ্ধা সুন্দরী আজ মানবজীবনের এই নিতান্ত সত্য, অপরিহার্য্য পরিণতির দৃশ্য দর্পণমধ্যে প্রতিবিম্বিত দেখিল।—আবার আত্ম প্রকৃতির ভিতর সুপ্তোত্থানপর 'মানব হৃদয়' তাহার স্বকীয় অস্তিত্ব পরিজ্ঞাত করিল।

তারপর সে দিন,—আহা, দর্পণে প্রতিবিম্বিত এ কি প্রাণস্পর্শী মনোরম দৃশ্য! ঐ যে নবপরিণয়ে উৎফুল্লহৃদয় 'মানব-দম্পতী'!

না, না,—আর না; প্রতিবিম্বের বিড়ম্বনা আর সহ্য হয় না, শৈলতট সুন্দরী!

(৩)

আবার সে দিন; ও কি অপরূপ দৃশ্য দর্পণে প্রতিবিম্বিত! এমন তো আর কখনও দেখা যায় নাই!

প্রাসাদ হইতে কতই বা দূর?—এই এরখানি বাণ-প্রক্ষিপ্ত তীর

যতদূর যাইতে পারে, ততদূর,—এত সন্নিকটে রাজপথ দিয়া কে ঐ একাকী অশ্বারোহণে যাইতেছে? আহা, মরি মরি, কি সুন্দর মূর্ত্তি!

সে দিন কমলঘটের রাজকুমার বীরশ্রেষ্ঠ পৃথ্বীশ্বর যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বিজয়-উল্লাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। শস্য-শ্যামল প্রান্তরের মধ্যদেশ দিয়া রাজপথ,—স্থানে স্থানে বৃক্ষাচ্ছাদিত। বীরের দেহ লৌহবর্ম্মে আবৃত, কটিদেশে বিলম্বিত অসি হইতে অশ্বপদক্ষেপের সহিত সমতানে ঝনৎ-শব্দ উত্থিত হইতেছে,—রশ্মিকিরণ কখনও অপ্রশমিত প্রাখর্য্যে, কখনও বা বৃক্ষপত্রান্তরালে ঈষৎ স্তিমিত প্রভাবের সহিত আসিয়া তাঁহার অসিবর্ম্মের উপর প্রতিভাত হইতেছিল। বীরের দেহাচ্ছাদনের উপর কোন্ অনামা শুভ্রবাসী, ভাগ্যবতী রমণীর কল্পিতমূর্ত্তি!—তাহারই সন্নিকটে সেই বীরবরের আত্মমূর্ত্তি, চিত্রাঙ্কিত, স্থির অবস্থিত।

* * * *

অশ্ব 'বল্‌গা'য় নিবদ্ধ-মণিমুক্তা সূর্য্য কিরণে উদ্ভাসিত হইতেছে,—নৈশগগনে শ্রেণীবদ্ধ তারকার ন্যায়। 'বল্‌গা'-নিবদ্ধ ঘুঙ্‌র'-শ্রেণী হইতে মৃদু নিক্কণ শ্রুত হইতেছে,—অশ্বারোহী বীর যাইতেছেন কমলঘট-প্রাসাদে।

বীরের পার্শ্বদেশ হইতে লম্বমান্ রৌপ্যনির্ম্মিত রণভেরী রবিকিরণে প্রতিভাত হইতেছে,—অস্ত্র-শস্ত্রের ঝঙ্কারসহ এমনি ভাবে বীর যাইতেছেন শৈলঘট-দীপের নিকট দিয়া।

* * * *

সে দিন আকাশে মেঘ নাই। সমগ্র নভোমণ্ডল নীল শোভায় সজ্জিত। অশ্বপৃষ্ঠস্থিত আসন-চর্ম্ম, বীরের শিরস্ত্রাণ ও তন্নিবদ্ধ পালকপুঞ্জ—সূর্য্যকিরণ-সম্পাতে দীপ্তোজ্জ্বল বহ্নিশিখার ন্যায় আলোকরশ্মি বিকীরণ করিতেছিল। বীর যাইতেছেন কমলঘট-প্রাসাদে।

দেখাইতেছিল যেমনি উজ্জ্বল, তেমনি সুন্দর,—যেমন কখন-কখন শান্ত স্নিগ্ধ রজনীতে শৈলঘট প্রাসাদের ঊর্দ্ধদেশে নক্ষত্রবিভূষিত আকাশে শুভ্র একটী বিচিত্র 'ধূমকেতু' তাহার সহিত সংবদ্ধ লক্ষ-লক্ষ ক্ষুদ্রগ্রহ হইতে কিরণ বিক্ষিপ্ত করিয়া উদয় হইত, আর চলিয়া যাইত।

* * * *

অশ্বারোহীর প্রশস্তললাটে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইল; অঙ্গের উপর রবিকিরণ প্রতিভাত হইল; নীল পুরুষের শিরস্ত্রাণ-অন্তরাল

কুঞ্চিত, কৃষ্ণ, কেশাংশ বায়ুস্তরে আন্দোলিত হইল,—তখন তিনি কমলতটের দিকে চলিয়াছেন।

নদীর তীর হইতে,—নদীর জল-প্রদেশ অতিক্রম করিয়া, [illegible] আসিয়া শৈলতটপ্রাসাদের কক্ষস্থিত দর্পণের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইল, [illegible] সেই সময় বীর পৃথ্বীরাজ নদীর প্রান্ত দিয়া "তায়রা তায়রা" সুরে [illegible] বিজয়-উল্লাসে অশ্ব ছুটাইয়াছেন।

* * * * * * *

আর নয়!

শৈলতটসুন্দরী এবার তাহার 'ইন্দ্রজাল' রচনা পরিত্যাগ করিল, তাহার বিচিত্র কার্য্যকার্য্য তখন স্থগিত হইল।

কক্ষমধ্যে তিনবার সে চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিল,—তারপর, এবার সে দর্পণ-দৃষ্ট প্রতিবিম্ব নয়! এবার সে স্থির করিল, সমস্ত বাহ্যপ্রকৃতি নয়ন ভরিয়া পূর্ণ আগ্রহের সহিত সে দেখিয়া লইবে,—তাহাতে যাহাই হউক না কেন।

তাই শৈলতটসুন্দরী তখন নির্ভীক দৃষ্টিতে চক্ষু মেলিয়া বহির্জগতের দিকে চাহিল। সে তাকাইয়া দেখিল, সরোবরে কুমুদ-কহ্লার ফুটিয়া রহিয়াছে, দেখিল বীরের অশ্বারোহী মূর্ত্তি-তাঁহার শিরস্ত্রাণ ও তাহাতে নিবদ্ধ পালক পর্য্যন্ত সে তাকাইয়া দেখিল কমলতট-প্রাসাদ!

* * * * * *

মুহূর্ত্তে এ-কি,—যেন প্রলয়কালীন ভীষণ দৃশ্য!

সযত্নরচিত বিচিত্র সূত্রে গ্রথিত 'ইন্দ্রজাল' হস্ত হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়া,—কোন্ দিক দিয়া তাহা বায়ুমণ্ডলে মিশিয়া গেল; কক্ষ-বিলম্বিত [illegible] নিমেষের মধ্যে বিদীর্ণ, চূর্ণ হইয়া গেল?

চকিত-দৃষ্টি শৈলতটসুন্দরী বলিল,—"ঐ যে, আমার সেই অভিসম্পাত!"

(৪)

তখন ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি।

অরণ্য বৃক্ষগুলি প্রবল বাত্যায় লুটাইয়া পড়িতেছিল, উর্ম্মিমালা [illegible] বক্ষঃ আলোড়িত হইতেছিল, মেঘাচ্ছন্নকায় নভস্তল কমলতটপ্রাসাদের [illegible] অবিরল বারিবর্ষণ করিতেছিল।

শৈলতটসুন্দরী নিঃশব্দে প্রাসাদ ত্যাগ করিল, ধীরে ধীরে নদীর [illegible]

নামিয়া আসিল। একখানি ক্ষুদ্র নৌকা তীর সংলগ্ন দেখিল, তাহাতে উঠিয়া তাহার শিরোদেশে সে লিখিল,—"শৈলতট-বাসিনী"।

* ০ * * *

পূর্ব্বাপর ভাগ্যদর্শনক্রম যাহার যখন ভবিতব্য দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত্তেই আসন্ন, সুনিশ্চিত, 'আত্মবিদান' দেখিতে পায়, তখন সে আর কি করিতে পারে? সে শুধু তো নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাহার ভবিষ্যৎ বিপদের দিকে চাহিয়াই থাকে যেন তাহার দৃষ্টি-প্রক্রিয়া একখানি প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তির উন্মীলিত নেত্রদৃষ্টির মতই স্থির, অচঞ্চল।

আহা, তেমনি স্থির দৃষ্টিতে শৈলতট-সুন্দরী চাহিল,—কমলতট-প্রাসাদের দিকে!

সমস্ত দিনব্যাপী ঝটিকার অবসানে সন্ধ্যার প্রাক্কালে সে নৌকা ছাড়িয়া দিল,—নৌকাবক্ষে শৈলতট-সুন্দরী শায়িতা। নদীর স্রোতে নৌকা ভাসিয়া চলিল।

* * * * *

শুভ্রবস্ত্রাচ্ছাদিতদেহ শৈলতটবাসিনী সুন্দরীর বস্ত্রাঞ্চল বায়ুভরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছিল।

সে রাত্রিতে আর ঝড় বৃষ্টি হয় নাই,—আবার নৈশগগন করুণা বিতরণ করিতেছিল।

নৌকা ধীরে ধীরে ভাসিয়া চলিল, আর শৈলতটসুন্দরীর জীবন-প্রদীপ ক্রমশঃ তিমিত, ক্ষীণপ্রভ হইয়া আসিতেছিল। তখন নৈশ প্রকৃতির অন্তরাল হইতে উত্থিত অব্যক্তধ্বনিসমূহের মধ্য হইতে সুস্পষ্ট মানবীয় সঙ্গীত শ্রুত হইতেছিল। বিস্মিত প্রাণীমণ্ডলী শুনিতে পাইল শৈলতটসুন্দরীর অন্তিম সঙ্গীত!

* * * * *

সেই বিষাদমাখা, পূত সঙ্গীত কখন উচ্চ, কখন বা নিম্ন স্বরে গীত হইতে হইতেই গায়িকার ধমনীরক্ত তুষার-শীতল হইয়া গেল, আর তাহার চক্ষুর্দ্বয় কমলতট-প্রাসাদের দিকে দৃষ্টিবদ্ধ-অবস্থায় থাকিতেই অনন্ত তিমিরাবরণে আচ্ছন্ন হইল।—ধীরে ধীরে যখন ক্ষুদ্রতরণী কমলতট জনপদস্থ সর্ব্বপ্রথম আবাস-গৃহের সন্নিকটে আসিল,—সেই মুহূর্ত্তে সঙ্গীতোচ্ছ্বাসের মধ্যেই তাহার জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল।

* * * * *

কত গৃহাবলীর উচ্চ শীর্ষ, কত রম্যোদ্যান অতিক্রম করিয়া বজ্রাহত মৃতদেহ নৌকাবক্ষে ভাসিয়া চলিয়াছে,—দেখিয়া বোধ হইতেছিল যেন কোন্ দিব্যমূর্ত্তি প্রভা কোন্ অজ্ঞাত-প্রদেশ-প্রবাসী প্রিয়তমের অন্বেষণে অনন্ত অভিমুখে ধাবিতা। ক্ষুদ্র তরণী প্রাসাদ-সংলগ্ন সৈকতভূমি স্পর্শ করিতেই স্থির হইয়া গেল,—তখন মৃত্যুর নিবিড় আশ্রয়ে শায়িতা সুষুপ্তা সুন্দরীর সমস্ত মুখমণ্ডল প্রাতঃসূর্য্যকিরণে রক্তবর্ণ।

কমলভট-প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত, বিস্মিত জনমণ্ডলী আগিয়া দেখিল, তাহার শিরোদেশে লিখিত রহিয়াছে,—"শৈলতট-বাসিনী!"

কে এ? কি-এ?

দীপালোক-সমুজ্জ্বল কমলভট-প্রাসাদ হইতে রাজপুরুষগণের উৎসব-কোলাহল মুহূর্ত্তে নিস্তব্ধ হইল।

কমলভটের কত বীরগণ অজ্ঞাত ভীতিতে শিহরিয়া উঠিল।

বীরশ্রেষ্ঠ পৃথ্বীধ্বজ মুহূর্ত্ত স্তম্ভিত থাকিয়া বিষাদমুখে বলিলেন,—"কি সুন্দর মুখ!—মাতা, মানস-সুন্দরি, শৈলতট-বাসিনি, জগদীশ্বর তোমার কল্যাণ বিধান করুন!" *

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক।

---

* টেনিসনের "Lady of Shallot" অবলম্বনে।

বাঙ্গালীর সমাজ-বিন্যাস*

শূন্য পুরাণ হইতে ধাণ্ড রায়ের পাঁচালী পর্য্যন্ত সহস্র বৎসরের খাঁটি বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশ্লেষণ করিয়া পাঠ করিলে, বিশেষতঃ শূন্য পুরাণ, ধর্ম্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, শিবায়ন এবং বৈষ্ণব মহাকাব্য সকলের সম্যক আলোচনা করিয়া দেখিলে, বাঙ্গালীর প্রতিযুগের সমাজ-বিন্যাসের পটমালা এমনভাবে সানসনয়নে প্রতিভাত হইবে, যাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিতে জানিলে সত্যই মনীষিমাত্রেরই হৃদয় বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া উঠিবে, অনেকেই চমৎকৃত হইবেন। আমার বড় সাধ যে আধুনিক ইংরেজিশিক্ষিত যুবজন, Scientific method বা ন্যায়ানুগত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আদিম ও মধ্যযুগের বাঙ্গালা মহাকাব্য সকলের Analysis বা বিশ্লেষণ করিয়া বাঙ্গালী জাতির বিশিষ্টতার পরিচায়ক সামাজিক ইতিহাসের বেদী সৃষ্টি করেন। তাই শুধু অনুসন্ধিৎসা জাগাইবার উদ্দেশ্যে, অতি সংক্ষেপে ইঙ্গিত করিয়া যাইতেছি যে, কোন মহাকাব্যের আলোচনা করিলে সমাজের কোন চিত্রের আবরণ উন্মোচিত হইবার সম্ভাবনা আছে। পরে যদি বিধাতা অবসর সৃষ্টি করিয়া দেন ত ধর্ম্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণব মঙ্গল, এই তিন প্রধান ধারার মাঙ্গলিক মহাকাব্য সকলের বিশ্লেষণ করিয়া আমার উক্তি সকলের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব। মাসিক পত্রের সন্দর্ভে ইঙ্গিত করা ছাড়া, খবর দিয়া রাখা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এইবার সোটাকয়েক পারিভাষিক শব্দের বিচার করিয়া দেখিব, এই বিচারে অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব আংশিক ফুটিয়া উঠিতে পারে।

ব্যবসায়গত জাতিবিচার

বৌদ্ধযুগের সময় হইতে নব ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যের অভ্যুত্থানের কাল পর্য্যন্ত প্রায় দেড়হাজার বৎসরকাল বঙ্গদেশে, মগধে ও উৎকলে, এবং ভারতবর্ষের অন্য সকল প্রদেশেও বৈদিক চাতুর্ব্বর্ণ লোপ পাইয়াছিল। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা পরায়ণ ব্রাহ্মণ ছাড়া বর্ণ-ব্রাহ্মণ সকল বৌদ্ধ সমাজের

* পৌষ-সংখ্যা "বঙ্গবাণী" হইতে উদ্ধৃত।

অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। তাই রঘুনন্দন লিখিয়া গিয়াছেন যে, কলিকালে অর্থাৎ বৌদ্ধ-প্রভাবের সময় হইতে ভারতবর্ষের সমাজ দ্বিবর্ণে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া আছে; ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ছাড়া অন্য বর্ণ নাই এবং থাকিতেও না।

এটা বোধ হয় অনেকেই জানেন যে, বৌদ্ধমন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ ও পৌরোহিত্য কার্য্যে বৌদ্ধগণ ব্রাহ্মণকেই নিযুক্ত করিতেন; খাঁটি ব্রাহ্মণ পাইলে তাঁহারা শ্রমণগণকে নিযুক্ত করিতেন না; শ্রমণগণ প্রধানতঃ প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। এই নীতি জৈন প্রধানগণ অবলম্বন করিয়া চলিতেন, এখনও সকল জৈন মন্দিরে সাধরত বা গৌড় ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্যের কাজ করেন। শ্রমণদিগের মধ্যে প্রায় শতকরা আশীজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইহার ফলে, বৌদ্ধ প্রাধান্যের প্রভাব কালেও ব্রাহ্মণ জাতির বিশিষ্টতা একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই। অশোকের সময়েও ব্রাহ্মণের একটা স্বতন্ত্র সত্তা ছিল। পক্ষান্তরে শক, হূণ, আভীর বা আশিরীয় ও ইরাণী প্রভৃতি রণদুর্ম্মদ জাতি সকল ভারতবর্ষে আসিয়া ক্ষাত্র শক্তির প্রভাব দেখাইয়া ক্ষত্রিয়পদবাচ্য হন। বৌদ্ধ যুগে বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া এই সকল জাতি ক্ষাত্রবর্ণের বিশিষ্টতা একেবারে নষ্ট করিয়া দেয়। শ্রেষ্ঠী বণিক জাতি সকল পূর্ব্বেই জৈনপ্রভাবে আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন, পরে বৌদ্ধ একাকারের কালে বৈশ্য ও শূদ্র এক বর্ণে পরিণত হয়। ফলে কয়েকশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছাড়া, আর সকল বৈদিক শ্রেণীভুক্ত জাতি শূদ্রের সহিত সম্মিশ্রিত হইয়া এক মহাজাতিতে পরিণত হয়। বৌদ্ধগণ পুরুষানুক্রমিক ব্যবসায়ীর প্রতি আস্থাবান ছিলেন, তাই যখন যে সম্প্রদায় যে বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, সেই বৃত্তি সেই সম্প্রদায়কে পুরুষানুক্রমিকভাবে ধরিয়া থাকিতে হইয়াছে। ফলে ক্রমে ক্রমে সমাজের মধ্যে বৃত্তিগত এক একটা জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাই Profession castes সৃষ্টির মূল। বাৎস্যায়নের কামসূত্রের সামাজিক অংশের ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করিলে এই বৃত্তিগত জাতিসৃষ্টির মূল পাওয়া যায়। কেহ এক বৃত্তি ত্যাগ করিয়া অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিলে, তাহার জাতিনির্দ্দেশের পরিবর্ত্তন ঘটিত। আজকাল নাপিত কেবল দাড়ি গোঁফ কামায়, নখচুল কাটে, বৌদ্ধযুগে নাপিত শল্যচিকিৎসক ছিল, অনেক ব্রাহ্মণ এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়া নাপিত আখ্যা লাভ করিত। রাণা সঙ্গ বা সংগ্রাম সিংহের নাপিত (Royal surgeon) একজন বৌদ্ধ মহাযানী ব্রাহ্মণ ছিলেন; চাঁদবরদায়ের পুস্তকে এইটুকু বেশ খোলসা করিয়া লেখা আছে। মূলে মহাযানী ব্রাহ্মণ বা শ্রমণ হইলে কি হয়, নাপিত বৃত্তি অবলম্বন হেতু সে ব্রাহ্মণ নাপিত

জাতিভুক্ত হইয়াছিল। বৃত্তিগত জাতি বিচারে Rigidity of caste জাতি-ভেদের কঠোরতা গণ্ডী যে ছিল না, বা এখনও নাই, আমি তাহাই বলিতে চাহি। গন্ধবণিক, তিলি, তাম্বুলী প্রভৃতি জাতির আসল ও পুরাতন কুলজীর পাণ্ডা আলোচনা করিলে বেশ জানা যায় যে, পুরাতন জৈন ও বৌদ্ধ শ্রেষ্ঠীর দল হিন্দুর প্রভাবে প্রণোদিত হইয়া ক্রমে এবম্বিধ বৃত্তিগত বণিক জাতিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কায়স্থের বাহ্যতঃ ঘরের পরিচয় বিশ্লেষণ করিলে বেশ জানা যায় যে, বৌদ্ধযুগের অনেক বৃত্তিগত জাতি কায়স্থ দলভুক্ত হইয়াছে,—অনেক শ্রেষ্ঠী, অনেক পুরাতন বণিক কায়স্থ আখ্যা লাভ করিয়াছে। বৃত্তিগত জাতি মূলতঃ বৈশ্য, বৈশ্যত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত; নবশাখ নামটাই উহার পোষক প্রমাণ। নবশাখ শব্দের অর্থই এই যে, অভিনব ব্রাহ্মণপ্রধান সমাজের উহারা নূতন শাখা—নূতন কাণ্ড; পূর্ব্বে হিন্দু সমাজ ভুক্ত ছিল না, এখন ব্রাহ্মণ্য সমাজের অঙ্গীভূত হইয়াছে। ইহাও Rigidityর পরিচায়ক নহে।

আকার সাম্য

পূর্ব্বে বলিয়া রাখিয়াছি যে, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন হিন্দুর আকার সাম্যের রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই আকার সাম্যকে Typical Evolution বলিয়া আমি মনে করি; বাস্তবপক্ষে উহা Typical Evolution মোটে কিছু নহে। একটা গল্প বলিব। তান্ত্রিক নিবন্ধকার ব্রহ্মানন্দ গিরি এক পাঠান রমণীর প্রেমে পড়িয়া যৌবনে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং সাজে, পোষাকে, আচারে, ব্যবহারে, ভাবে, ভাষায় পুরাদস্তুর মুসলমান হইয়া যান। পরে তাঁহার কুলগুরু আসিয়া বিচারে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া বলেন, তুমি পূর্ব্বাভিষিক্ত হইয়া তন্ত্রধর্ম্ম অবলম্বন কর, তোমার পত্নী ও সন্তান-সন্ততি সকলকে আমি পুনশ্চরণ করাইয়া পুনরভিষিক্ত করিতে প্রস্তুত। সেকালের লোকে বিচারে হারিলে, অবিচারিতচিত্তে বিজেতা পণ্ডিতের আজ্ঞা অনুসরণ করিতে ইতস্ততঃ করিত না। ব্রহ্মানন্দ গিরি তাহাতেই রাজী হইলেন। পরন্তু গুরু বলিলেন, তোমার পক্ষে তন্ত্র ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে কোন বাধা নাই বটে, সমাজ তোমাকে গ্রহণ করিবে কিনা, তাহা আমি বলিতে পারি না; কেননা তোমার আকারে এবং আচারে এখনও পাঠানী বা ইস্‌লামী ভঙ্গী যেন অনপনেয় রেখায় চিহ্নিত রহিয়াছে। ঐ রেখা মুছিয়া ফেলিতে হইবে। অবয়ব ও রুচিগত সাম্য না ঘটিলে হিন্দু তোমাকে দলভুক্ত করিতে পারে না। ব্রহ্মানন্দ

গিরি এই আকার-সাম্য সাধন জন্য দ্বাদশ বৎসরকাল জপ ও তপস্যা করিয়াছিলেন। সেই সাধনকালে এক মহাপুরুষের কৃপাবলে তিনি দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভুক্ত হন এবং ব্রহ্মানন্দ গিরি নামে পরিচিত হন। ইহা হইল Typical Evolution। পাঠান, ভুটিয়া, ভিল্লাতী, আরাকানী, মগোল প্রভৃতি অন্য জাতির মানুষকেই তন্ত্রধর্ম্মে দীক্ষিত করা চলে, পরন্তু তাহাদের অভিনব সমাজ চালাইতে হইলে, জাতীয় বিশিষ্টতার পরিচায়ক আচারগত, ব্যবহারগত, ভাবগত, ভাষাগত, সাম্য সাধন সকলকে করিতে হইত। Dum Dum এই সাধনার সিদ্ধি লাভ করিয়া গুরু দুর্গা নাম পাইয়াছিলেন। আলোচিক ব্রাহ্মণ, আলোচিক জাতি এই পদ্ধতির ভিতর দিয়া আসিয়া হিন্দুসমাজের অঙ্গীভূত হয়। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ কুলাচার্য্যগণ ও মূলতঃ Scythian বা Babylonian বংশ Chaldean ছিলেন। আকার-সাম্য ঘটাইয়া এবং নৈবেদ্যের ঘুসি প্রদর্শন করিয়া তাঁহারা সমাজে ব্রাহ্মণের আসন লাভ করেন। বিহারে ও যুক্তপ্রদেশে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ প্রধানতঃ চিকিৎসা-ব্যবসায়ী এবং সারস্বত ব্রাহ্মণের সমাদর পাইয়া থাকেন। এই সঙ্গে পশ্চিমের "ভূমিহার ব্রাহ্মণের" কথাও ভাবিতে হয়। ইহারা সবাই শাক বা শাকদ্বীপী; স্বয়ং শাক্যসিংহ সিদ্ধার্থও শাক ছিলেন। আকার-সাম্য ঘটাইয়া কালে ইঁহারা হিন্দুসমাজভুক্ত হন। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন আচার-ধর্ম্মের বেষ্টনীর মধ্যে সকলকে টানিয়া এক করিয়া, বিধিনিষেধের বন্ধনীতে আবদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণ্য Type বা আদর্শের উন্মেষসাধনে তৎপর হইয়াছিলেন। তাই তিনি সৎ-শূদ্র বলিয়া এক নূতন শ্রেণীর সৃষ্টি করেন। ব্রাহ্মণাচার-সম্পন্ন, ব্রাহ্মণ-আকার-আকারিত, ব্রাহ্মণ-ভাবাপন্ন ভাবুক বৈদ্য ও কায়স্থগণ সৎ-শূদ্র আখ্যা লাভ করেন। ছিল দিন যখন আচারে ও ব্যবহারে ব্রাহ্মণ অনুরূপ কায়স্থ ও বৈদ্য বাঙ্গালায় বিরাজ করিত; তাঁহারাই হিন্দুর জাতিগত বিশিষ্টতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। আমি তাই এই সাম্যকে Typical Evolution বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি।

জাতিবিন্যাস

কৌলযুগের একাকারের পরে শঙ্করাচার্য্যের সময় হইতে যখন নূতন করিয়া ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়, তখন সেই একীভূত, সমীভূত যৌনসাম্যকে ভাঙ্গিয়া, ছানিয়া, বাছিয়া-কাড়িয়া তবে হিন্দুসমাজবিন্যাস ঘটান হইয়াছিল। মহাসাম্য এবং হীনযানীদিগের নানাবিধ শাখা-উপশাখায় বিভক্ত ভারতীয় সমাজ

প্রত্যেকটাই কর্ত্তব্য হইয়াছিল, এমনই সাধ্যসাধ্য হইয়াছিল যে, এই ছাঁকা-ছানা-বাছা-ঝাড়ার কাজ এক শতাব্দীর মধ্যে শেষ হয় নাই। শঙ্করাচার্য্য ও নৃসিংহদেবের চেষ্টার প্রভাবে সর্ব্বাগ্রে দাক্ষিণাত্যে,—কঙ্কণ, কর্ণাট, দ্রবিড় ও ত্রাবিড়দেশে—এই শুদ্ধি-সাধনের কার্য্য আরম্ভ হয়, পরে কান্যকুব্জ ও মিথিলায় উহার সম্প্রসারণ ঘটে, শেষে বঙ্গদেশে উহার সমাপ্তি ঘটে। একপক্ষে দাক্ষিণাত্যের চেল ও পাণ্ড্যদিগের বংশধরগণ বঙ্গাধিকারী হওয়াতে, অন্য পক্ষে কান্যকুব্জ হইতে সাগত বাজিক ব্রাহ্মণদিগের প্রতিষ্ঠা বঙ্গীয় সমাজে হওয়াতে কতকটা দক্ষিণের আদর্শে, কতকটা কান্যকুব্জ ও মিথিলার আদর্শে বাঙ্গালার নব সমাজকে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজা হয়। পুরাতন একটা সমাজের উপর নূতন একটা কিছুর বনীয়াদ বসাইতে হইলে অনেকটা আপোষ (Compromise) করিতেই হয়। বাঙ্গালায় সে আপোষ একটা পদ্ধতি অনুসারে হইয়াছিল, বাঙ্গালার বিশিষ্টতা একটু স্বতন্ত্র আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাই বাঙ্গালী এখনও তাহার এই স্বাতন্ত্র্য অনেকটা রক্ষা করিতে পারিয়াছে। এই সামাজিক শুদ্ধি-সাধনটা ঠিকমত বুঝিতে হইলে গোটা কয়েক গোড়ার কথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

(১) বৌদ্ধধর্ম্ম জগতের প্রথম ও প্রধান প্রচারের ধর্ম্ম (Proselytysing Religion) বৌদ্ধধর্ম্মই সর্ব্বাগ্রে অন্যধর্ম্মাবলম্বীকে স্বধর্ম্মে আনয়ন করিবার পন্থা উন্মুক্ত করিয়া দেয়।

(২) বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের ধর্ম্ম হওয়াতে উহাই আদিগণবাদের (Democratic Religion) ধর্ম্ম বলিয়া মান্য ও গ্রাহ্য হইয়াছে।

(৩) বৌদ্ধধর্ম্মই সর্ব্বাগ্রে প্রাকৃত ও পালিভাষায়, অর্থাৎ জনগণের ভাষায় প্রচারিত এবং ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। বৌদ্ধগণই ভারতবর্ষের অভিজাতবর্গের সংস্কৃত ভাষাকে পরিহার করিয়া জনসাধারণের পালি ভাষায় ধর্ম্মতত্ত্বের সিদ্ধান্ত-রাশি ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করে।

(৪) শাক্যসিংহ শক বা Scythian ছিলেন, তাঁহার ধর্ম্মের প্রথম প্রচারকগণের মধ্যে অনেকেই শক বা Chaldean বা তুরুষ্কবংশাবতংস ছিলেন। ঐতিহাসিক সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে বলিতেই হইবে যে, প্রচারধর্ম্মের আবিষ্কার এবং ধর্ম্মে গণবাদের প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষের শক-মনীষা-সম্ভূত; উহা আর্য্য-মস্তিষ্ক প্রসূত নহে।

সিদ্ধাচার্য্যগণ

বৌদ্ধদিগের এই মূল তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালার সহজিয়া ও তান্ত্রিক প্রধানগণ জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারের ও ব্যাখ্যানের প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সকল ধর্ম্মপ্রচারক ব্যাখ্যাতাগণকে সিদ্ধাচার্য্য বলা হইত। ইহাদের এক সম্প্রদায় কেবল গান করিয়া, ছড়া কাটাইয়া সহজ ও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতেন, আর এক শ্রেণী কেবল ব্যাখ্যাতা ছিলেন এবং নিজেদের অর্জ্জিত "সিদ্ধাই" বা সিদ্ধির সাহায্যে জনগণকে স্বদলভুক্ত করিতেন। এই সিদ্ধাচার্য্যগণের গান ও পাঁচালী বাঙ্গালা সাহিত্যের বনীয়াদ, বাঙ্গালা ভাষার বেদী। কত সিদ্ধাচার্য্য যে ছিলেন, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না; তবে লুই, কাহ্ন, শবর, নাগার্জ্জুন, ডাক, নাঢ় প্রভৃতিই অধিকতর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কাহ্নই বাঙ্গালায় কীর্ত্তনের প্রচলন করেন, তাঁহার রচিত অসংখ্য গীত বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে গীত হইত। "কানু ছাড়া গীত নাই" এই প্রবচনের মূলে সিদ্ধাচার্য্য কাহ্নই আছেন, কানু শ্রীকৃষ্ণ নহেন। শ্রীচৈতন্য দেব ও গুরুপাদ নিত্যানন্দ এই সিদ্ধাচার্য্যগণের দলবলকে আত্মসাৎ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। নাঢ় ও নাঢ়ী, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী, সিদ্ধাচার্য্যের পদ পাইয়া এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। এই সম্প্রদায়ভুক্ত নর নারীকুলকে হাঁটের সন্ধ্যা ভাষায় নাঢ় ও নাঢ়ীর দল বলিত; শ্রীমন্নিত্যানন্দ ইহাদিগকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদলভুক্ত করেন এবং পরে উহারাই "নেড়া নেড়ী" বলিয়া পরিচিত হয়। এই সকল সিদ্ধাচার্য্যসৃষ্ট সম্প্রদায়ে "পণ্ডিত"-উপাধিধারী এক শ্রেণী ভিক্ষুক বা ভ্রমণ যজমান-যাজনের কাজ করিতেন। ইহা ছাড়া সপ্তশতী ব্রাহ্মণ এবং ভুসুবর পরগণার বংশজ ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে বাঙ্গালায় বাস করিতেন। মহারাজ বেনের আমলে বা তাহার পূর্ব্বে পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণগণ দলে দলে আসিয়া বাঙ্গালায় বাস করে। তাহারা এই সকল আদিম বঙ্গীয় ব্রাহ্মণকে অনেকটা আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করে। ব্রাহ্মণ্য-প্রতিষ্ঠার বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠী বৃন্দ নানা রকমের আপোষ করিবার চেষ্টা হয়। সে চেষ্টার ফলে প্রকৃত ব্রাহ্মণ্যের উন্মেষ না ঘটাতে, পরে কান্যকুব্জ হইতে এবং তাহারও পরে মিথিলা ও কলিঙ্গ ও মায়াপুর হইতে নূতন ব্রাহ্মণের আমদানী করা হয়। যজ্ঞাদি ক্রিয়ার জন্য উৎকল ও দাক্ষিণাত্য হইতে অনেক ব্রাহ্মণের আমদানী করা হয়। বলিতে কি দক্ষিণের-নামধেয়দের সমাবেশের আমলে বাঙ্গালার এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের বাঁধ-

বস্ত চাষ চলিয়াছিল। যে চাষের কাহিনী পুরাতন কুলজীগ্রন্থে নিবদ্ধ আছে। উহা সেই স্থানেই প্রচ্ছন্ন থাকুক। পরে যদি কখনও Scientific basis বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি-অনুসারে সমাজতত্ত্বের উদ্ঘাটন চেষ্টা হয়, তখন উহার প্রকাশ এবং প্রচার করিলে চলিবে। তবে পরবর্ত্তী বজ্রযানী তান্ত্রিক বৌদ্ধ-প্রভাবে, সিদ্ধাচার্য্যগণের ব্যাখ্যাত সহজ মতের প্রচার-প্রভাবে বাঙ্গালায় তথা উত্তর ভারতে Sexual morality কেমন ভয়ঙ্করজনক পরিণতি লাভ করিয়াছিল, তাহা বুঝিতে হইলে সমাজে গোড়ায় কি রীতিতে জাতি-বিন্যাস ঘটিয়াছিল তাহা জানা চাই বৈকি। হিন্দুর সামাজিক যত কদাচার তাহার প্রায় সকলেরই মূল হেতু নৈতিক্য বা সমাজ-বিক্ষেপ। কৌলীন্য এবং বহুবিবাহ সিদ্ধাচার্য্যদিগের সহিত আপোষের বিষময় ফলস্বরূপ। কেবল এইটুকুই নহে; পাঠানদিগের আগমনের পরে মিত্রাই দলের নর-নারী যে ভাবে পাঠানদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়াছিলেন, তাহারই ফল-ফল সামলাইবার উদ্দেশ্যে, শোণিতগত দোষের Cauterisation and absorptionএর প্রয়াসে কৌলীন্য থাক্ মেল্ পাল্টি প্রভৃতির উদ্ভাবন হয়। কৌলীন্য প্রথা Social distillation বা সমাজক ছোয়াইয়া পরিশুদ্ধ করিবার নামান্তরমাত্র। কেবল ব্রাহ্মণের মধ্যে যে কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা নহে। যে সকল বৃত্তিগত এবং ছাঁকা-মাড়া জাতি নবীন হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়াছিল, তাহাদের সকলের মধ্যে কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত আছে; কায়স্থ, বৈদ্য, নবশাখদিগের মধ্যে কৌলীন্য আছেই; আর এই কৌলীন্য বৌদ্ধ বা সহজ মতের দোষ ঢাকিবার নামান্তর মাত্র, social cauterisation and absorptionএর উদাহরণ মাত্র। পরে যদি কখনও বাঙ্গালীর সমাজতত্ত্বের বিশ্লেষণ রীতিমত হয়, তখন এই সকলের বিচার হইবে।

জাতি বিচার

সর্ব্বাগ্রে বলিয়া রাখি যে, বাঙ্গালায় তথা উত্তর ভারতের জাতিবিভাগ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নহে, উহা বৃত্তিগত শ্রেণীবিভাগ ছাড়া অন্য কিছু নহে। যখন বৃত্তিগত শ্রেণীবিভাগ তখন উহার রদ-বদল হয়ই; নবাগন্তুকের প্রবেশ সম্ভবপর। উহাতে কোন কালে কখনই Rigidity বা কঠোরতা ছিল না। ইংরেজের আগমনের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় জাতিবিভাগ স্থিতিস্থাপকতা-গুণসম্পন্ন ছিল। বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ্য আচারধর্ম্মের প্রভাব মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলের অব্যবহিত

পূর্ব্ব হইতেই অনুভূত হইয়াছিল। উত্তরে যবনের নাটোর, পূর্ব্বে ঐশ্বর্য্যশালী ব্রাহ্মণ জমীদারবর্গের উদ্ভব-ফলে, মুসলমান রাজের প্রতিষ্ঠা প্রবল হইলে, পরে বাগড়ীতে কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ প্রবল হইবার ফলে ব্রাহ্মণ্য আবরণ সমাজ-দেহের উপর একটু কঠোর হইয়া বসিয়াছিল। সেই আবরণ সমেত হিন্দু-সমাজকে ইংরেজ হাতে তুলিয়া লয়েন এবং অবজ্ঞাগ, জিবেণী ও ভট্টপল্লীর পণ্ডিতমণ্ডলীর পরামর্শ অনুসারে, অন্য পণ্ডিতদিগের বিচার-সিদ্ধান্ত অনুসারে এবং ব্রাহ্মণ্য কলিঙ্গ এবং আইন-কানুনের প্রভাবে এই ব্রাহ্মণ্য আবরণ এখন দেহ, সমাজের উপর জাঁকিয়া বসিয়াছে। Orthodoxy বা গোঁড়ামী ইংরেজের আমলে এবং শিক্ষা প্রভাবে যত উৎকট হইয়াছে, উহা এত উৎকট পূর্ব্বে কখনই ছিল না। তাহার উপর নবীন ইংরেজিশিক্ষিত সমাজ সনাতন সমাজের দিকে একেবারে তাকাইতেন না, কোন বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেন না, ইংরেজ পণ্ডিত এবং পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ যাহা বলিতেন, তাহাই বেদবাক্য বিবেচনা করিয়া সেই সুরে গলা মিলাইয়া ইঁহারা মাতিয়া উঠিতেন। ফলে সমাজ-বিষয়ে অজ্ঞতা সমাজের স্তরে স্তরে যেন পাঁজিয়া বসিয়া আছে; উহাকে যেন অপসারণ করিবার উপায় নাই। এমন কি আজকাল যাঁহারা ইংরেজি শিক্ষার ধার ধারিয়া চলেন না, তাঁহাদের অনেকের জাতিগত মূল উৎপত্তির ইতিহাস কথা যদি খুলিয়া বলি, তবেই তাঁহাদের ইংরেজি orthodoxy চটিয়া উঠিবে, লেখককে জব্দ করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিবেন। আসল কথাটা কি জান? এখনও বাঙ্গালীজাতির বারোআনা অংশ বৌদ্ধ ও সহজ মতের সিদ্ধান্তে ও আচার-পদ্ধতিতে আচ্ছন্ন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম—চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম সহজ মতের বেদীর উপরে প্রতিষ্ঠিত। তান্ত্রিক শাক্ত ধর্ম্মের পনর আনা অংশ বজ্রযান এবং কালচক্রযানের স্তম্ভের উপরে সুবিন্যস্ত। কি শাক্ত তান্ত্রিক, কি গৌড়ীয় বৈষ্ণব কাহারও সাধনধর্ম্মে জাতিবিচার নাই; আর এই দুই ধর্ম্ম এখনও বাঙ্গালীর সমাজ শাসন করিতেছে। বিশেষতঃ বৌদ্ধ এবং মুসলমান প্রধান সমাজের মসলা দিয়া আধুনিক হিন্দু-সমাজ গঠিত; রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ হইতে রাজা রায়ের পাঁচালী পর্য্যন্ত সমগ্র পুঁথি বাঙ্গালা সাহিত্য ইহার সাক্ষী ও প্রমাণ। এমন অবস্থায় বাঙ্গালীকে যেখানে-সেখানে আর্য্য হিন্দু বলিয়া গালাগালি করিলে অভিজ্ঞ মাত্রেই উপেক্ষার হাসি হাসিবেন।

জাতির পারিভাষিক অর্থ

বাঙ্গালার কুলজী সাহিত্য অনুসারে জাতি শব্দের অর্থ বুঝি—ক, খ—

জীবিকা; "জাতঃগাৎ" হওয়ার অর্থ বৃত্তিচ্যুত হওয়া, জীবিকার্জ্জনের পন্থা হইতে বঞ্চিত হওয়া। ধারণ বৃত্তি-ব্যবসায় জীবিকা সকলেরই জাতিগত বৈশিষ্ট্য ছিল। ব্রাহ্মণেই যে অন্য জাতীয় মানুষকে একঘরিয়া করিত তাহা নহে, অনেক সময়ে অন্য জাতীয় মানুষে ব্রাহ্মণকে উৎকটভাবে একঘরিয়া করিয়া রাখিত। একটী গল্প কথা বলিব। যখন ম্যাঞ্চেষ্টারের মাল কাপড় বুঙ্গী এদেশে আমদানী হইত না, কার্পাস-শিল্প এই ভারতবর্ষের অধিবাসীর একচেটিয়া শিল্প ছিল, ভারতবর্ষ হইতে কার্পাস বস্ত্র অন্য বিদেশে রপ্তানী হইত, তখন শিল্পী ও বণিক জাতি সকলের প্রভাব সমাজের উপর প্রবলভাবে প্রকট ছিল। তখন সকল জাতিই অনাদীভাবে একে অপরের উপর নির্ভর করিয়া থাকিত। ভাটুরের অর্থাৎ রামপুরহাটের নিকট ভদ্রপুরের নন্দকুমার (মহারাজ নন্দকুমার) মুর্শিদাবাদে যাইয়া নবাবী সেরেস্তায় বড় চাকরী পান। সুতরাং বড় মানুষ হইয়া তিনি একবার দুর্গোৎসব উপলক্ষে সকল প্রয়োজনীয় বস্ত্র, এবং আচ্ছাদন মুর্শিদাবাদ হইতে খরিদ করিয়া আনেন। ভাটুরের তন্তুবায়ের দল বলিল, এঁকি ঠাকুর, তোমার দুর্গোৎসবে, আমরা চিরকাল—অসময়ে ও সুসময়ে—তোমাকে ও তোমার পরিবারবর্গকে কাপড় যোগাইয়া আসিতেছি, আমাদের বয়ন করা বস্ত্রেই এতকাল দেবীর আবরণ-বস্ত্র হইয়াছে, আর আজ তুমি হঠাৎ ধনী হইয়াছ বলিয়া কি বালুচরের চেলী দিয়া পূজার কাজ সারিবে, আমাদের বয়ন করা কাপড় লইবে না? বিদেশের কাপড় আনিয়াছ, ভাল কথা, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তাঁতের কাপড় তোমাকে লইতে হইবে। গ্রামের শিল্পীর পোষণ পালন করিতে না পারিলে বা সে পক্ষে অবহেলা করিলে যে মায়ের পূজা সিদ্ধ হইবে না, মা ত তোমার একলার নহে। মহারাজ নন্দকুমার তখন নূতন বড় মানুষ। তিনি গ্রামের তন্তুবায়দিগের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। দলে তন্তুবায়ের দল তাঁহার বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট করিল, ক্রমে সে ঘট উত্তর, কাচ ও দক্ষিণ রাঢ়ের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া আসিল; পশ্চিম বাঙ্গালার তন্তুবায় সমাজ পণ করিল যে, মহারাজ নন্দকুমারকে আমরা কাপড় যোগাইব না; ক্রমে অন্য শিল্পী জাতি সে ধর্ম্মঘটে যোগ দিল। বৎসরেকের মধ্যে মহারাজ নন্দকুমারের এমন দশা ঘটিল যে, পশ্চিম ও মধ্য বাঙ্গালার কোন হাটে বা গঞ্জে তাঁহাকে কেহ কাপড় যোগাইত না; গ্রামে প্রবেশ করিতে তিনি পারিতেন না; মুটে মোট বহিত না, নাপিত কামাইত না, ধোপা কাপড় ধৌত করিত না। অথচ তখন মহারাজ হুগলীর ফৌজদার এবং মুর্শিদাবাদের নিজামতীয় নায়েব

দেওয়ান। শেষে মহারাজকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইল যে, আমি প্রায়শ্চিত্ত করিব। মহারাজের উপর প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা এই হইল যে তিনি এক লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন এবং সবশাখ ও অন্য শিল্পীসাধি সকলকে জগন্নাথ দেবের আটকে ভোগ খাওয়াইবেন। মহারাজ বল্লালসেনের এই প্রায়শ্চিত্ত রাঢ়দেশে একটা বড় সাঁতের ব্যাপার হইয়াছিল; নানা অঞ্চলের ছড়া এবং পাঁচালী এই উপলক্ষে রচিত হইয়াছিল। একটা ছোট ছড়া আছে,—

"ভাদুরের নন্দকুমার,
সব বামুন কদুরে গুমার।
কেউ গেলে মাছের মুড়ো,
কেউ খেলে বন্দুকের ছড়ো॥"

মোট কথা এই, 'বর্ণ' হিসাবে জাতির প্রয়োগ বাঙ্গালায় কখনই হইত না; জাতি বলিলেই বৃত্তি বুঝাইত, ব্যবসায় বুঝাইত। এক জাতি হইতে একঘরিয়া হইলে লোকে দেশান্তরে যাইয়া অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অন্য জাতিভুক্ত হইয়া থাকিত। সেকালের জাতিবিষয়ক প্রবচনগুলির আলোচনা করিলে এই সিদ্ধান্ত কথাই সপ্রমাণ হইবে। একটা উদাহরণ দিব,—

"জাত হারালে কায়েত"

ইহার প্রকৃত অর্থ এই, শিল্পী বণিক জাতীয় কেহ বৃত্তিচ্যুত হইলে কায়স্থ দলভুক্ত হইত। মৌলিক কায়স্থ তাহারাই যাহারা মূলতঃ কায়স্থ জাতির পুরোধা করিত, যাহাদের ছানিয়া ছাঁকিয়া কুলীন গজাইত। এই মৌলিক কায়স্থ সমাজের বিশ্লেষণ করিলে এখনও বেশ ধরা যায় যে, অনেক বণিক, শিল্পী, শ্রেণী এই বাহাত্তর ঘরের আশ্রয়ণে আত্মগোপন করিয়া আছে। তাহা ছাড়া স্বাভি অর্থে বৃত্তি, কায়স্থ জাতির কোন নির্দ্দিষ্ট শিল্পগত বৃত্তি নাই। আমরা দেখি কবিরাজ, জমীদার, পাটোয়ারী, চাকুরে, ভৌমিক,—কায়স্থ কয়ে না কি? কায়স্থের মধ্যে রাজপুত আছে, ক্ষত্রিয় আছে, বৈদ্য আছে, ব্রাহ্মণ আছে; অথচ জাতির হিসাবে কায়স্থের কোন নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি নাই। তাই এই বচন হইল—জাত হারালে কায়েত! আর একটা প্রবচন আছে,—

"ধানে আমন, জেতে বামুন!"

ইহার অর্থ ইহা নহে যে, ধানের মধ্যে যেমন আমন ধান শ্রেষ্ঠ, জাতির মধ্যে তেমনি ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। আমনের চাষে যেমন অতি পরিশ্রম করিতে হয়, ব্রাহ্মণ

বোয়া নিজের প্রকৃতি কত কি করিতে হয়, তেমনই ব্রাহ্মণ জাতিয় চাষে বা সৃষ্টিতে, বিস্তৃতিতে ও পুষ্টিতে বহু পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়। পুরাতন কুলজী গ্রন্থে, বিশেষতঃ এভু মিশ্রের পাতড়ায় এই সিদ্ধান্ত কথা, স্পষ্ট ব্যাখ্যাত রহিয়াছে। এই ছোট একটী প্রবচনে কত বড় সামাজিক রহস্য লুকান আছে, তাহা ভাবিয়া দেখ দেখি।

আমাদের এই বৃত্তিগত জাতিভেদের মূলে গণতন্ত্র বা ডিমক্রাসি প্রকট হইয়া আছে। জাতির গণ্ডীর মধ্যে ধনী নির্ধনের বিচার নাই, পণ্ডিত মূর্খের বৈষম্য নাই, সবাই সমান অধিকারে অধিকারী। আবার কোন জাতিই অপর কোন জাতি হইতে ন্যূন নহে; প্রত্যেক জাতিই Self-sufficient and self-contained. এমন কি ব্রাহ্মণ জাতিকেও অপর জাতি, জাতির হিসাবে বড় বলিয়া মান্য করে না; ব্রাহ্মণ যজন যাজন করেন, গুরু-পুরোহিতের কাজ করেন তাই পূজনীয়। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারের মধ্যে জাতির হিসাবে ব্রাহ্মণ জাতিকে খুব বড় করিয়া ধরা হইয়াছিল বটে, পরন্তু বাঙ্গালার অন্য সকল প্রদেশে ও খণ্ডে ব্রাহ্মণের জাতির হিসাবে, এতটা আদর ছিল না। এমন কি স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের ব্যবস্থা বাঙ্গালার সর্ব্বত্র মান্য হয় নাই।

ভাষা ছাড়া সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথা ইঙ্গিতে আমি বলিলাম। সে সমাজ নাই, তাহার স্মৃতি ও সজীব নাই, সকল কথা গোছাইয়া বলিতে হইলে একখানি বিরাট সামাজিক ইতিহাস রচনা করিতে হইবে। অসীম দিদিমার কাহিনী শুনিবার মতন, সেই ভাবী ও ভাব্য ইতিহাসের জন্য গোটাকয়েক উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিয়া যাই। তোমরা মাঝে মাঝে একটা 'হুঁ' বলিলে আমি পরিতৃপ্ত হইব।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাহিত্যে আবর্জ্জনা।

সাহিত্য জাতির সভ্যতার পরিচায়ক। জগতে যে জাতির সাহিত্য যত উন্নত সেই জাতি সেই পরিমাণে সভ্য বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়া থাকে। বহু প্রাচীন জাতির অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে, কিন্তু আজিও তাহাদের সংরক্ষিত সাহিত্যে তাহাদের মানসিক উন্নতি-সাধনের পরিচয় পরিস্ফুট। স্থাপত্য-শিল্পও এ বিষয়ে জাতীয় সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। প্রাচীন আর্য্যহিন্দু, চীন, পারস্যিক, চাল্দীয়, আসিরীয়, মিসরীয়, ফিনিসীয়, বাবিলোনীয়, গ্রীক বা রোমান জাতির চরম সভ্যতার নিদর্শন আজিও তাহাদের সংরক্ষিত শিল্পসাহিত্যে জাজ্বল্যমান। সুতরাং জাতীর নবজাগরণের দিনে জাতীয় জীবনে জাতীয় শিল্পসাহিত্যের প্রভাব যে বহুদূর-বিসারী হইবে, তাহাতে সন্দেহযাত্র নাই। এই প্রভাবের দুইটী দিক আছে, একটী শুভ অপরটী অশুভ।

যখন জাতি বহুকালের সুষুপ্তির অবসাদের পরে নবজাগরণের মোহ-মদিরায় উন্মত্ত হইয়া উঠে, তখন পদে পদে তাহার পদস্খলনের সম্ভাবনা হয়। বন্ধন-মুক্ত বৎসতরের মত সে তখন নর্ত্তন-কুর্দ্দন-উল্লম্ফন করে। সে সময়ে তাহার সাহিত্যেও ঐ উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব পরিলক্ষিত হয়। তখন তাহার সাহিত্য অবাধ, স্বচ্ছন্দ ও অনিয়ন্ত্রিতগতি হইয়া থাকে। তখন তাহার সাহিত্যের Liberty বা স্বাধীনতা Licesenএ অর্থাৎ অনাচার অত্যাচারে পরিণত হয়। কিন্তু সমাজবন্ধন সুশৃঙ্খলিত সুনিয়ন্ত্রিত রাখিতে হইলে যেমন সমাজবদ্ধ জীবের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সঙ্কোচসাধন করা কোনও কোনও ক্ষেত্রে আবশ্যক হয়, পূর্ণ ও আদর্শ সাহিত্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইলেও তেমনই ভাব ও ভাষার উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করা আবশ্যক হয়। স্বচ্ছন্দ ও অনিয়ন্ত্রিতগতি ভাব ও ভাষার একটা duty ও obligation আছে। সেই duty না মানিয়া ভাবের সৎসাহিত্যের প্রচার না হইয়া সাহিত্যে আবর্জ্জনার প্রলয় বৃষ্টি হইয়া থাকে। সাহিত্যের প্রভাব জাতির জীবনে শুভ বা অশুভ—একটা না একটা—ফল উৎপন্ন করিয়া থাকে; সৎসাহিত্য বা সাহিত্যে আবর্জ্জনা জাতির জীবন ও প্রকৃতিানুযায়ী গঠন করিয়া থাকে। সুতরাং উন্নীয়মান বা উন্নতোন্মুখ জাতির পক্ষে নিজস্ব সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি নির্ণয় করিয়া সংসার-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া

কর্ত্তব্য। যে সাহিত্যে Liberty, Licenseএ পরিণত হইয়াছে, যাহাতে যম, নিয়ম বা শৃঙ্খলা মানিত না হইয়া স্বেচ্ছাচারের তাণ্ডবনর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে, সেই সাহিত্য পরিবর্জ্জন করা উন্নতিকামী নবজাগরিত জাতির পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। সংযত সাহিত্য জাতির সংযমের ও যোগসাধনার পরম পবিত্র পথ-প্রদর্শক।

সাহিত্যের একটা দিক লোকচরিত্র-গঠনের সহায়ক। সে দিকটায় উপন্যাস ও কাব্য-নাটকের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত। জাতির জীবন-স্রোত যখন যে খাতে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার সাহিত্যের উপন্যাস ও কাব্যনাটকে সেই ধারাই প্রতিফলিত হইয়াছে। ভারতের আর্য্যসভ্যতার প্রভাতে বীর্য্যোৎকর্ষের দিনে রামায়ণ, মহাভারতের সৃষ্টি; পরাধীনতার দিনে নিকৃষ্ট কাব্যনাটকের প্রাচুর্য্য। আবার যখন হিন্দুকুলসূর্য্য শৌর্য্যবীর্য্যগুণাগ্রগণ্য বিক্রমাদিত্যের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়, তখন ভারত সাধুসতকুলের কোকিল কালিদাসের অভ্যুদয়। তাহার পর চির পরাধীনতার যুগে সাহিত্যে কেবল রমণীসুলভ ক্রন্দন, অমর বৈষ্ণব কবির মধুময় কাব্য-সাহিত্যেও কেবল নারীজনসুলভ কোমলতা, করুণা, বা হৃদয়ভাবী ক্রন্দনের অভিব্যক্তি। স্বাধীন জাতির বীরদর্পে ভাষিত সেই গম্ভীর মৃদঙ্গনাদ নাই,

"This England never did
Nor ever shall,
Lie at the proud foot of a conqueror, etc."

ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে ইংলণ্ড বীরসেবিত, তখন তাহার নির্ভীক সাহসী নাবিক ড্রেক, ফ্রবিসার, র‍্যালে প্রভৃতির পদভরে পৃথিবী কম্পান্বিতা, তাই তখন তাঁহার সাহিত্য জীবন্ত স্বদেশপ্রাণতার মদিরায় নিষিক্ত। দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে বিলাসব্যসন ও কুৎসিত রীভৎসরসে ইংলণ্ড নিমগ্ন, তাই তৎকালীন সাহিত্যে সেই ধারাই প্রতিফলিত। রাণী এনের রাজত্বকালে লোকসমাজে কেবল অস্বাভাবিকতা, স্ত্রীপুরুষ উভয় (পরচুল) পরিধান করে, বাহির দলের পোষাক পরিধান করে, কথাবার্ত্তাও একটিংয়ের ধরণে হয়, তাই পোপ ড্রাইডেনের সাহিত্যে কেবল কৃত্রিমতা, কেবল অস্বাভাবিকতা দেখিতে পাওয়া যায়।

আমাদের নবজাগরণের দিনে আমাদেরও জাতীয় সাহিত্যে একটা নূতন ভাবের বন্যা আসিয়াছে। চারিশতাধিক বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় যখন শ্রীচৈতন্য-

দেব প্রেমের বন্যা আনিয়া দেশ প্লাবিত করিয়াছিলেন, তাই দেশের গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, সমাজে সমাজে, মধুর হরিনাম-গানের বন্যা বহিয়াছিল, বাঙ্গালী তাহাতে ডুবিয়া মজিয়া নিজকে ধন্যজ্ঞান করিয়াছিল। আজ বাঙ্গালীর শান্ত সন্তুষ্ট নিরীহ জীবনে ভিন্ন স্রোত বহিয়াছে। বাঙ্গালীর সেই শান্ত নিরীহ ভাব নাই। প্রেম বা সখ্যের ভাব নাই। এখন বাঙ্গালী আনন্দমঠের সন্ন্যাসীদের মত "জেগেছে আজ মায়ের ডাকে।" সে জাগরণের পূর্ব্বের সেই সদা সন্তুষ্ট শান্ত সংযত ভাব কোথায় অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। তাহার স্থানে আশায় বুক বাঁধিয়া প্রাণে বাঙ্গালী বিভোর, বাঙ্গালী এক দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত।

এই ভাব পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর সাহিত্যেও এক নূতন ভাব দেখা গিয়াছে। চিরপরাধীন জীব বন্ধনমুক্ত হইলে যেমন উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে, তেমনই বাঙ্গালীর সাহিত্যের ভাব ভাষা উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল হইয়া অবাধ-গতিতে চলিয়াছে। সে গতিতে বাধা দিবার কেহ নাই; সুতরাং ইহার পরিণাম কি হইবে, তাহা সাহিত্যের ভাগ্যবিধাতাই বলিতে পারেন।

কাব্য-নাটকে বা গল্প-উপন্যাসে লোকচরিত্র বিস্তার প্রকৃষ্ট সুযোগ পাওয়া যায়। উহার মধ্যে উপন্যাসে বা গল্পে জনসাধারণের সমধিক অনুরাগ বেশী; গল্প-উপন্যাস যত পঠিত হয়, এত আর কিছুই হয় না। সুতরাং সেই গল্প-উপন্যাসে যদি ভাব ভাষা কালধর্ম্মে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল অসংযত হইয়া বক্রগতি স্রোতে পরিণতিতে প্রধাবিত হয়, তাহা হইলে উহা সমাজের পক্ষে কিরূপ ভয়ঙ্কর অনিষ্টকর হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়।

আমাদের সাহিত্যে—বিশেষতঃ গল্প-উপন্যাসে সম্প্রতি এমনই একটা অবস্থা আসিয়া পড়িয়াছে। ইহা কতকাংশে যেমন নবজাগরণের ফল, তেমনই পাশ্চাত্য বিদেশী আদর্শানুকরণ-চেষ্টার ফল। নবজাগরণের ফলে, নব আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রেরণায় যেমন সীমাবদ্ধ শৃঙ্খলিত মন বন্ধনমুক্ত শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া উন্মুখ অনন্ত আকাশে উড়িয়া বেড়াইতে সমুৎসুক, তেমনই লেখকেরা ভাব ও রূপের এতদিন প্রাচীন নিয়ন্ত্রিত সমাজবন্ধনের কঠিন নিগড়ে খাসরুদ্ধের মত থাকিবার পর হঠাৎ এই রাষ্ট্রবন্ধু রবে রাধা আশা-আকাঙ্ক্ষার নবজাগরণের দিনে সকল বাধা-বিঘ্ন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ বিহারে আত্মসচেতন হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু ফল তাহার বিষময় হইতেছে। পবিত্র স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দিলে সাহিত্যে আবর্জ্জনা আসিয়া পড়িবেই। খুবেই হইয়াছে,

কতকটা কালধর্ম্মের ফলে সাহিত্যে আবর্জ্জনার প্রভাব বিস্তৃত হইতেছে, আবার কতকটা বিদেশী আদর্শানুসরণেও সমান ফল ফলিতেছে। উপন্যাসে আমরা ইংরাজের শিষ্য, একথা স্বীকার করিলে বোধ হয় আমাদের জাতীয় সম্মানের ক্ষুণ্ণ করা হইবে না। আর ক্ষুণ্ণ হইলেও সত্য অস্বীকার করা সঙ্গতপর নহে। বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রও একথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সেই ইংরাজের উপন্যাসের অনুকরণে আমাদের জাতীয় সাহিত্যে উপন্যাসের সৃষ্টি দোষের কথা নহে। কিন্তু ডিকেন্স, স্কট, লিটন, থ্যাকারে প্রভৃতির উপন্যাসে চরিত্র-সৃষ্টি যে ভাবে হইয়া গিয়াছে এবং উহাতে লোকশিক্ষা ও সমাজসংস্কার যে ভাবে ঘটিয়াছে, আধুনিক য়ুরোপীয় উপন্যাস-সাহিত্যে সে ভাবে হইতেছে না ইহাই দুঃখ। সে সব "ক্লাসিক" চরিত্র, সকল দেশের সকল সমাজে সকল সময়েই আদর্শ দিয়া থাকিতে পারে। এখনকার Blue-stockingএর যুগে, free-thinking society women ও suffragistsএর প্রভাবের দিনে, ইংরাজী উপন্যাস ও গল্পসাহিত্যের গতি-প্রকৃতিও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। য়ুরোপীয় সমাজে রমণীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা মতের স্বাতন্ত্র্য নিন্দনীয় নহে। কিন্তু সেই স্বাধীনতা যদি তাহার duty ও obligationএর গণ্ডী ডিঙাইয়া অথবা মাত্রা অতিক্রম করিয়া ধর্ম্ম ও দেশাচার-সম্মত বিবাহ-সংস্কার অথবা স্ত্রীপুরুষের পরস্পর মিলনের পবিত্রতা সন্দেহসঙ্কুল ও বিচারসাপেক্ষ বলিয়া ধারণা করে, তাহা হইলে তাহা যে সমাজের শৃঙ্খলার পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ উপন্যাস ও গল্পসাহিত্যে যদি এই ভাবের পরিপুষ্টি ও অভিব্যক্তি সাধিত হয়, তাহা হইলে যে সেই সাহিত্য জাতির বা সমাজের অতি প্রাণহানিকর হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিষভোজন যদি সদ্যঃপ্রাণহানিকর হয়, তবে সাহিত্যের এই বিষভোজন সমাজের প্রাণহানিকর হইবে না কেন?

বিখ্যাত ফরাসী-লেখক অক্টাভ্ মীর্বো ফরাসী সাহিত্যে আবর্জ্জনার প্রভাব দেখিয়া দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, এমন সাহিত্য দূরে অতি করিতেছে বলিয়া আনন্দপ্রকাশ না করিয়া উহার মৃত্যুকামনা করা কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ সাহিত্যের এই অবস্থা হওয়া অপেক্ষা "কর্ম্মনাশা জলে" সেই সাহিত্যের বিসর্জ্জন দেওয়াই দেশের ও সমাজের পক্ষে মঙ্গল। আমাদের সাহিত্যেও—বিশেষতঃ উপন্যাস ও গল্পসাহিত্যে—এমনই একটা আবর্জ্জনার ঢেউ আসিয়াছে। এ ঢেউয়ের পৃষ্ঠপোষক অনেকে। কলাবিভবের মধ্যেও এই সাহিত্যের স্থানক

অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। দেশের ও সমাজের রুচি বিকৃত না হইলে এরূপ অবস্থা সম্ভবপর হয় না। এ রুচিবিকার বন্ধনমুক্ত উচ্ছৃঙ্খল উদ্দাম যথেচ্ছাচার ও দুরন্ত ভাবাতিব্যক্তির পরিচায়ক নহে কি? এই সমাজের সর্ব্বনাশকর উচ্ছৃঙ্খল-প্রতিবাদ করিবার সামর্থ্যও সমাজ হারাইয়াছে। আজ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে'র চাঁবুক থাকিলে এমন উচ্ছৃঙ্খলতা কখনই মার্জ্জনা লাভ করিত না।

একটা ধুয়া উঠিয়াছে Nature Painting. পাপ যতই নিন্দনীয় হউক, পাপের স্পষ্ট স্বাভাবিক চিত্র চক্ষুর সম্মুখে ধারণ করা এবং তৎপ্রতি পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করা সাহিত্যিকের উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য! যেন Dickens, Scott, বঙ্কিম কখনও Nature paint করেন নাই। যেন তাঁহারা সমাজের সব ভাল দিকটা দেখাইয়া গিয়াছেন। মন্দ দিক কিছুই দেখান নাই! বঙ্কিম-চন্দ্রের অমর লেখনী "কৃষ্ণকান্তের উইলে" নরীভটে গোবিন্দলাল ও ভোমরের ছাপ-চিত্র অঙ্কিত করিবার সময় কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। তাই বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন :—

"এইখানে যবনিকাপতন করিতে ইচ্ছা হয়। যাহা অশ্লীল, অদর্শনীয়, তাহা আমরা দেখাইব না—যাহা নিতান্ত না বলিলে নয়, তাহাই বলিব।"

ইচ্ছা করে, এই কথা কয়টী বঙ্গের সাহিত্য-মন্দির-দ্বারে সুবর্ণাক্ষরে লিখিয়া দিই। বঙ্কিমচন্দ্রের মত বাঙ্গালা উপন্যাস সাহিত্যে কেহ Natureকে অবলম্বন করিয়া সুন্দর ও স্বাভাবিক চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া জানি না। অথচ তিনিই Nature painting সম্বন্ধে যাহা অশ্লীল, অদর্শনীয়, তাহা পরিবর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার Nature painting বা চরিত্রসৃষ্টির Art মারা পড়ে নাই। সুতরাং Natureকে follow করিতেছি,—এই দোহাই দিয়া যাহারা উপন্যাস ও গল্পসাহিত্যে আবর্জ্জনা—বিষ আমদানি করিতেছেন, তাঁহারা পরোক্ষভাবে নরহত্যা-পাপে অপরাধী; কেন না লেখার দ্বারা মানুষের soul হত্যা করা অস্ত্রের দ্বারা মানুষের দেহ হত্যা করা অপেক্ষাও ভীষণ। কলমের দ্বারা একটা মানুষ বা কতকগুলা মানুষ এক সময়ে নিহত হয়, আর সাহিত্যে আবর্জ্জনা-বিষ দ্বারা একটা জাতি বা সমাজের সমস্ত বয়স্ক পুরুষ ধরিয়া জর্জ্জরিত ও কলুষিত হয়।

এই যে জোলা-চোরা গাদাভরা Nature painting এর কথা,—এটা ফরাসীয় সাহিত্যের ধার করা। (Zola) তাঁহার Nana বা Nana's Daughter প্রভৃতে Nature paint করিয়াছেন; গাদাটা তাঁহার ইবসেনের প্রেতে

ভঙ্গীতে Nature paint করিয়াছেন; এইরূপ Victoria Cross, Rex Beach, Grant Allen, Ethel M. Dell, Charles Garvice, প্রভৃতি ইংরাজ নর ও নারী উপন্যাসকার nature paint করিয়াছেন। অতএব আইস আমরাও Nature paint করিতে লাগিয়া যাই, পাপের উলঙ্গ মূর্ত্তিটাকে আমাদের ছবের ঝি বউ বালক-বালিকা সকলকে দেখাইয়া দিই, তবেই না আমরা genius হইবার দাবী করিব!—এই ভাবটা যেন সভ্যই আধুনিক এক শ্রেণীর উপন্যাসকারের অস্থিমজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই আধুনিক free thinking য়ুরোপীয় নর ও নারী উপন্যাসকারের সমাজচিত্র আমাদের প্রকৃত সমাজচিত্র হইতে যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে। আমাদের অপেক্ষাকৃত সাত্ত্বিক আহারে অভ্যস্ত সমাজে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে অসাধারণ সহিষ্ণুতা, সংযম ও ধৈর্য্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে; কিন্তু মদ্যমাংসাহারী য়ুরোপীয় সমাজে ধৈর্য্যচ্যুতি ও সংযমভঙ্গ পদে পদে ঘটিয়া থাকে। তাই তাহাদের সমাজে অবিবাহিতা বালিকা প্রেমের সরল স্রোতে বাধা পাইলে রোষে ক্ষোভে আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তিতে বলিয়া থাকে "Oh, I cannot bear, I cannot bear!" কিন্তু আমাদের দেশের আধুনিক কোনও প্রথিতযশা উপন্যাসকার ইহার অবিবাহিতা বাঙ্গালী নায়িকার মুখে Charles Garviceএর এই কথাটা ঠিক তাহাতুরিত করিয়া লিখিয়াছেন, "আর পারি না, আর পারি না!' এই ভাবভঙ্গী আমাদের সংযমের দেশে মেয়েছেলেদের শিখান কি ভাল? এই শ্রেণীর লেখক আমাদের দেশের রমণীকে সম্পূর্ণ free thinking, নির্লজ্জা, উদ্ধতা, ও বাকসংযমহীনা করিয়া independent য়ুরোপীয়ান গার্ডেসে সাজাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। স্বামী বা প্রণয়ীর সহিত সকল বিষয়েই টেক্কা দিব, বিদ্যাবুদ্ধির ভান ঠোকাঠুকি করিব, আমার ভয়ে গৃহস্থের। সদাই কম্পান্বিত-কলেবর হইয়া থাকিবে, তাহা হইলেই আমি আদর্শ heroine হইব,—ইহাই ইহাঁদের চরিত্রসৃষ্টির পরাকাষ্ঠা Charles Garviceএর heroine প্রায় এই ভাবেরই। দুঃখের বিষয়, এই ভাবের heroineই এখনকার কৃতবিদ্য যুবকেরা পছন্দ করিয়া থাকেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীঃ—

আলোচনা।

পৌষ-পার্ব্বণ।

পৌষ-পার্ব্বণই আমাদের বড়-দিন, বাঙ্গালীর কেষ্ট-উৎসব। যখন বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ-কায়স্থ সকল জাতিই কৃষিপ্রধান ছিল, তখন পৌষপার্ব্বণের খুবই ধুম ছিল। এখনও যাহারা কৃষী, যাহারা চাষ-আবাদ করে এবং গ্রামে বাস করে, তাহাদের মধ্যে পৌষপার্ব্বণের আনন্দ-উৎসব খুব আছে। ইহা উপবাসের উৎসব—উপবাসের নহে; আস্‌কে পিটে, পুলি, সকচাকলী, মুনচিকুরী, গোকুল পিঠে প্রভৃতি অসংখ্য রকমের পায়স পিষ্টক পৌষসংক্রান্তিতে তৈয়ার হয়। সহরের ঠাকুরাণীরা আস্‌কে পিঠে গড়িতেই পারেন না, কোনরকমে দুবেলা দুটি খান। নূতন চাউল, কলায়ের ডাল, মুগের ডাল, নারিকেল, খেজুরের গুড় ও তিল—ইহা হইল পিষ্টকের উপাদান। চাল, ডাল, তিল কোটার সে আনন্দই কত, সে নাচ গান, কবি-ছড়া তর্জ্জার উল্লাসই কত! ধনীদরিদ্রনির্ব্বিশেষে সবাই সমানভাবে এই উৎসবে যোগ দিতেন। আজ-কাল সহরবাসী, পৌষ-পার্ব্বণের ধার ধারেন না; ফলে উহা এখন দরিদ্র গ্রামবাসীর উৎসবে পরিণত হইয়াছে। যখন কলিকাতায় আরও অধিক মাত্রায় হিন্দুয়ানী ছিল, তখন এই পৌষ-সংক্রান্তির দিন খুব নিমন্ত্রণ হইত, থালা-পিলা চলিত, পায়স পিষ্টকের মালসসলা উপঢৌকন পাঠান হইত। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পৌষপার্ব্বণের কবিতা লিখিতেন। এখন আমরা সভ্য হইয়াছি, জাতির মহোৎসবগুলি মন রাখিয়া করিতেছি।

তোমরা "যেমন্ত্র খিল্‌ড্রিং" খেয়ে গগন পবন মুখর করিতেছ, কিন্তু আমাদের যে সকল উৎসব-উল্লাসে ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ, পণ্ডিত মূর্খ, সবাই সমানভাবে যোগ দিত, সে সব উৎসব-উল্লাস তোমরা এখন ছাড়িতেছ। হয়ের দিক্ দিয়া সমাজের দিক দিয়া যে সব উৎসব-আনন্দে ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে সমান ভাবে উল্লাস প্রকাশ করিত, সেসব বন্ধ হইতেছে; যে সকল উৎসবে ধনী দরিদ্রের, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালের একত্র মিলন হইত, সে সব উঠিয়া যাইতেছে। কোথায় কলুষ-কুর্দ্দান, টাকার ঝঞ্ঝন, ইংরেজি বিদ্যাবিজ্ঞতার আস্ফালন হইতে কবি

ভাষা ভূষার সহিত, যাহারা জাতির মেরুদণ্ড মেরুদণ্ড তাহাদের সহিত সকল সম্পর্ক পরিহার করিতেছে। সে কালের ব্রাহ্মণ কায়স্থের মতই জাত্যভিমান থাকুক না, মতই আচার-নিষ্ঠা থাকুক না, তাহারা কখনই দরিদ্রকে ভুলিতেন না। এই পৌষ-পার্ব্বণের দিনে হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, গ্রামে গ্রাম্য অধিবাসীর ভবনে একত্র সমবেত হইতেন, এক সঙ্গে কবির গান শুনিতেন, হুঁকা খাইতেন, চাউল গুড় চুড়িয়া মাখামাখি করিতেন। সে কালের দাদা ঠাকুর ব্রাহ্মণ, গোসাঁই, বসুরা আপন কুটিরে ও দরিদ্র প্রতিপালন—দরিদ্রের অন্নদাতা ছিলেন, তাই সেকালে সমাজ সরল ও সতেজ ছিল, সমাজের সংহতি-শক্তি প্রবল ছিল। আর এই কালে গোসাঁই সহরে বাবু, বড় মানুষ, সেকালের দল সব সাহেবী ধাঁচের টবের ফুল হইয়া আছে, দরিদ্রের সংস্পর্শে আসিতে চাও না, দরিদ্রের ছায়া মাড়াইতে চাও না। এই পৌষ-পার্ব্বণের আনন্দের দিনে বড় দুঃখে এই সব বেদনার কথা বাহির হইতেছে। হৃদিন জাতির ছোঁয়া জল ও খাইতে চাও, পরন্তু সে সভ্যতার ও অভ্যাসের গাঢ় আলিঙ্গনে তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ, উচ্চ আত্মীয় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যগণ সমাজটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতেন, সে সভ্যতা, সে সমবেদনা, সে স্নেহ, দরিদ্র সেবার সে শক্তি-সামর্থ্য, উৎসব-আনন্দের উপদ্রব পরিপূর্ণতা তোমাদের আছে কি? থাকিলে,—পৌষটা এমন উৎসবশূন্য হইত না।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিরাশী বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ করিয়া ঠাকুর বাড়ীর সাহেব বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর গত ২৩শে পৌষ সোমবার রাত্রি তিনটায় পর লোকধামে চলিয়া গিয়াছেন। ঠাকুরবাড়ীর দুইজন সন্তান প্রথম বাঙ্গালী সিবিলিয়ান—তন্মধ্যে প্রথম বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম বাঙ্গালী সিবিলিয়ান ছিলেন, ১৮৬৩ সালে তিনি সিবিল সার্ভিস পাশ হইয়া বাহির আসেন; তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য বেলগেছের বাগানে এক বিরাট সভা-সম্মেলন হইয়াছিল, ঠাকুরবাড়ীর প্রথম বিলাত-ফেরত সিবিলিয়ান বলিয়া কলিকাতার পদস্থ সমাজের অনেকে সোহাগ করিয়া তাঁহাকে সাহেব বলিয়া ডাকিতেন। সত্যেন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র, জ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথ এখনও জীবিত আছেন। সত্যেন্দ্রনাথ ১৮৪১ কি ৪২ সালের গোড়ায় জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী; আমাদের যাবতীয় প্রথম চৌধুরী তাঁহার জামাতা। পুত্র পৌত্র কন্যা জামাতা রাখিয়া অশীতিবর্ষ কাল সুখে ও সম্মানের জীবন অতিবাহন করিয়া সজ্ঞানে মাথ নিত্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। এমন মরণ ত ঈর্ষিত; সুতরাং তাঁহার সুখের ও পুণ্যের পরিচায়ক এমন শ্লাঘার মৃত্যুর সমাচার পাইয়া আমরা কেহ কোনো বিলাতী ঢঙ্গে শোক প্রকাশ করিতে পারিলাম না! এমন নিরাময় সুখী আত্মার লোকান্তরিত হইবার পরে যা হতাশ করিলে সে আত্মার আভিজাত্যে বেদনা পহুচে।

তবে ঠাকুরবাড়ীর একটা মাথা গেল—একজন যুগপ্রবর্ত্তক পুরুষ বিদায় গেল। সত্যেন্দ্রনাথ প্রথমে নিজ গৃহে, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে, তবে তাহারই অনুকরণে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ কায়স্থভদ্র ও মধ্যস্থ গৃহে মহিলাদের মধ্যে সিমিজ, বডিস্, জ্যাকেট প্রভৃতির প্রচলন করেন। আজকালকার ছেলেরা জানে না, বোধ হয় অনুভব করিতেও পারে না যে, পঞ্চাশ, ষাট বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার ভদ্রমহিলা সকল সেলাই করা জামা, বডিস্ পরিতেন না। সত্যেন্দ্রনাথই সিমিজ-সেলুকার প্রথম প্রচলনকর্ত্তা। সত্যেন্দ্রনাথই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কন্যা ও বধূদিগকে স্বাধীনতা দান করেন। স্ত্রী স্বাধীনতা, স্ত্রী জাতির বসন ভূষণের প্রাচুর্য্যপ্রয়োজন সত্যেন্দ্রনাথই ঘটাইয়াছিলেন। তিনিই ঠাকুরবাড়ীর অবরোধের কর্ত্তা ও মূল প্রবর্ত্তক ছিলেন। পরে ঠাকুরবাড়ীর দেখাদেখি কলিকাতায় সকল বড় ঘরে চলে, শেষে উহা শিক্ষিত বঙ্গীয় সমাজে আদরের স্থান পায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে কোন প্রচেষ্টাই নিজে করেন নাই, তিনি পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের প্রয়াসে বাধা ঘটান নাই। কাজেই সত্যেন্দ্রনাথকেই বাঙ্গালার সজ্জনসমাজের মূল সংস্কারক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়।

এখনকার ছেলেরা জানে না যে, ১৮৬৫ সাল হইতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত কলিকাতায় বিদ্বজ্জনসমাজে ঠাকুরবাড়ীর প্রভাব কত প্রবল ছিল। সে প্রভাবের মূলে সত্যেন্দ্রনাথের মনীষা বাহুশিয়াল কাজ করিয়াছিল। সাজে-পোষাকে, ভাবে-ভাষায়, চলন-ফিরন-বলন সকল ব্যাপারে ঠাকুরবাড়ীর একটা বিশিষ্টতা ছিল; ঠাকুরবাড়ীর সাহিত্য, ঠাকুরবাড়ীর ভঙ্গী, ঠাকুরবাড়ীর শিষ্টাচার সকল রকমেরই ভিন্ন। মহর্ষিদেব এই বিশিষ্টতার মধ্যেও সুবিমুখী ফুলের মত মুটিয়া উঠিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ

কিন্তু উহার গোড়া ছিলেন। যাহারা গোড়ার প্রথম তিন চারি বৎসরের 'ভারতী' মাসিকপত্র পাঠ করিয়াছে, তাঁহারা আমাদের এই উক্তির সমর্থন করিবেনই। সত্যেন্দ্রনাথ কেবল সমাজ-সংস্কারকই ছিলেন না, তিনি বাঙ্গালা গদ্য পদ্যে সুলেখক ছিলেন, সুকবিও ছিলেন। ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথের প্রোজ্জ্বল দ্যুতিতে আচ্ছন্ন হইয়া না থাকিলে সত্যেন্দ্রনাথ স্বয়ং একজন বড় কবি, বড় লেখক বলিয়া পরিচিত হইতে পারিতেন। তিনি বহুকাল সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি হইয়া ছিলেন। পাপ রাজনীতিক আন্দোলনের ভস্মাচ্ছাদিত হইয়া অদ্য বাঙ্গালায় ও বাঙ্গালীর সকল বিশিষ্টতা নষ্ট হইয়াছে। দেশ-বন্ধিকেরা যদি আজ বর্ত্তমান থাকিতেন সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে সমাজে একটা বিরাট আলোড়ন উপস্থিত হইত। সে বাঙ্গালা নাই, সে ব্রাহ্মসমাজ নাই, সে হিন্দু-সমাজের বিদ্বজ্জনমণ্ডলী নাই, সে সাহিত্যচর্চ্চা নাই, সে সুরুচির সৃষ্টি নাই, সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে আধুনিক কাহারও ত তেমন টনক নড়িবার কথা নহে। যোড়াসাঁকোর সে ঠাকুরবাড়ী নাই, সে আদিব্রাহ্মসমাজের জাঁকজমকও নাই। তাই সত্যেন্দ্রনাথের দেহকে কাঁওড়াতলার ঘাটে লইয়া চুপি চুপি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাধা করা হইয়াছে। শতদল কমলের মতন যে ঠাকুরবাড়ী কলিকাতার বক্ষস্থলে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কালের প্রভাবে সে ভাবসম্পদ শুকাইতে বসিয়াছে, এখন কমলদল শুষ্ক হইয়া পত্রে পত্রে ঝরিয়া পড়িতেছে। নাম করিবার মতন এখন তিন জন রহিলেন—ঋষিকল্প দ্বিজেন্দ্রনাথ, কবি জ্যোতিরিন্দ্র এবং কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ। সব যাইতেছে—ক্রমে সব যাইবে, সে সুখস্মৃতিটা কি থাকিবে? সে ১১ই মাঘের উৎসব, সে থিয়েটার অভিনয়, সে সাহিত্য-চর্চ্চা, সে হৈহৈ সংসাহিত্যের সে প্রস্ফুরণ, সে সরস হাস্যরস, খানা পিনা, মিষ্টালাপ, সদালাপ, সভ্যতা-ভব্যতার পালিশ—সে সব কি আর ফুটাপি ফুটিবে? ঠাকুর-বাড়ী গিয়াছে, ঠাকুরবাড়ীর সে সৌন্দর্য্য-সংহতি নষ্ট হইয়াছে, এখন বিধাতার ডাকের মুখে এক একজন করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। দুঃখ এই, ক্ষোভ এই,—অতীত স্মৃতির সে সুখমাটুকুও বজায় রহিল না!

জাতি-প্রসঙ্গ।

বঙ্গীয় কর্ম্মকার সম্মিলনীর সভাপতি সুলেখক শ্রীযুত প্রিয়লাল দাস এম এ, বি এল মহাশয় স্বজাতির কল্যাণকর আলোচনা-প্রসঙ্গে কতকগুলি কাজের

কথা বলিয়াছেন। এই জাতীয়তার উন্মেষণের দিনে তাঁহার পরামর্শগুলি যে সময়োপযোগী ও সকলেরই চিন্তাযোগ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"মানব-সমাজ দিন দিন জনতন্ত্রের পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছে। য়ুরোপ ও আসিয়া খণ্ডের প্রত্যেক দেশে প্রজাদের হাতে অল্পবিস্তর রাজশক্তি ক্রমশঃ চলিয়া যাইতেছে। সমাজ মধ্যে এক জন, দুই জন বা দশ বিশ পঞ্চাশ জন লোকে সকল সুখ ভোগ করিবে, সকল সম্পদের অধিকারী হইবে, হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইয়া অবশিষ্ট সকলের বুকের উপর বসিয়া জাঁতা পিষিতে থাকিবে, এই প্রকার বন্দোবস্তে প্রজারা এক্ষণে জীবন ধারণ করিতে অনিচ্ছুক। পৃথিবীর সর্ব্বত্র-চিন্তার নূতন ও প্রবল স্রোত সেই জন্য পুরাতন অব্যবহার্য্য রীতি নীতি আইন কানুন ভাঙ্গিয়া দিতেছে, কুলগৌরব আভিজাত্য মিথ্যা দম্ভকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। ইউরোপ ও আসিয়ার প্রায় সকল দেশের পরিবর্ত্তনশীলতা বলিয়াছে যে উচ্চ নীচের মধ্যে যে আড়াল আছে, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে বৈষম্য রহিয়াছে, তাহাকে সরাইয়া না ফেলিলে মানব সমাজ কোনও কালে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি-সুখ ভোগ করিতে পারিবে না। যত দিন রাজায় প্রজায় ধনীতে দরিদ্রে মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিতে অভ্যস্ত না হইবে ততদিন সমাজের বুকে যুদ্ধের নরকাগ্নি জ্বলিতে থাকিবে। ভারতের বাহিরে এই নূতনতর সমাজতন্ত্রের জয় ডঙ্কা বাজিয়া উঠিয়া স্বাধীনতার যে বার্ত্তা বিঘোষিত করিতেছে তাহাতে ভারতবাসী চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। শান্তিপ্রিয় বাঙ্গালী জাতির চিন্তা-রাজ্যেও যে বিপ্লবের সূচনা হয় নাই, তাহা নহে। চতুর্দ্দিকে রব উঠিয়াছে,—অস্পৃশ্যকে বুকে তুলিয়া নাও, শ্রমশিল্পীর অবস্থার যাহাতে উন্নতি হয় তাহা কর, দরিদ্রের মুখে অন্ন, গায়ে বস্ত্র দাও, যে নিরক্ষর তাহাকে লেখাপড়া শিখাও; যে ব্যাধিগ্রস্ত তাহার শুশ্রূষা কর, ইত্যাদি। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই জাতীয় জাগরণের দিনে বাঙ্গালার জাতির কর্ত্তব্য কি? আমরা অভিব্যক্তিবাদের (evolution) উপরে মানিলা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অগ্রসর হইব —না, আমাদের পরিবর্ত্তিত অবস্থাকে উপেক্ষা করিয়া অন্য পন্থা অবলম্বন করিব? একতা সদ্ভাব ও প্রীতির অনুকূল, সঙ্ঘবদ্ধতা ও সর্ব্বজনীন প্রেমের সম্পূর্ণ উপযোগী। দেশের এখনকার যে অবস্থা আমাদিগকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া রহিয়াছে, তাহার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া কার্য্যকর হইতে যদি নিজেদের চিত্তবৃত্তিকে নীরোগ করে তবেই তাহারা জীবনসংগ্রামে টিকিয়া

থাকিবে, তবেই দয়া মায়া সদ্ভাব ও প্রীতি তাহাদের নৈতিক উন্নতিসাধন করিবে, তাহাদের জাতীয়-চরিত্রকে সবল করিবে। কর্ম্মকারগণ যদি নিজেদেরকে চারিদিকের অবস্থার উপযোগী করিয়া না লয়, যদি তাহারা ভেদজ্ঞান ও বিরোধিভাবের বশবর্ত্তী হইয়া প্রবহমান জীবন্ত স্রোতের বিপরীত দিকে চলে, তাহা হইলে তাহারা প্রাণসিক উন্নতির পরিপন্থী নিকৃষ্টবৃত্তিনিচয়ের পেষণে চূর্ণ হইয়া যাইবে। আপনারা স্মরণ রাখিবেন, প্রেমের শক্তিই মানব-সমাজকে বাঁচাইয়া রাখে, কারণ প্রেমের আকর্ষণে মনুষ্য ব্যক্তিত্ব ভুলিয়া গিয়া সমাজকে সবল-করিয়া তুলে। মানুষ মরে, সমাজ কখনও মরে না। সভা সমিতি সম্প্রদায় ও জাতিবিশেষ মানবী-শক্তি হারাইলে সেইজন্য হীনবল হইয়া পড়ে। ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইলে সংসার উৎসন্ন যায়। আমরা এই যে সমগ্র য়ুরোপের সভ্য উন্নত স্বাধীন জাতিগুলির মধ্যে রণক্রীড়া সেদিন দেখিলাম, তাহা হইতে কি বুঝিলাম? য়ুরোপ এই যুদ্ধে সংহৃত মানবী-শক্তির অপচয় করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতাকে ধ্বংসমুখী করিয়াছে। তাই আজ সকলে মিলিয়া সদ্ভাব ও প্রীতির বাঁধনে য়ুরোপীয় সমাজের ভাঙ্গা হাড়গুলিকে বাঁধিতে চেষ্টা করিতেছে। যুদ্ধই কেবল যে সমাজের দেহ হইতে রক্ত বাহির করিয়া দিয়া সমাজকে নিস্তেজ করে তাহা নহে। যে সমাজে রক্তপাতের সম্ভাবনা নাই, কিন্তু অনৈক্য ও বিরোধ বর্ত্তমান আছে, সে সমাজও শক্তিহীন হইয়া পড়ে। মানব-দেহের ন্যায় সমাজের দেহেও রক্ত চলাচলের পথগুলি বন্ধ হইয়া গেলে সমাজের হৃদপিণ্ড দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; আমার সেই জন্য মনে হয় যে, কর্ম্মকার জাতি যদি বাঙ্গালীজাতির জীবন্ত ইতিহাসের উপদেশ গ্রহণ না করে, যদি তাহারা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে থাকে, যদি তাহারা বিভিন্ন শাখাগুলির ভিতর দিয়া অসাম্প্রদায়িক প্রেমভাবকে সঞ্চালিত না করে, তাহা হইলে কর্ম্মকার জাতির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল শক্তিহীন হইয়া পড়িবে সমাজ তাহা হইলে উপরের দিকে উঠিতে পারিবে না।"

পথের সন্ধান।

ভারতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এ কি হাহাকার,
ওঠে আজি নিশিদিন ধ্ব ন চারিধার
নাই নাই চাই শুধু ; কেবলি অভাব ;
তাই আজি ভারতেব এ দীন হীন ভাব !
হস্ত তা'র শৃঙ্খলিত অধীনতা ফাঁসে
বেদনায় অশ্রুধারা শূন্য বক্ষ ভাসে !
যুগ যুগান্তর হ'তে মুক্তি দিয়ে গড়া
হিয়া যা'র ভ্রমে কভু দেয়নি ক ধরা
কাহারও কঠোর দৃঢ় অধীনতা পাশে ;
চিন্তা যার অন্ত হীন বিমুগ্ধ আকাশে
মুক্তপক্ষ পুলকিত বিহঙ্গের ন্যায়
সতত হিয়ার মাঝে প্রধাবিয়া যায় ;
পূর্ব্বপুরুষেরা যা'র বিশ্বজয়ী বীর ;—
তা'ব দেহ রহে আজ স্পন্দহীন, স্থির !
হিন্দুর সুশুভ্রাকাশে কলঙ্কের মেঘ,—
শান্ত তার বক্ষে হেন ঝটিকার বেগ
কারা আজ সৃজিল রে নিজ ধ্বংস হেতু ;
উদিল যে প্রলয়েব কাল ধূমকেতু !
তোদেরই কবিতে ধ্বংস তাহার উদয় ;
মিথ্যা কিরে সত্যে পারে করিবারে জয় ?
চাস যদি উঠিতে এ মহাপঙ্ক হ'তে—
ফিবাতে জীবন-তরী অনুকূল স্রোতে ;
কর তবে ত্বরা করি সত্যে শুধু ভর,—
স্বার্থ, হিংসা কর তারে সিংহসম ডর ;
হিয়া হ'তে দুর্ব্বলতা, নাশি ক্ষণিকের—

আশা তোর দীপ্ত আলো মুক্ত বিবেকের ;
হৃদয়ের বন্দী ভাব ভেঙ্গে কর খান্ !
সেই তোরে ব'লে দেবে পথের সন্ধান্
আলস্যের নিদ্রা হ'তে জেগে দেখ্ চেয়ে
ক্রন্দন কাঁদনে তোর স্বর্গ হ'তে ধেয়ে
এসেছেন নারায়ণ ল'য়ে চক্র হাতে
দুঃখ ভারে ব্যথিতের অশ্রুবারি-পাতে
হিয়া তাঁর বিগলিত, ব্যাকুলিত আজ,
তাই বুঝি স্বর্গ ত্যজি নাম্র ধরা-মাঝ ;
অত্যাচারী দানবেরে করিতে দমন ;
হানিবেন বিদ্যুতিয়া চক্র সুদর্শন ;
উদ্ধারিতে ভক্তদলে, দেখাইতে পথ ;
করিবারে পূর্ণ তোর জীর্ণ মনোরথ !
নিদ্রা ত্যজি ব'য়ে নেবে হৃদে ভগবান্ ;
টুটে যাবে মোহ, পাবি পথের সন্ধান ॥

শ্রীসুকুমার ভাদুড়ী।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

(জীবনী-প্রসঙ্গ)

(৮)

ভ্রমণ অভিজ্ঞতা ও স্বর্ণলতা রচনা।

Sanitary Commissionerএর অধীনে Vaccination Superintendentরূপে উত্তরবঙ্গের প্রত্যেক জিলায় প্রত্যেক গ্রামে ঘুরিয়া তারকনাথ তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণের কর্ম্ম পরিদর্শন করিতেন। তিনি কখনও পদব্রজে, কখনও বা ঘোড়ায়, কখনও হাতীতে কখনও বা গরুর গাড়ীতে করিয়া কর্ম্মপরিদর্শনে যাত্রা করিতেন। সরকার হইতে গরুর গাড়ীর বন্দোবস্ত ছিল। তিনি অধিকাংশ সময় গোযানেই মফস্বলে যাত্রা করিতেন। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে গরুর গাড়ীতে চড়িয়া যাতায়াত করিতে দেখিয়া একজন জমিদার তাঁহাকে একখানি পাল্কী উপহার দিয়াছিলেন। জমিদারের বাটীর মুমূর্ষু রোগীকে কঠিন রোগ হইতে রোগমুক্ত করিয়া জীবন দান করিয়াছিলেন—তাই কৃতজ্ঞতার উপহার। তারকনাথ তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়াছেন, Zemindar Satcouri Babu gave my usual fee daily for his grandson against my will. 13, Jan, 73. Left for English Bazar. went to see the gsandson of Zemindar. Boy is quite cured. Every one is very glad. Thank God. 15 Jan. 73.

Zamindar Babu present me a 'paiki' against my will. I have no mind to accept it. He gave me my usual fee Inspection report sent to Darjiling. 13 Mar 73.

তারকনাথের দৈনন্দিন-লিপি (Diary) পাঠে জানা যায় যে, তিনি দিনাজপুরে থাকিবার সময় একটী টাট্টু ঘোড়া ও হাতী ক্রয় করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার দৈনন্দিন-লিপিতে লিখিয়াছেন,—"Went out on Inspection Nobin's work, bought a pony for Rs. 30 Was obliged to borrow Rs. 10 for the purpose. এক কয়েক দিবস পরে তিনি লিখিতেছেন,

পাঠে জানা যায় যে, তিনি ২৩ টাকায় উক্ত টাট্টু ঘোড়াটী বিক্রয় করিয়াছিলেন। যেহেতু, তিনি লিখিয়াছেন, I had an unfortunate adventure with my pony" তিনি যে হাতী ক্রয় করিয়াছিলেন, সেটীতেও চড়িতে পারেন নাই। অবশেষে এক বন্ধু পুত্রকে উপহার দিয়াছিলেন। ইহা পর তিনি ভ্রমণ করিবার জন্য ঘোড়া বা হাতী ক্রয় করেন নাই। জমিদার বন্ধুগণ যে হাতী ও ঘোড়া উপহার দিয়াছিলেন, সেগুলিকে তিনি সযত্নে পালন করিয়াছিলেন। সুতরাং তারকনাথকে বাধ্য হইয়া সরকারী গরুর গাড়ী করিয়াই কর্ম্ম পরিদর্শনে যাত্রা করিতে হইত। তাঁহার সঙ্গে একজন পাচক ব্রাহ্মণ, একজন খানসামা সর্ব্বদা থাকিত। এই খানসামা ব্যতীত দু'টী সরকারী আর্দ্দালীও (orderly peon) থাকিত। তিনি কখনও নিজকর্ম্মের—নিজ সুখ-সুবিধার জন্য সরকার নিয়োজিত আর্দ্দালির সাহায্য লইতেন না। বন্ধুবান্ধবেরা এ বিষয়ে তাঁহাকে অনেক কথা বলিত। তিনি বলিতেন, উহারা সরকারের কর্ম্মের জন্য নিযুক্ত, আমার নিজ কর্ম্মে কেন উহাদিগকে নিযুক্ত করিয়া বৃথা কষ্ট দিব।" এমনই তাঁর তীক্ষ্ণ কর্ত্তব্য-জ্ঞান ছিল। সরকারের কোন দ্রব্য তিনি কখন ব্যবহার করিতেন না। কার্য্যোপলক্ষে যশোহর অবস্থানকালে তারকনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যশোহরের সুপ্রসিদ্ধ উকীল স্বর্গীয় রজনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তারকনাথের হাঁসপাতাল হইতে একশিশি টিঞ্চার আইডিন আনিবার জন্য একজন লোক পাঠান। সে ব্যক্তি তারকনাথকে টিঞ্চার আইডিন দিবার কথা জানাইলে তারকনাথ বলেন আইডিন আমার গৃহ ব্যবহারের জন্য সরকার দেন না, হাঁসপাতালের ব্যবহারের জন্য দিয়া থাকে। রজনীকে কিনিয়া আনিতে বল।

তারকনাথ মৎস্য ও মাংসপ্রিয় ছিলেন। মৎস্য ও মাংস না হইলে তাঁহার আহার হইত না। এই সময় তিনি নিজ ইচ্ছা মত মৎস্য বা মাংস পাইতেন না, এইজন্য যোলমাছ পুড়াইয়া তারকে দিয়া রাখিতেন। পাচক ব্রাহ্মণ সেই মৎস্য রন্ধন করিত। গরুর গাড়ীতেই তাঁহার গৃহস্থলীর সমস্ত জিনিষ খানসামা ও পাচক ব্রাহ্মণের অধীনে থাকিত।

গোযানে ভ্রমণ করিতে করিতে মধ্যাহ্নে কোনও কোনও স্থানে বিশ্রাম করিতেন। স্বর্গলতা রচনাই তাঁহার বিশ্রাম সুখ ছিল। গোযানের নিম্নে সতরঞ্চ বিছাইয়া রচনায় মনোনিবেশ করিতেন। গ্রামের প্রান্তে নির্জ্জন বনস্থলীতে বিশাল বটবৃক্ষচ্ছায়ায়, অদূরে পাচকব্রাহ্মণ রন্ধন করিতেছে, চাকর তাহার

সাহায্য করিতেছে। গাড়োয়ান তামাক সাজিয়া দিতেছে চারিদিক নিস্তব্ধ। সংসার-কোলাহল হইতে বহুদূরে বসিয়া তারকনাথ তাঁহার বহুসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস লিখিতেন।

প্রত্যেক জেলার প্রত্যেক গ্রামে ভ্রমণ উপলক্ষে তাঁহার নানাশ্রেণীর লোকের সহিত মিশিবার ও লোকচরিত্র পরিদর্শনের সুযোগ হইয়াছিল। নানাশ্রেণীর লোকের লোক-চরিত্র পরিদর্শনের অভিজ্ঞতাও লাভ করিয়াছিলেন। এই অভিজ্ঞতা তাঁহার গ্রন্থমধ্যে চিত্র হিসাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমরা নিম্নে এই অভিজ্ঞতার কথা দু'চারিটি লিখিলাম।

—"বিদেশে আস্‌তে শিখেছ গাছ তলায় শুতে শেখনি।"

তারকনাথ অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণের কর্ম্ম পরিদর্শনের জন্য বাহির হইয়া গমন করেন। সারাদিন ভ্রমণ করিয়া ক্লান্ত হইয়াছেন। শীতের সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। অন্ধকার ভেদ করিয়া অসংখ্য মাঠ পার হইয়া গ্রামের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। অন্ধকারে সারা গ্রামখানি মসিবর্ণ পটের মত দেখাইতেছে। সন্ধ্যাতেই গ্রাম-নির্জ্জীব হইয়া ঘুমাইতেছে। কোলাহল নাই—কেবল মাঝে এক আধ দু'খানি গোযান চালকের মুখনিঃসৃত বিকৃত ধ্বনি ও চাবুকের আঘাতের শব্দ মধ্যে মধ্যে নৈশ-নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। দূরে কোন গৃহস্থের গৃহের জানালার ছিদ্র হইতে আলোক বাহির হইতেছে দেখিয়া তারকনাথ সেখানে রাত্রির মত আশ্রয় লইবার জন্য গমন করেন। তথায় পৌঁছিয়া দেখেন সেটী এক মুদির দোকান। দোকানে কোন পুরুষ মানুষ নাই, একটী স্ত্রীলোক বিক্রয় করিতেছে। তিনি স্ত্রীলোকটীকে সে রাত্রের মত তথায় থাকিবার স্থানের প্রার্থনা করিলে। স্ত্রীলোকটী তাঁহাকে থাকিবার জন্য স্থান দিতে রাজি হয়, কিন্তু তাঁহার সঙ্গীগণকে—পাচক ব্রাহ্মণ, চাকর, গাড়োয়ান ও গরুদুটীকে থাকিবার জায়গা দিতে সম্মতি হইল না। তারকনাথ বলেন, 'আমার লোকেরা শীতের রাত্রে কোথায় যাবে, আর আমি কেমন করিয়া ভিতরে আরাম করিয়া শুইব?' এই কথা শুনিয়া মাত্র স্ত্রীলোকটী—অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিল, "বিদেশে আস্‌তে শিখেছ, গাছ তলায় শুতে শেখনি?" অনেক তর্কবিতর্ক হইতেছে এমন সময় মুদির দোকানের সমস্ত মিট মাট হইয়া যায়। সকলেই গৃহমধ্যে স্থান পায়, পর দিন প্রাতে তাঁর নাথ—দিনাজপুর যাত্রা করেন। মুদির দোকানে রাত্রি যাপনের কথা তিনি তাঁহার দৈনন্দিন-লিপিতে (Diary) লিখিয়াছেন—

Started from Tetalyah in the morning. Breakfasted at

Bhagwangote and passed the night in a mudhikhana; moody altogether, a good man, but moodini a troublesome woman etc. Feb 1873.

রাজসাহী হইতে দিনাজপুরে প্রিয়বন্ধু ইন্দ্রনাথের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া মুদির দোকানে রাত্রি যাপনের কথা বলেন। ইন্দ্রনাথ সমস্ত ঘটনা শুনিবা মাত্র বলেন, মুদি ও মুদিনীকে স্বর্ণলতার Chapterএ চড়াইয়া দাও। সেই দিন রাত্রে স্বর্ণলতার "প্রবাসে প্রথম রাত্রি" দশম পরিচ্ছেদ লিখিত হয়। বিধুভূষণ ও নীরদ বাবুর প্রথম প্রবাসে রাত্রি যাপন, মুদি ও মুদিনীর সহিত বাক্যালাপ, ব্রাহ্ম মুনকেশ্বরকে মুদি কর্ত্তৃক দোকান হইতে বহিষ্করণ প্রভৃতি চিত্র স্মরণ করুন।

"একা বিদেশে আসতে পার, মানুষ দেখে ভয় পাও।"

তারকনাথ তলপাই গুড়ির পাতগ্রামে কর্ম্মপরিদর্শনের জন্য অতি প্রত্যুষে যাত্রা করেন। মাঠ মাঝ—কোথাও মাঠ ঘাট সমস্ত আচ্ছন্ন। তখনো লোক চলাচল আরম্ভ হয় নাই। কেবল মাত্র তিনি গোযানে করিয়া বহির্গত হইয়াছেন। কিয়ৎ দূর গমন করিবার পর, গাড়োয়ানকে গাড়ী থামাইয়া গরু বাঁধতে বলেন, খালাসীকে চা প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ করিয়া পদব্রজে কিয়ৎদূর গমন করিয়া একটী গাছের নিকট দাড়াইয়া চারিদিক নিরিক্ষণ করিলেন। কিন্তু সেই গাছের পিছনে একটী লোক সর্ব্বাঙ্গে চাদর মুড়ি দিয়া চোকি দু'টী বার করিয়া দাড়াইয়াছিল, তাহাকে তিনি দেখিতে পান নাই। নির্জ্জন মাঠ কেহ কোথায় নাই হঠাৎ হুকার টানের শব্দ শুনিয়া তিনি ভীত হইয়া পিছন দিকে তাকাইতেই চাদর আবৃত লোকটিকে দেখিতে পান। তাঁহার বোধ হইল যেন লোকটী বৃক্ষ হইতে সেই দণ্ডে নামিয়া আসিল। চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? লোকটী তাঁর গতিক দেখিয়া বুঝিল, বাবুটী ভয় পাইয়াছে। সে বলিল "একা বিদেশে আসতে পার, আর মানুষ দেখলে ভয় পাও"। তারকনাথ এই কথোপকথনটী নীরু কমল ও বিধুভূষণের কথোপকথনের মধ্যে লিখিয়াছেন। স্বর্ণলতার নবম পরিচ্ছেদ "মিত্র" লাভ চিত্রটী একবার স্মরণ করুন।

"রাস্তার লোকে রাস্তা বলে দেবে কানের জল
জল দিলে বেরোয়"।

আর একবার তারকনাথ কুচবিহারের মাথাভাঙ্গা যাত্রা করিয়াছেন। দ্বিপ্রহর রৌদ্রে মাঠ ঘাট পুড়িয়া জ্বলিয়া যাইতেছে, গরুরগাড়ী ধীর মন্থর গমনে চলিয়াছে। তারকনাথ গরুর গাড়ীর মধ্যে বসিয়া সম্মুখের দিকে তাকাইতে

সেখানে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। সেদিন কার্ত্তিক; তারকনাথ উপনেতা তুলিলেন। এখন হইতে রাজা খুব সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে তারকনাথকে দেখিতে লাগিলেন। তারকনাথ টীকার উপকারিতা বুঝাইতে লাগিলেন। রাজাও মনোযোগের সহিত শুনিতে লাগিলেন। একঘণ্টা বক্তৃতার পর রাজা পুনরায় টীকা গ্রহণে আপত্তি জানাইয়া বলিলেন, ইংরাজী টীকা দিলে আবার জাত যাবে, ওতে গরুর রক্ত মিশান আছে।" অনেক বুঝাইবার পর রাজা তাঁর প্রজাদের মধ্যে টীকা দিবার অনুমতি দেন। এই প্রকার অনেক শ্রম স্বীকার করিয়া ইংরাজী টীকা গ্রহণের নিশ্চয় উপকারীতা বুঝাইয়া, উত্তর বঙ্গে ইংরাজী টীকার প্রচলন করেন। এই রাজার সম্বন্ধে তারকনাথ তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়াছেন,—

The raja in dirty clothes and wooden shoes, asking me all the usual questions about my pay, rank, and residence. But he seemed nevertheless to be gentlemen, 10 Feb. 1873.

তারকনাথ যে সময় মফস্বল ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়—ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তখনও ইংরাজী শিক্ষা—বিশেষতঃ ডাক্তারি শিক্ষার বিস্তার লাভ করে নাই। মফস্বলের অতি অল্প গৃহস্থের ছেলেরাই ডাক্তারি পড়িত। তার উপর সেই সময় গভর্ণমেণ্ট মফস্বলে ইংরাজী টীকা প্রচলনের আদেশ করায় ইংরাজীতে অশিক্ষিত, সামান্য ইংরাজী জানা ও নিরক্ষর পল্লীবাসীদের মধ্যে ইংরাজী টীকা এক বিভিষিকার সঞ্চার করিয়াছিল। কেহই সহজে ইংরাজী টীকা গ্রহণ করিত না। টীকা প্রদানকারী (Vaccinator) অথবা টীকার তারকনাথী (Vaccination Inspector) গৃহস্থের আসিলে গৃহস্থেরা গালি দিত, তাহাদিগকে দেখিলেই গৃহস্থ গৃহের দরজা বন্ধ করিত। এই স্থানে একটী ঘটনার উল্লেখ করিলাম। একদিন অতিশয় বৃষ্টি হইতেছে; তারকনাথ রঙ্গপুর হইতে সদর জলপাইগুড়ি আসিতেছেন। ক্রমে রাত্রি হইল, ক্রমশঃ সেধারে বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। গরু গাড়ী আর চলে না নিরুপায় হইয়া তিনি ভিজিতে ভিজিতে এক গ্রামে প্রবেশ করিয়া এক গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপে আশ্রয় লইলেন। যখন অধিক রাত্রি হইয়াছে, বৃষ্টিও থামিয়াছে, সেই সময় কামী এর বাহির বাহিরে আসেন. চণ্ডীমণ্ডপে পেণ্টলুন চাপকান পরা তারকনাথকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কেহে বাপু? এতরাত্রে এখানে? তারকনাথ উত্তর করিলেন, Superintendent Vaccination; শুনিবামাত্র কামী বলিল ওঃ বুঝেছি টীকার ডাক্তার বলিয়া অবজ্ঞাভরে অন্দরে চলিয়া

গেলেন; আর বাহির হন নাই। তারকনাথ প্রায়ই তাঁর আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবগণের নিকট এই গল্প বলিতেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী।

ছাপার ভুল!

গত অগ্রহায়ণের সাহিত্যে 'বাঙ্গালার জাতি,' এবং পৌষের সাহিত্যে, 'পুরাণ প্রসঙ্গ' শীর্ষক প্রবন্ধ দু'টিতে কয়েকটি ছাপার ভুল ঘটিয়াছে। সকলগুলি না হইলেও দু'একটি সংশোধন করা প্রয়োজন। নিম্নে কয়েকটী ভুল সংশোধন করিয়া দেওয়া হইল।

অগ্রহায়ণের সাহিত্য, "বাঙ্গালার জাতি" প্রবন্ধে—

(১) ৬৮২ পৃষ্ঠায় ৭ পংক্তিতে, "সম্প্রদায়" শব্দের পর "অন্যান্য" না হইয়া "অনার্য্য" হইবে।

(২) ৬৮৩ পৃষ্ঠায় ২ পংক্তিতে "বুনা" না হইয়া "বুলা" হইবে।

(৩) ১৮৯ পৃষ্ঠায় ১৪ পংক্তির প্রথমেই ১৫ পংক্তির "এই পরম্পর" বাক্য বসিবে, এবং ১৫ পংক্তির ঐ বাক্য ঐ স্থানে থাকিবে না।

(৪) ১৯৪ পৃষ্ঠায় ২৫ পংক্তিতে প্রথমেই "ইহা স্বীকার" না হইয়া "ইহা অস্বীকার" হইবে।

পৌষের সাহিত্যে, 'পুরাণ প্রসঙ্গ" প্রবন্ধে—

(১) ৭৬৪ পৃষ্ঠায় ২৬ পংক্তিতে 'অনুক্রমই" উঠাইয়া "পুরাণের একখানিই" বসাইতে হইবে।

(২) ৭৬৭ পৃষ্ঠায় ২০ পংক্তিতে "অনুবর্ত্তিতার পর" (!) চিহ্ন বসিবে, এবং "কথা" স্থানে "কথার" হইবে।

(৩) ৭৬৭ পৃষ্ঠায় ২৬ পংক্তিতে "মত" শব্দের পর "পরের ভাষায়" পড়িতে হইবে।

ঐ :—

তা হউক, সেখানে ঠিক সতেই তার মায়ের পূজার বলি নাই। মা আমার জীবনদায়িনী কিনা, তাঁহার পূজায় জীবনগ্রহণ-ব্যবস্থা নাই।

বসন্তে প্রথমে মায়ের পূজা হয় কেন? বসন্ত ঋতুর প্রথম, সৃষ্টির গোড়ার দিক, উন্মেষের বিকাশের পরিচায়ক, তাই সরস্বতীর পূজা বসন্তকালের প্রথমেই হইয়া থাকে। এই যে সৃষ্টির বিকাশ ইহা জ্ঞানসাধ্য। তুমি অজ্ঞান হইয়া থাকিলে, মহামোহে অবসন্ন থাকিলে সৃষ্টির মাধুরী ত বুঝিতে পারিবে না; তাই জ্ঞান—অনুভূতি বিচার বুদ্ধি যাঁহার কৃপায় মানুষ লাভ করিয়া থাকে, সেই জ্ঞানদায়িনী দেবীর আরাধনা করিতে হয়। এই যে বিশ্বপ্রপঞ্চ কি ও কেমন, যাঁহার কৃপায় তাহা বুঝা যায়, তিনিই মাতঙ্গেরী। চারিদিকে যাহা দেখি, শুনি, স্পর্শ করি, আস্বাদন করি, তাহা কি ও কেমন, সেটুকু জানিতে ও বুঝিতে মানুষের প্রবল ইচ্ছা হয়। কেন সুখ কেন দুঃখ, কেন জন্ম কেন মরা, কেন উন্নতি কেন অধঃপতন,—এই জিজ্ঞাসার উত্তর মানুষ চাহে। সে উত্তর যিনি দিতে পারেন, তিনিই সরস্বতী। এই উত্তর পাইবার জন্য মানুষের মধ্যে মানুষ যে চেষ্টার জন্য মানুষ যে সাধনপরায়ণ হয়, তাহা মাত্র ভারতীর কৃপাতেই বটে। তিনিই প্রথম প্রভাতে বিহগ-কলরবের মতন ভূমিষ্ঠ হইবার পর প্রথম অনুভূতি-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে জিজ্ঞাসার কল্লোল-কোলাহল উত্থিত করিয়া থাকেন। তিনিই কৃপাবশে সে অনুসন্ধিৎসার তৃপ্তি-সাধন করিয়া থাকেন। গোড়ায় তিনি—তিনি না থাকিলে মানুষের অনুভূতি ফুটিয়া উঠে না, তিনি না থাকিলে মানুষের চিত্তবৃত্তির উন্মেষ ঘটে না, তাই সৃষ্টির গোড়ায় সরস্বতী, প্রথম বসন্তে সরস্বতী পূজা; পঞ্চমী তিথিতে জ্ঞানের বোধন ও আরাধনা। বিদ্যার্থীর পক্ষে মায়ের বিসর্জ্জন নাই, নিত্য পূজা করিতে হয়, নিত্য আরাধনা করিতে হয়। সে বিদ্যার্থী নাই, সে ব্রহ্মচর্য্য নাই, সে বিদ্যা-আরাধনা নাই, কাজেই মাটির পুতুল একদিনে পূজা শেষ করিয়া পরদিনে জলে ভাসাইয়া দিই।

এমনই ত বর্ষে বর্ষে মা আমরা তোমায় পূজা করিতেছি, কিন্তু তবুও এখন তোমার ভক্ত হইয়া আছি? কেন এত দুঃখ? কেন এত কষ্ট? জ্ঞান-সূর্য্যের উদয় হইলে সকল দুঃখ, সকল দারিদ্র্য, সকল অভাব, সকল কষ্ট দূর হয়; কোথাও কোনও অন্ধকার থাকে না। বুঝি মা আমাদের তেমন একনিষ্ঠা নাই। বুঝি বা আমাদের তেমন দুঃখের অনুভূতি নাই। শীতের জড়তা দূর করিতে না পারিলে যেমন মাঘের পূজা হয় না, তেমনই মনের অন্ধতা যখন

হইতে অপসারিত করিতে না পারিলে মনোময়ী জ্ঞানময়ীর চিরন্তন আবাহনা করা যায় না। আমরা এখনও মোহ দূর করিতে পারি নাই, এখনও বিলাসের মোহ আমাদের দেহ মন ও আত্মাকে তুহিনরাশির মত যেন জড়াইয়া রাখিয়া আছে। উপভোগের এই মোহ দূর করিতে না পারিলে নবরূপা পূজা করা যায় না। আমরা এতদিন মায়ের পূজা করিতে পারি নাই, তাই দুঃখ দৈন্য দারিদ্র্য এখনও আমাদের বেড়িয়া আছে। শক্তিময়ী মা নিজগুণে কৃপা না করিলে আমাদের অন্য উপায় নাই, অন্য অবলম্বন নাই।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঙ্গালার ইতিহাসে কর্ম্মকার-শিল্পীর স্থান।*

বঙ্গীয় কর্ম্মকার সম্মিলনীর বাৎসরিক অধিবেশন উপলক্ষে স্বজাতি-নারায়ণের দর্শন-লাভ বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। আমি এ উৎসব নর-নারায়ণের পূজার্থী নির্ব্বাচিত হইয়াছি। দেবতার অর্চ্চনার উপযুক্ত সামর্থ্য আমার নাই। তবে, গঙ্গাজলে গঙ্গা-পূজা করিবার যে একটী সুন্দর বিধি এদেশে প্রচলিত আছে, আমি সেই সনাতন বিধির দোহাই দিয়া এই সভায় সমবেত স্বজাতি-বর্গের পূর্ব্বপুরুষগণের যশঃকীর্ত্তন করিয়া ধন্য হইতে পারিলে মনে করিব যে, দরিদ্রের ঠাকুর পূজা কোনও রকমে বাদ হইল।

বাঙ্গালার সুসম্পূর্ণ ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই, কবে যে হইবে তাহারও নিশ্চয়তা নাই, বাঙ্গালার যে ইতিহাস আমরা পাঠ করিয়া থাকি তাহা রাজা-রাজরার ইতিহাস। এই ইতিহাসে বাঙ্গালী জাতির ইতিকথা খুব কম পাওয়া যায়। বাঙ্গালীর জাতিত্ব সম্বন্ধে অবিসংবাদী ঐতিহাসিক সত্যও এখন পর্য্যন্ত নিরূপিত হয় নাই। যতদিন পর্য্যন্ত সেই সত্য নিরূপিত না হয় ততদিন বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিবার প্রধান উপকরণের অভাব থাকিবে। কয়েক বৎসর যাবৎ কিন্তু বাঙ্গালীর কর্ম্মময় জাতীয় জীবনের ইতিহাস লিখিত হইবার উপযোগী মালমসলা প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইতেছে। পৌরাণিক

* বঙ্গীয় কর্ম্মকার সম্মিলনীর একবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের ভাণ্ডার হইতে বাঙ্গালী সমাজের অতীত অবস্থা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় বাঙ্গালী ইতিহাস-লেখকেরা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলার কাহিনী কিম্বদন্তী, ভগ্নস্তূপ, শিলামূর্ত্তি, শিলালিপি, তাম্রলিপি কীটদষ্ট পুঁথি প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত বিবিধ উপাদেয় ঐতিহাসিক তথ্য লিপিবদ্ধ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া মনে হয় যে, একদিন না একদিন বাঙ্গালার সুসম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিত হইবে আর আমার বিশ্বাস যে, সেই ইতিহাসে কর্ম্মকার শিল্পী নাম বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে।

নিরপেক্ষ ইতিহাস-লেখকের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা আমকাল শ্রীনতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কোনও শিল্পী জাতিকে 'ইতর জাতি' বলিয়া অভিহিত করেন না। শ্রেণীবিশেষে আবদ্ধ বংশগত শিল্প-নৈপুণ্য যে বাঙ্গালীর জাতীয় ধন-সম্পত্তির সামিল (national asset) তাহা এক্ষণে তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন। ব্রাহ্মণাদি উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত শিল্পীরা এখন কাপড়ের উপর তুলি ধরিয়া ছবি আঁকিলে, ছেনী ও হাতুড়ি লইয়া ধাতু শিল্পের সেবা করিলে, চরকা ও তাঁতের সাহায্যে প্রতিদিন বস্ত্র বুনিলে, এমন কি ওজন ও কলিক ধরিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিলেও তাঁহারা যে ছোট লোকের কাজ করিতেছেন বলিয়া কেহ আর মনে করেন না। সাহিত্যের ন্যায় শিল্পও যে মানুষের মস্তিষ্কের কারখানায় জন্মলাভ করে, তাহার অন্তর্দৃষ্টির প্রাচুর্য্যে ধীরে ধীরে সেই সুকুমার শিল্প সৃষ্টি সম্ভব করে ও শেষে মানব-হৃদয়ের প্রেমে সিক্ত হইয়া পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া উঠে, ইহা দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তি-গণ এক্ষণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। সত্য-সন্ধিৎসু ঐতিহাসিকেরা এখন স্পষ্ট বুঝিয়াছেন যে, জাতিবিশেষের কর্ম্মজীবনের সহিত শিল্পের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। যখন আমরা দেখি যে একজন শিল্পী কর্ম্মশালায় বসিয়া হাতা, বেড়ী, খুন্তী গড়িতেছেন, লৌহপিণ্ড পিটিয়া চাটু ও কড়া প্রস্তুত করিতেছেন, তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, সেই কর্ম্মকার শিল্পী বাঙ্গালী জাতির গার্হস্থ্য জীবনের উপযোগী দ্রব্য সম্ভার যোগাইয়া আমাদের জাতীয়-জীবনকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেন। আবার যখন আমরা দেখি যে, একজন কর্ম্মকার শিল্পী তাঁহার কর্ম্মশালায় লাঙ্গলের ফাল, কোদালি, কাটারি, কুড়ুল, কাস্তে প্রভৃতির ধাতব উপাদানে পান-সংযোগ করিতেছেন, তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, তিনি দেশের কৃষি-শিল্পের সহায়তা করিতেছেন, প্রকারান্তরে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির জন্য অন্ন প্রস্তুতের বন্দোবস্ত করিতেছেন। কর্ম্মকার

শিল্পী যখন তুণীরদণ্ড ও বাটখারা প্রস্তুত করিতেছেন, তখন বুঝিতে হইবে যে, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা হইতেছে। এই কর্ম্মকার শিল্পী যখন তরোয়ার বর্ষা-ফলক-বর্ম্ম-প্রভৃতি কার্য্যে দিবারাত্রি অতিবাহিত করেন, তখন বুঝা যায় যে, দেশকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন। এইরূপে কর্ম্মকার শিল্পী যখন ধাতুময় দেবমূর্ত্তি রচনা করিতেছেন, তখন দেশের স্থানবিশেষে ধর্ম্মভাব যে জাগিয়া উঠিয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। বাস্তবিক কেবল এক কর্ম্মকারগণের জাতীয়-শিল্পের ইতিহাস হইতে আমরা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির সামাজিক অবস্থা, উন্নতি-অবনতি, দেশীয় ও বিদেশী ব্যবসা-বাণিজ্যের সঠিক সংবাদ প্রাপ্ত হইতে পারি।

শিল্পের কাঁধে ভর দিয়া কোনও জাতি যখন কর্ম্মময় জীবনের পথে চলিতে আরম্ভ করে, সাহিত্য তখন জাতীয়-জীবনের কার্য্য-কলাপ নানা ছাঁদে লিপিবদ্ধ করিতে থাকে। ইউরোপের আধুনিক ইতিহাস বিজ্ঞানাশ্রিত শিল্পের ইতিহাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইউরোপীয় সাহিত্যের উদ্ভব সেইজন্য আধুনিক যুগে শিল্পের প্রভাব সর্ব্বাধিক বলিয়া মনে হয়। ইংরাজ কবি টেনিসনের কাব্য-গ্রন্থে বিজ্ঞানসম্ভূত শিল্পকলার প্রভাব তাঁহার উপমালঙ্কৃত কাব্য-শিল্পের প্রত্যেক স্থানে অনুভব করা যায়। হিন্দুদিগেরও প্রাচীন শিল্পের সুস্পষ্ট আভাস আমরা প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্কৃত নাটকে দেখিতে পাই। বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত প্রাচীন বঙ্গের কোনও সামাজিক ইতিহাস যদিও নাই, কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের স্থানে স্থানে বাঙ্গালীর কর্ম্মময় জাতীয়-জীবনের লীলাতিনয় বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীন বঙ্গে কর্ম্মকার শিল্পীর জীবনের ছবিও সেই সঙ্গে বাঙ্গালী কবিরা অঙ্কিত করিয়াছেন। আমি আপনাদিগকে প্রাচীন বাঙ্গালী কবির চিত্রাধার হইতে কর্ম্মকার শিল্পীর কয়েকখানি ফটো বাছিয়া লইয়া দেখাইব। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার সুবিখ্যাত চণ্ডী-কাব্যে কালকেতুর উপাখ্যান গুজরাট নগর বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন।

"কর্ম্মকার পাতি শাল, কোদালি কুড়ালি কাল,
গড়ে টাঙ্গি আজরেখি শেল।"

মুকুন্দরাম খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর কবি। তাঁহার সমকালে যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য ধুমঘাটে নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া মোগল সম্রাট আকবরের অধীনতা অস্বীকার করিয়াছিলেন। স্বাধীন বাঙ্গালায় সেইজন্য কর্ম্মকার শিল্পীকে 'কোদালি কুড়ালি কাল' প্রভৃতি কৃষি-শিল্পের উপযোগী

সংখ্যা যেমন গণিতে হইয়াছিল, সেইরূপ 'টাঙ্গি আগ্নেয়াস্ত্রেও' প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। প্রতাপের অধীনে অসংখ্য হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যের হাতিয়ার প্রস্তুত করিবার জন্য যে বহু সহস্র কর্ম্মকার শিল্পী নিযুক্ত হইয়াছিলেন ও যেখানে অন্তর্বেতন অস্ত্রাগারে প্রকাণ্ড কারখানা সকল স্থাপিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই সমৃদ্ধিশালী স্বাধীন যাবনালার নিদর্শন বর্ত্তমান কালে অতি অল্প কয়েকটা ভগ্নাবশেষ ও মন্দির-মসজিদ অন্বেষণে পাওয়া যায়। প্রতাপের নূতন রাজধানী ধুমঘরের আশে পাশে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বহু দুর্গের ভগ্নাবশেষ স্তূপ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। বেদকাশী নামক স্থানের নিকটে এমনই একটি ভগ্ন অট্টালিকা আছে। সুন্দরবনের কাঠুরিয়াগণ ইহাকে "কামান বাড়ী" বলে। এইরূপ প্রবাদ যে, এই ভগ্ন অট্টালিকায় একদা লৌহাস্ত্র গঠিত হইত। "যশোহর-খুলনার ইতিহাস"-প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র মিত্র বি-এ বলেন যে, এই প্রবাদ-উক্ত বাটীর নাম "কামারবাড়ী" সত্ত্বেও উহা কোন বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ধনীর বাড়ী" ছিল। আমার কিন্তু মনে হয় যে, প্রতাপাদিত্যের রাজত্বকালে এই "কামারবাড়ী" কোনও কর্ম্মকুশলী কর্ম্মকারের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশিল্পের একটা সুবৃহৎ কারখানা ছিল। প্রতাপাদিত্যের সময়ে যশোরের রণকৌশলের গৌরব ইতিহাস স্বীকার করিয়া থাকে। প্রতাপের সমসাময়িক কবি মুকুন্দরামের বীরবর কালকেতু যখন দেবী-প্রদত্ত ধনে নিজের জন্য বীরোচিত সাজ-সজ্জা খরিদ করেন, তখন তাঁহাকে যে কর্ম্মকার শিল্পীর দ্বারস্থ হইতে হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। মুকুন্দরাম লিখিয়াছেন,—

"বুদ্ধের জানিয়া মর্ম্ম, অভেদ্য কিনিল বর্ম্ম,
নানা রত্ন বিচিত্র মুকুটে।
কিনিল মহিষা ঢাল, তাড়ীপত্র করবাল,
মুট যার বিচিত্র পুবটে॥
ভরক বেয়াক টাঙ্গি, ভিন্দিপাল শেল সাঙ্গি,
ভূষণ্ডি ভাস্কর চক্রবাণ।
হিরায়ুটি ফলধনু, পট্টিশ পেটক শর,
কিনে বীর কামান কৃপাণ॥"

মুকুন্দরামের 'চণ্ডী'তে কামানের সাহায্যে যুদ্ধের বিবরণ অনেক স্থানে আছে। বলা বাহুল্য, যশোরেশ্বর রাজত্বের সময়ে কর্ম্মকারগণ যে কামান প্রস্তুত করিতেন তাহা শুধু কথার কথা নহে। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ জুনার্দ্দন কর্ম্ম-

কারের "জাঁহা-কোষা" নামক কামান মুক্তুন্দরামের পরবর্ত্তী যুগে ঢাকায় প্রস্তুত হইয়াছিল। উড়িষ্যার বিদ্রোহ-দমনের জন্য এই প্রকাণ্ড ২০২ মণ ওজনের কামান নির্ম্মিত হয়। এই "জাঁহা-কোষা" অর্থাৎ "দিগ্বিজয়ী" কামান ঢাকা হইতে উড়িষ্যার পথে বাঙ্গালার তৎকালীন রাজধানী মুর্শিদাবাদে আনীত হইয়াছিল। সেইজন্য ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের যতগুলি ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইয়াছে তাহাতে জনার্দ্দন কর্ম্মকারের নাম কোথাও পাইয়াছেন ইংরাজ ঐতিহাসিক মিঃ বিভারিজ্ জনার্দ্দনকে ভ্রমবশতঃ ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। ইংরাজী ভাষায় লিখিত "বাঙ্গালার মসনদ" (Masnad of Bengal) নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে উক্ত কামানের পার্শ্বে সংলগ্ন নরখানি ফোটোগ্রাফের উপর ফার্সি ভাষায় কামান-প্রস্তুত-কারক জনার্দ্দন কর্ম্মকারের নাম ও "জাঁহা-কোষা" কামানের বিবরণসহ উৎকীর্ণ লিপির ফটো মুদ্রিত হইয়াছে। এই কামান এখনও পর্য্যন্ত মুর্শিদাবাদেই আছে। সম্প্রতি বঙ্গীয় কর্ম্মকার সম্মিলনী বঙ্গের শাসনকর্ত্তাকে উক্ত কামান মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় লইয়া আসিয়া ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ভবনে রক্ষিত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ সম্মিলনীর অনুরোধ গ্রাহ্য করিয়া ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ট্রষ্টিগণকে লিখিয়াছেন। উক্ত ট্রষ্টিগণের সহিত "জাঁহা-কোষা" কামান সম্বন্ধে বঙ্গীয় কর্ম্মকার সম্মিলনীর পত্রাদির আদান-প্রদান চলিতেছে। স্বয়ং বড় লাট কার্জ্জন রেডিংও এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন। "জাঁহা-কোষা" কামান ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ভবনে রক্ষিত হইলে সমগ্র সভ্য-জগতের দৃষ্টি জনার্দ্দন কর্ম্মকারের অক্ষয় শিল্প-কীর্ত্তির প্রতি আকৃষ্ট হইবে; আর তাহাতে কর্ম্মকার জাতি যে গৌরবান্বিত হইবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই "জাঁহা-কোষা" কামান প্রস্তুত করিয়াছিলেন কালু কর্ম্মকারের নামও কোনও কোনও ঐতিহাসিক উল্লেখ করিয়া থাকেন। "জাঁহা-কোষা" নামক একাধিক কামান নির্ম্মিত হইয়াছিল কি না বলা সুকঠিন। শ্রীহট্টের ইতিহাসেও এই কামানের উল্লেখ দেখা যায়।

নদীয়াধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে কিশোর দাস কর্ম্মকার নামে আর একজন কামান-নির্ম্মাতার নাম পাওয়া যায়। এসিয়াটিক্ সোসাইটির ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের কার্য্যবিবরণীতে উক্ত কিশোরদাস কর্ম্মকারের কথা স্থান পাইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়ের "নদীয়া-কাহিনী" নামক পুস্তকেও কিশোর দাসের নাম পাওয়া যায়। এই কর্ম্মকার নির্ম্মিত কামান এক্ষণে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ভবনে রক্ষিত হইয়াছে।

থাকিতে কচিৎ দেখিতে পাই। বাঙ্গালীর জাতীয়-হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমের সুধা বর্ষিত হইয়া শ্রীচৈতন্যের সময়ে কবি ও শিল্পীকে মাতিয়া তুলিয়াছিল। বাঙ্গালার সে এক যুগ আসিয়াছিল! শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি বাঙ্গালী-জীবনের ওপর একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়াতে আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক কর্ম্মকার-কবি গোবিন্দদাসকে ধাতুশিল্পের উপাসনার পরিবর্ত্তে ভক্তিরসাত্মক কবিতা রচনায় জীবন সার্থক করিতে দেখিয়াছি। শিল্পী ও কবির এমন আশ্চর্য্য সংমিশ্রণ বাঙ্গালার ইতিহাসে বিরল। কর্ম্মকার-কবি গোবিন্দদাস তাঁহার রচিত কড়চায় আত্মপরিচয় দিয়া লিখিয়াছেন,—

"বর্দ্ধমানে কাঞ্চননগরে মোর ধাম।
শ্যামাদাস পিতৃনাম গোবিন্দ মোর নাম॥
অস্ত্র, হাতা বেড়ি গড়ি জাতি কর্ম্মকার।
মাধবী নামেতে হয় জননী আমার।"

কড়চাতে যখন "শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে ভেসে যায়", গোবিন্দদাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত নিজগ্রাম কাঞ্চননগরের কর্ম্মশালায় "অহ বেড়ি" নির্ম্মাণকার্য্য ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে মহাপ্রভুর বাটীতে গমন করিয়া তৎপরে তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত সমুদয় দক্ষিণ ভারত পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি "কর্ম্মবীর" শ্রীচৈতন্যের কার্য্যকলাপ স্বচক্ষে দেখিয়া পদ্যময় কড়চায় তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। এই কর্ম্মকার-কবি বেশী লেখাপড়া জানিতেন না বলিয়া তাঁহার নাম চৈতন্যচরিতাখ্যান-লেখকদিগের মধ্যে উল্লেখ হয় নাই বলিয়া আজ

কিন্তু ইহা মার্কিন দেশ, কি প্রাচীন গ্রীস, ইতিহাস তাহার বিচার করে না। তাই বলিয়া ঐতিহাসিকগণ যদি প্রবৃত্তি-মার্গের পথিককে কিমাসিতার পাদপীঠায় অলঙ্কার উপযোগী শিল্পের সাহায্য লইতে দেখেন তাহা হইলে তাহারা সেই শিল্পকে দেবের কর্ম্মযজ্ঞভাগে উচ্চাসন দিতে চাহেন না। বোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গ-সাহিত্যের সমাজ স্বাধীন গার্হস্থ্যালাপ আমোদ নেই জন্য সৌখিনিল্পের আশ্রয় দেবের কার্যে নিরত কর্ম্মকারগণের বিরুদ্ধে কোনও কথা শুনিতে পাই না। মুকুন্দরাম কালকেতুর জাতীয় চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন তাহার ফলে তিনি সমসাময়িক বঙ্গীয় সমাজের প্রত্যন্ত শ্রেণীর লোকেদের চরিত্র সমালোচনা করিবার অধিকারী হইয়াছিলেন। শুদ্রেরা শিল্প ও শিল্পিবিদ্বেষকে সমাজের নিম্নস্তরে বসাইয়া দিয়াছেন। কর্ম্মকারগণ যখন কবির সময়কালে যে অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিতেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। ষোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে যাঁহারা গহনা প্রস্তুত করিতেন সমাজে তাঁহারা অভ্যস্ত হেয় ছিলেন। কবিকঙ্কণ লিখিয়া গেছেন—

"সুবর্ণ বণিক বসে, রত্নভ কাঞ্চন বাসে,
পোড়ে ফোড়ে করিলে সংস্রব।
কিনে বেচে কিছু কিনে, মনুষ্যের ধন টানে,
পুর মধ্যে যাহার নিলয়॥"

শ্রীযুক্ত শীল নামে একজন ধনী সুবর্ণবণিকের যে চিত্র মুকুন্দরাম অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে স্বার্থপরতা উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। সে সময়ে সোনা-রূপা বেচা-কেনা সুবর্ণবণিকেরা করিতেন। যাঁহারা অলঙ্কার-নির্ম্মাণ করিতেন তাঁহারা ছিলেন জাতিতে পঞ্চতোহর অর্থাৎ স্বর্ণকার।

"নিবসে পঞ্চতোহর, পুরমধ্যে যার ঘর,
নির্ম্মাণ করয়ে আভরণে।
দেখিতে দেখিতে জন, হরয়ে সভার মন,
হাতে হাতে বদলিতে জানে॥"

বলাল সেন স্বর্ণবিনায়ী সুবর্ণবণিক ও অলঙ্কার-নির্ম্মাণকারক স্বর্ণকারকে যে অন্যায় ভাবে সমাজের নিম্নস্তরে বসাইয়া দিয়াছিলেন বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিহাসের পাঠকমাত্রই তাহা অবগত আছেন। সেই কারণে অলঙ্কার-নির্ম্মাতা স্বর্ণকার শ্রেণীর শিল্পীও সমাজে অবজ্ঞাত হইয়া থাকেন। কর্ম্মকারগণ

অলঙ্কার-নির্ম্মাণের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ইংরাজ রাজত্বে যখন স্বল্পমূল্যের বিদেশী লৌহজাত দ্রব্যাদির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কর্ম্মকারের জাতীয় শিল্প টিকিয়া থাকিতে পারিল না, তখন হইতে কর্ম্মকারগণ অনেকেই অলঙ্কার-নির্ম্মাণের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় হইতে তাঁহারা যে দেশের জাতীয় আদর্শ হইতে বহুদূরে সরিয়া গেলেন তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। সমাজের যথার্থ হিতকারী শিল্পী যাঁহার উদ্যমে দেশের কৃষি বাণিজ্য পরিপুষ্ট, শত্রু নিহত হয়, ছোট বড়, ধনী নির্ধন, বিদ্বান ও মূর্খ সকলে সমভাবে উপকৃত হন, সমাজের পক্ষে সেই শিল্পীর স্থান অনেক উচ্চে। বৈদিক যুগে সেইজন্য রথ-চক্র-নির্ম্মাণকারী সূত্রধর আর্য্যসমাজে শিল্পীদের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। শুধু শিল্পীসমাজে কেন, বর্ণশ্রেষ্ঠ আততিদিগের তুলনায় সূতবর্গও তখন আর্য্যসমাজে হীন বলিয়া গণ্য হইতেন না। যুদ্ধের জন্য রথ তখন সর্ব্ব প্রথমে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। আর্য্য-সৈন্য রথারোহণে অল্পক্লেশে অনায়াসে সুশিক্ষিত যুদ্ধে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কর্ম্মকারের জাতীয় শিল্পের অবনতি সমগ্র বাঙ্গালীজাতির অবনতির পরিচয় দিতেছে। এমন একদিন ছিল যখন কর্ম্মকারের বাটীতে সূচিকা নির্ম্মাণের উল্লেখ করিলে লোকে মনে করিত যে, কথাটা বিদ্রূপোক্তি মাত্র। কর্ম্মকারগণ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রভাবে বঙ্গদেশের শিল্প-জগতে স্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেও ম্যাঞ্চেষ্টার ও ম্যাঞ্চেষ্টারের কলের কাপড় বাঙ্গালী তন্তুবায়দিগের বস্ত্রবয়ন-শিল্পকে ধ্বংস করিয়া তন্তুবায় জাতিকে যেরূপ শিল্পশক্তিহীন করিয়া ফেলিয়াছে, বর্ম্মিংহাম্ ও সেফিল্ডের তাড়নায় কর্ম্মকার জাতির অবস্থা সেরূপ হয় নাই। কর্ম্মকার শিল্পীর বহুমুখী প্রতিভা ও উদ্ভাবনী শক্তি তাঁহার শিল্পবিদ্যাকে পরিবর্ত্তিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপযোগী করিয়া লইয়াছে। সেই কারণে কর্ম্মকার শিল্পীরা অলঙ্কার নির্ম্মাণ করুন বা পিত্তল ও কাঁসার তৈজসাদি প্রস্তুত করুন, আজও তাঁহারা স্বাধীন ব্যবসা দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন। বিদেশজাত ধাতুশিল্পকে কোনও রকমে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। একক বাঙ্গালাদেশের অনেক স্থানের প্রসিদ্ধি কর্ম্মকারগণের শিল্পের উপর নির্ভর করিতেছে। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাঞ্চননগরের প্রেমচাঁদ কর্ম্মকারের ছুরি কাঁচি, বনগ্রামের পিত্তলনির্ম্মিত দ্রব্যাদি, বাঁকুড়ার কাঁসার তৈজসাদি, ঢাকার রৌপ্য-শিল্প, রাধানগরের অন্তর্গত উদ্ধিরমুরের লৌহাস্ত্র ও কামারপাড়া মুলোড়ের অদ্যাপি বঙ্গদেশের শিল্প জগতে কর্ম্মকারের শিল্পীত্বের পরিচয়

পুরের অন্তর্গত বগড়ী নামক গ্রামে রাধাকৃষ্ণের যে ধাতুময় যুগলমূর্ত্তি আছে কৃষ্ণদাস কর্ম্মকারের কৃষ্ণভক্তি ও শিল্পচাতুর্য্যের তাহা সুপ্রাচীন নিদর্শন। প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে এই বিগ্রহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাধাকৃষ্ণের এই যুগল মূর্ত্তি ও তৎসঙ্গে বগড়ীর নিকটবর্ত্তী নেপুরা গ্রাম নিবাসী উক্ত কৃষ্ণদাস কর্ম্মকারের জীবনের একটি ছোট-খাট ইতিহাস আছে। দশবৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় কর্ম্মকার সম্মিলনীর উৎসাহে পরিচালিত "কর্ম্মকার বন্ধু" নামক মাসিক পত্রিকায় সেই ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছিল। ভারতবিখ্যাত অভিরাম গোস্বামী একটী প্রণাম করিলেই অনেক প্রতিমা ফাটিয়া যাইতেন। তাহার উপর্য্যুপরি তিনটি প্রণাম করিলেও বাড়ীর শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায় জীবিত ও তাঁহার শ্রীমতী কিছুই হয় নাই। স্বয়ং লক্ষ্মী কৃষ্ণদাস কর্ম্মকারের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। কৃষ্ণদাস কর্ম্মকারের জন্মস্থান উক্ত নেপুরা গ্রাম তাঁহার জীবদ্দশায় বঙ্গদেশের শ্রীবৃন্দাবনে পরিণত হইয়াছিল। বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণদাস কর্ম্মকারের আঙ্গিনায় শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরীর ধ্বনি শুনিবার আশায় বাঁশরীর দূরতম স্থান হইতে আসিতেন। পূজ্যপাদ ভক্তকুল গোস্বামী মহাশয় কৃষ্ণদাস কর্ম্মকারের জীবনী প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে স্বীয় সংস্কারপত্রে লিখিয়াছিলেন। কর্ম্মকারগণ যে প্রাচীন বাঙ্গালায় সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেন তাহার আরও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বাঙ্গালীর প্রকৃতি এক্ষণে ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে বিলাসিতাকে পূজা করিতে শিখাইয়াছে। কর্ম্মকারগণের শিল্প-চাতুর্য্য সেই কারণে এখন আর দেবতার শ্রীঅঙ্গে প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া শুনা যায় না। তবে আধুনিক সময়ে কর্ম্মকার শিল্পী যে সৎ সাহিত্যের চর্চ্চা আদৌ করেন না, এখন কথা বলিবারও বিশেষ কোন কারণ নাই। বিগ্রহের হীরকখচিত স্বর্ণ মুকুটে ও রৌপ্যময় সিংহাসনে কর্ম্মকারগণ অনেক সংশিল্পের প্রভাব কতকটা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের কর্ম্মকার শিল্পীদিগের মধ্যে যাঁহারা স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুত করেন তাঁহারা যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বার-বিলাসিনীগণের পণ্যভূত দেহের শোভা বর্দ্ধনের জন্য গহনা নির্ম্মাণের কার্য্য ত্যাগ করেন, তাহা হইলে বঙ্গীয় সমাজে তাঁহারা শিল্পের ভিতর দিয়া এক নূতন নৈতিক যুগ প্রবর্ত্তন করিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত, যদি তাঁহারা স্বাধীনভাবে কার্য্যের জন্য যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে মনোযোগী হন ও অন্যান্য সৎ শিল্পের আতিশয্য অনুশীলন করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা বাঙ্গালীর জীবন্ত ইতিহাসে আবার বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে পারিবেন। কিন্তু

শ্রীরামপুরের স্বনামপ্রসিদ্ধ কেরী সাহেব ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে পঞ্চাননকে অনুরোধ করিয়া পুনরায় বাঙ্গালা অক্ষর ঢালাই করান। সেই অক্ষরে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে রাম রাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিত ছাপা হয়। "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য" নামক গ্রন্থে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন,—"পঞ্চানন কর্ম্মকার বসে প্রাচীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র মনোহর কর্ম্মকার অক্ষর ঢালাই কার্য্যে অতঃপর তৎস্থলে সম্পূর্ণ অভিষিক্ত হইলেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালা অক্ষরগুলি দেখিতে খুব সুন্দর ছিল না। কিন্তু ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের পর মনোহর সম্পূর্ণ দায়িত্ব-গ্রহণের পর বঙ্গাক্ষরের এক নবযুগ প্রবর্ত্তিত হয়।" সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মার্শম্যান্ সাহেবও এই চতুর কর্ম্মকার শিল্পীর যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। মনোহর কর্ম্মকার প্রতিভাবান্ শিল্পী ছিলেন, তিনি বাঙ্গালা অক্ষর ছাড়া ইংরাজী হিন্দি প্রভৃতি নানা ভাষার সুন্দর সুন্দর অক্ষর ঢালাই করিয়াছিলেন। তাঁহার অক্ষরে বঙ্গভাষায় গ্রন্থ পত্রিকা মুদ্রিত হয় আর সেই পত্রিকার প্রকাশক তাঁহার আত্মীয় শ্রীরামপুরের একজন কর্ম্মকার ছিলেন। মনোহর কর্ম্মকারের বংশধরগণ এখনও শ্রীরামপুরে বসবাস করিতেছেন।

বর্ত্তমান যুগে স্বর্গীয় উমাচরণ কর্ম্মকারের নির্ম্মিত তুলাদণ্ডের নিদর্শন কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়া রহিয়াছে। ঐ [illegible] অতি ক্ষুদ্র পালঙ্কের ভাষও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। স্বর্গীয় [illegible] দণ্ডসহ এন্থ্রপমেট্রিক (anthropometric) টিপ্‌ই প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্যে একাধিক শাসন-বিভাগে প্রচলিত হইয়াছিল। তাঁহার কারখানায় নির্ম্মিত অনেকগুলি বৃহৎ বাড়ী কলিকাতার সরকারী ও বে-সরকারী আফিসে ব্যবহৃত হইতেছে। এদেশের শিল্প-জগতে নীরব নিষ্ঠাবান বহু কর্ম্মকার শিল্পী এইরূপে তাঁহাদের উদ্ভাবনী শক্তির বাহ্যিক পরিচয় দিয়াছেন বাঙ্গালী ইতিহাস লেখকগণ তাহার মূল্য এখনও বুঝিতে পারেন নাই। সাহিত্যের ন্যায় ধাতু-শিল্পের প্রভাবও যে বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবনে হিতকর পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিয়া বাঙ্গালী জাতীয় নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি সাধন করিতে পারে এ কথা যেদিন কর্ম্মকার-শিল্পী বুঝিবেন সেদিন তিনি সংনিবেশন চর্চ্চা করিয়া বঙ্গীয় সমাজে উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিবেন আর যেদিন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ইতিহাসলেখক [illegible] বাঙ্গালার ইতিহাসে কর্ম্মকার শিল্পীর যথার্থ স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন সমগ্র বাঙ্গালাদেশের উচ্চ শ্রেণীর ধাতুশিল্প যে

বলিয়া মানিয়া লওয়া এবং তাহার বিকট পুলিশপ্রথার নগ্ন চিত্র অঙ্কনের পুঁজিতে সাহস করা, ইহা যে কাণ্ডজ্ঞানে এবং বিদেশী নিরপেক্ষ সামাজিক চিত্রের অনুকরণে হইতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ অন্য একটী সামাজিক কারণ এই পাপানলে ঘৃতাহুতি দিতেছে। সে কারণটী একজন মনীষী ইংরাজ সমালোচক অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনিও তাঁহার দেশের উপন্যাস-সাহিত্যের আধুনিক দুর্দ্দশা দেখিয়া দুঃখের সহিত বলিতেছেন :—

Most novels now-a-days have to run as serials through Magazines or Newspapers and the editors of these periodicals are timid to a degree which outsiders would hardly believe with regard to the fiction they admit into their pages. This story or episode would annoy their Catholic readers; that one would repel their Wesleyan Methodist subscribers; such an incident is unfit for the perusal of the young person; such another would drive away the offended British matron.

ইংরাজ সমালোচক যাহা তাঁহার সমাজের রুচির সম্বন্ধে বলিতেছেন, আমাদের সমাজের রুচির সম্বন্ধে আর এক ভাবে তাহা বেশ বলা যায়। আমাদের দেশের মাসিক বা পাক্ষিক সাপ্তাহিকের সম্পাদকগণকে সকল সময় এদেশের পাঠকের ও গ্রাহকের মুখ চাহিয়া কাজ করিতে হয়। মাসিকে যে সব গল্প বা ধারাবাহিক উপন্যাস বাহির হয়, তাহার রুচি গ্রাহকের রুচি অনুসারে ঠিক করিয়া লইতে হয়। মাসিকের সম্পাদক বা অধ্যক্ষিকারী সমাজের মাথা টিপিয়া দেখেন যে, এই শ্রেণীর বিলাসী ছাঁচে ঢালা বেপ্রোটার্থি, নির্ব্বিচারায়ণী, কথায় কথায় ত্যাগ-অভিমানকারিণী নায়িকা অপেক্ষা কোন অকাতর, সমাজের ভয়ে অভীত, dare devil নায়ক এদেশের গ্রাহক বা পাঠকের রুচিকর, তখন তাঁহারাও ঐ ভাবের চরিত্র-সম্বলিত গল্প বা উপন্যাস প্রকাশ দিতে থাকেন। আর মাসিকে একবার এইভাবে নায়ক নায়িকার পারিবারিক সম্বন্ধের আটঘাট একবারে খুলিয়া যায়, তিনি তখন সে ভাবে নিত্য পাপের নগ্ন চিত্র সমাজের চক্ষুর সম্মুখে খুলিয়া ধরিতে থাকেন। তখন তাঁহার বুক বলিয়া যায়, চোখে তাঁহার লজ্জা বা কাহাকেও সঙ্কোচ রাখে না। এই ভাবেই আমাদের [illegible] আবর্জ্জনা-সাহিত্য সৃষ্টি হইতেছে।

আবার Victoria Crossএর heroineএর চরিত্র আরও ভয়ানক। তাহার Life of my heartএ সেটাইওয়ালা পাঠান বালকের, এবং ইংরাজ অসাবধান কন্যার উদ্দাম কাম-লালসা-সঞ্জাত প্রাণের টান যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনি লজ্জায় ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিয়াছেন। অথচ ঐ লেখাই Nature painting বলিয়া ইংরাজ সমাজে মহাসমাদর লাভ করিয়াছে। তাহার Ana Lombard এর কথা উল্লেখ না করাই ভাল, উহাতে ইহা অপেক্ষাও বীভৎস কাণ্ড, এক ইংরাজ যুবতীর একসঙ্গে দুই জনের উপর টান; প্রথম প্রণয়ীর তাহার পিতার পাঠান ভৃত্য গইদা খাঁ, দ্বিতীয় তাহারই স্বজাতীয় একটী সিভিলিয়ান যুবক। ইংরাজ যুবতী কাহাকেও ছাড়িতে চাহেন না, পাঠানকে দেহ দিয়া এবং সিবিলিয়ানকে মন দিতেছেন! এরূপ বীভৎস চিত্র আর কোথায় দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না, অথচ ইহা bold nature painting বলিয়া সমালোচক-শ্রেষ্ঠ Stead সাহেবের নিকটও আদর পাইয়াছে। সেইটা সাহেবেই দিই না, মনটা একজনের জন্য কিম্বা রাখিয়াছি। অতএব আমি আদর্শ heroine,—এ কেমন কথা?

এইবার আমরা বিখ্যাত লেখক Grant Allenএর জগৎ-প্রসিদ্ধ British Barbarians গ্রন্থ হইতে কয়েকটি কথোপকথন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব, আধুনিক বিলাতী সমাজে Nature paintingএর মাত্রা কতটা চড়িয়াছে এবং উহার অনুকরণে আমাদের গল্প ও উপন্যাস-সাহিত্যে কি পরিমাণে অনধিকার প্রবেশ হইতেছে। প্রথমে বলিয়া রাখি, গ্রন্থের নায়ক Bertram পরপুরুষ, নায়িকা Frida বিবাহিতা পত্নী। স্বামীর অসাক্ষাতে প্রণয়ী Bertramএর সহিত Fridaর কথাবার্ত্তা হইতেছে:—

Bertram.—You can't look me in the face and tell me you love him.

Frida.—No, not since the first few months. But, Bertram, he is my husband, and of course I must obey him.

Bertram.—You must do nothing of the sort. You don't love him at all and you must n't pretend to. It is *wrong*, it is *wicked*.

Bertram—*you yourself* he has no claim or right over. You may now go home to-night, dear one, but you must come

...often. If you can't come round to my room—for fear of Miss Blecke's (মেয়েটা-ওয়ালী) fetich, *the respectability of her house* we must meet elsewhere.

Frida.—But will it be *right*, Bertram ?

Bertram.—Why, Frida, do you think if it were *wrong* I would advise you to do it ? I am here to help you, to guide you, to lead you on by degrees to *higher and truer life*. How can you imagine I would ask you to do anything on earth, unless I felt perfectly sure and convinced it was the *very most right and proper conduct*.

ফ্রিডা—তবে ? বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব কিছুই নাই, যে দিকে মন উধাও হইবে, সেই দিকেই ছুটিবে, ইহাতে কোনও পাপ নাই, দোষ নাই, ইহা সম্পূর্ণ ন্যায় ও সঙ্গত, ইহাই Natureএর নিয়ম। যেমন অবাধ নিঃসঙ্কোচ, তেমন উচ্ছৃঙ্খল উদ্দাম স্বাধীনতা চরিতার্থ করিবার উদার উন্মুক্ত পথ। এবং Gerut Allen একটা কাল্পনিক মানব সৃষ্টি করিয়া তাহার নায়ক Bertramকে খাড়া করিয়াছেন ; যাঁহাদের free-thinking মানব মানবী বিরূপ হইবে, তাহাই Bertram ও Fridaতে চিত্রিত। তাহা হইলেও গ্রন্থকারের লেখার আধুনিক ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য অসংযত উচ্ছৃঙ্খল বিলাতী সমাজের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। Bertramএর মুখে খানিকটা কথা উদ্ধৃত করিয়া আধুনিক বিলাতী সমাজের মনের ভাবটা বলা করিয়া দিই :—

Bertram.—The worst of them all (taboos) in their (Englishmen's) present complicated state are the ones that concern marriage and the other hideous sex-taboos. They seem to have been among the earliest human abuses ; for marriage arises from the stone age's practise of felling a woman of another tribe with a blow of one's club and dragging her off by the hair of her head to one's own cave *as a slave and a drudge*.

It (marriage) *is the hatefullest taboo of all the hateful taboos, the unworthiest of a pure or moral community,*

Nature has given us this divine instinct of love within, to tell us with what persons we should spontaneously unite.

We think every man and woman should be free to do as they will with their own persons; for that is the very basis and foundation of personal liberty.

কেমন, আর কিছু চাহেন কি? কেমন বিবাহের ধারণা, কেমন ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ধারণা? এইরূপ ধারণার অনুকরণে এদেশেও যদি পদ্যে ও উপন্যাসে সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করা হয়, এবং সাধারণ পাঠকের রুচি অনুযায়ী প্রতি [illegible] পত্রের সম্পাদক বা স্বত্বাধিকারী সেই সাহিত্যের আদর [illegible] থাকেন, তাহা হইলে যে আমাদের সাহিত্যে nature paintingটা চলিবে তাহাতে এবং আমাদের নবীন সাহিত্য যে দ্রুত "উন্নতির" পথে অগ্রসর হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভগবান, আমাদিগকে এবং আমাদের ভাবুক বন্ধুবান্ধবগণকে এই উন্নতি হইতে রক্ষা করুন!

এই ভদ্রলোক পাশ্চাত্যের nature paintingএর উপর আর এক বিষয় জুড়িয়াছেন। উপন্যাস-সাহিত্যে কেবল মনস্তত্ত্বের প্রাধান্য দেখাইতে হইবে, ইহাই আধুনিক উপন্যাস লেখকের বহুমূল ধারণা। ইহারা মনস্তত্ত্বের বৃত্তি-স্ফুরণের পূর্ণ অবকাশ দিয়া উপন্যাসের অঙ্গ ও অবয়ব অসংগঠিত বা নামমাত্র গঠিত করাই ইঁহারা উপন্যাস-রচনার চরম সার্থকতা মনে করেন। ফলে এই হইতেছে যে, আজিকালিকার আদর্শ উপন্যাসের স্থান কেবল dialogue দিয়া পরিপূর্ণ করা হইতেছে, উপন্যাসে বর্ণনার মাত্রা না-নাবিধ রসসম্ভাবের ক্রমেই অগ্রাহ্য হইতেছে। ইহাতে উপন্যাসে [illegible] হইতেছে। আধুনিক য়ুরোপীয় Society women বা তাঁহাদের [illegible] সমাজের মানুষগুলা পৃথিবীর সকল বস্তুতেই অতৃপ্তি ও বিরক্তি অনুভব করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিত্যই একটা নূতন কিছু চাই, না হইলেই তাঁহারা [illegible] to death অনুভব করিয়া থাকেন। খবরের কাগজে Race বা Sporting পাতাটা, না হয় বড় জোর fashion pageটার নূতন নূতন পোষাকের কথাটা অথবা বড় ঘরের কেলেঙ্কারীর কথাটা তাঁহারা কখনও কখনও উল্টাইয়া থাকেন বিশেষ বিরক্তি বোধ করেন না। তাঁহাদের পক্ষে Novelএ descriptive portionটা পড়া ঝক্কি! তাহা হইতে তাঁহাদিগকে [illegible] বলা হয় না কেন? কাজেই বিলাতী উপন্যাসে তাঁহাদের [illegible]

তাঁহাদের নায়ক-নায়িকার মুখ দিয়া কেবল আসল কথাটা বলাইয়া যান তাহার অধিক কর্ত্তব্য তাঁহাদের আছে বলিয়া বিশ্বাস করেন না।

এদেশেও ঐ ভাবে উপন্যাসের একটা প্রধান অঙ্গ কাটিয়া ছাঁটিয়া ফেলা হইতেছে। পরন্তু চূড়ার উপর ময়ূরপাখা এই যে, আধুনিক লেখকেরা যাহা লিখেন তাহাই ভাষা। এভাষায় উহাই কথার আমদানী হইলেও কিছু বলিবার যো নাই; বাগরে, উহা যে শ্রেষ্ঠ লেখকের লেখা! রামায়ণ মহাভারতের আমলের ঋষিরা আর্ষ প্রয়োগ করিতেন। কিন্তু কালিদাসের মত জগৎবরেণ্য কবিও আর্ষ প্রয়োগ করিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঙ্কুচিত হইয়াছেন। অথচ, একালের দো-কলা কালিদাসরা সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। ভাষা এ স্থানে কুম্ভকারের কর্দ্দমপিণ্ডের ন্যায় তাঁহারা যে প্রকারে ইচ্ছা গড়িয়া লইতে পারেন। সুতরাং সাহিত্যের ভাব ও ভাষার ক্রমশঃ কি গতি হইতেছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। এ বিষয়ে যেন কাহারও মা বাপ নাই, যে যেমন ইচ্ছা ভাষা সৃষ্টি করিবে; কেহ কোনও কথা বলিতে গেলেই অবজ্ঞাভরে বলা হইবে—উহা সাধারণ পাঠকের বোধগম্য নহে অর্থাৎ যাহা অবোধ্য, তাহাই উপাদেয় ভাষা ও ভাব বলিয়া সকলকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। বিড়ম্বনা আর কি?

বস্তুতঃ কালভেদে নূতন নূতন ভাব, নূতন নূতন সমস্যা দেশের ও সমাজের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে। কথামাত্র সংস্কারের বিরোধী প্রাচীন-পন্থীর মত সেই ভাবের বন্যা রোধ করিতে গেলে উপহাসাস্পদ হইতে হয় মাত্র—এক ভগবানের অবতার ভিন্ন অন্য কেহ সেই বন্যার গতিরোধ করিতে পারে না। কিন্তু তাহা হইলেও সমাজ ও দেশের উপযোগী নূতন ভাবের পরিপোষক চরিত্র সৃষ্টি করিয়া লোকচক্ষুর সম্মুখে ধরিলেই কালোপযোগী শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সেই সম্পর্কে বিসদৃশ কুরুচি-জ্ঞাপক স্বাভাবিক চরিত্র-সৃষ্টির দ্বারা সাহিত্যকে কলঙ্কিত না করিয়া শিক্ষাপ্রদ পাপে অনাস্থাবান ও পুণ্যে অর্থাৎ সৎকর্ম্মে উৎসাহান্বিত চরিত্র চিত্রিত করিয়া সৎসাহিত্যের কলেবর পুষ্টি করাই কর্ত্তব্য। যাহা পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া পাঠ করা যায় না, যাহা অন্তঃপুর-চারিণীদের হস্তে নিঃসঙ্কোচে পাঠ করিতে দেওয়া যায় না, এমন আবর্জ্জনা সাহিত্য ক্ষেত্র হইতে ঝাঁটাইয়া সাফ করিয়া দিলেই সমাজের মঙ্গল। কিন্তু সেবার উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল অবাধ সমাজের এ কথায় কর্ণপাত করিবার ধৈর্য্য আছে কি?

সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য নানাবিধ চাতুরী খেলেন এবং খোন্দ, ভিল, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিম জাতি সকলকে Animist বা পশু-উপাসক বলিয়া হিন্দুর গণ্ডীর বাহিরে রাখিয়া দেন। স্যর এডওয়ার্ড গেট পরে প্রজাগণনায় কর্ত্তা হইয়া শিখ, জৈন ও কবীরপন্থীদিগকে হিন্দু নামের গণ্ডীর মধ্যে রাখিবার চেষ্টা করেন। অবশ্য সম্প্রদায় তাঁহার উস্কানীতে আর বিভেদের পরিচয় দিয়া হিন্দু বলিয়া দেয় না। জৈনদিগের মধ্যেও একটু গণ্ডগোল ঘটে; জৈনদিগের সহিত রাজপুতানায়, গুজরাটের এবং পশ্চাবের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনেকের বৈবাহিক আদান-প্রদান চলিয়া থাকে। এমন পাঁচ সাতটা জৈন-বৈষ্ণব বিবাহে আমরা নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলাম। কাজেই জৈনগণ সোজাসুজি বিভেদের অ-হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে পারিলেন না; বল্লভ কুলের এবং রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ জৈনদিগকে পর বলিয়া বিবেচনা করেন না। নেপাল ভুটান প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশের "শু-ভিতু" বৌদ্ধ সমাজ নিজেদের হিন্দু বলিয়াই পরিচিত করে; তাহারা বলে আমাদের দেশের সবাই হিন্দু, এক সম্প্রদায় ওকাদি—শ্রীগুরুকে দেবতার আসন দিয়া পূজা করে, দ্বিতীয় সম্প্রদায় দেব-ভক্তা বা বেদোক্ত বা তন্ত্রোক্ত দেবতার পূজা, অর্চ্চনা, যজ্ঞাদি করিয়া থাকে। নেপালের বৌদ্ধগণ ব্রাহ্মণ বিচারকের বিচার ধারা করিয়া চলেন। সুতরাং হিন্দু পরিচয় হইতে মুক্ত ভাবাবলম্বী অ-মুসলমান বা অ-খৃষ্টান কোন ধর্ম্মাবলম্বীকে বাদ দেওয়া চলে না। এমন এক সময় ছিল যখন ব্রাহ্ম সমাজের অনেকে নিজেদের হিন্দু বলিয়া পরিচিত করিতে চাহিতেন না। এখন সে দিন আর নাই; আদি সমাজ অনাদিতে যাইয়া মিশিয়াছে, অর্থাৎ আদি ব্রাহ্মসমাজ লোপ পাইয়াছে; কেশবচন্দ্রের নববিধান সমাজের অস্তর্দ্ধান হইয়াছে বলিলেই হয়, কোচবিহারের মহারাজার মৃত্যুর পরে উহার কঠখাসের অবস্থা হইয়াছে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মেরুদণ্ড গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ ভাঙ্গিয়া দিয়া গিয়াছেন, যেটুকু সজীবতা উহাতে ছিল তাহা আচার্য্য শিবনাথের মৃত্যুর পরে অপচয় লাভ করিয়াছে। এবারকার মাঘোৎসবের কাণ্ড লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জানই বা কতটুকু আছে। এখন ব্রাহ্ম-সন্তানগণ হিন্দু বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। শেষ কথা কলিকাতার কায়স্থ সমাজ এবং আংশিক ভাবে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজ বিলাত-ফেরতার দলকে অবাধে সমাজে চালাইয়া লইতেছেন, অনেক গো-খাদকও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পাংক্তেয় হইয়া যাইতেছেন। এমন অবস্থায় হিন্দু শব্দের নূতন পরিভাষা সৃষ্টির প্রয়োজন হইয়াছে। "স্বতন্ত্র" নামক হিন্দী দৈনিক কাগজের

সম্পাদক পণ্ডিত অম্বিকাপ্রসাদ বাজপেয়ী এবং মহোপাধ্যায়ের বিরলা ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রধানগণ সম্প্রতি একটা নূতন বিবৃতির সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা এই,—

(১) যিনি আর্য্য সংস্কৃত সভ্যতাকে মান্য করিয়া চলেন এবং যাঁহারা ভারতভূমিকে স্বীয় জন্মভূমি বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করেন।

(২) যিনি মুসলমান নহেন, খৃষ্টান নহেন এবং ভারতবর্ষে সুপ্রচলিত কোন ধর্ম্মমতকে মান্য করিয়া চলেন এবং বিশিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত।

(৩) যিনি গো-হত্যাকে পাপ বলিয়া বিবেচনা করেন এবং গো-মাংস ভোজনে যাঁহার অভিরুচি নাই।

সোজা কথা এই, মুসলমান ও খৃষ্টান বাদে, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের সকল সম্প্রদায়ভুক্ত ভারতবাসীকে হিন্দু বলিয়া আপন জন করিয়া লইবার প্রয়াস সর্ব্বত্রই প্রকট হইয়াছে। পণ্ডিত মদনমোহনের হিন্দু মহাসভায় বক্তৃতার ইঙ্গিতও তাহাই। এই প্রয়াসের খবর পাইয়া রাজপুত মুসলমানগণ হিন্দু-সমাজভুক্ত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। একজন বিচারশীল হিন্দুস্থানী পণ্ডিত সেদিন বলিতেছিলেন যে, "বিবাহাদি ব্যাপারে আমরা সবাই স্ব-স্ব সমাজের গণ্ডীভুক্ত, পান-আহার সম্বন্ধেও আমরা বিধিনিষেধের দ্বারা শাসিত, আমরা সবাই এক একটা compartmentএ আবদ্ধ, ছুৎমার্গের ঘোর বিরোধী মহাত্মা গান্ধিও তাঁহার গুজরাটী বালিয়া সমাজের গণ্ডীর বাহিরে পুত্র-কন্যার বিবাহ দেন নাই, কদাপি দিবেনও না। ছুৎমার্গ তুলিয়া দিলেও, পঞ্চম জাতি সকল জলচল হইলেও বিবাহাদি ব্যাপারে সামাজিক গণ্ডী সহজে কেহ কাটিবে না। বিলেতী রাজ জোর-জবরদস্তি না করিলে এই প্রাদেশিক ও সামাজিক গণ্ডী শীঘ্র নষ্ট হইবার নহে। এমন অবস্থায় যে আপনাকে হিন্দু বলিয়া ঘোষণা করিবে তাহাকেই হিন্দু বলিয়া গ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য। ভারতীয় বিশিষ্টতার কথা যাহা তুলিয়াছ তাহা ন্যাশনালিজিয়মের বেদীর উপরে দাঁড়াইয়া আবার প্রচার করিতে হইবে, বিলাতী অনুচিকীর্ষাকে পরাজয় করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা আবার করিতে হইবে। এখন সংখ্যা বাড়াইয়া লও, অন্ততঃ হিন্দু নামের মাহাত্ম্যটা বেশ করিয়া ফুটাইয়া তোল। পরের কথা পরে বিবেচনা করা যাইবে।"

হিন্দু নামের পরিভাষিক ও ঐতিহাসিক-কথা আমরা সংক্ষেপে বলিয়াছি। আত্মরক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার যে প্রয়োজন তাহা হিন্দু সমাজনায়কগণ বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। 'সংহতিঃ কার্য্যা বিজয়ে'—এ মন্ত্রবাক্যের মর্ম্ম পঞ্জাব হইতে বাঙ্গালা পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দুমাত্রেই অনুভব করিতেছেন।

এই অনুভূতির ব্যঞ্জনা পণ্ডিত মদনমোহন বর্মার হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে করিয়া দিয়াছেন। এখন তাঁহার কথা অনুসারে কাজ হওয়া প্রয়োজন। সে কাজ হইবে কি? আমার নিশ্চিত হিন্দু সমাজ এখনও কি গা-ঝাড়া দিয়া উঠিবেন না? ব্রাহ্মণাদি হিন্দু ধনী জমীদারগণ কি সঙ্ঘবদ্ধের কার্য্যে অগ্রণী হইবেন না? মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যখন সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তখন মনে একটু আশা জাগিয়াছে যে, তিনি নিশ্চেষ্ট থাকিবেন না, কাজের মত কাজ যাহাতে হয়, সে চেষ্টা করিবেন।

শ্রীপাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

ষট্‌চক্র বিবরণ।

মূলাধারচক্র।

মূলাধারচক্র চতুর্দ্দল, ইহার চারিটি পত্র রক্তবর্ণ। পত্রমধ্যে ব শ ষ স এই চারি বর্ণ দক্ষিণাবর্ত্ত ক্রমে অবস্থিত আছে। বর্ণগুলি স্বর্ণের ন্যায় বর্ণ (হং) যুক্ত। এই পদ্মের কর্ণিকাতে চতুষ্কোণ পৃথ্বীমণ্ডল অবস্থিত। উহা আটটি শূলাকার চিহ্নের দ্বারা আবৃত ও পীতবর্ণ। ধরামণ্ডলের মধ্যে ধরাবীজ (লং) অবস্থিত। এই বীজ চতুর্ভুজ, ঐরাবতস্থিত, পীতবর্ণ ও বজ্রহস্ত অর্থাৎ উহার হাতে বজ্র আছে। ধরাবীজের বিন্দুমধ্যে ত্রিমুখরূপী রক্তবর্ণ চতুর্ম্মুখ ও চতুর্ভুজ ব্রহ্মা অবস্থিত। ইঁহার হস্তচতুষ্টয়ে দণ্ড কমণ্ডলু জপমালা ও অভয় ধৃত হইয়াছে। পদ্মের কর্ণিকাতে রক্তপদ্মোপরি রক্তবর্ণা চতুর্ভুজা চক্রাধিষ্ঠাত্রী ডাকিনী শক্তি অবস্থিতা। ইঁহার হস্তচতুষ্টয়ে শূল খট্টাঙ্গ চক্র ও চষক (মদ্যপাত্র) ধৃত হইয়াছে। কর্ণিকামধ্যে বিদ্যুদাকার ত্রিকোণ, তন্মধ্যে কন্দর্পনামক বায়ু ও রক্তবর্ণ কামবীজ (ক্লীং)। তাহার উপরে শ্যামবর্ণ পশ্চিমাভিমুখ স্বয়ম্ভু-লিঙ্গ অবস্থিত। লিঙ্গের উপরে সার্দ্ধত্রিবলয়াকারা (দক্ষিণাবর্ত্তে সাড়ে তিন পেচ দিয়া পেঁচাইয়া করিয়া) কুণ্ডলিনী শক্তি আছেন। তাঁহার উপরে লিঙ্গের অগ্রদেশে দণ্ডাকার চিৎকলা অবস্থিত। কুণ্ডলিনী দেবী মৃণালসূত্রের মত সূক্ষ্ম ও বিদ্যুতের মত ঔজ্জ্বল্যযুক্তা। ইনি বিদ্রিজসর্পাকারে সার্দ্ধত্রিবৃত্তরূপে ঊর্দ্ধভাগে

বয়ম্ভূলিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছেন। ইনি সিন্দুরবর্ণ দশ ঊর্দ্ধ দিকে মুখযুক্তা। বর্ণিত আধারচক্রের দলগুলি সুষুম্না নাড়ী ও কন্দযোনি-চতুষ্টয়ের সন্নিহিতস্থলে সংলগ্ন। লিঙ্গের দুই অঙ্গুলী পরিমাণ নিম্নে ও কন্দস্থানের দুই অঙ্গুলী পরিমাণ ঊর্দ্ধে পক্ষীর ডিমের মত আকৃতিযুক্ত কন্দমূলস্থান অবস্থিত; পরন্তু অবস্থিতি মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে লিঙ্গাদিস্থানের সমদেশে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ যেখানে লিঙ্গমূল অথবা নাভিদেশ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ আছে, সেই স্থলে লিঙ্গমূলাদির সমদেশে মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে চক্রাদির অধিষ্ঠান বুঝিতে হইবে। যদিও মূলাধারপদ্ম অধোমুখ বলিয়া কথিত হইয়াছে, তথাপি ধ্যানকালে ঊর্দ্ধমুখরূপে চিন্তা করিতে হইবে। এই বিষয়ে তন্ত্রান্তরে কথিত হইয়াছে যে, দৃষ্টিদিগের পক্ষে পদ্মগুলি অধোমুখরূপে এবং যতিদিগের পক্ষে ঊর্দ্ধমুখরূপে চিন্তনীয়।

স্বাধিষ্ঠানচক্র।

লিঙ্গমূলের সমদেশে "স্বাধিষ্ঠান"-নামক চক্র অবস্থিত। এই চক্র সিন্দুরবর্ণ ষড়্‌দলযুক্ত। দলমধ্যে বিন্দুযুক্ত ব ভ ম য র ল এই ছয়বর্ণ অবস্থিত। ইহাদের বর্ণ বিদ্যুতের মত। এই পদ্মের কর্ণিকামধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রযুক্ত অষ্টদলযুক্ত পদ্মাকার শুক্লবর্ণ অম্বোমণ্ডল। তন্মধ্যে বরুণবীজ (বং) উহা মকরস্থিত ও শুক্লবর্ণ। তাহার ক্রোড়ে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ, পীতাম্বর বনমালাশোভিত শ্রীবৎসচিহ্ন কৌস্তুভধারী যুবকরূপ বিষ্ণু। পদ্মের পূর্ব্বদিকে রক্তবর্ণোপরি শ্যামবর্ণা শূলপদ্মডমরুকপাশধরা চতুর্ভুজা ত্রিনেত্রা রক্তবস্ত্রা ভাকিনী চক্রাধিষ্ঠাত্রী রাকিনীশক্তি আছেন।

মণিপুরচক্র।

নাভিমূলের সমদেশে মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ দশদল "মণিপূর"-নামক চক্র অবস্থিত। ইহার দলমধ্যে বিন্দুযুক্ত এবং নীলবর্ণ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ বর্ণ অবস্থিত। ইহার কর্ণিকাগ্রে ত্রিকোণাকার এবং ত্রিকোণের প্রতি তিনটি স্বস্তিক চিহ্নযুক্ত রক্তবর্ণ বহ্নিমণ্ডল। তন্মধ্যে রক্তবর্ণ বহ্নিবীজ (রং) এই বীজ মেষস্থিত চতুর্ভুজ ও বরদশক্তিবরাভয়ধারী। ইহার ক্রোড়ে পদ্মে বিভুজ বরাভয়ধারী রুদ্রদেব তপ্তকাঞ্চনগৌরী ওঢ্রাভরণশোভিতা ত্রিনেত্রা রক্তবস্ত্রা রুদ্রমূর্ত্তি অবস্থিতা। পদ্মের কর্ণিকাতে রক্তপদ্মোপরি নীলবর্ণা লিকিনী বরদশক্তি বরাভয়ধারিণী চতুর্ভুজা ত্রিনেত্রা নানাবিধালঙ্কারভূষিতা চক্রাধিষ্ঠাত্রী শক্তিরূপা [illegible]

অনাহতচক্র।

হৃদয়স্থানে রক্তপদ্মের মত রক্তবর্ণ দ্বাদশদল "অনাহত" নামক পদ্ম অবস্থিত। এই পদ্মের দলমধ্যে সিন্দূরবর্ণ ষট্‌কোণ [illegible] বিদ্রুমের ন্যায় এই দ্বাদশবর্ণ বর্ণিত হইয়াছে। উহার কর্ণিকামধ্যে ষট্‌কোণ ধূম্রবর্ণ বায়ুমণ্ডল, তদুপরি সূর্য্যমণ্ডল, তন্মধ্যে বিদ্যুৎকোটিসমানকান্তি ত্রিকোণ। ত্রিকোণের উর্দ্ধে ধূম্রবর্ণ বায়ুবীজ। উহা কৃষ্ণসারারূঢ় চতুর্ভুজ ও অঙ্কুশভৃৎ। ইহার ক্রোড়ে হংসের মত শুক্লবর্ণ ত্রিনেত্র বরাভয়হস্ত ত্রিদেব উপলাময় দেখা যায়েন। এই পদ্মের কর্ণিকাতে রক্তপদ্মোপরিস্থিতা নীলবর্ণা চতুর্ভুজা পাশ অঙ্কুশ বরাভয়হস্তা সর্ব্বভূষণভূষিতা পীতবস্ত্রা নরকপালমালাধারিণী চক্রাধিষ্ঠাত্রী কাকিনীশক্তি আছেন। ইঁহার অবস্থিত ত্রিকোণে সুবর্ণবর্ণ বাণলিঙ্গ শিব অবস্থিত। ইনি কামকলানিবন্ধন উমাসমযুক্ত। ইঁহার মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্র আছে। ইঁহার অধোদেশে নিশ্চল দীপকলিকাকার হংসরূপী জীবাত্মা। এই পদ্মের কর্ণিকার অধোদেশে উর্দ্ধমুখ রক্তবর্ণ অষ্টদলপদ্ম আছে। ইহা বন্ধুজীব রক্তবেলিকা চন্দ্রকলতাকা প্রভৃতির দ্বারা সুশোভিত। এই স্থানে ইষ্টদেবতার ধ্যানমন্ত্র বলিতে হয়।

বিশুদ্ধচক্র।

কণ্ঠমূলে ধূম্রবর্ণ ষোড়শদল "বিশুদ্ধ" নামক পদ্ম। ইহার কেশরগুলি ঈষদ্রক্ত বর্ণ। দলমধ্যে বিদ্রুমরক্তবর্ণ অকারাদি ষোড়শ স্বর আছে। ইহার কর্ণিকাতে বৃত্তাকার শুক্লবর্ণ নভোমণ্ডল অবস্থিত। মণ্ডলমধ্যে ত্রিকোণ; ত্রিকোণমধ্যে চন্দ্রমণ্ডল। চন্দ্রমণ্ডলের উপরে নভোবীজ (হং); উহা শুক্লবর্ণ শুক্লবর্ণগরিমান শুক্লস্থিস্থিত ও চতুর্ভুজ। ইহার হস্তচতুষ্টয়ে পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অভয় ধৃত হইয়াছে। বর্ণিত নভোবীজের ক্রোড়ে বৃষোপরি মহাসিংহাসনে অর্দ্ধনারীশ্বর সদাশিবমূর্ত্তি। ইঁহার বামার্দ্ধ স্বর্ণবর্ণ ও দক্ষিণার্দ্ধ শুক্লবর্ণ। ইঁহার পঞ্চমুখ, (প্রতিমুখে) তিন চক্ষু ও দশহস্ত। দশহস্তে শূল টঙ্ক খড়্গ বজ্র অগ্নি নাগেন্দ্র (সর্পরাজ) ঘণ্টা অঙ্কুশ পাশ ও অভয়মুদ্রা বর্ত্তমান। ইঁহার পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম ও সর্ব্বাঙ্গে ভস্মের দ্বারা লিপ্ত। ইনি সর্পমালার দ্বারা পরিশোভিত। ইঁহার মস্তকে অমৃতবর্ষী অধোমুখ অর্দ্ধচন্দ্র শোভা সম্পাদন করিতেছে। এই পদ্মের কর্ণিকামধ্যে চন্দ্রমণ্ডলাভ্যন্তরে অস্থির উপরেস্থিত শুক্লবর্ণা শাকিনীশক্তি

আছেন। ইঁহার চারিহস্তে পাশ অঙ্কুশ ধনু ও বাণ রহিয়াছে। পরিধানে পীতবস্ত্র, মুখ পাঁচখানা ও নয়ন তিনটি।

আজ্ঞাচক্র।

ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থানে "আজ্ঞা" নামক চক্র অবস্থিত। এই চক্র শুক্লবর্ণ, ইহার দল দুইটি। দলদ্বয়মধ্যে কর্পূরবর্ণ (বিচিত্রবর্ণ, মিশ্রবর্ণ) 'হ ক্ষ' এই বর্ণদ্বয় আছে। ইহার কর্ণিকাতে চক্রাধিষ্ঠাত্রী হাকিনী শক্তি আছেন। ইনি শুক্লবর্ণা ষড়্‌বদনা ও ত্রিনেত্রা। ইঁহার নেত্রত্রয় রক্তবর্ণ। ইনি চাপিহস্তের দ্বারা জ্ঞানমুদ্রা অথবা পুস্তকমুদ্রা অর্থাৎ পুস্তক ও চিন্মুদ্রা ধারণ করিয়াছেন। কালীচরণের মতে ইনি ষড়্‌ভুজা। ইঁহার হস্তে বর, অক্ষমালা, কপাল, ডমরু ও পুস্তক আছে। ইঁহার ঊর্দ্ধে ত্রিকোণমধ্যে বিদ্যুৎ আকার শুক্লবর্ণ "ইতর" বিবলিঙ্গ। লিঙ্গের উপরে ত্রিকোণে জীবাত্মরূপ জ্যোতিঃস্বরূপ প্রণবাকৃতি "অন্তরাত্মা" ইঁহার চতুর্দ্দিকে মূলস্থানে জ্যোতিঃস্ফুলিঙ্গ, এই অন্তরাত্মার স্বকীয় তেজের দ্বারা মূলাধারপদ্ম হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান উদ্ভাসিত। ইঁহার ঊর্দ্ধে সূক্ষ্মরূপ মন, মনের ঊর্দ্ধে চন্দ্রমণ্ডল-মধ্যে হংসের ক্রোড়ে শক্তির সহিত পরমশিব অবস্থিত।

সহস্রদলপদ্ম।

প্রদর্শিত সমস্ত পদ্মের উপরিদেশে শশিনীনাড়ীর শেষ সীমায় মূলস্থানে ব্রহ্মরন্ধ্রের ঊর্দ্ধভাগে স্থিত বিসর্গের অধোদেশে প্রকাশমান, নির্ব্বাণ সহস্রদলপদ্ম অবস্থিত। এই পদ্ম পূর্ণচন্দ্রের মত অতিশয় শুভ্রবর্ণ। ইহা অপরূপ ও মনোরম। ইহার কেশরগুলি নবোদিত সূর্য্যের কিরণসদৃশ। ইহার শরীর অকারাদি পঞ্চাশদ্বর্ণের দ্বারা পরিশোভিত। পঞ্চাশদ্ বর্ণ যথাক্রমে বিংশতিবার আবর্ত্তনের দ্বারা অর্থাৎ বিংশতিশক্তিরূপে দলমধ্যে অবস্থিত আছে। পদ্মদলের সংখ্যার বিংশতিগুণে বর্ণসংখ্যা একসহস্র হইয়াছে। এইস্থলে অকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত বর্ণমালা বুঝিতে হইবে। ইহাতে হ্রস্বকারের পরে পঠিত ঋকারাদি গ্রহণ হয় নাই। অন্যত্র বর্ণগুলিকে শুক্লবর্ণরূপে চিন্তা করিতে হইবে। এই পদ্মের কর্ণিকাতে কলাসমন্বিত নিষ্কল সম্পূর্ণ চন্দ্র আছেন। ইঁহার কিরণসমূহ ঝক্ ঝক্ করিতেছে। ইঁহাতে অমৃতপ্রবাহ বর্ত্তমান। এই চন্দ্রের অন্তর্ভাগে বিদ্যুতের মত শুভ্রবর্ণ ত্রিকোণ সর্ব্বদা ভূমিত হইতেছে। এই ত্রিকোণের মধ্যে শুক্ল শোভা পাইতেছে, উহা পরম-বিশুদ্ধরূপে, বস্তুতঃ অনির্ব্বচনীয়

চিৎস্বরূপ। উক্ত সহস্রদলপদ্মের কর্ণিকাতে ঊর্দ্ধক্রমে অন্তরাত্মা প্রভৃতি অবস্থিত আছেন। প্রথম হংসরূপ অন্তরাত্মা, তদূর্দ্ধে পরমশিবরূপ গুরু, তদূর্দ্ধে চন্দ্রমণ্ডল ও সূর্য্যমণ্ডল, তদূর্দ্ধে মহাবায়ু, তদূর্দ্ধে ব্রহ্মরন্ধ্র ও তদূর্দ্ধে মহাশক্তিনী। এই পদ্মের কর্ণিকাতে পরমশিব বাস করেন। ইনি আকাশস্বরূপ, মতান্তরে ব্রহ্মস্বরূপ। এই পদ্মে চন্দ্রের অমানাম্নী প্রসিদ্ধ ষোড়শী কলা আছেন। এই কলা রক্তবর্ণা ও মৃণালসূত্রের শতভাগের এক ভাগের মত সূক্ষ্মা। ইহার শরীর কোটি বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল। ইনি একাদশমানা ও অধোমুখী। অমাকলার ক্রোড়দেশে নির্ব্বাণনাম্নী কলা অবস্থিত। উহা সহস্রভাগে বিভক্ত কেশাগ্রের একভাগ পরিমিত অতিসূক্ষ্মা। উহা রক্তবর্ণা ও অধোমুখী। ইহার অধোদেশে অব্যক্তনাদাত্মক নিরোধিকাসংজ্ঞক বহ্নিকলা। এই কলা প্রাণীদিগের ইষ্ট চৈতন্যস্বরূপ। এই নির্ব্বাণকলার ক্রোড়ে অনির্ব্বচনীয়া পরব্রহ্মশক্তিরূপা নির্ব্বাণশক্তি আছেন। ইনি কোটি সূর্য্যের সমান প্রকাশযুক্তা ও ত্রিজগতের উৎপত্তিস্থানস্বরূপা। ইনি কেশাগ্রের কোটি ভাগের এক ভাগ তুল্য সূক্ষ্মা। ইনিই সকল প্রাণীর জীবস্বরূপা, এবং যতিদিগের চিত্তে তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদন করেন। নির্ব্বাণশক্তির মধ্যবর্ত্তী শূন্যস্থানে শিব-স্থান আছে, উহা সম্পূর্ণ সুখ-স্বরূপ ও বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ।

কুণ্ডলিনীর জাগরণ-প্রণালী।

যোগযুক্ত সাধক গুরুর নিকট হইতে নিয়ম অবগত হইয়া দেহস্থ বায়ুর এবং বহ্নির আক্রমণের দ্বারা এবং হুং এই বীজ উচ্চারণের দ্বারা কুণ্ডলিনী দেবীকে জাগরিত করিয়া ব্রহ্মদ্বারের ছিদ্র প্রস্ফুটিত করিবে, তৎপর কুণ্ডলিনী দেবীকে চিত্রিনী নাড়ীর মুখমধ্যে স্থাপিত করিবে। "হংসঃ" এই মন্ত্রের দ্বারা অথবা প্রণবের দ্বারা অর্থাৎ এই দুই মন্ত্রের মধ্যে একটি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হৃদয় হইতে জীবাত্মাকে মূলাধার চক্রে আনয়ন করিবে। তৎপর হুং বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক কুলকুণ্ডলিনী দেবীকে উত্থাপিত করিবে।

যোগী সাধক উপযুক্ত আসনে উপবিষ্ট হইয়া হস্তদ্বয় নিজের ক্রোড়দেশে উত্তানভাবে (চিৎ করিয়া) স্থাপন করিবে। অনন্তর খেচরী* মুদ্রার দ্বারা

* খঃ কপালবিবরে জিহ্বাং ব্যাবৃত্য বক্ষয়েৎ। ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিরগ্র্যেষা মুদ্রা ভবতি খেচরী। (ঘেরণ্ডের সংহিতা।) কপালদেশপর্য্যন্তচ্ছিদ্রেষ অভ্যন্তরে জিহ্বা ব্যাবৃত্ত ও বদ্ধ করিয়া ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিকে স্থিরভাবে নিহিত রাখিতে হয়। ইহার নাম খেচরী মুদ্রা। ঘেরণ্ডসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে খেচরী মুদ্রার বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

চিত্ত স্থির করিয়া দেহাভ্যন্তরে বায়ুর দ্বারা পূর্ণ করিবে, তৎপর কুম্ভক করিয়া হৃদয়স্থান আকুঞ্চিত করিবে। এই অনুষ্ঠানের দ্বারা বায়ুর ঊর্দ্ধগতি নিবৃত্তি হইবে। অনন্তর দেহাভ্যন্তরস্থিত বায়ুর দ্বারা উদর, কণ্ঠপ্রভৃতি স্থান ব্যাপ্ত হইলে নাড়ীগুলির ছিদ্র প্রস্ফুটিত হয়, এবং বায়ুর অধোগমন হয়, তখন সাধক বায়ুর অধোগমন অনুভব করিয়া গুদস্থান আকুঞ্চিত করিবে, এবং অপান কর্ম্ম করিয়া বায়ুর উত্তোলন অর্থাৎ ঊর্দ্ধগতি সম্পাদন করিবে। অনন্তর মূলাধার পদ্মের কর্ণিকাস্থিত ত্রিকোণমধ্যে বর্ত্তমান কন্দর্পকে বামদিকে আবর্ত্তিত অর্থাৎ চালিত করিবে। সেই উদ্দীপ্ত কামাগ্নির দ্বারা কুণ্ডলিনী উত্তপ্তা হইলে, তাঁহাকে হুঙ্কার বীজের দ্বারা জাগরিত করিবে। এই অবস্থায় ঊর্দ্ধতপ্তা কুণ্ডলিনী সহস্রারস্থিত পরম শিবের সমাগমাভিলাষিনী হন। তখন সাধকে স্বয়ম্ভুলিঙ্গের মুখ প্রসারিত করিয়া সেই ছিদ্রের দ্বারা চিত্রিনীনাড়ীর মধ্যে স্থাপন করিবে।

বিশেষ বিবরণ।

বর্ণিত ষট্‌চক্রের অতিরিক্ত আরও অনেকগুলি চক্র তন্ত্রবিশেষে বর্ণিত হইয়াছে। অনাবশ্যক বোধে তাহাদের বিবরণ এস্থলে উপেক্ষিত হইল; কিন্তু মূলাধার পদ্মের অধঃস্থিত সহস্রদল পদ্ম এই স্থলে উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্ব বর্ণিত কন্দস্থানের ঊর্দ্ধদেশে রক্তবর্ণ সহস্রদলপদ্ম অবস্থিত, এই পদ্ম উল্টান এবং কন্দমূলে সংলগ্ন, উহা সমস্ত পদ্মের আধার বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহার ঊর্দ্ধে মূলাধারপদ্ম অবস্থিত। মূলাধারপদ্মের আড়াই আঙ্গুল উপরে একটি অষ্টদলপদ্ম। উক্ত অষ্টদলপদ্ম হইতে দুই আঙ্গুল ঊর্দ্ধে স্বাধিষ্ঠান পদ্ম; স্বাধিষ্ঠান হইতে অষ্টাঙ্গুল উপরে মণিপুরপদ্ম। মণিপুর হইতে চতুরাঙ্গুল উপরে অনাহতপদ্ম। অনাহত হইতে একাদশাঙ্গুল ঊর্দ্ধে বিশুদ্ধপদ্ম।*

---

* পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ সম্পাদিত 'তন্ত্র-তত্ত্বকথা' গ্রন্থের [illegible] ইহার পরিশুদ্ধ [illegible] আলোচনা-সাহিত্য' হইতে বাহির হইবে আমরা [illegible] পাঠকগণ। তুমিও [illegible] মনে করিলে আমাদের [illegible]

—সাহিত্য-সম্পাদক।

স্বামী বিবেকানন্দ।

না চাহিলে যেমনতর ফল পাওয়া যায় না ; বাঞ্ছা-কল্পতরুমূলে বসিয়া থাকিলেও ফলের আকাঙ্ক্ষা করিতেই হয় ; তবেই দ্রুমরাজ বাঞ্ছাপূর্ণ করিয়া থাকেন। বাঞ্ছাকল্পতরুমূলে আমরা সবাই বসিয়া আছি, তাঁহার শীতল শ্যামল ছায়া আমাদের সকলেরই আশ্রয় ; কেবল এই আশ্রয়ের অনুভূতি কাহারও আছে, কাহারও নাই। অনেকে জানিতেই পারে না যে, এমন শীতল-শান্ত, স্নিগ্ধ-কান্ত আশ্রয় তাহাদেরই আশ্রয়। যাহারা সজ্ঞানে এই আশ্রয় ভোগ করে, তাহারা যখন যে ফল প্রার্থনা করে, সেই ফল পাইয়া থাকে। অদ্বৈতাচার্য্য এই আশ্রয়ের মহিমা বেশ বুঝিতেন, তাই অহরহঃ প্রার্থনা করিয়া তিনি শ্রীচৈতন্য দেবকে লাভ করিয়াছিলেন। সমাজে দুঃখের অনুভূতি পূর্ণরূপে না হইলে, সে জ্বালায় কাতর অধীর না হইলে, দুঃখদূর করিবার জন্য, জ্বালা প্রশমন উদ্দেশ্যে তিনি সংসারে অবতীর্ণ হন না। যখন যেমন রোগ তখন তেমনি চিকিৎসক আসেন। রোগ তেমন উৎকট হইলে ভার্গবের মতন চিকিৎসক দেখা দেন ; প্রবোধিবে রোগোপশম সম্ভবপর হইলে বুদ্ধ বা শ্রীচৈতন্য প্রকট হন ; উদ্বোধনে—জাগরণে রোগোপশম-সম্ভাবনা থাকিলে গুরুগোবিন্দ কিংবা স্বামী বিবেকানন্দের মতন অতি-মানুষের—স্বরাট্ পুরুষের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

বহুকালের সুখ শয়ন—শুইয়া শুইয়া যেন অরুচি ধোধ হইয়াছিল ; কালবশে শয্যাদ্রব্যে কাদা কীটের জন্ম হইয়াছিল, তাহাদের দংশনে মোহনিদ্রা ভাঙ্গিতেছিল না বটে, পরন্তু সুখশয়নের ব্যাঘাত ঘটিতেছিল। সে নিদ্রায় কত সুখস্বপ্ন দেখিয়াছি, সে স্বপ্ন-ঘোরে আত্মহারা হইয়াছি, নিজের পরিচয় নিজে ভুলিয়াছি। তাই স্বপ্নের ঘোরে মনে হইত, কেহ যদি আসিয়া দেয় আমায় পূর্ব্বপরিচয়ের যাদুমন্ত্র বজ্রনির্ঘোষে গান করিয়া প্রথম প্রভাতে আমাকে যদি জাগাইয়া দেয়, তাহা হইলে উঠিয়া বসিয়া দশদিক দেখিয়া লই, আমার দীর্ঘ স্বপ্নের জড়তা দূর করিয়া একবার দুই পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াই এবং আমার শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারের পথ চিনিবার চেষ্টা করি। রাজা রামমোহন রায় হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের কাল পর্য্যন্ত এই যে জাগরণের চেষ্টা, সে কেবলই স্বপ্নের চেষ্টা। প্রকৃত জাগা মানুষে জাগায় নাই, অথবা ছায়াপোতায় কায়ক্লিষ্ট প্রবুদ্ধ স্বপ্নের ঘোরে

চাপড় মারিয়াছেন, তাহার জন্য কদাচিৎ সামান্য একটু পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, একটু বা নিদ্রিতের প্রলাপ শুনিতে পাওয়া গিয়াছে। রামপ্রসাদ গানে কহিয়াছেন "এক ভাবীর কাছে ভাব পেয়েছি; যে দেশে রজনী নাই মা, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।" যাহারা ঘুমায় না, তাহারাই নিদ্রিতকে জাগাইতে পারে; যে দেশে রজনী নাই, মায়া-নিদ্রা, মোহ-নিদ্রা নাই, সেই দেশের মানুষ পাইলে তবে ত তিনি নিদ্রিতকে জাগাইবেন। বাঙ্গালী এতদিন পরে যে দেশে রজনী নাই, সেই দেশের এক লোক পাইয়াছিলেন। বিধাতার কৃপায় ভগবান রামকৃষ্ণ বাঙ্গালায় অবতীর্ণ হইলেন; তিনিই বাঙ্গালীকে জাগাইবার ব্যবস্থা করিলেন; এমন মানুষ দিলেন,—এমন জগদম্বার কোটায়, সে জাগে চিরকাল—গড়িয়া তুলিলেন যিনি বাঙ্গালীকে বাঙ্গালীর মতন জাগাইতে পারেন। সে মানুষ বাপ্পার, সাবের, সোহাগের, সাধনার, মনের মানুষ নগদ টাকার লোভে এবং অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব-বিলাস-ব্যসনের আকর্ষণে আকৃষ্ট বাঙ্গালী ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিল; দেশাচার, কুলাচার, সমাজ-বন্ধন এবং ধর্ম্ম-বন্ধন সব শিথিল করিয়া বাঙ্গালী যথেচ্ছাচারের মোহে মুগ্ধ হইয়া ইংরেজ সাজিতেছিল, ফরাসী সাজিতেছিল, ইউরোপের বাবুয়ানীর অনুকরণ করিতেছিল। সেই বাঙ্গালীকে ডাক্তারী, ওকালতী, জমিদারীর মোহ ছাড়াইয়া দরিদ্র-নারায়ণের সেবক, রোগী-আর্ত্তের শুশ্রূষাকারী যিনি বানাইতে পারিয়াছিলেন, তিনি—"যে দেশে রজনী নাই" সেই দেশের মানুষই বটেন। ভগবান্ রামকৃষ্ণ বাঙ্গালার শুষ্কভোগা ভাগীরথীর মাটী তুলিয়াই শিব গড়াইবার ব্যবস্থা করেন। তিনি তজ্জন্য বিদেশ হইতে মাল-মসলা আমদানী করেন নাই। বাঙ্গালার মাটী লইয়া—ইংরেজী-নবীশ বাঙ্গালীর ছেলে ধরিয়া তিনি শিব গড়িতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বড় সাধ ছিল, সহস্র শিব গড়িয়া বাঙ্গালাকে ধন্য করিয়া তিনি চলিয়া যান। তাঁহার সে সাধ মিটে নাই। অথবা প্রয়োজনাভাব বুঝিয়া ব্যর্থ-প্রয়াস করেন নাই। তবে তিনি যে কয়টি শিব গড়িয়া ছাড়িয়া ছিলেন, তাহারা রকম-বেরকমের এক-এক শিব। কেহ বা আপন ভাবে মগ্ন প্রাণারাম শিব, কেহ বা সামগানে বিভোর হইয়া আপন ভাবে আপনি মাতিয়া আছেন, কেহ বা শিঙ্গাডমরুধারী ভিক্ষোপজীবী শিব, শিবোহম্—শিবোহম্ বলিয়া দ্বারে ঘুরিতেছেন, ভৈরব-রাগের সুতানে উমার মুদিভাঙ্গে যোগী গুণ গুণায়িত করিয়া শান্তিযাচন করিতেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ এই শেষ শ্রেণীর

শিব; বেদান্তের ডমরুধ্বনি করিয়া, আগমতন্ত্রের শৃঙ্গার ধরিয়া, গীতায় ইতিহাসের নাম দান করিয়া তিনি বাঙ্গালার উদ্বোধন সাধন করিয়াছিলেন।

তিনি জাগাইয়া আসাইয়া, বাঙ্গালীকে শুশ্রূষ, সেবাপরায়ণ করিয়া গিয়াছেন তাঁহার স্মৃতির ত্রিশূল ধারণ করিয়া আজ ভারতবর্ষের যেখানে রোগ, যেখানে শোক, যেখানে বেদনা, যেখানে ভাবনা, সেইখানেই বাঙ্গালী ছুটিতেছে, দুঃখের ভয় নাই, রোগের ভয় নাই, অনাহারের ভয় নাই, মরণ ভয় নাই, ইংরেজী-নবীশ বাঙ্গালী বেলুড়মঠের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়, ব্রহ্মচারী সেবক দল বলে দুর্গমে যাইতেছে। শ্রীচৈতন্য একভাবে বাঙ্গালীকে সন্ন্যাসের ও সর্ব্বত্যাগের পথ দেখাইয়াছিলেন, ভগবান রামকৃষ্ণ আর একভাবে বাঙ্গালীকে সেই পথ দেখাইয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ সেই পথের ঋষিত্ব আমাদের ভাষায় আমাদের বোধগম্য করিয়া বুঝাইয়াছিলেন। তিনি আমাদের শ্রুতিমূলে সিদ্ধমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, সাধনার সিংহনাদ করিয়া আমাদিগকে জাগাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ঐ গঙ্গার পশ্চিম তটে, বেলুড়ের মঠের প্রতি একবার তাকাও! যেমন করিয়া দেখিলে বাঙ্গালার মত দেখা হয়, তেমনি মীনের মতন নির্নিমেষনয়নে একবার তাকাও, কোটিবিচিভঙ্গপ্রতিফলিত সে ভবনের প্রতি একবার দেখ! যে দুন্দুভিনাদে তোমার নিদ্রাঘোর ভাঙ্গিয়াছিল, সেই দুন্দুভি ঐখানে লুকান আছে, যে অনাবিল রূপের বিকাশে তোমার মোহান্ধতা দূর হইয়াছিল সে মাধুরীর প্রতিচ্ছায়া এখানে ঝুলান আছে; যাঁহারা তাঁহার সঙ্গগুণে ধন্য তাঁহারা ঐখানে সজীব দেহে বিচরণ করিতেছেন, ঐখানে তাঁহার দেহের ভস্মরাশি, স্মৃতির প্রচ্ছন্ন পুষ্পরাশি, বাগ্‌বিভূতির প্রতিধ্বনির সৌরভ রাশি! দেখ—দেখ, পতিত-পাবনী সুরতরঙ্গিনী কুল্ কুল্ রবে উহার পাদধৌত করিয়া অনন্ত সাগরকে সে সমাচার দিতে তরলতরঙ্গে কেমন ছুটিয়াছেন। সে জাগরণ-বার্ত্তা গঙ্গার প্রতি উর্ম্মিসঙ্ঘাতে যেন উচ্ছলিত হইয়া আকাশের দিকে উঠিতেছে। তাঁহার কর্ম্মজীবনের সে পাঞ্চজন্যনাদ যেন প্রতি জোয়ারের মুখে বহন করিয়া আনিয়া ত্রিলোকপাবনী ঐখানে সঞ্চয় করিতেছেন। একবার দেখ! তেমন ডাকার মতন আর ত কেহ ডাকিবে না, অমন স্পর্দ্ধার স্তুতিগান আর ত কেহ করিবে না। বড় ভাগ্য আমাদের যে, এই যুগে—উনবিংশ শতাব্দীর শেষে—বীরবাহুর এমন নির্ভয় আহ্বান শুনিয়াছিলাম! বড় ভাগ্য আমাদের যে, এই বিলাস-ব্যসন-বিকৃত দেহে সে কুমারকান্তের মুখে কান্ত-মাতৃপদাবলী শুনিয়াছি-

লাম। তখন তাহাকে বুঝি নাই বটে, কিন্তু তাহাকে দেখিয়াছিলাম, স্পর্শ করিয়াছিলাম, তাহার সঙ্গ করিয়াছিলাম, তাহার সহিত বাদবিতণ্ডা করিয়াছিলাম, সমুদ্রোপম সে অগাধহৃদয়ে ডুবিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। ডুব দিয়া তল স্পর্শ করিতে পারি নাই, তলার মণি-মাণিক্য আহরণ করিতে পারি নাই, পরন্তু স্নেহের সে শীতল সলিল-স্পর্শে প্রাণ-মন শীতল হইয়াছিল, অনেক জ্বালা জুড়াইয়াছিলাম। সে মানুষ এখন স্মৃতির ভস্মস্তূপে উঠিয়াছে, অতীতের ধূসর-বাল-ক্রোড়ে সন্ধ্যার সপ্তরাগে রঞ্জিত হইয়া দিব্যপুরুষের ন্যায় শোভা পাইতেছে। এইবার তাহাকে দেখিয়া লও। হিমালয়ের সানুদেশে বসিলে হিমালয়ের উন্মাদ মহিমা বুঝা যায় না—হৃদয়ঙ্গম করা যায় না; হিমালয়ের কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ রূপ দেখিতে হইলে দূরে দার্জ্জিলিঙ্গের চূড়ায় উঠিয়া দেখিতে হয়। এই হিমবান্ অতিমানুষের পরিমাণ ও মহিমা বুঝিতে হইলে বেলুড় যাইয়া, ভাবের উচ্চ চূড়ায় দাঁড়াইয়া একবার তাহাকে দেখিয়া লও। দেখিলে বুঝিবে সে কেমন ছিল—কত বড় ছিল। তেমন দেখার মতন দেখিবার জন্য আজ তাই সকলকে আহ্বান করিতেছি; নিজের মানুষকে—যে ধর্ম্ম শিখাইয়াছে, শ্রদ্ধা শিখাইয়াছে, কর্ম্ম শিখাইয়াছে, ত্যাগ শিখাইয়াছে, বাঙ্গালীকে আবার মানুষ গড়িবার পথ দেখাইয়াছে—সেই নিজের মানুষকে মনশ্চক্ষুর সম্মুখে নয়ন, মনের নির্নিমেষ দৃষ্টিতে একবার দেখিয়া লও। এই সন্ধিক্ষণে, জগদ্ব্যাপী বিপ্লব বিবর্ত্তনের মহামুহূর্ত্তে একবার যে দেখে রক্ষা নাই মা, সেই দেবোর মানুষকে দেখিয়া লও। বাঙ্গালা তরুমূলে বসিয়া কি জানি, কেন এক ঘোরে তাহারি আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলে, তাই সে আসিয়াছিল—রাখিতে পারিলে না, রাখিতে জানিলে না—তাই সে সকালে সকালে চলিয়া গেল।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

বীরকবি ভূষণ।

সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে হিন্দীসাহিত্যে বীর, রৌদ্র এবং ভয়ানক-রসাশ্রিত কবিতার একেবারে অভাব ছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, কারণ একমাত্র চন্দ বরদাঈ ব্যতীত এই সময়ের পূর্ব্বে আমরা আর কোন প্রতিভাবান কবিকে এক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে দেখিতে পাই না। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদিগের মধ্যে অধিকাংশ কেন সকলেই কেবল শান্ত, করুণ এবং শৃঙ্গার রসাশ্রিত কবিতাতেই মনোনিবেশ করেন, বীর, রৌদ্র কিম্বা ভয়ানক রস সৃষ্টি করিতে তাহারা একেবারেই চেষ্টা করেন নাই বলিলে চলে না। চন্দ বরদাঈও যে একার্য্যে কেমন সফলতা লাভ করিয়াছিলেন তাহা বলা যাইতে পারে না; চন্দ বরদাঈ বিশেষ প্রতিভাবান ছিলেন, অতএব তিনি যে আবশ্যকতানুরূপ চেষ্টা করিয়াও একার্য্যে সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই তাহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। আমাদের মনে হয় চন্দ বরদাঈ এ কার্য্যে আবশ্যকতানুরূপ চেষ্টা না করার জন্যই এবং পরবর্ত্তী হিন্দীকবিদিগের ন্যায় বীর, ভয়ানক প্রভৃতি রসের দিকে তাঁহার উদাসীনতা থাকার দরুণই, তাঁহার চেষ্টা সফলতামণ্ডিত হইতে পারে নাই। কারণ যাহাই হউক না কেন, চন্দ বরদাঈএর পর প্রায় ছয়শত বৎসর পর্য্যন্ত হিন্দীসাহিত্যের এই মহা অভাব 'জয়সা তা ত্যয়সা' রহিয়া গিয়াছিল, অবশেষে তাঁহার প্রায় ৬০০ বৎসর পরে ভূষণ নামক একজন কবি হিন্দীসাহিত্যের এই অভাব অপনোদন করিতে অগ্রসর হন, বলা বাহুল্য, তিনি এই কার্য্যে আশাতীত সফলতা লাভ করেন এবং তজ্জন্য হিন্দীসাহিত্যে অমর হইয়া যান।

সুপ্রসিদ্ধ কানপুর জিলায় যমুনা নদীর বামকূলে 'অকবর পুর বীরবল' নামক একটী বৃহৎ গ্রাম আছে, এই গ্রামই অকবরের সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্রী বীরবলের জন্মস্থান, অনেকদিন পূর্ব্বে এই গ্রামের অতি নিকটে 'তিকওঁয়াপুর' অথবা 'ত্রিবিক্রমপুর' নামে একটী গণ্ডগ্রাম ছিল। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রামে রত্নেশ্বর ত্রিপাঠী নামক একটী কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন. এই ব্রাহ্মণের চিন্তামণি, মতিরাম ভূষণ এবং নীলকণ্ঠ নামে চারিজন পুত্র হয়। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভবিষ্যতে ব্রাহ্মণের এই চারিজন পুত্রই উচ্চদরের কবি

হন, তন্মধ্যে আমার ভূষণ বীররসের এবং চিন্তামণি শৃঙ্গাররসের কবিদিগের মধ্যে অত্যন্ত উচ্চস্থানীয়।

কথিত আছে, ভূষণ কৈশোরে অত্যন্ত অকর্ম্মণ্য ছিলেন, পড়াশুনা ত' কিছু করিতেনই না, উপরন্তু বসিয়া বসিয়া কবিতা আদি করিতেন। একদিন তিনি আহার করিবার সময়, ভ্রাতৃজায়ার নিকট রূঢ়ভাবে লবণ প্রার্থনা করেন, তাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ভূষণকে অনেক ভর্ৎসনা করেন এবং বলেন "তুমি যে অভ্যাস করিয়া আমার নিকট লবণ প্রার্থনা করিতেছ, তুমি তাহা নিজে উপায় করিয়া আনিয়াছ কি? যেদিন তুমি লবণ উপায় করিতে শিখিবে, সেইদিন ঐরূপ করিয়া চাহিও, নহিলে তোমার ঐরূপ করিয়া চাহিবার কোন অধিকার নাই।"

ভ্রাতৃজায়ার উপরোক্ত কথাগুলি এই অভিমানী নবযুবকের মর্ম্মস্থলে বিদ্ধ হইল, তিনি মনে করিলেন "তাই ত, আমি কিছুই উপায় করিতে পারি না, আচ্ছা সেদিন আমি উপায় করিতে শিখিব সেদিনই ফের তোমার কাছে যাইব।" এই মনে করিয়া তিনি অভুক্ত অবস্থাতেই তৎক্ষণাৎ ভ্রাতৃগৃহ ত্যাগ করেন। রাজ কন্যার কথায় যেমন কালিদাসের, স্ত্রীর বাক্যে যেমন তুলসীদাসের জ্ঞান হইয়াছিল, তেমনি ভ্রাতৃজায়ার এই রূঢ়কথায় ভূষণের জ্ঞান হইল, অতঃপর তিনি সাহিত্য, পিঙ্গল শাস্ত্র, অলঙ্কারশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে মনোনিবেশ করেন এবং আজন্ম সে অভিনিবেশ ও অধ্যবসায়ের ফলে অল্পদিনেই তত্তৎশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

ইহার পর তিনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন এবং অল্পদিনেই তিনি বিখ্যাত হইয়া যান। তাঁহার খ্যাতি শ্রবণ করিয়া চিত্রকূটের রাজা রুদ্রশাহী রুদ্র তাঁহাকে নিজের সভায় আহ্বান করেন এবং তাঁহাকে ভূষণ উপাধিতে ভূষিত করেন। এই ভূষণ উপাধি পরে এত প্রসিদ্ধ হয় যে, তাঁহার আসল নাম কি ছিল তাহা পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যায়। যাহা হউক এখানে তিনি অল্পকালমাত্র অবস্থান করিয়া মোগলসম্রাট আওরঙ্গজেবের দরবারে গমন করেন।

তাঁহার খ্যাতি শুনিয়া আওরঙ্গজেব তাঁহার কবিতা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ভূষণ বলিলেন "প্রথমে আপনি নিজের হাত ধুইয়া ফেলুন, তাহার পর আমার কবিতা শুনিবেন। শৃঙ্গাররসগর্ভিত কবিতা শ্রবণ করিয়া আপনার হস্ত হয়ত অস্থানে কুস্থানে পড়িয়া থাকিবে, অতএব তাহা অশুচি,

কিন্তু আমার কবিতা বীররসগর্ভিত হওয়াতে আপনাকে ঘন ঘন গুম্ফে তা দিতে হইবে। অতএব হস্ত ধৌত করুন নহিলে গুম্ফ অশুদ্ধ হইয়া যাইবে।"

ভূষণের এই অবিনীত কথা শুনিয়া সম্রাট অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "ভাল, যদি আমার হস্ত সত্য সত্য গুম্ফের উপর আসিয়া পতিত না হয়, তাহা হইলে তোমাকে ধৃষ্টতার উপযুক্ত শাস্তি দিব।"

"বহুৎ আচ্ছা" বলিয়া ভূষণ সভার মধ্যস্থলে নির্ভীকভাবে দাঁড়াইয়া স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ জলদগম্ভীরস্বরে কবিতা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। সে কি কবিতা! অত্যন্ত অলস অত্যন্ত নিরুৎসাহের মনেও উৎসাহের সঞ্চার করে। মরা মানুষও যে কবিতা শুনিলে চাহিয়া দেখে! অওরঙ্গজেব ত কোন ছার! মুহূর্ত্তের মধ্যে অওরঙ্গজেবের সমস্ত প্রতিজ্ঞা ভাসিয়া গেল, তিনি উৎসাহ ভরে গুম্ফে তা' দিতে লাগিলেন। বাদশাহের নিকট ভূষণের খুব প্রতিপত্তি হইল, কিন্তু অত্যাচারী অওরঙ্গজেবের সাধ্য ভূষণের বনিবে কেন? একদিন অওরঙ্গজেব স্বীয় সভাকবিদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "প্রত্যহ তোমরা ত আমার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া থাক, কিন্তু আজ তো মরা আমার যথার্থ গুণ বর্ণনা কর।"

অওরঙ্গজেবের এই কথা শুনিয়া সভাস্থ সকল কবিই নীরব রহিলেন, কেবল মুখোড়ভয় ভূষণ সভার মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া জলদগম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন :—

"কিবলে কি ঠোর বাপ বাদশাহ সাহিজহাঁ তাকে কিয়ো কয়দ মানো মকে আগ লাঈ হয়। বড়ো ভাই দারা ওয়াকো পকরিকে কয়দ কিয়ো, মেহ-রহ নাহি সকোজায়ো সগো ভাই হয়। বন্ধুতো মুরাদ বক্স আদি চুক করি-কেকো বীচ লৈ কুরাণ খুদা নবী সোঁহ খাই হয়। ভূষণ ভন ত অওরঙ্গজেব এতে কাম কীনো তউ পাতসাঈ ছাঈ হয়।"

"যাহার দিকে পীঠ করাও মুসলমান ধর্ম্মমতে নিষিদ্ধ এমন যে পিতা বাদশাহ সাহজহাঁ তাঁহাকে আপনি বন্দী করিয়াছেন, তাহাতে আপনার মুসলমান হইয়া মক্কায় অগ্নিসংযোগ করিবার অপরাধ হইয়াছে। আপনি স্বীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা দারাকে ধরিয়া বন্দী করিয়াছিলেন এবং সে আপনার সহোদর ভ্রাতা হওয়া সত্ত্বেও আপনি তাহার উপর কিছুমাত্র অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন নাই। ভ্রাতা মুরাদ বক্সের সহিত আপনি খুদা, পয়গম্বর এবং কুরাণ সাক্ষী করিয়া বন্ধুত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু আপনি তাহাও পালন করেন নাই।" "ভূষণ" বলিতেছেন,

"আপনি এত কাজ করিয়াছেন, তথাপি আপনি বাদশাহ আছেন। ধন্য বিধাতঃ তোমার বিচার!"

ভূষণের এই কবিতা শুনিয়া অওরঙ্গজেব তরবারি লইয়া ভূষণকে বধ করিতে উদ্যত হন, কিন্তু সভাসদদিগের অনুরোধে তিনি ভূষণকে বধ করিতে নিবৃত্ত হন। ভূষণ দেখিলেন যে তাঁহার ন্যায় স্বাধীনচেতার পক্ষে অওরঙ্গজেবের দরবারে থাকা বিড়ম্বনামাত্র, তখন তিনি সেইদিনই অওরঙ্গজেবের দরবার ত্যাগ করিয়া শিবাজীর দরবারে গমন করেন। শিবাজীর দরবারে ও ঐরূপ স্বাধীনচেতা লোকের প্রয়োজন ছিল, তজ্জন্য তাঁহার সেখানে যথেষ্ট সম্মান হয়। কথিত আছে, শিবাজীর দরবারে থাকিয়া অতুল ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়া, তিনি ভ্রাতৃজায়ার নিকট দুই লক্ষ টাকার দ্রব্য কিনিয়া পাঠাইয়া দেন।

শিবাজীর দরবারে কয়েক বৎসর থাকিয়া তিনি দেশে ফিরেন, পথে বিলাসের জন্য মহারাজ ছত্রশালের দরবারে যাইবেন। 'বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে' বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজিত হয়, সেখানেও তাঁহার যথেষ্ট মান হইল। ভূষণকে চলিয়া যাইবার সময় ছত্রশাল তাঁহাকে যত মান্য করেন, তত বোধ হয় আর কোন রাজা আর কোন কবিকে করেন নাই। তিনি ভূষণের পাল্কী কিছু দূর পর্য্যন্ত স্বয়ং বহন করিয়া লইয়া যান।

ইহার পরে ভূষণের জীবনে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই, তিনি ১৭৭২ সম্বতের কাছাকাছি কোন সময়ে ১০২ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন।

ভূষণের কবিতার একটী নমুনা নীচে দেওয়া হইল, যমকের এমন সুন্দর উদাহরণ আর কোথাও বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না,—

ঊঁচে ঘোর মন্দরকে (১) অন্দর রহনেওয়ারী ঊঁচে ঘোর মন্দরকে (২) অন্দর রহাতী হয়। কন্দমূল (৩) ভোগ করেঁ কন্দমূল (৪) ভোগ করেঁ তীনকাল (৫) গাতী পীরো তীনবের (৬) খাতী হয়। ভূষণ (৭) শিথিল অঙ্গ ভূষণ (৮) শিথিল অঙ্গ বিজন (৯) তুলাতী ভেই বিজন (১০) তুলাতী হয়। 'ভূষণ' অতি ভীর ভীর ভেদে এসে নগন (১১) জড়াতী ভে বি নগন (১২) জড়াতী হয়।

"হে শিবাজী! দেখ তোমার ত্রাসে মোগল রমণীদিগের কি দশা হইয়াছে,

(১) মন্দির, গৃহ, সৌধ। (২) মন্দরাচল পর্ব্বত, এখানে পরমহংসা। (৩) কিন্নর। (৪) কন্দমূল। (৫) তিনবার। (৬) তিনটী কুল—যৎসামান্য কিছু। (৭) ভূষণ (৮) ভূষণ-কাপড়। (৯) বাজন। (১০) বিজন। (১১) নগ—পর্ব্বত, এখানে স্তনযুগল পক্ষে। (১২) নাগর অর্থে।

যাহারা অট্টালিকাবাসী যৌবনমুখে বাস করিত, তাহারা এখন পর্ব্বতগুহার মধ্যে বাস করিতেছে, যাহারা মিষ্টমূলসমূহ ভোজন করিত তাহারা ফলমূলসমূহ ভক্ষণ করিতেছে, যাহারা প্রত্যহ তিনবার ভোজন করিত তাহারা সামান্য কিছু খাইতে পাইলেই সন্তুষ্ট হয়। যাহাদের অঙ্গভূষণসমূহের ভার দ্বারা শিথিল যাইত, তাহাদের অঙ্গ এক্ষণে ক্ষুধায় শিথিল। যাঁহাদিগকে সর্ব্বদা দাসীরা ব্যজন করিত, তাঁহারা এখন বিকলে ভ্রমণ করেন এবং যাহারা সুন্দর সুন্দর প্রাসাদসমূহ ধারণ করিত, তাহারা এক্ষণে বৃক্ষতলাবে শীতের প্রকোপ সহ্য করিতেছে।"

এই ক্ষুদ্র উদাহরণ হইতেই কবির প্রতিভা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। তিনি শুদ্ধভাষাই ব্যবহার করিতেন, তবে তাহাতে ফারসী এবং মারাঠীর অনেক শব্দ আছে, ইঁহার কবিতায় প্রসাদগুণ প্রধান।

শ্রীব্রজবল্লভ গুপ্ত।

সম্বোধন।

[ভারত হিন্দু সভার অধিবেশনে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রি-লিখিত।]

আমরা সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী। বেদ আমাদের ধর্ম্ম। বেদ নিত্য, সত্য ও সর্ব্বব্যাপী। কোন কোন মহাপ্রভাবশালী ঋষির নিকট বেদ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই আমাদের ঋষি। ঋষিরাই অগ্নি আনিয়াছিলেন, সেইজন্য ঋষিরা অগ্নি নিত্য। যে সকল ঋষির সহিত অগ্নির মিত্রতা ছিল, তাঁহাদের নাম প্রবর-ঋষি। এই সকল ঋষিদিগের বংশানুক্রমে অগ্নি লইয়া যজ্ঞ করা হয়। অগ্নি কিন্তু আপনার মিত্র কোন ঋষির নামোচ্চারণ না করিলে আসিতে চাহেন না। সেই নাম উচ্চারণমাত্রেই তিনি চিনিতে পারেন এই আমার মিত্রের বংশধর; সেই জন্যেই আমরা প্রবর-ঋষির নাম উচ্চারণ করিয়া থাকি। যে ঋষিদিগের নিকট ছন্দোবদ্ধ হইয়া বেদ আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহারাই আমাদের গোত্র প্রবর্ত্তক। তাঁহাদের বংশে অনন্ত গোত্রের উৎপত্তি হইয়াছে, তাই আমরা

সকল কার্য্যেই গোত্র উচ্চারণ করিয়া ঋষিগণকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহাদের পূজা করি। তাই আমরা সমান গোত্র ও সমান প্রবর কন্যার সহিত বিবাহ করি না।

বেদ হইতে আমাদের স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র ও অন্যান্য সকল শাস্ত্রই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সুতরাং আমরা সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী। অগ্নিই আমাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা, কিন্তু তিনি ভূলোকে অগ্নিরূপে, ভুবর্লোকে ইন্দ্ররূপে এবং স্বর্লোকে সূর্য্যরূপে অবস্থান করিতেছেন। ইহা ভিন্নও আমরা অগ্নির আরও নানারূপ চিন্তা করিয়া থাকি। সকলরূপেই অগ্নি আমাদের দেবতা। অগ্নি ভিন্ন আমরা আরও অনেক দেবতা স্বীকার করিয়া থাকি, এবং সেই সকল দেবতার পূজা অর্চ্চনা করিয়া থাকি। এই ভাবে আমরা বহুকাল ধরিয়া ভারতবর্ষে আধিপত্য করিতেছিলাম, বহুকাল ধরিয়া আমরা ভূমণ্ডলে সভ্যতা বিস্তার করিতেছিলাম। এক সময় আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রতাপে সমস্ত ভূমণ্ডল চমকিত হইয়াছিল।

কিন্তু আমাদের সে প্রতাপ এখন নাই, আমাদের নাম অনেকদিন লোপ পাইয়াছে। আমাদের যে কি নাম ছিল তাহা আমরাও জানি না। মুসলমানেরা আমাদের দেশ অধিকার করিয়া আমাদের নাম দিয়াছেন। হিন্দু বা ভারতবাসী যে কেহ ভারতবর্ষে বাস করেন তিনিই হিন্দু, তা তিনি বৌদ্ধই হউন, জৈনই হউন, আস্তিক হউন, নাস্তিকই হউন, পাহাড়ীয়াই হউন, বন্যই হউন বা কিরূপ হইতে আসিয়া ভারতবর্ষে বাসই করুন মুসলমান রাজার চক্ষে সবই হিন্দু ছিল। সুতরাং সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী বৈদিকগণও হিন্দু। হিন্দু হইতে তাঁহাদের আর স্বতন্ত্র সত্তা ছিল না, স্বতন্ত্র সত্তা না থাকিলেও আমরা আপনাদের বিদ্যা বুদ্ধি পরাক্রম ও প্রতাপে তাঁহাদিগকে জানাইয়া দিতে পারিয়াছিলাম যে আমাদের সত্তা এখনও লোপ হয় নাই।

তাহার পর ইংরাজদিগের অধিকার আসিল। তাঁহারা প্রথম প্রথম বলিতেন ভারতবর্ষে দুই জাতীয় লোক আছেন, হিন্দু ও মুসলমান। আমাদের সত্তা ত হিন্দুর মধ্যে লুপ্তই হইয়াছিল; তথাপি ছিল। কিন্তু বিলাতী আইনে এখন আমাদের একেবারেই সত্তা নাই। বিধর্ম আইনে বলে আমরা অভাব পদার্থ। ঐ আইনে ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের সত্তা স্বীকার করে। আমরা মুসলমানাভাব। আকারে বলে অভাব চারিপ্রকার, প্রথম অন্যোন্যাভাব, কারণ তাহা হইলে অভাবটি পরস্পরে নষ্ট। মুসলমানের অভাব হিন্দু ও হিন্দুর অভাব মুসলমান। সুতরাং আমরা মুসলমানের অন্যোন্যাভাব দ্বিতীয় নহি। প্রাগভাব, যেটা হইবে এখন

তাহার অভাব আছে, তাহার নাম প্রাগভাব। আমার সত্তাও হইবে বলিয়া বোধ হয় না সুতরাং আমরা প্রাগভাবও নহি। তবে আমরা হয় ধ্বংসাভাব না হয় অত্যন্তাভাব। আমরা অভাব পদার্থ হইলেও রিফর্ম আইনে আমাদের একেবারে ছাঁকিয়া ফেলিতে পারে নাই। আমরাও ভোট দিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছি। সেই ক্ষমতা আমরা কিরূপে ব্যবহার করিব তাহারই বিচার করিবার জন্য আজ আমাদের এই মহাসভার আহ্বান।

আমরা মুসলমানাভাব হইলেও আমরা ক্রীশ্চান বৌদ্ধও নহি। সুতরাং আমাদেরও ধর্ম্মের অনেক উপাসক আছেন। আমরা কে জানিতে হইলে, আমাদের ধর্ম্ম কি জানিতে হইলে, আমরা কিসে একতাসূত্রে বদ্ধ তাহা জানিতে হইলে অনেক বাগবিতণ্ডা অনেক বিচার আচার করিতে হয়। কিন্তু এ তাহার স্থলও নহে, তাহার সময়ও নহে। মোটামুটি আমরা বলিতে পারি আমরা বেদ মানি, আমাদের সমস্ত সম্প্রদায়েরই ধর্ম্ম বেদমূলক। আমরা দেবতা মানি ও অনেক দেবতার পূজা করিয়া থাকি। গরু আমাদের প্রধান দেবতা ভগবতীর অংশ। গরুর প্রতি আমাদের মায়া মমতা ও ভক্তি অত্যন্ত অধিক। আমরা ব্রাহ্মণ মানি, দেবতা ও আমাদের মধ্যে ব্রাহ্মণই দাঁড়াইয়া আমাদের সহিত দেবতার মিল করিয়া দেন। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র সমস্তই বেদ হইতে উৎপন্ন। মানিয়া লই যে সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্রই বেদমূলক। সমস্ত পুরাণই বেদের ব্যাখ্যা মাত্র। সমস্ত তন্ত্রই বেদ হইতে বাহির হইয়াছে। এই সকল শাস্ত্র আমাদের অনেক প্রকার ঐহিক ও পারত্রিক অভ্যুদয়ের উপদেশ দিয়াছেন। সে সমস্ত উপদেশমত কার্য্য করা আমাদের মত স্বল্পায়ু হীনবীর্য্য লোকের সাধ্যায়ত্ত নহে। তাই আমরা স্মৃতিশাস্ত্রের উপদেশগুলির মধ্যে আচার ও ব্যবহার এই দুইই অধিক পরিমাণে পালন করিয়া থাকি।

পারত্রিক উপদেশ সম্বন্ধে আমাদের মত অতিশয় উদার। তুমি পরলোকের জন্য এক ঈশ্বর মানিয়া অদ্বৈতবাদীই হও, দুই ঈশ্বর মানিয়া দ্বৈতবাদীই হও, বা অনেক ঈশ্বরই মান, তাহাতে আমরা কোন কথাই কহি না। তুমি যদি কোন ঈশ্বরই না মান, তাহাতেও আমরা কোন ক্ষতি বোধ করি না। নানারূপ সম্প্রদায় আছে, তাহাদের পারত্রিক ধর্ম্মের মতে আকাশ-পাতাল ভেদও আছে, কিন্তু তাহাতে আমরা কিছুমাত্র বিচলিত হই না। যিনি ঈশ্বরবাদী সাংখ্য, তিনিও আমাদের, অনীশ্বরবাদী মীমাংসক তিনিও আমাদের। তাহাকে আমাদের সমাজভুক্ত করিয়া লইতে আমরা কখনও দ্বিধা করি না, কিন্তু আমাদের কতকগুলি

আচার ও ব্যবহার আছে, সেগুলি পারত্রিক ধর্ম্ম নহে, ঐহিক ধর্ম্ম। সেগুলির এতটুকু ব্যত্যয়ও আমরা সহ্য করিতে পারি না। মনে আমরা করি যিনি আচারবান্ তাঁহার শক্তি অলৌকিক। তিনিই সকলের শ্রেষ্ঠ, সকলের পূজ্য, —তিনিই সর্ব্বত্যের দেবতা। অনেক সময়ে আমরা হীনবীর্য্য বলিয়া স্মৃতির অনেক উপদেশ পালন করিতে পারি না; কিন্তু আচার ও ব্যবহারে আমরা কিছু মাত্র ত্রুটি সহ্য করিতে পারি না।

মনু লিখিয়া গিয়াছেন—

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্যচ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥

ইহাতে সদাচারকেও বেদ ও স্মৃতির সমান স্থান দেওয়া হইয়াছে। আমরা বেদোদ্ধৃত ক্রিয়া-কলাপ করিয়া উঠিতে পারি না; কারণ আমরা হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছি। যাবজ্জীবন অগ্নি রক্ষা করিয়া প্রত্যহ অগ্নিহোত্র করিয়া তাহাতে মাসের মধ্যে দুই বার দর্শ ও পৌর্ণমাস যাগ করিয়া তাহার পর অন্যান্য যজ্ঞে অধিকারী হওয়া যায়। ইহার মধ্যে সপ্তপাক যজ্ঞ, সপ্তহবির্যজ্ঞ, সপ্ত সোমযজ্ঞ ও তাহাদের প্রকৃতি ও বিকৃতিতে অসংখ্য যজ্ঞ ও সত্র আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাহা পারি না, যেহেতু আমরা হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়া বেদের প্রতি আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা আদর কিছুই কমে নাই। কয়েক শত বৎসর হইতে আমরা আর সাগ্নিক নাই। অতি প্রাচীন কালে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা তিন অগ্নিতে যজ্ঞ করিতেন, পরে তিন অগ্নি গিয়া এক অগ্নি হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু এখন আমাদের মধ্যে শতকরা নিরনব্বই জনেরও অধিক নিরগ্নি। ইহার একমাত্র কারণ আমরা হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছি।

কিন্তু আচার ও ব্যবহারে আমাদের এখনও খুব আঁটাআঁটি আছে। শুধু আমাদেরই বলি কেন, আমাদের বহু পূর্ব্বপুরুষদিগেরও এইরূপ ছিল। স্মৃতির পুঁথিতে দেখিতে পাই আচারেরই স্থান সকলের আগে। আচারের সম্বন্ধে আমাদের যত পুঁথি আছে এমন বোধ হয় আর কোন বিষয়েই নাই। ব্যবহারেও আমাদের আদর আচারেরই মত। আচার দ্বারা আমরা দেহ পবিত্র করি, ব্যবহার দ্বারা আমরা সমাজ পবিত্র করি। আমাদের সংস্কার আচার-পূত দেহে ও ব্যবহার-পূত সমাজে দেবতা অধিষ্ঠান করেন। তাই আমরা আচার ও ব্যবহারের পবিত্রতা রক্ষার জন্য এত লালায়িত। আচার ও ব্যবহারের উপর আঘাত পড়িলে আমরা অত্যন্ত বিচলিত হই; মনে করি আমরা দেহের ও সমাজের

পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারিতেছি না ও দেবতাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক উঠিয়া যাইতেছে। আমরা এই আচার ও ব্যবহারে অনেক আঘাত সহ্য করিয়া আসিয়াছি। নীরবে ও নিঃশব্দে আমাদের হৃদয়ের অন্তস্তলে যে আঘাত করিয়াছে তাহা ফুটিয়া বলি নাই। যেহেতু আমরা জানি আমরা স্বল্পায়ু ও হীনবীর্য্য।

রাজনীতিক্ষেত্রে আমাদের সত্তা বহুদিন লোপ হইলেও আমরা যতদূর পারিয়াছি আমাদের আচার ও ব্যবহার রক্ষা করিয়া আসিয়াছি। কেন না আমরা জানি এই আচারে ও এই ব্যবহারেই সনাতন ধর্ম্মের অস্তিত্ব পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই দুটির লোপ হইলেই সনাতন ধর্ম্মের লোপ হইবে, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও লুপ্ত হইয়া যাইব।

আমাদের আচার ও ব্যবহারে যে-সকল আঘাত লাগিয়াছে তাহা যে শুদ্ধ শাসনকর্ত্তাদেরই ইচ্ছায় হইয়াছে এমন নহে, সে আঘাত নানাদিক হইতে লাগিয়াছে। আমাদেরই লোক আমাদের উপর সময়ে সময়ে দারুণ আঘাত করিয়াছে। আমাদের প্রতিবেশীরা অনেক সময় আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। বিদেশী বাণিজ্যে আমাদের অনেক আচার ব্যবহার লোপ করিয়া দিয়াছে। বিদেশীর সম্পর্কে আসিয়াও আমাদের অনেককে আচার ব্যবহার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। আইন আদালতেও আমাদের অনেক আচার ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে। শাসনকার্য্যের সকল বিভাগ হইতেই আমাদের আচার ও ব্যবহারের বিরুদ্ধ কার্য্য চলিতেছে; আমাদের এখন পরস্পর নিলিবার একটা প্রবৃত্তি হইয়াছে। সে প্রবৃত্তিটুকু আমরা যদি সুভাবে চালাইতে পারি আমাদের সত্তা আরও অনেক দিন বজায় থাকিতে পারে। সে প্রবৃত্তিটুকু কিরূপে সুভাবে চালাইতে পারি তাহাই বুঝিবার জন্য আজ এই মহাসভার আহ্বান।

এই মহাসভায় আমরা যে কতদিক হইতেই কতরূপ আঘাত পাইতেছি, সেই টুকু দেখাইতে চেষ্টা করিব ও পরে তাহার প্রতিবিধানের ভার মহাসভার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হইব। কিন্তু সেরূপ করিবার আগে আমরা কে, কে কে আমাদের মধ্যে আসিবেন এবং কে কে আমাদের মধ্যে আসিবেন না, সেটা একটা ধারণা করিয়া দেওয়া উচিত। এ সভা কাহাদের সভা, কে কে ইহার মেম্বর হইতে পারিবেন, একথাটা আগে মীমাংসা হইয়া যাওয়া উচিত।

আমরা ত নন্-মুসলমান। দেশীয় ক্রীশ্চানেরাও নন্-মুসলমান। পার্সীরাও নন্-মুসলমান, চট্টগ্রামের বৌদ্ধরাও নন্-মুসলমান। পাহাড়তলীর ভুটিয়া ও হুণীয়ারাও নন্-মুসলমান। সাঁওতাল, ভীল, কুকী, গারো, খাসিয়া, কোল, ওরাওঁ,

মুণ্ডা, নাগা, আদি ইহারাও নন্-মুসলমান। আমাদের এ মহাসভা এ সকল জাতির সহিত একমত হইতে পারে না, কারণ ইঁহাদের আচার-ব্যবহার আমাদের আচার-ব্যবহার হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যেও অনেক সম্প্রদায় আছেন, নানা শ্রেণীর বৈষ্ণব আছেন, নানা শ্রেণীর শৈব আছেন। শিখ্ আছেন, কবীরপন্থী আছেন, দাদূপন্থী আছেন, সৎনামী আছেন, আরও কত কত সম্প্রদায় আছেন। শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী বলিলে তাঁহাদের সকলকে ইহার মধ্যে মিলাইয়া লওয়া যায় কি না সন্দেহ। সনাতন্ ধর্ম্ম মিশনরীর্দ্ধর্ম্ম নহে ইহার অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকদের মতে লইয়া আসিবার জন্য কখনও কিছুমাত্র চেষ্টা করে না। এ পর্য্যন্ত ইহারা যে চেষ্টা একেবারেই করেন নাই, ইহাদের দল হইতে লোক বাহির হইয়া গিয়াছে ছাড়া কেহ এপর্য্যন্ত ঢুকিতে পারে নাই। সুতরাং ইহাদের সংখ্যা ক্রমে কমিয়াছে ছাড়া বাড়ে নাই। তথাপি বোধহয় বলা যায় ইহাদের সংখ্যা ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহাদের একটা নাম নাই। বাঙ্গালা দেশে আমরা নিজেদের হিন্দু বলিয়াই পরিচয় দিই, কোন কোন দেশে ইহারা আপনাদিগকে স্মার্ত্ত বা পৌরোপাসক বলিয়া পরিচয় দেন। সে পরিচয়ের অর্থ এই যে, আমরা ভারতবাসী সনাতনধর্ম্মী, আমরা কোন সম্প্রদায়ভুক্ত নহি। আমরা বেদ ও স্মৃতির ব্যবস্থা অনুসারে চলি, কেবল এক দেবতার উপাসনা করিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত হই না। শিব, বিষ্ণু, সূর্য্য, গণেশ, দুর্গা এই পঞ্চদেবতারই আমরা উপাসনা করিয়া থাকি। আমরা স্মার্ত্ত স্মৃতি মানি এবং স্মৃতি যে বেদমূলক তাহা মনে করি, স্মৃতির মতে আমরা পরকাল মানি, জন্মান্তরবাদ মানি, ব্রাহ্মণ আমাদের গুরু, আমাদের পুরোহিত। দেবতা ও মনুষ্যের মধ্যে তাঁহারাই মধ্যবর্ত্তী।

যাঁহারা এই সকল মত মানেন, তাঁহারাই প্রধানতঃ এ সভায় আসিবেন। বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত কেহ আসিলে তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই। সেই জন্যই আমরা সভার নাম দিয়াছি "ভারত-হিন্দু-সভা"। মুসলমান শাসনকর্ত্তারা যাঁহাদিগকে হিন্দু বলিয়া জানিতেন তাঁহাদের সকলকেই এ সভায় আসিবার জন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি তাই ইহার নাম "ভারত-হিন্দু-সভা"। ভারতবর্ষের বাহিরেও হিন্দু আছেন তাঁহারা এ সভার সভ্য হইতে পারিবেন না। তাঁহাদের সহানুভূতি আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি; কিন্তু তাঁহাদের সহিত একযোগ হইতে আমরা পারিব না, কারণ তাঁহাদের ও আমাদের রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। ভারতবাসী হিন্দুসকলেই আমরা গ্রহণ করিব, কাহাকেও ছাড়িব না।

আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের স্বত্বরক্ষা, আমাদের আচার-ব্যবহারের পবিত্রতা রক্ষা, সনাতন ধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষা। সে পবিত্রতা রক্ষা করিতে হইলে আমরা সকলে মিলিয়া তাহার প্রতিবাদ করিব। কতদিকে আমাদের স্বত্ব লোপ হইতেছে তাহার কিছু কিছু আভাস এখানে দিবার চেষ্টা করিব।

প্রথম আইন আদালত। আইন আদালতে আর এখন আমাদের হাত নাই। সমস্তই ইংরাজের, যেহেতু ইংরাজ আমাদের রাজা। আইন আদালত সকল কালেই সকল দেশেই রাজার হাতে থাকা উচিত। ইংরাজও আমাদের আইন অনুসারে আমাদের বিচার করিবেন-প্রথম হইতেই স্থির করিয়াছিলেন এবং সেই প্রতিজ্ঞা অনুসারে সর্ব্বদাই অবহিত চিত্তে কার্য্য করিতেছেন; কিন্তু নানা কারণে আইন আদালত হইতে হিন্দুধর্ম্মের উপর আঘাত হইতেছে। ইংরাজ রাজত্বের প্রথম ভাগে ইংরাজ জজেরা ঘটনার সম্বন্ধে বিচার করিয়া আইন কি সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদিগের মত লইতেন। তাঁহারা ব্যবস্থা দিলে সেই ব্যবস্থা জজেরা গ্রাহ্য করিতেন। কিন্তু এখন আর জজ পণ্ডিত নাই। জজেরাও পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করেন না, স্মৃতির ইংরেজী তর্জ্জমার উপর নির্ভর করিয়া বিচার করেন। তর্জ্জমা অনেক সময় ঠিক নহে। অনেক সময় গ্রন্থের পাঠাপাঠ ভালরূপে বিচার না করিয়াই তর্জ্জমা করা হইয়াছে, তাহাতেও ধর্ম্মবিরুদ্ধ বিচার হইয়াছে। যে দায়ভাগ লইয়া বাঙ্গালী হিন্দুর উত্তরাধিকার নির্ণয় হয় সেই দায়ভাগেরই পাঠ ঠিক না করিয়া তর্জ্জমা হইয়াছে। ইহাতে কত জায়গায় যে জীমূতের ধন রামকে দেওয়া হইয়াছে বলা যায় না। একে বিচার ত অন্যায় হইয়াছেই আবার সেই বিচারকে নজীর করিয়া আরো কত যে অন্যায় হইয়াছে বলা যায় না।

বেদ ব্রহ্মণ ও স্মৃতির ব্যাখ্যায় মতদ্বৈধ উৎপন্ন হইলে তাহার মীমাংসার জন্য একটা প্রকাণ্ড শাস্ত্র আছে। তাহার নাম মীমাংসা। মীমাংসা শাস্ত্রের এককালে অনেক সূত্র ছিল, সে সূত্র একত্র করিয়া জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসা সূত্র হইয়াছে। শবরস্বামী ঐ সূত্রের প্রকাণ্ড ভাষ্য করেন, সেই ভাষ্যের উপর দুই সম্প্রদায়ের টীকা হয়। এক সম্প্রদায় কুমারী ভট্টের আর এক সম্প্রদায় প্রভাকরের। প্রভাকর বাঙ্গালা ও পূর্ব্ব উপকূলের সর্ব্বত্র চলিত। পার্থসারথি মিশ্র এই দুই মত সমন্বয় করিয়া জৈমিনী-সূত্রের এক টীকা লেখেন, সেই টীকাই এখন চলিতেছে। মাধবাচার্য্য জৈমিনীর ন্যায়মালা নামক পুস্তকে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মীমাংসা মতসমূহ আবার মীমাংসা করিয়া ৯৬৩টী অধিকরণ লিখিয়া গিয়াছেন।

বেদ ও স্মৃতির ব্যাখ্যায় আমরা এ পর্য্যন্ত ঐ অধিকরণগুলি অবলম্বন করিয়া চলিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু এরূপ মতদ্বৈধস্থলে হাইকোর্টের জজেরা ইউরোপীয় রুলস অব ইণ্টারপ্রিটেসন এ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। তাহাতে আমাদের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে খিদিরপুরের জমিদার ৺যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের এদিকে নজর পড়ে। তিনি সেই জন্য বিস্তর টাকা সংগ্রহ করিয়া যাহাতে এরূপ বিচার-বিভ্রাট না ঘটে তাহার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত দেখিয়া তিনি কলিকাতা ইউনিভারসিটীর হাতে নিজ হইতে দশ হাজার টাকা দিয়া যান। যে সকল বিষয়ে এইরূপ অবিচার হইয়াছে তাহার সমালোচনার জন্য পণ্ডিত মহাশয়েরা চেষ্টা করেন এই তাঁহার উদ্দেশ্য। ইউনিভারসিটীর কর্ত্তৃপক্ষ দুই বৎসর অন্তর এরূপ এক একটী অবিচারের উপর এক একটী প্রবন্ধ লিখাইয়া লন এবং লেখককে যোগেন্দ্রবাবুর টাকার উপস্বত্ব হইতে ৫০০ টাকা করিয়া পুরস্কার দেন। এরূপ দশটী বিষয়ের এই কুড়ি বৎসরে সমালোচনা হইয়াছে। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের পক্ষে এই একটী বিষম কথা। এই মহাসভা যাহাতে এরূপ কার্য্য আর না হইতে পারে তাহার জন্য সচেষ্ট হইবেন।

বি গ্রেট আনচেষ্টীটী কেসে দেখে যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল তাহা বোধ হয় এখনও অনেকের মনে আছে।

সম্প্রতি এক মোকদ্দমায় একজন কায়স্থ ধনীর তাতিনী গর্ভজাত পুত্রকে আদালত বৈধ পুত্র বলিয়া ধনীর বিষয়ের ভাগ দিয়াছেন। ইহাতে সমস্ত কায়স্থ জাতির মনে বিষম ত্রাস উপস্থিত হইয়াছে। ধনে মানে বিদ্যায় বুদ্ধিতে তাঁহারা জাতি এখন বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে এক ত্রাস হওয়া দেশের পক্ষে ভাল নয়। তনিলাম কায়স্থও শূদ্র, তাঁহারা শূদ্র, সুতরাং শূদ্রে শূদ্রে বিবাহ বৈধ এই বলিয়া আদালত উক্ত রায় [illegible] ছেন। আমাদের দেশীয় আইন অনুসারে দেশীয় রাজার অধীন দেশীয় বিচারকের দ্বারা কখনও এরূপ বিচার হওয়া সম্ভব নহে। কায়স্থ এখন সকলেই জানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এ চারি বর্ণের অস্তিত্ব অতি প্রাচীন কালে ছিল। ক্ষত্রিয় বৈশ্য আর আছে কি না সে কথা লইয়া [illegible] বিচার হইয়াছে। বাঙ্গালার স্মৃতিকর্ত্তা রঘুনন্দন বলিয়া গিয়াছেন, কলিতে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভিন্ন অন্য বর্ণ নাই। মহারাষ্ট্র দেশেও পণ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সুতরাং জাতি বা বর্ণ বলিতে গেলে এখন আর শূদ্র ও ব্রাহ্মণকে ছাড়ি [illegible]

বসিয়া থাকিলে চলিবে না। এখন নানা বর্ণ হইয়াছে। এই সকল বর্ণের মধ্যে পরস্পর বিবাহ, এমন কি খাওয়াও চলে না। এ কথা আমরা সকলেই জানি। এখন যদি আইনের দ্বারা শূদ্র বলিয়া বহুসংখ্যক জাতির মধ্যে পরস্পর বিবাহ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে সমাজ বড়ই বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিবে।

এখন কথা হইতেছে মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতিকারেরা যে ভাবে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহার ব্যাখ্যা করিয়া দেশ কাল পাত্র অনুসারে তাঁহাদের বিধিগুলির সমন্বয় করিয়া একটা মত গড়িয়া লইয়াছি। সে মতের মূল ভিত্তি সেই স্মৃতি। কিন্তু ব্যাখ্যায় এবং দেশ কালপাত্রভেদে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। সে পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে হিন্দু সমাজ ও হিন্দু সমাজের নেতৃগণ করিয়া গিয়াছেন এবং এই বিশাল হিন্দু সমাজ তাহাই মানিয়া চলিতেছে। এখন যদি আমরা হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলি যে, আমরা বর্ত্তমান আচার ব্যবহার চাই না, আমরা মনু যাজ্ঞবল্ক্যের মতেই চলিব, তাহা হইলে আমাদের বলিতে হয় যে, টীকাকারেরা দুই তিন হাজার বৎসর ধরিয়া যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অপব্যাখ্যা। পরবর্ত্তী নিবন্ধকারেরা প্রায় হাজার বৎসর ধরিয়া যে সকল ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহা অপব্যবস্থা। আমরা সে কথা বলিতে প্রস্তুত নহি। কায়স্থ ধনীর তাঁতিনী গর্ভজাতপুত্র বিষয়ের অধিকারী হইতে পারে না, তাহাকে অধিকারী করিয়া আদালত ঘোর অবিচার করিয়াছেন। কিন্তু আইন আদালত যেরূপ চলিতেছে তাহাতে উত্তরোত্তর এই অবিচারের সংখ্যা বাড়িবে বই কমিবে না। ইহার উপায় কি? এক উপায়—প্রধানি উপায়—যাহারা এই সকল বিচার করিয়া আসিতেছিলেন, আবার তাঁহাদেরই উপর বিচারের ভার দেওয়া হউক। তাঁহারা দেশের পূর্ব্বাপর অবস্থা জানিতেন, দেশের tradition জানিতেন, কালে কালে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে সকল পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাঁহারা জানিতেন, তাঁহারাই সুবিচার করিতে পারিতেন। আবার তাঁহাদেরই হাতে বিচারের ভার দেওয়া ভিন্ন ইহার আর উপায় নাই। যেমন চলিতেছে তেমন চলিলে হিন্দু সমাজ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে। হাজার সুখেও হিন্দুর অস্তিত্ব থাকিবে না।

আর এক কথা। সকলেই জানেন, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা পিণ্ডলোপের অত্যন্তই ভয় করেন। আমার নাম ও গোত্র লোপ হইবে, আমার পূর্ব্বপুরুষেরা পিণ্ড পাইবে না এ চিন্তাও তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না। তাই অপুত্রকস্থলে তাঁহারা নানাবিধ উপায়ে পুত্র সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেন। এখন পুত্র

সংগ্রহের আর নানা উপায় নাই। আর বাকী সব রহিত হইয়া গিয়াছে। এক আছে পোষ্যপুত্র গ্রহণ। আমার নাম গোত্র লোপ না হউক, পিতৃপুরুষের পিণ্ডলোপ না হউক, সেইজন্য আমি পরের একটী ছেলেকে আমার বলিয়া গ্রহণ করিব, প্রতিপালন করিব। কিন্তু আর একজনের নাম গোত্র লোপ করিয়া তাহার পিতৃ-পুরুষের পিণ্ড লোপ করিয়া তাহার একমাত্র পুত্রকে পোষ্য পুত্র-গ্রহণ করিতে পারি? কখনই পারি না। আমিও যেমন বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাবলম্বী, পোষ্য-পুত্রের পিতাও ত তেমনি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাবলম্বী। একজনের পিণ্ড লোপ করিয়া আর জনের পিণ্ড দান করিতে শাস্ত্র দিবে কেন? সুতরাং বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুর পক্ষে এক-পুত্রস্থলে দত্তক দেওয়া নিষিদ্ধ।

কিন্তু এখন অনেকে মনে করেন যে, অপুত্রকস্থলে পোষ্য-পুত্র গ্রহণ নিত্য বা Compulsory নহে। কেন না সকল লোকে লয় না। যে লয় না সে পাপ-ভাগী হয়, ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ করে। কিন্তু তাই বলিয়া অপুত্রকস্থলে কর্ত্তব্য নিত্য নয়, নৈমিত্তিক বা কাম্য,—এ সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত মাত্র। কিন্তু এখন ইংরেজী পুস্তকে এই অপসিদ্ধান্তকেই সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাতে সমাজে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে।

এইরূপে ইংরাজ-রাজ দয়া-পরবশ হইয়া আমাদিগকে ব্যবহার সম্বন্ধে যে স্বাধীনতা দিয়াছেন, এবং যে স্বাধীনতা লোপ করিবার তাঁহাদের কিছুমাত্রও ইচ্ছা নাই, আমরা আইন-আদালতের ঘণবাখ্যা, অপসিদ্ধান্ত ও ধর্ম্মের অপব্যাখ্যা হেতু পূর্ণ মাত্রায় তাহা ব্যবহার করিতে পারিতেছি না। কিন্তু হিন্দু-সমাজ ঐ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট, নিশ্চেষ্ট বলিয়াই রাজদত্ত অধিকার আমাদের কোন কাজে আসিয়া পড়িতেছে। আমরা যদি সতর্ক ও সাবধান হইতাম এইরূপ কখন কিছুতেই ঘটিতে পারিত না। সুতরাং এখনও আমাদের সাবধান হওয়া উচিত। কিরূপে সাবধান হইতে হইবে—তাহারই উপায় নির্দ্ধারণের জন্য আজ এই মহাসভার আহ্বান।

শুধু আইন আদালত কেন আরও অনেক বিষয়ে আমাদের আচার-ব্যবহারের প্রতি সাংঘাতিক আঘাত হইতেছে। জাতিভেদ-প্রথা আমাদের অস্থিমজ্জাগত। প্রাচীন ঋষিরা চার জাতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাহার অনেক উন্নতি করিয়াছি। তাঁহারা শুদ্ধ বর্ণভেদেই জাতিভেদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আমরা শুদ্ধ বর্ণভেদে নয় ব্যবসায়ভেদে, কর্ম্মভেদে, বাসস্থানভেদে, পূর্ব্ববাসস্থানভেদে ও পরবর্ত্তী বাসস্থানভেদে, নানা জাতির সৃষ্টি

করিয়াছি। এই সকল জাতি আপনাদেরই মধ্যে বিবাহ করে এবং আহারাদিও আপনাদেরই মধ্যে করে,—ইহাদের আচার-বিচারও ভিন্ন ভিন্ন। এই যে জাতি-ভেদ-প্রথা ইহা দ্বারা ভারতবর্ষের যে কত উপকার হইয়াছে তাহা বলা যায় না এবং এখন সমস্তদেশে অর্থাৎ ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি সভ্য দেশে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা দৃষ্টে বোধ হয় যে ইহারাও আমাদের দেশের জাতিভেদ-প্রথা বা caste systemএর দিকে অগ্রসর হইতেছেন। জাতিভেদ-প্রথার মত প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী অর্থাৎ democracy বোধ হয় সভ্যাপি সভ্য দেশেও নাই। একটী জাতির মধ্যে সব সমান। সমাজ-শাসনে সকলেরই কথা চলে। আমি রাজাধিরাজ হইলেও আমার জাতির শাসন বিষয়ে আমার জাতির নিতান্ত দরিদ্র প্রজারও যে ক্ষমতা আমারও সেই ক্ষমতা। ইংরেজী করিয়া বলিতে গেলে casteএর মধ্যে রাজাধিরাজেরও এক ভোট পাংশুপাদ দরিদ্রেরও এক ভোট। আমি যদি কোন সময় বিরুদ্ধকাজ করি আমার জাতির অতি দরিদ্রও আসিয়া বলিবে তুমি রাজা হোনার যে ক্ষমতা তুমি আমার জাতির অনেক লোককে বশ করিয়াছ, আমি অতি দরিদ্র আমার কথা কেহ শুনিবে না কিন্তু তথাপি তুমি সমাজবহির্ভূত কর্ম্ম করিয়াছ আমি তোমার সহিত আমার ব্যবহার বন্ধ করিলাম। তাহাকে দণ্ড পাওয়াইতে হইবে না সম্বন্ধ হইতে হইবে না, সে একাই আমাকে সম্পূর্ণ শাস্তি দিতে পারিবে। এমন democracy আর কোথায় পাইব; কিন্তু আমাদের এই জাতিভেদ-প্রথা ভাল করিয়া না বুঝিয়াই ইংরেজী শিক্ষার প্রথম আরম্ভ হইতেই লোকে এই জাতিভেদ-প্রথাটা উঠাইয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। পূর্ব্বে প্রত্যেক জাতিতেই এক একটা গভর্ণমেণ্ট ছিল। এক একজনকে তাহারা প্রামাণিক বা Authority বলিয়া মানিত। তাঁহার অধীনে একজন নেট প্রামাণিক বা Vice-President থাকিত। তাঁহার অধীনে তিন চারিজন কর্ম্মচারীও থাকিত। তাঁহারা প্রামাণিকের আজ্ঞানুসারে শাসনকার্য্য চালাইতেন।

এখন অনেক জাতিতে নামতঃ এই সকল পদের লোপ হইয়াছে। কিন্তু পদবীগুলি আছে, পদবী দেখিয়াই মনে করিয়া লইতে হইবে যে এককালে পদও ছিল। যিনি ধনে মানে মর্য্যাদায় বিশেষ চরিত্রে আচারে ব্যবহারে বড় হইতেন, লোকে তাঁহাকেই প্রামাণিক বলিয়া মানিত। তাঁহার বংশধরেরা ঐ সকল গুণ সম্বন্ধিত হইলে তাঁহারাও প্রামাণিক হইতেন। না হইলে যাহারই এই সকল গুণ থাকিত তিনিই প্রামাণিক হইতেন। ঠিক election ও ছিল না, ঠিক

selectionও ছিল না মাঝামাঝি একটা উপায়ে পরাযাণিক স্থির হইত। এখন সে caste গবর্ণমেণ্ট আর নাই, কিন্তু এক জাতির মধ্যে সকলেই যে সমান সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আগেও যেমন democracy ছিল এখনও তেমনি democracyই আছে। তবে তখন যেমন আঁটা-আঁটী বাঁধাবাঁধি ছিল এখন সেটা এলাইয়া পড়িয়াছে। এখন অনেকে নিজের গোঁয়ে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছে, প্রত্যেক জাতিতেই দলাদলির সৃষ্টি হইতেছে।

জাতিভেদ-প্রথাই আমাদের সকল অবনতির মূল, ইংরেজী-শিক্ষিতদের এটী যেন মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্রাহ্ম বলিতেছেন ভাঙ্গ, বিলাত-ফেরৎ বলিতেছেন ভাঙ্গ, ইংরেজী-শিক্ষিত বলিতেছেন ভাঙ্গ; সকল নই-রোশনীর সম্প্রদায় বলিতেছেন ভাঙ্গ। পুরাণী-রোশনীরা যেন কতকটা থতমত খাইয়া গিয়াছেন। নই-রোশনীর পশ্চিম দেশ হইতে আনীত তীব্র আলোকে তাঁহাদের আলো যেন ম্লান হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা যেন চোখে ধাঁধা দেখিতেছেন। কিন্তু এখন ত' নূতন রোশনী অনেক দিন চলিয়াছে, পুরাতন রোশনীও অনেক দিন চলিয়াছে —এখন ত' দুই রোশনীর তুলনায় সমালোচনার দরকার। এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা দুই রোশনীরই কিছু কিছু ভোগ ভুগিয়াছেন, কিছু কিছু দোষ-গুণ বিচার করিয়াছেন। নই-রোশনীর কথা আমার এখানে বলার কিছু প্রয়োজন নাই। তাঁহাদের ওকালতী করিবার লোক বিস্তর, অবশ্য গালিও খায়। বিদ্যাবুদ্ধি-বলে তাঁহারা খুব বলীয়ান, কলমের জোরও তাঁহাদের বেশী; সুখের দৌড়ও তাঁহাদের খুব। পুরাণী-রোশনীর এত সরঞ্জাম নাই, কিন্তু মন ত' আছে, বুদ্ধিও একটু একটু আছে। নই-রোশনীর একটু আধটু আলোও তাঁহারা পাইয়াছেন। এখন একবার জাতিভেদ-প্রথাটা পরীক্ষা করা যাক দেখি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এক একটী জাতি এক একটী Democracy আর খুব জবরদস্ত Democracy। United States দেশটীকে নানাপ্রদেশে ভাগ করিয়া এক একটী Democracy করিয়াছে। যতগুলি State ততগুলি Democracy। আমাদেরও তাই, যতগুলি জাতি ততগুলি Democracy। তফাৎ এই যে আমাদের Democracy নহে, জাতি লইয়া আমাদের Democracy। সুতরাং এ আমগায় বড় বলিবার কিছু নাই। তবে এক জাতি অন্য জাতির প্রতি বড়ই আধিপত্য করিতেছে। ভদ্রলোকেরা (ভদ্র-Cracy) অন্য Cracyর উপর অত্যাচার করিতেছেন; বিশেষ ব্রাহ্মণেরা। ইঁহারা ত' জাতিটীকে অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। সেকালে যে একটু

আমো ছিল বেটুন্ একচেটিয়া করিয়া বাকী সকলকে অজ্ঞান-অন্ধকারে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন। তাই ত' জাতি-ভেদ তুলিয়া দেওয়ার দরকার হইয়াছে। তাই ত' দেশের এ দুর্দ্দশা হইয়াছে। এ কথাটা কি সত্য? একটী জাতি তেল তৈয়ারী করে। যাহার তেলের দরকার সকলকেই তাহার কাছে যাইতে হইবে, তাহার কাছে না গেলে উপায় নাই। আর একটী জাতি কাপড় বোনে, যাহারই কাপড়ের দরকার হইবে তাহাকেই কাপড়ের জন্য তাঁতির বাড়ী যাইতে হইবে। আর একটী জাতি চিকিৎসা করে, বাড়ীতে রোগ হইলেই তাহার বাড়ী না গিয়া উপায় নাই। এ ত বেশ কথা, ইহাতে কাহারও আপত্তি হইবার কোন কারণই নাই। আর এক জাতি বাঙ্গালা লেখাপড়া লইয়া থাকে। হিসাবপত্র দলিল-দস্তাবেজ চিঠিপত্র মুসাবিদা নকল আর এক জাতির কাজ। এসব কাজের দরকার হইলে তাহার বাড়ী যাইতে হইবে, নহিলে উপায় নাই। সেইরূপ শাস্ত্রের বিধি-ব্যবস্থা, ধর্ম্মকার্য্যের পরামর্শ এসকলের জন্য ব্রাহ্মণের বাড়ী যাইতে হইবে, নইলে উপায় নাই। সকলেরই ব্যবস্থা একচেটিয়া, কিন্তু একচেটিয়া বলিয়া এ জনের হাতে ত নয়, যে সে যা ইচ্ছা তাই করিবে; একটা একটা জাতের হাতে, বলিতে গেলে অসংখ্য লোকের হাতে। সুতরাং একচেটিয়ার যে সকল দোষ জাতিভেদ সমাজে তাহা হইতে পারিত না। এ শ্রেণিভেদ ত' Democracyর সমষ্টিমাত্র। ব্রাহ্মণেরা যে অন্য জাতিকে অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন, এ কথাও সত্য নয়। কারণ শাস্ত্রের বিধি এই যে, আপন-আপন জাতির ব্যবসায়ে থাকিয়াও সকলেই ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে পারে। দান, পূজা, যাগযজ্ঞ সকলই করিতে পারে। ইহকালে পরম সম্মান লাভ করিয়া পরকালে স্বর্গ, এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে; সুতরাং পারত্রিক ব্যাপারেও জাতিভেদ থাকা। Democracy তবে নই-য়োশনীর ইহার উপর এত রাগ কেন? ইউরোপেও ত এখন এক রকম জাতিভেদই দাঁড়াইয়াছে। যাহারা খনিতে কাজ করে তাহারা এক জাত, যাহারা রেলওয়ে চালায় তাহারা এক জাত, যাহারা কাপড় বোনে তাহারা এক জাত। তফাতের মধ্যে এই, তাহারা আপন আপন জাতির বাহিরেও বিবাহ করিতে পারে, এবং সকলেই একত্র খায়। আমাদের জাতি বংশগত, উহাদেরও প্রায় বংশগত হইয়া আসিতেছে। বাপ সর্ব্বদাই ইচ্ছা করে, ছেলে আমারই কাজ করুক, এ ইচ্ছাও স্বাভাবিক, কিন্তু ছেলেরা ইচ্ছা করিলে অন্য কাজও করিতে পারে এবং আপনার ইচ্ছানুসারে অন্য জাতিতে

বিবাহও করিতে পারে। আমাদের দেশে বিবাহটী করিতে পারে না, কিন্তু অন্য ব্যবসা অবলম্বন করিতে পারে। রাজপুতানায় ও মহারাষ্ট্র দেশে যে কেবল উচ্চশ্রেণীয় লোকেই বড় বড় রাজকার্য্য করে এরূপ নহে, অনেক নিম্ন নীচ-জাতীয় লোকেও বড় বড় রাজকর্ম্ম পায় এবং করিয়া থাকে। তবে এদেশ আমাদের জাতি ও ইউরোপের জাতিতে তফাৎ কি হইল? এই আজিকার ইউরোপে আর কিছু দিন থাকিলে বোধ হয় সেখানেও বিবাহ ও খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হইয়া আসিবে। পুরুষানুক্রমে এক কাজ করায় সেকালে আমাদের দেশের লোকে যেরূপ দক্ষ ও পরিপক্ক হইয়া উঠিত সেটা ইউরোপে এখনও হয় নাই। কিন্তু ধনী ও দরিদ্রে, মহাজন ও মজুরে, Capital ও Labourএ ইউরোপে যে ভয়ঙ্কর ঝগড়া বাধিয়া উঠিয়াছে, আমাদের দেশে তাহা ছিল না। কারণ, অল্প মূলধন লইয়াই লোকে কার্য্য করিত অনেক সময় মূলধনের একেবারেই দরকার হইত না। ইহাতে সমাজের শান্তি ভিন্ন অশান্তির কোন কারণ থাকিত না। সুতরাং জাতিভেদ-প্রথায় আমাদের সমাজে উপকার ভিন্ন অপকার দিল না এবং এখনও নাই। Unemployment বলিয়া ইউরোপে যে এক ভীষণ ব্যাধির উদয় হইয়াছে, আমাদের দেশে সেটা ছিলই না। যদি কোন জাতিতে Unemployment জন্মিত সেই সেই জাতির লোকেই তাহার একটা ব্যবস্থা করিয়া দিত। নিতান্ত না পারিলে মুষ্টিভিক্ষা ত ছিলই সে ত আমাদের দেশে প্রত্যেক গৃহস্থেরই কর্ত্তব্য, কত অন্ধ, আতুর, বৃদ্ধ, জরাজীর্ণ লোক যে মুষ্টিভিক্ষায় আপনাদের জীবনাতিপাত করিত তাহা বলা যায় না।

ক্রমশঃ।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

(জীবনী-প্রসঙ্গ)

(৯)

কর্ম্মোপলক্ষে মফঃস্বলে প্রবাস যাপন ; আমোদ প্রমোদ ও উকীলের গান রচনা।

তারকনাথ উত্তর বঙ্গ পরিভ্রমণ কালে বন্ধু-বান্ধবের গৃহে অতিথি হইতেন। তিনি যে গৃহে অতিথি হইতেন, সেই গৃহে হাসির ফোয়ারা ছুটিত। সে হাসির ভাগে আসিবার জন্য গ্রামগ্রামান্তর হইতে জনসাধারণ সমবেত হইত। কর্ম্মোপলক্ষে মালদহ অবস্থান কালে পাবনা নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ কলাবিৎ বাবু স্বর্গীয় ভোলানাথ অধিকারী মহাশয়ের বাটীতে অতিথি হইতেন। স্বর্গীয় অধিকারী মহাশয় সেই সময় মালদহের পুলিশ ইনেস্পেক্টর ছিলেন। স্বর্গীয় অধিকারী মহাশয় গীতবাদ্যকুশলী ছিলেন। পাখোয়াজ বাজাইতে তৎকালে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না, সেইজন্য সেকালের কালোয়াৎ সমাজে তিনি বিশেষ সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। আজিকাল সঙ্গীত ও বাদ্যকুশলীরা যে "তেহাই" দেন, তাহা স্বর্গীয় অধিকারী মহাশয় প্রচলন করেন। স্বর্গীয় অধিকারী মহাশয়ের গীতিনাট্যের সুখ্যাতি ইয়োরোপ পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। প্যারিসে একবার এক সঙ্গীত-বাদ্যের সম্মেলন (Congress) হয়; সেই সম্মেলনে কলাবিৎ অধিকারী মহাশয় গীত ও বাদ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পঠিত হয় প্যারিসের স্বর-বিজ্ঞান পত্রে তাঁহার চিত্রসমেত এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

বন্ধুগৃহে অতিথি হইলে তারকনাথ কিরূপ আমোদ প্রমোদে কাটাইতেন, সে সম্বন্ধে স্বর্গীয় অধিকারী মহাশয়ের পুত্র রায়সাহেব শ্রদ্ধেয় শ্রীঅঘোরনাথ অধিকারী মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক যে বিবরণটী লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা নিম্নে তাঁহার ভাষায় প্রকাশ করিলাম,—

"তারক বাবু তখন মালদহে কাজ করিতেন। আমার পিতা কিছুদিন মালদহের পুলিশ ইনেস্পেক্টর ছিলেন। এই সূত্রে ও আমার পিতা কয়েক বৎসর

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজেও পাঠ করিয়াছিলেন, এই সম্পর্কে তারকবাবুর সহিত তাঁহার খুব ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল, তারকবাবুকে সে সময় কর্ম্মোপলক্ষে উত্তর বঙ্গের সমস্ত জেলাতেই ভ্রমণ করিতে হইত। প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই আমাদের বাটীতে গানবাজনার মজলিস বসিত। কুমারখালির (নদীয়া জেলার অন্তর্গত) স্বর্গীয় রংগী লাহিড়ী মহাশয় বৎসরের ছয় মাস আমাদের বাটীতেই কাটাইতেন। লাহিড়ী মহাশয়কে আমি বৃদ্ধাবস্থায় দেখিয়াছি। কানে কিছু কম শুনিতেন। তিনি উত্তম গায়ক ছিলেন। তাঁহার সঙ্গীত রচনার শক্তিও অসাধারণ ছিল। লাহিড়ী মহাশয়ের পানদোষ ছিল। তিনি ও তারকবাবু এক ঘরেই শয়ন করিতেন; এক দিনের একটী ঘটনা লিখিলাম। শরীর অসুস্থ হওয়ায় তারক বাবু সন্ধ্যার পরই শয়ন করেন। এদিকে তারকবাবু না হইলে লাহিড়ী মহাশয়ের গান আসিত না। তারকবাবু নিজে সঙ্গীতজ্ঞ না হইলেও সমঝদার লোক ছিলেন। খুব গান চলিতেছে—হিন্দী গান। শ্রোতাদিগের মধ্যে পাবনার সুপ্রসিদ্ধ গভর্ণমেণ্ট প্লীডার স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র রায় ও প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের মধ্যমাগ্রজ স্বর্গীয় তারকচন্দ্র মিত্র মহাশয় ও অন্যান্য অনেক ভদ্রলোক ও অনেক উকিল উপস্থিত ছিলেন। গিরিশচন্দ্র তখন যুবক। আড়ালে মুখ লইয়া গিরিশচন্দ্র বলেন, ওসব হিন্দি গান বুঝি না—একটা বাঙ্গালা গান হোক। সে কালের ওস্তাদী বাঙ্গালা গানের প্রধান গানই ছিল "বাঙ্গালী তোর আছে ভেবে ভেবে বাঁচিনে"; সঙ্গীত শেষ হইলে স্বর্গীয় তারকচন্দ্র মৈত্র বলিলেন যে, ভদ্র সমাজে বিদ্যাসুন্দরের গান গাওয়া ঠিক নয়। তারক মৈত্র ও তারক গাঙ্গুলী পরস্পরের মিত্র ছিলেন। মৈত্র মহাশয়ও ডাক্তার ছিলেন। তিনি তখন পাবনার ব্রাহ্মসমাজের নেতা ছিলেন। ইনি অতিশয় নির্মল চরিত্র ছিলেন;—যাহা হউক মৈত্র মহাশয়ের সমালোচনায় লাহিড়ী মহাশয় বড় অপমান বোধ করেন। তখন তিনি গাঙ্গুলী মহাশয়ের শরণাপন্ন হন। দুই তারকে মধ্যে মধ্যে বেশ তর্ক-কলহ হইত। তারকবাবু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন সেদিন সন্ধ্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। লাহিড়ী মহাশয় তারক বাবুর ঘুম ভাঙ্গাল। তারক বাবু উঠিলেন, উঠিয়া লাহিড়ী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্যাপার কি? বল কি হুকুম? সমঝদার পাও নাই বুঝি?" লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন "হাঁ নয় ভায়ে (লাহিড়ী মহাশয় তারকচন্দ্র মৈত্রের সম্পর্কে ভাগিনেয় ছিলেন। উত্তরের বাড়ী কুমারখালী অঞ্চলে) বড় চটে গেছে। বলে কি যে বিদ্যাসুন্দরের গান ভদ্র সমাজে গাওয়া উচিত নয়। সেকেলে বাঙ্গালা গানই হয় না, দু'একটী

যা আছে তা বিদ্যাসুন্দরের, তা বাদ দিলে পাইব কি? তুই ওঠ একটা গান বেঁধে দে, ঐ নাতনি ভোর জন্যে ভেবে বাঁচিনে সুরে। আমি ততক্ষণ তামাক সাজি। খুব তাড়াতাড়ি লিখে দে, তা নইলে ছোকরারা সব উঠে চলে যাবে"। তারকবাবু উঠিলেন, তিনি দেখিলেন শ্রোতাদিগের মধ্যে অধিকাংশই উকীল। তিনি তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া নিম্নলিখিত গান রচনা করেন—

মজেন ভোর জন্যে ভেবে ভেবে বাঁচিনে।
পথপানে চেয়ে থাকি তবু তুই আসিসনে॥
ভাবি বুঝি অন্য বাড়ী গেলি তুই আমায় ছাড়ি
আমার বুঝি উনুনে হাঁড়ী জীবনে আর চড়ে না।

সঙ্গীত শেষ হইল। গান শুনিয়া সকলেই খুব বাহবা দিলেন। কিন্তু মৈত্র মহাশয় ইহাকেও কুরুচিপূর্ণ বলিয়া উঠিয়া গেলেন। সঙ্গীত-সভা ভাঙ্গিল। ভোজনের সময় লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন তারক তোর একেবারেই কবিতা বোধ নাই। "নাতনির" সঙ্গে "বাঁচিনের" কেমন সুন্দর মিল; আর তুই সেখানে বসালি কি না একটা বদখৎ কথা মজেন"—তুই নেহাতই বেয়াক্কেল। তারক বাবু বলেন, দেখ লাহিড়ী, ভাব ঠিক রাখতে হবে, কবিতা ঠিক রাখতে হবে; এত ঠিক করে রাখতে গেলে তোমার মত কবি হয়ে যেতেম।"* নাতনীর সঙ্গে মুদিনী বেশ মেলে, তা তোমার মিল রাখতে গেলে যে, ভাব হয় না। লাহিড়ী গান ধরিলেন "মুদিনী ভোর জন্যে ভেবে ভেবে বাঁচিনে।" এই ঘটনা বোধ হয় স্বর্ণলতা রচনার পূর্ব্বে। আমার অবশ্য এত কথা স্মরণ থাকিবার কথা নয়। আমি তখন ছোট। কিন্তু এ সকল বিষয় পরেও অনেক সময় আমাদের বাটীতে আলোচনা চলিত—তাই অনেক কথাই মনে আছে। মধুসূদন কুণ্ডু নামক একটী যুবক তখন আমাদের বাটীতে থাকিতেন। তিনিই এই গানটী লিখিয়া রাখিয়াছিলেন ও মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে গাহিয়া শুনাইতেন। তাই এখনও গানটী স্মরণ আছে। বিখ্যাত কবি স্বর্গীয় রজনীকান্ত সেন একদিন পাবনার সুবিখ্যাত উকীল বাবু কালীচরণ সেনের বাটীতে সঙ্গীত আলাপ করিতেছিলেন, রজনীকান্ত স্বরচিত "উকীলের গান" গাহিতেছিলেন; আমি সে আসরে উপস্থিত ছিলাম। আমি তৎক্ষণাৎ তারক বাবুর 'উকীলের গান'

* স্বর্গীয় লাহিড়ী মহাশয় একজন সুকবি ছিলেন; তাঁহার সঙ্গীত রচনার শক্তি অসাধারণ ছিল। তাঁহার সঙ্গীতগুলি সংগৃহীত হইলে বঙ্গসাহিত্যের যথেষ্ট উপকার করা হইবে। শুনিয়াছি বঙ্গবাসী কার্য্যালয় স্বর্গীয় লাহিড়ী মহাশয়ের অনেকগুলি সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়াছেন।

যাইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "রজনী, এখানে তোমার Originality [illegible] নাথদুর কচিয়া দিলাম। রজনীকান্ত গান শুনিয়া বলিলেন, "তারকবাবু এই অল্প কয়েক লাইনে খুব ভাবের বাহাদুরী দেখাইয়াছেন"।

তারকনাথ মিষ্টভাষী বিনয়ী ও খুব রসিক ছিলেন; তাঁহার রসের কথা শুনিবার জন্য প্রতি সন্ধ্যাতেই যে বাটীতে তিনি আসরে জমকাইতেন সে বাটীতে ভীড় বলিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অঘোর বাবু লিখিয়াছেন, "আমার এক মাতুল ছিলেন, তাঁহার নাম হরিমোহন রায়। ইঁহার বাড়ী কুমারখালি অঞ্চলে। ইনি খুব রসের গল্প করিতে পারিতেন। তারকনাথ ও হরিমোহন একত্র হইলে হাসির ফোয়ারা ছুটিত। তারকনাথ একটী রসের গল্প বলিলেন, হরিমোহনকে তদপেক্ষা অধিকতর রসযুক্ত গল্প বলিয়া পাল্টা দিতে হইত। একদিন তারকনাথের গল্পের পরে, হরিমোহন আর পালটা গল্প বলিতে পারিলেন না। গল্পটী যে কি তাহা আমার স্মরণ নাই। তবে পাল্টা গল্প বলিতে না পারায় তারকনাথ যে রহস্য করিয়া হরিমোহনকে বলিয়াছিলেন, সে কথাটি অদ্যাপিও আমার স্মরণ আছে। সেটী এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম,—"The hen got on the top of a hut, but the fox can not." সে সময়ে সবে মাত্র প্যারীচরণের First Book উঠিয়াছে। এই বাক্যটী সেই পুস্তকের। এইরূপ ইংরাজী বুকনী দিয়া তিনি খুব আসর গরম করিতে পারিতেন। একদিন গাঙ্গুলী মহাশয় একটুবেশী মাত্রায় পান করিয়া অঘোরে ঘুমিয়ে গিয়াছেন। এমন সময় ডাক্তার তারকচন্দ্র মৈত্র আসিয়া উপস্থিত। মৈত্র মহাশয় তারকনাথকে জিজ্ঞাসা করেন, মামা কোথায়? তারক (গাঙ্গুলী) উত্তর করিলেন "It was foretold in the Puranas, that the Turk would come and the old moharaj fled by the back door at once to Puri or Jagannath." (এই ছত্রটী মেডিকেল স্কুলের বাঙ্গালার ইতিহাসের ছত্র।) Turcks না আসুক তারক আসিয়াছে। সুতরাং old গাঙ্গুলী পলায়ন করিয়াছে! তখন মৈত্র মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, পলায়নের হেতু কি? গাঙ্গুলী মহাশয় উত্তর করেন, There is some thing rather in the state of Decemale. আসলেট নাটকের বাহা। এই রূপ মিষ্ট মিষ্ট কথায় তারকনাথ সকলকে খুব হাসাইতে পারিতেন।

স্বর্ণলতার চরিত্র।

তারকনাথ বলিতেন "বাস্তব জীবনে যে সমস্ত ঘটনাবলী নিয়ত সংসারে সংঘটিত হইতেছে, তাহা অবলম্বন করিয়া উপন্যাস রচনা করিলে বড় হৃদয়গ্রাহী হয়।" এজন্য তিনি স্বর্ণলতার অধিকাংশ চরিত্র বাস্তব জীবন হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোথায় কিরূপ অবস্থায় ও কি প্রকারে এই সমস্ত লোক-চরিত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই এইবার বলিব। তিনি নিজ দৈনন্দিন-লিপিতে স্বর্ণলতার চরিত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—Some characters of my novel are from the real life. 11 July, 1873.

নীলকমল।

নীলকমল তাঁহার স্বগ্রামবাসী। জাতিতে গোয়ালা। আধপাগলা গোছের লোক। এই বেহালা-পাগলটী সত্যই বলিত, "লেখা কি? কলম দিয়া আকর (অক্ষর) বের করা আর কাঠের বাজনা ভিতর থেকে কথা বের করা এদু'টী বড় কঠিন কাজ। তবে লেখা ইচ্ছে কল্লে সকলেই লিখতে পারে, কিন্তু বাজনা মা সরস্বতীর বিশেষ করুণা চাই।" পাগলটী একস্থানে কখন স্থির হইয়া থাকিত না। আজ বাগআঁচড়া, কাল হাঁসখালির রাস্তায় পরশ্ব কৃষ্ণনগরের রাস্তায় বেহালা হাতে করিয়া আপন মনে বকিতে বকিতে চলিয়াছে। বেহালা বাজাইবার জন্য কেহ অনুরোধ করিলে গম্ভীর হইয়া চুপ করিয়া দ্বিতীয় অনুরোধের অপেক্ষায় থাকিত। দ্বিতীয়বার অনুরোধ না করিলে সে আপনা আপনি মাথা চুলকাইয়া কেঁকোর কেঁকোর করিয়া বেহালা বাজাইতে সুরু করিয়া দিত। কেহ গান গাহিবার জন্য বলিলে বেহালা বাজাইয়া তাহার প্রিয় সঙ্গীত "সখা আঁখি আজ্ঞা দিলে" সুর ধরিত। সঙ্গীতকালে তাহার হাবভাব মুখভঙ্গী এরূপ বিকৃত হইত যে, শ্রোতা না হাসিয়া থাকিতে পারিত না। হাসিলে অত্যন্ত চটিয়া বলিত "দাদা ঠাকুর বলেছিল, নীলকমল বেনা বনে মুক্তা ছড়িও না" তোমরা এর কি বুঝবে? যদি তোমাদের গুণ থাকতো তা'হলে এ সব বুঝতে পারতে। শুধু হাসলেই হয় না।" স্বর্ণলতায় লিখিত কথাগুলি সত্য-সত্যই সে বলিত।

দিগম্বরী ঠাকুরণদিদি।

ইনিও তারকনাথের স্বগ্রামবাসী, কোপনস্বভাব স্ত্রীলোক; তারকনাথ শৈশবকালে হইতে স্ত্রীলোকের ঝগড়া শুনিতে ভাল বাসিতেন। খেলিতে

খেলিতে পাড়ায় স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে ঝগড়া হইতেছে শুনিলে খেলা ছাড়িয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত হইতেন। তিনি নিজেও তাঁর বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজনের নিকট বলিতেন, "দেখ এই যে, হাতের কনুয়ে কড়া দেখিতে পাচ্ছ, ইহা শুধু মেয়ে মানুষের ঝগড়া শোনার ফল। বাটীতে স্ত্রীলোকের ঝগড়া হইলে, মাটীতে দুটী কনুই রাখিয়া বসিয়া মনোনিবেশপূর্ব্বক তাহাদের ঝগড়া শুনিতেন। কলহকালীন তাহাদের মুখভাব হর্ষ ও সঞ্চারাদি অভিনিবেশ পূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। অধিষ্ঠায় কলহপরায়ণা দিগম্বরী ঠাকরুণের সহিত তাঁর বাল্যে পরিচয় হয়; যৌবনে স্বর্ণলতায় তাঁহার প্রতিচ্ছবি তুলিয়া তাহাকে অমর করিয়া দিয়াছেন। 'ঠাকরুণদিদিকে চিনিত না এমন লোক সেকালে অতি বিরল ছিল। ঠাকরুণদিদি বৈকালিক ভ্রমণে বাহির হইলে প্রৌঢ়ারা দরজা অর্গলবদ্ধ করিতেন। কেন না যে বাটীতে প্রবেশ করিতেন, সেখানে প্রথমে মিষ্ট, পরে সুদীর্ঘ উপরোপরি কলহের পর সে স্থান ত্যাগ করিতেন। তারকবাবু বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট বলিতেন, ঠাকরুণদিদির যে রূপ ও গুণের পরিচয় দিয়াছি তাহা এক বর্ণও অত্যুক্তি করি নাই, যেমনটী দেখিয়াছি, সেইরূপই ফটো তুলিয়াছি।

রমেশ দারোগা।

রমেশ দারোগার সম্বন্ধে তারকনাথ তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়াছেন, My friend Suresh and Paresh two figures under the name of Ramesh and Debesh 11 July 1873. স্বর্ণলতায় রমেশ দারোগার সাক্ষাৎ পাইয়াছি, পরেশ দারোগার সাক্ষাৎ পাই নাই। রমেশ দারোগা মালদহের থানার দারোগা ছিলেন।

গড়াচর চন্দ্র।

কর্ম্মোপলক্ষে রাজসাহী অবস্থান কালে এই অদ্ভুত জীবটীর সহিত তারকনাথের পরিচয় হয়। তারকনাথের অপূর্ব্ব সৃষ্টি জীবটী রাজসাহীর এক জমিদারের শ্যালকরত্ন। এই হতভাগ্য "আমি জমিদারের শালা" বলিয়া নিজ পরিচয় দিত। হতভাগ্য প্রকৃতই অন্যের মেজেষ্টারী চুরি করিয়া শ্রীঘরবাস করিয়াছিল। জমিদার বাটীতে চিকিৎসার্থ আহূত হইয়া "পেট মোটা গলা সরু অদ্ভুতদর্শন বিশিষ্ট জীবটীকে দেখিয়া তারকনাথ চিত্র হিসাবে গ্রহণ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

শশাঙ্কমোহন স্মৃতি গিরি।

এই পাপিষ্ঠ স্মৃতি গিরি মহাশয় রংপুর জিলার অধিবাসী ছিলেন। ইনি খুলের পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সহজেই এক জমিদারের নায়েবের প্ররোচনায় ও অর্থলোভে এক গৃহস্থের অনূঢ়া কন্যাকে আটকাইয়া রাখিয়া এক বৃদ্ধ জমিদারের সহিত বিবাহ দিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। কর্ম্মোপলক্ষে রংপুরে অবস্থান করিবার সময় এই আদর্শ পণ্ডিত মহাশয়ের পরিচয় লাভ করেন এবং রংপুরেই পণ্ডিত মহাশয়ের ফটোগ্রাফ গ্রহণ করেন।

গোপাল।

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ অধিকারী মহাশয় বলেন, "হাইকোর্টের এক উকিলের বাটীতে এইরূপ একটী গরীব ছাত্র বাস করিত। সে রন্ধনাদি করিত, ও স্কুলে পড়িত। সে যখন এল-এ পরীক্ষায় বৃত্তিসহ উত্তীর্ণ হইল, তখন উকীল বাবুর তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িল।—উকীল বাবুর একমাত্র কন্যা—পুত্র ছিল না। কন্যাটী বয়স্থা হইয়াছিল, বিবাহের পূর্ব্বেই উভয়ের মধ্যে প্রণয় জন্মে। শেষে বিবাহ হয়।

শশীভূষণ।

মালদহে অবস্থান কালে কোন নবীন জমিদারের নায়েবের কীর্ত্তি-কথা শশীভূষণ চিত্রে অঙ্কিত করিয়াছেন। জমিদারের তহবিল হইতে নায়েব মহাশয় অর্থ আত্মসাৎ করিয়া নিজ বৃহৎ অট্টালিকা ও গৃহিণীর অসংখ্য গহনা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। অবশেষে বুদ্ধিমান নায়েব মহাশয়ের বড়বুদ্ধি ধরা পড়িলে যথারীতি পুলিশ হাঙ্গামা হয়। স্ত্রীর নিকট নিজ বিপদের কথা জানাইলে পতিব্রতা একটী কপর্দ্দকও সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া দিয়া স্বামীকে বিপন্মুক্ত হইবার সুযোগ দেয় নাই। অর্থ পরহস্ত হইবার ভয়ে বুদ্ধিমতী পিত্রালয়ে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। হতভাগ্য নায়েব পতিব্রতা স্ত্রীর পায়ে মাথা খুঁড়িয়া যখন কোন অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিল না, সেই সময় সে নিজে পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণ করে। মালদহে এই ঘটনা ঘটে; এই ঘটনা হইতে শশীভূষণ চরিত্র সৃষ্ট।

প্রমদা।

পাপিষ্ঠা প্রমদার চিত্র তারফলাথের কোন পরিচিত ব্যক্তির পত্নীর চিত্র। প্রমদার চরিত্র সম্পূর্ণ বাস্তব। প্রমদার যে চিত্র আমরা অঙ্কিত করিয়াছি

দেখিতে পাই, জ্ঞানাঙ্কুরে প্রকাশিত স্বর্ণলতায় ইহা অপেক্ষা অধিকতর নগ্নবর্ণে চিত্রিত ছিল। স্বর্ণলতা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার সময়, সে সমস্ত চিত্র তারকনাথ বর্জ্জন করিয়াছিলেন। জ্ঞানাঙ্কুরে প্রকাশিত অনেক চিত্র যাহা স্বর্ণলতা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার সময় বর্জ্জন করা হইয়াছিল আমরা পরে সেই সকল পরিত্যক্ত অংশ পাঠক পাঠিকাগণকে, যাঁহাদিগের জ্ঞানাঙ্কুরে প্রকাশিত স্বর্ণলতা পড়িবার সুযোগ হয় নাই, তাঁহাদিগের নিমিত্ত প্রকাশ করিব।

সরলা।

সরলার চিত্র সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তারকনাথের কোন কোন বন্ধুর মতে সরলার চিত্র বাস্তবজগত হইতে গৃহীত। কিন্তু তাঁহার পুত্রগণ বলেন, ইহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক চিত্র। স্বর্গীয় আদর্শ চরিত্র গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, সরলার চিত্র অতি ভাস্বর, অতিমর্ম্মস্পর্শী। তারকবাবু বাস্তব জগত হইতে এ চিত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং এই চরিত্র তাঁহার কোন পরিচিত ব্যক্তিবিশেষের চরিত্র। স্বর্গীয় আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ও এই কথা বলিয়াছেন।

সরলার মৃত্যুচিত্র ও তারকনাথের মানসিক অবস্থা।

জ্ঞানাঙ্কুরে সরলার যক্ষ্মা পীড়ার বর্ণনা ও লক্ষণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে লিখিত হইয়াছিল, উহা পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হইবে ইহা কোন চিকিৎসা ব্যবসায়ীর রচিত। স্বর্ণলতা পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় এই পরিচ্ছেদের অনেক অংশ বর্জ্জিত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে তারকনাথ নিজেই বলিয়াছেন, "জ্ঞানাঙ্কুরে যখন স্বর্ণলতা প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন ঐ রোগের এমন বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছিলাম যে, পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার সময় উহার একটা পরিচ্ছেদই বাদ দিতে হইয়াছিল। তথাপি এখনও সরলার পীড়া বর্ণনায় তাহা কালীন ডাক্তারি গন্ধ পাওয়া যায়।

সরলার মৃত্যুর জন্য পাঠকসম্প্রদায় সকলেই অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। গ্রন্থকার তারকবাবু বিধুভূষণের দেশে প্রত্যাবর্ত্তন—সরলার ঋণ শোধ করিবার মৃত্যু পরিচ্ছেদে লিখিয়া তারকনাথ এতই পাকা কার্ত্তা হন যে, এক পরিচ্ছেদে তাঁহার চির সরল হৃদয়ের হাসি রঙ্গতামাসা অন্তর্হিত হইয়াছিল। তারকনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জামাতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন সরলার মৃত্যু-চিত্র অঙ্কিত করিবার পর কিছু দিন তারকনাথের আলোর বিষয় হইয়া

শুধু নির্জ্জনে বসিয়া ভাবিতেন ও নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। সরলার মৃত্যুতে তারকনাথ কিরূপ শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার দৈনন্দিন লিপি পাঠে বুঝিতে পারা যায়। তিনি লিখিয়াছেন,—am very sorry and shed tears for the death of Sarala. Very sorry to part with her. I feel as if I were a murderer! What an awful thing Death is! 21. June 1873. Saturday.

স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ও সরলার মৃত্যু চিত্র।

সরলার মৃত্যু সম্পর্কে স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় একদিন তারকনাথকে বলিয়াছিলেন, "বেচারা সরলাকে তিলে তিলে না মারিয়া তাহাকে বাঁচাইলে সকল দিক রক্ষা হইত। তাকে তুমি বড় কষ্ট দিয়ে মেরেছ।" ইহার উত্তরে তারকনাথ বলেন, পণ্ডিতজী, সরলাকে মারিয়াছিলাম বলিয়াই আপনার হৃদয়ে একটা চিরস্থায়ী ছাপ পড়িয়াছে, তাই আজ আপনি কলিকাতা হইতে বরাবর আমার বাটীতে পায়ের ধূলা দিয়াছেন।

স্বর্ণলতা রচনা শেষে তারকনাথের মানসিক অবস্থা।

বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস স্বর্ণলতা ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুলাই সোমবার দিন সমাপ্ত হয়। এই গ্রন্থ সমাপ্তির পর তারকনাথের হৃদয়ে বিষাদ উপস্থিত হয়, কেন না স্বর্ণলতার অধিকাংশ চরিত্রই তাঁহার আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত নর-নারীর চিত্র। তাঁহাদিগকে যেরূপ দেখিয়াছেন, সেইরূপ ভাবেই তাহাদিগের ফটোগ্রাফ তুলিয়াছেন। এই সমস্ত আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণ স্বর্ণলতা-মুকুরে আপন আপন মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইবেন, কেহ বা রুষ্ট হইবেন, হয় ত বা তারকনাথের উপর চিরদিনের মত এই সকল বন্ধু ও আত্মীয়গণের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন হইবে ভাবিয়া তারকনাথের মানসিক অবসাদ উপস্থিত হয়। গ্রন্থ-রচনা শেষে তারকনাথের তৎকালীন মানসিক অবস্থার পরিচয় তাঁহার দৈনন্দিন-লিপি হইতে বুঝিতে পারা যায়। তিনি লিখিয়াছেন,—

Finished my tale in the evening at about 8 P. M. It was melanchaly pleasure to see it completed as I was to part company with my friends for ever. Monday 7th July 1873.

শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার

ইংরাজ আমলে বাঙ্গালী কবির স্বদেশ-প্রেম।

(তৃতীয় প্রস্তাব)

ইংরাজী সাহিত্য এবং ইতিহাস পঠন ও পাঠনের ফলে এক নূতন ভাব আসিয়া বাঙ্গালীর "ভীরু" হৃদয়কেও উদ্বেলিত করিতে লাগিল। স্বাধীনতার যে রুদ্রবাণী শ্বেতদ্বীপের অতীত যুগ হইতে সুদূর আট্‌লাণ্টিক মহাসমুদ্রের তীব্র-কল্লোলে শ্রুত হইতেছিল তাহা ইংরাজ কবিগণের বীণায় বাঙ্গালীর সুপ্তিমগ্ন হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভাবের অবতারণা করিয়াছিল। দিব্যোন্মাদে পরিপূর্ণ প্রেমের আনন্দধারার মধ্যে যৌনসম্পর্কজনিত ভাবরাশির আনন্দ-উচ্ছ্বাস মধ্যে, এই এক দেবদুর্লভ অপরূপ ভাব বাঙ্গালী কবির হৃদয়ে আবির্ভূত হইল। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, রঙ্গলালের সহিত বঙ্গসাহিত্যে এক নবযুগের অভ্যুদয় হইয়াছিল। তিনিই প্রথম স্বদেশপ্রীতিরূপ অমৃতের নবগঙ্গা আনয়নের ভগীরথ। "আপনারা ঘৃণিত উলঙ্গ আদিরসের কবিতার প্রেম পরিহার পূর্ব্বক বিমলানন্দদায়িনী কবিতায় প্রীতিরসে প্রবৃত্ত হউন" বলিয়া পদ্মিনী উপাখ্যানের ভূমিকা সমাপ্ত করিয়া রঙ্গলাল তাঁহার কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পূতিগন্ধময় কলুষিত দুর্ব্বলতা-প্রতিপাদক মানুষী প্রেমের কবিতা হইতে বাঙ্গালীর মন আকৃষ্ট করিয়াছিলেন রঙ্গলাল। ইংরাজী সাহিত্যের মধ্যে—শুধু ইংরাজী সাহিত্যের মধ্যে কেন, সমস্ত ইয়োরোপীয় সাহিত্যের মধ্যে যে প্রচণ্ডতা বর্ত্তমান আছে—যে অগ্নিশিখা সমস্ত জাতীয় সাহিত্যে প্রকট, তাহা বাঙ্গালাদেশে নবজীবনের অবতারণা করিয়াছিল—বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্যে উত্তেজনা, রুদ্রতা ও প্রচণ্ডতার ভাব আনয়ন করিয়াছিল। বাঙ্গালী কবি রঙ্গলাল পদ্মিনীকে উপলক্ষ্য করিয়া ভারতের অতীত গৌরব-কাহিনীর কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া—তাহার বর্ত্তমান হীন ও পতিত অবস্থার কথা শুনাইয়া দিয়া বাঙ্গালীর প্রাণে মত্ততা আনয়ন করিয়াছিলেন।

অসংখ্য বীরের যিনি জন্মবিধায়িনী।
এখন দুর্ভাগ্যে পরভোগ্যা পরাধিনী॥

বলিয়া কবি স্বদেশবাসিগণের বর্ত্তমান দুর্ব্বলতার কথা শুনাইয়া দিতেছেন—"তেজোহীন জনগণ, সে সব শব"।

স্বাধীনতা-হীনতায় জীবন ধারণ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ—দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ—অনন্তকাল পরাধীনতা ভোগ করিয়া "দাসত্ব-শৃঙ্খল" পরিধান করা অপেক্ষা একদিনের স্বাধীনতার ও স্বর্গসুখ। বাঙ্গালা সাহিত্যে যে স্বদেশ প্রেমের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তাহা মধুসূদনে যত অতকটা পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। রঙ্গলাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই আগুনের গতি সমস্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের বিস্তৃত ক্ষেত্রে বিকাশ পাইয়াছে। বাঙ্গালী-নূতন মন্ত্র শ্রবণ করিয়া চমকিত হইল। বাঙ্গালীকে নূতন ভাবে উজ্জীবিত করিতে হইলে বাঙ্গালীর ইতিহাসে সেরূপ মনোজ্ঞ কাহিনী খুঁজিয়া বাহির করা অসুবিধা ভাবিয়া বোধ হয় রঙ্গলাল বীরভূম রাজপুতানার ইতিহাসের সেই চিরপ্রসিদ্ধ পদ্মিনী উপাখ্যান গ্রহণ করিয়া নবযুগের স্বাধীনতা প্রচার করিয়াছিলেন। মৃত জাতির অসাড় হৃদয়ে সঞ্জীবনী শক্তি আনয়ন করিতে হইলে তাহার অতীত পৌরুষ বল ও স্বাধীনতার কথা স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে এবং বর্ত্তমানের হীন অবস্থার সহিত তাহার পূর্ব্বপুরুষের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনীর তুলনা করিতে হইবে। পদ্মিনী উপাখ্যানে কবি রঙ্গলাল সেই প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার কাব্য জাতিবৈর-জনিত দেশভক্তিতে পরিপূর্ণ। তিনি বলিতেছেন—

এ কথা যখন হয় মানসে উদয় হে
মানসে উদয়।
পাঠানের দাস হবে ক্ষত্রিয়-তনয় হে
ক্ষত্রিয়-তনয়॥
তখনি জ্বলিয়া উঠে হৃদয়-নিলয় হে
হৃদয়-নিলয়।
নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে।
বিলম্ব কি সয়?

এই দেশপ্রীতির সুর—এই জাতিবৈররূপ মাদকতা না থাকিলে "শরীরে রুধিরের ধার" ছুটে না—"অবসাদ-হিমে" অর্জ্জরিত কঠিন শীতল বক্ষে স্বাধীনতার উৎস প্রবাহিত হয় না।

এই সময় আর একজন প্রতিভাশালী বাঙ্গালী কবিও "ইংরাজী সাহিত্যের মুক্তবায়ুতে তাহার ফুসফুস্ এবং হৃৎপিণ্ড ভবিষ্যৎ পালোয়ানের উপযোগী ক্রিয়া-শক্তি এবং প্রসার লাভ করিতেছিল।" মধুসূদন বিশ্বসাহিত্যের অমৃতভাণ্ড হইতে

মধুচক্র রচনা করিবেন বলিয়া উপযুক্ত মাদমসলা সংগ্রহ করিতেছিলেন এবং জাতীয় সাহিত্যের মহাপূজার আসনে উপবিষ্ট হইতেছিলেন। বোধ হয় সম-য়োপযোগী হইবে ভাবিয়া—নব্যতন্ত্রে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মুখরোচক হইবে বুঝিয়া মধুসূদন শর্ম্মিষ্ঠার প্রস্তাবনায় লিখিলেন—

শুন গো ভারতভূমি কত নিদ্রা যাবে তুমি ?
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ, ত্যজ ঘুমঘোর— হইল হইল ভোর ;
দিনকর প্রাচীতে উদয়।
কোথায় বাল্মিকী ব্যাস, কোথা তব কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয় ?
অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক স্বাচ্ছে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয় !
সুধাবসে অনাদরে, বিষবারি পান করে
তাহে হয় তনু মন ক্ষয়।
মধু কহে, জাগো মাগো, নিজস্থানে এই মাগো
সুরসে প্রবৃত্ত হ'ক তনয়-নিচয়।

কিন্তু শিল্পাদর্শ ও সার্ব্বজনীন সাহিত্য-ভাব পুরিপুষ্টির পরিপন্থী মনে করিয়া বোধ হয় মধুসূদন এই নবোদ্বোধিত বিপ্লব ও স্বাধীনতা মন্ত্রের উন্মার্গগামিত্ব হইতে নিজকে রক্ষা করিয়াছেন। যে সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর সুর সুদূর ফরাসী রাজ্যে বাজিয়া উঠিয়া সমগ্র ইয়োরোপকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল, তাহা বাঙ্গালার সাহিত্যরথী ও ভাবুকগণের হৃদয়ে নূতন উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করিলেও মধুসূদনের সাধনা বাঙ্গালা সাহিত্যের অনাবিল ভাব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া-ছিল। অনেক ক্ষুদ্র কবিতার মধ্যে মধুসূদনের স্বাদেশিকতার ভাব পরিস্ফুট ; "বেথুন সাহেবের মনে এ মিনতি কবি পদে" বলিয়া তিনি জন্মভূমির নিকট যে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অন্তর্নিহিত স্বদেশপ্রাণতা প্রকাশ পাইয়াছে। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যাহা বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য ; "মধুসূদন ইয়োরোপে ছিলেন কিন্তু তাঁহার অন্তর ভারতে বিশেষভাবে পড়িয়া ছিল। কবে বাঙ্গালায় শ্রীপঞ্চমী, কবে শরতে দোয়েলার অর্চনা, কবে বিজয়া দশমী, কপোতাক্ষ নদ কেমন কুল কুল করিয়া বহিয়া যায়, সেই সকল ঈশ্বরী পাটনী খেয়া দিতেছিল—সুদূর ফরাসী দেশে বসিয়া, নিশীথে

যে দেশ স্মৃতিপ্রায় সেই স্থানে বসিয়া, তিনি বঙ্গের এ সমস্ত সুখস্মৃতি মনে জাগাইতেন; ও না জানি কতই আনন্দ পাইতেন! বাঙ্গালার মেঘমুক্ত শারদাকাশে সায়ংকালের তারা যে কত সুন্দর, তাহা তিনি ভারসেল্‌সে বসিয়া কল্পনানেত্রে দেখিতে পাইতেন! জন্মভূমি সাগরদাঁড়ীর অদূরে, নদীতীরে, বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির নিশাকালে পথিকের মনে যে কি ভাব জাগাইত, কেমন একটী খুমে নয়ন ছাইয়া আসিত, সে সমুদয় তিনি মাসিবপারে থাকিয়াও অনুভব করিতে পারিতেন। ফলতঃ তাঁহার হৃদয় যথার্থই মধুময় ছিল! "বাঙ্গালায় জন্ম বাঙ্গালার জলে, বাঙ্গালার মাটী বাঙ্গালার ফলে" তাঁহার অন্তর-বাহির ভরপুর হইয়া গিয়াছিল।" ইয়োরোপের প্রচণ্ডভাবে উদ্বোধিত মধুসূদন নবাভ্যুদিত "চণ্ড-মুণ্ড" দলের অগ্রণী মধুসূদন—স্বাধীন ছন্দের স্বাধীন ভাবের মধুচন্দা ঋষি মধুসূদন—তাঁহার বৃহৎ প্রাণকে জাতি বৈর-প্রবল স্বাদেশিকতার ক্ষুদ্র গণ্ডীতে বদ্ধ করিয়া পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ও হিংসার উৎপাদন করেন নাই—প্রেম ও জীবজগতে চিরচলিতেছে স্থায়ী অর্ত রাখিয়া যান নাই। তাঁহার নিয়ম-নম্র-পূত আদর্শ ও মহত্বময়তা বঙ্গসাহিত্যে মধুর উজ্জ্বল আলোক প্রদান করিতে থাকিবে। ভবিষ্যতের বঙ্গসন্তান সমস্ত ভারতের আদর্শ স্থানীয় হউক্—বাঙ্গালী জাতি মহীয়ান্ হইয়া গৌরবমণ্ডিত হউক্, ইহাই কবির শ্রেষ্ঠ কামনা, আশা ও বিশ্বাস।

এই বর, হে বরদে! মাগি তব কাছে
জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ-ভারত রতনে।

মহাকবি মধুসূদনের ভেরী নীরব হইয়া গেলে হেমচন্দ্রের বীণা মাঝিত অ.ত্ত করিয়াছিল। ১২৭৭ সালে হেমচন্দ্রের "ভারত সঙ্গীত" প্রকাশিত হইলে দেশে হলস্থুল পড়িয়া গেল। প্রসিদ্ধ সমালোচক স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলিয়াছেন ঃ—

"হেমচন্দ্রের কাব্যে স্বদেশপালন বা স্বজাতিবাৎসল্য নাই বলিলেও হয়। কিন্তু হেমচন্দ্র জাতি-বৈরদলিত দেশভক্তিতে ভরপুর। হেমচন্দ্রের দেশভক্তি কখন রৌদ্ররসে তুলিয়া উঠে নাই। সেই দেশভক্তি শান্ত, করুণ, বীররসে মাখান।"

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে হেমচন্দ্রের প্রভাব বড় কম হয় নাই। তাঁহার স্বজাতিবাৎসল্য ও স্বদেশানুরাগ জাতি বৈর প্রতিষ্ঠিত। এই "কৃষ্ণবর্ণ-জাতি" ভারতগান-শুনাইয়া "শুষ্ক যজ্ঞেশ্বরকে" এক সময় চমৎকৃত করিয়াছিল। পৃথিবীর

লোককে বিস্মিত করিয়াছিল—উৎসাহে তাহাদের হৃদয় পূর্ণ করিয়া দিয়াছিল—তাহারা :

শিখরে শিখরে, জলধির জলে
পদাঙ্ক অঙ্কিত করি ভূমণ্ডলে,
জগৎ ব্রহ্মাণ্ড নখর দর্পণে
তুলিয়া দেখাত মনুজ-সন্তানে,
সমর হুঙ্কারে বাঁধিত অচল,
নক্ষত্র অর্ণব আকাশ মণ্ডল,
তখন তাহারা ঘৃণিত নহে।

স্বদেশানুরাগে মত্ত হইয়া—বীরপদভরে অবনতিকুল কম্পিত করিয়া যখন আর্য্যগণ ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং আর্য্যসভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন, "তখন ভাবা কেমন ছিল?" এখন কোটি কোটি ভারতবাসী। দেব আরাধনা, ঋষিত্ব-তপস্যা প্রভৃতি প্রাক্তনজন-সেবিত পন্থা এখন কার্য্যকরী হইবে না—তাহা নো দিবসাঃ গতাঃ—এখন মন্ত্রবলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না।

যে জাতি-বৈর রঙ্গলালের পদ্যে ক্ষীণভাবে দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা হেমচন্দ্রে মাংস শোণিত-পরিপুষ্ট দেহরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। জগতে একটা নূতন জাগরণ আসিয়াছে—সমস্ত জাতির মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে—"গিরিশৃঙ্গ দেখি জীবন সঞ্চার"—"অসভ্য জাপান"ও বীরজাতি বলিয়া পূজিত হইতে চলিল, কিন্তু "ভারত কেবল ঘুমায়ে রয়।" জাতির অবমাননা—বিধর্ম্মী ও বিদেশীর হস্তে জাতির লাঞ্ছনার কথা স্মরণ করিয়া, কবি তাঁহার তপ্ত-নিঃশ্বাসপ্রসূত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। ভারতবাসীর প্রাণ উদ্দীপিত করিবার—এমন কি সরল সত্য-কথনে উপায় বন্ধ দেখিয়া কবি বলিতেছেন—

ভয়ে ভয়ে লিখি ; কি জানি আমি,
নহিলে শুনিতে এ বীণা ঝঙ্কার,
বাজিত গরজি, উথলি আবার—
ভাঙ্গিত ভারত-ঘুমায়ে ঘোর।

প্রথম বয়সে বাঙ্গালী কবি তাঁহার দেশবাসীর প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিধবার বৈধব্য-যন্ত্রণার কথা ভাবিয়া কবি বলিতেছেন—

অবিলম্বে ভি দুর্গম ছারখার হবে
হিন্দুকুলে বাতি দিতে কেহ নাহি রবে।
দেখনে দুর্গতি যত, চির ম্লেচ্ছ পদানত
বিধবার শাপে হায় এ দুর্গতি হয় রে!

যে বিধবা যমুনার সোণার প্রতিমা গড়িয়া ভারতভূমির স্থানে স্থানে রাখিতে তিনি চাহিয়াছেন—যাঁর মত পতিব্রতা নারী পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমিতেই দেখিতে পাওয়া যায়—তিনি সেই সমাজের—সেই ধর্ম্মের প্রতি অনুরক্তি, সহানুভূতি বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া পড়িলেন! ঈশ্বর গুপ্তের ন্যায় তাঁহার স্খলিখিত ধর্ম্মানুরাগ-জনিত স্বজাতি-প্রেম ছিল না। ঈশ্বর গুপ্তের স্বদেশ-বাৎসল্য নিম্নলিখিত কয়েক ছত্র পদ্যে সুন্দর ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল—

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কত ঘৃণা স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥

আমি যে দেশকে ভালবাসি,—সে দেশ অসুন্দর হইলেও, আমি তাহাকে ভালবাসিব, আমি যে সমাজে জন্মিয়াছি, সে সমাজে দোষ ত্রুটী থাকিলেও তাহার সংশোধনের চেষ্টা করিব কিন্তু তাহাকে ঘৃণা করিব না, যে দেশের অন্নে-জলে দেহ পরিপুষ্ট, যে দেশমাতৃকার স্তন্যপানে আমি বর্দ্ধিত তাঁহাকে উপেক্ষা না করিয়া কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার সেবায় মন-প্রাণ নিয়োজিত করিব —ইহাই ত হইল যথার্থ স্বদেশপ্রেম। দেশবাসীকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিয়া —এমন কি "বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া" "দেশের কুকুর"কে গ্রহণ করিব, হইতে পারে ইহা ধর্ম্ম স্বদেশপ্রেম, কিন্তু ইহা হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে উৎসারিত, অকপট ও শোভন। ইংরাজ কবি বলিয়াছেন—

The naked Negro panting at the line,
Boasts of his golden sands and palmy wine.

উত্তরকালে পরিণত বয়সে হেমচন্দ্রের বীণায় আর এক নূতন সুর বাজিয়াছিল। "বৃত্রসংহার" কাব্য লিখিবার সময় তিনি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অমরগণ স্বর্গরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া পাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। দেবদেবীগণ ক্রন্দন ও অগ্নিমূর্ত্তি বৈশ্বানর শূন্যময় মুহ্ করিতেছেন—দৈব

পত্র-শল্যের প্রশংসা তাঁহাদের মুখে ধরিতেছে না। কিন্তু প্রগাঢ় ধীর-স্থির-প্রকৃতি তাঁহাদের সে ভ্রম ঘুচাইবার জন্য বলিতেছেন—

দেবতেজ, দেব অস্ত্র, দেবের বিক্রম,
বার বার এত যার কর অনুভব,
এতদিন কোথা ছিল? অসুরের সনে
যুঝিলে যখন রণে কবি প্রাণপণে?
কেনই বা ইন্দ্র আজি নিবৃত্তির ধ্যানে,
সঙ্কল্প করিয়া দৃঢ় প্রগাঢ় মানসে,
কুমেরু শিখরে একা কাটাইছে কাল,
কেন সুরপতি বৃথা এ ধ্যান-নিরত?

এই জন্য চাই তপস্যা—চাই আরাধনা—চাই সাধনা। স্বদেশের কল্যাণে, চাই স্বার্থত্যাগ—কঠোর তপস্বী দধিচীর মত পরহিতব্রতে আত্মবলিদান চাই।

দধিচীর প্রতি ইন্দ্রের উক্তিতে কবি বলিতেছেন—

কর্ত্তব্য নরের নিত্য স্বার্থ-পরিহার,
জীবকুল কল্যাণ-সাধন অনুদিন।
পরহিত ব্রত, ঋষি, ধর্ম্ম যে পরম
তুমিই বুঝিয়াছিলে, উদ্যাপিলে আজ।

যীশুখৃষ্টের ন্যায় উদার প্রেমিকের আত্মদেহ বলিদানে—তুচ্ছ স্বার্থ প্রমত্ত প্রেমিকের নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ, ঐশ্বর্য্য ও বিলাস ভোগ বলিদানে—মানবজাতি চিরপ্রুব কল্যাণ-মণ্ডিত হইয়াছিল; দেবহিত-সাধনে-তেজোপুঞ্জ দধিচী ঋষির তপঃপূত পূত পবিত্র দেহ বিসর্জ্জনে দৈত্যকুলের বিনাশ ও স্বর্গ উদ্ধার হইয়াছিল। ইহাই বৃত্রসংহার কাব্যের গভীর উপদেশ—ইহাই হেমচন্দ্রের কবি জীবনের চরম পরিণতি ও উৎকর্ষ।

এই স্থানে আমরা আর এক মহাপুরুষের কথা বলিব। মাইকেলের বৃত্রসংহার কাব্য সিংহাসন যখন শূন্য হইয়াছিল, তখন তিনিই রাজটীকা দিয়া হেমচন্দ্রকে সেই সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসুদের ঋষির ন্যায় দিব্য অনুভূতি ও কল্পনাবলে দেশের ভাবী জাগরণের বাণী আবার "বলেমাতরম" গানে দেশবাসীর কর্ণে ঝঙ্কৃত করিয়াছিলেন—সেই মহিমময়ী বাণীরই কবিপর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছি।

১২৮০ সালের ১১ই কার্ত্তিকের "সাধারণী"তে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

যতদিন দেশী বিদেশীতে বিজিত-জেতৃ সম্বন্ধ থাকিবে, ততদিন আমরা নিরুষ্ট হইলেও, পূর্ব্ব-গৌরব মনে রাখিব, ততদিন জাতি-বৈর ভাব সম্ভাবনা নাই এবং আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, যতদিন ইংরেজের সমতুল্য না হই, ততদিন যেন আমাদের মধ্যে এই জাতি-বৈরভাব প্রভাব এমনই প্রবল থাকে। ০ ০ উন্নত শত্রু উন্নতির উদ্দীপক। উন্নত বন্ধু বিনাশের আশ্রয়। আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমেই ইংরেজের সঙ্গে আমাদের জাতি-বৈর ঘটিয়াছে।"

বঙ্কিমচন্দ্র যে এই জাতি-বৈরভাব সমর্থন করিয়াছিলেন ১২৮০ সালে। তিনি "আনন্দমঠ" লিখিয়াছিলেন ১২৮৮ সালে। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইয়োরোপের আদর্শে সন্তান-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার কল্পনা যাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের উদ্দেশে "আনন্দমঠ" রচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, জাতি-বৈরভাব একটা সীমা আছে। যে রাজারা প্রজা রাখা করে না—যাহাদের রাজত্বে "টাকা রাখিয়া সোয়াস্তি নাই—সিংহাসনে শালগ্রাম শিলা রাখিয়া সোয়াস্তি নাই—ঘরে ঝি-বৌ রাখিয়া সোয়াস্তি নাই—ঝি-বৌএর কোলে ছেলে রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, পেট চিরে ছেলে বার করে"—যাদের আমলে ধর্ম্ম গেল, হিন্দুর হিন্দুয়ানি গেল—তাহাদের "না ভাসাইলে আর দেশের মঙ্গল নাই।" অতএব আমরা দেখিতেছি, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিতে পারা যায় যেন সেই উদ্দেশ্যে সন্তাননিয়ম আবশ্যক; কিন্তু অত্যাচারী দায়িত্বজ্ঞানহীন রাজার হস্ত হইতে দেশকে মুক্ত করিয়া অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করা শ্রেয়ঃ ও মঙ্গলজনক। অনর্থক প্রাণিহত্যা করিয়া প্রয়োজন নাই। আনন্দমঠের প্রধান পুরোহিত—সন্তানগণের প্রধান নেতা সত্যানন্দ— মাতৃরূপা জন্মভূমি-প্রতিমার দিকে ফিরিয়া বোড়হাতে বারংবার ক্রন্দনস্বরে বলিতে লাগিলেন—"মা! তোমায় উদ্ধার করিতে পারিলাম না—আবার তুমি ম্লেচ্ছের হাতে পড়িবে। সন্তানের অপরাধ লইও না।" চিকিৎসক বলিলেন—"সত্যানন্দ, কাতর হইও না। তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের কখন পাপের ফল হয় না। অতএব তোমরা দেশ উদ্ধার করিতে পারিবে না। ০ ০ সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে আগে বহির্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার আবশ্যক। এখন এদেশে বহির্বিষয়ক জ্ঞান নাই—শিখায় এমন লোক নাই। ইংরাজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত;

লোক-শিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরাজকে রাজা করিব। ইংরেজী শিক্ষায় এ দেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে; তখন প্রকৃত ধর্ম্ম আপনা আপনি পুনরুদ্দীপ্ত হইবে। ৩ ৩ যতদিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান্ গুণবান্ আর বলবান্ হয়, ততদিন ইংরেজ রাজা অক্ষয় থাকিবে।" ইহা শুনিয়া সত্যানন্দ—যখন ক্রোধে বলিলেন—"শত্রু-শোণিতে সিক্ত করিয়া মাতাকে শস্যশালিনী করিব", তখন মহাপুরুষ তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন—"চল, জ্ঞান লাভ করিবে চল। হিমালয়-শিখরে মাতৃমন্দির আছে, সেইখানে তোমাকে মাতৃমূর্ত্তি দেখাইব।" বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত বয়সের স্বদেশ-প্রেমিকতা জাতি-বৈরক্তরূপ বিষ হইতে মুক্ত—এই স্বদেশভক্তি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত—স্বধর্ম্মানুমোদিত কর্ম্মে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত।

১২৮২ সালে নবীনচন্দ্রের "পলাশীর যুদ্ধ" প্রকাশিত হয়। "পলাশীর যুদ্ধ" কথনকার যুবকদিগের অতি প্রিয় আদরের সামগ্রী হইয়াছিল। কবির সেই বিখ্যাত উক্তি সময়োপযোগী হইয়াছিল :—

সাধে কি বাঙ্গালী মোরা চির পরাধীন ?
সাধে কি বিদেশী আসি দলি পদভরে
কেড়ে লয় সিংহাসন ? করে প্রতিদিন
অপমান শত শত চক্ষের উপরে ?
স্বর্গ মর্ত্ত্য করে যদি স্থান বিনিময়
তথাপি বাঙ্গালী নাহি হবে একমত ;
প্রতিজ্ঞায় কচ্ছপ, সাহসে দুর্জ্জয় !
কার্য্যকালে খোঁজে সব নিজ নিজ পথ !

এখানে কবি আলেখ্যের ন্যায় বাঙ্গালী-চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর মুখ দিয়া ধূর্ত্ত ও কাপুরুষ কৃষ্ণচন্দ্রের ন্যায় স্বদেশদ্রোহী ব্যক্তিগণকে তিরস্কার করিতেছেন এবং স্বদেশ-উদ্ধারের বিস্তৃত পথ নির্দ্দেশ করিতেছেন। বঙ্গললনার এই তেজোদীপ্ত বাক্যে কোন্ বাঙ্গালীর রক্ত উষ্ণ না হয় ?

ইচ্ছা করে এই দণ্ডে ভীমা অসি করে,
নাচিতে চামুণ্ডারূপে সমর ভিতর।
পরদুঃখে সদা মম শুদয় বিদরে,
সহি কিসে মাতৃদুঃখ ! সত্য, শেঠবর !

স্বাধীনতা উদ্ধারের পন্থা যুবিষ্ঠির
রয়েছে সম্মুখে ছায়াপথের মতন ;
ও স্বপ্নময় নহে ধরি পরিহায়
রবের দীপ্ত গগনে ক্ষুব্ধ বিচরণ।

যুদ্ধক্ষেত্রে মোহনলালের গর্জ্জন—বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি ও যবন সেনার প্রতি তিরস্কার যেন আমাদের কর্ণে অদ্যও ধ্বনিত হইতেছে :—

দেখিছ না সর্ব্বনাশ সম্মুখে তোমার
যায় বঙ্গ-সিংহাসন,
যায় স্বাধীনতা ধন,
ভেসেছে ভাসিয়া সব, কি দেখিছ আর ?

একদিন—একদিন—জন্মজন্মান্তরে
নাহি হই পরাধীন
যবনা অবলিনীর
নাহি সহি যেন নর-পৃথিনীর ভবে !

পলাশির স্বাধীনতা-রত্ন হারাইয়া—অধীনতা অপমান সহ্য করিয়া, পরবলিত হিন্দুজাতির দুর্দ্দশার যেমন সীমা নাই, সেইরূপ মুসলমানগণও হিন্দুজাতির সহিত একই সূত্রে গ্রথিত হইবে সন্দেহ নাই। বীর মোহনলালের মুখ দিয়া, কবি নিজ প্রাণের কথা বলিয়াছেন, পলাশীর রণক্ষেত্রে ভারতের শেষ স্বাধীনতার আশা চিরতরে নির্ব্বাপিত হইল। কবি বলিতেছেন—

নিভাও কি দিনমণি ডুবিবে এবার,
ডুবাইয়া বঙ্গ আজি শোক-সিন্ধুজলে ?
যাও তবে, যাও দেব ! কি বলিব আর ?
ফিরিও না পুনঃ বঙ্গ উদয় অচলে।
কি কাজ কহ না আহা ! ফিরিয়া আবার,
যাবতে আলোক কিছু নাহি প্রয়োজন।
আজীবন কারাগারে বসতি যাহার,
আলোক তাহার পক্ষে যন্ত্রণার কারণ।

চির-স্বাধীনা ভারতমাতা নূতন বিপদে আবদ্ধ হইলেন। বন-বিহঙ্গী পিঞ্জরাস্তরে প্রবেশ করিলে যে দুঃখ তাহার পক্ষে সমান। পাণিপথে যে স্বাধীনতা-রবি

অস্ত গিয়াছিল তাহা পঞ্চশতবর্ষ পরে দূর নীলাচলে একবারমাত্র ঈষৎ কটাক্ষে হাসি হাসিয়াছিল—তাই কবি আশান্বিত হইয়া বলিতেছেন—পলাশীতে যে নিবিড় মেঘ ভারতগগন আবৃত করিয়াছিল, তাহা পুনরায় অপসারিত হইতে পারে, কারণ মেঘের ছায়া অল্পক্ষণস্থায়ী এবং উদয়-অস্ত জগতের নিয়ম।

স্বর্ণপ্রসবিনী ভারতমাতার রূপে মুগ্ধ হইয়া কত বিদেশী কতবার তাঁহার সোণার অঙ্গে পীড়া দিয়াছে, এই কথা ভাবিয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখে কবি বলিতেছেন—

হায়! মা ভারতভূমি! বিদরে হৃদয়,
কেন স্বর্ণপ্রসূ বিধি করিল তোমারে?
কেন মধুচক্র বিধি করে সুধাময়,
পরাণে বধিতে, হায়! মধুমক্ষিকারে?

যদি ভারত-সন্তান নারীসুকুমার ক্ষীণকলেবর না হইত—তাহা হইলে ভারত অদৃষ্টক্রীড়ার রঙ্গভূমি হইত না—তাহা হইলে ভারত-গৌরবসূর্য্য দিগ্‌দিগন্তর উদ্ভাসিত করিত—বাঙ্গালার ভাগ্য অন্যরূপ হইত, কিন্তু তাহা দুরাশা ভাবিয়া কবি প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন। Byron ও ইটালির দুর্দ্দশা দেখিয়া শেষে বলিয়াছিলেন—

Italia! Oh Italia! thou who hast
The fatal gift of beauty, which became
A funeral power of present woes and past,
On thy sweet brow is sorrow plough'd
with shame
And annals graved in characters of flame.
Oh, God! that thou wert in thy nakedness
Less lovely or more powerful,
and could claim Thy right.

কিছুদিন পূর্ব্বে যিনি মিল্টনের Satan এর উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছিলেন—

পরাধীন স্বর্গবাস হতে গরীয়সী
স্বাধীন নরকবাস,

তিনিই আবার "রৈবতকে" আমাদিগকে নূতন কথা শুনাইলেন—

বিশ্বরাজ, দেব বাসুদেব,
রাজসূয় মহাযজ্ঞে। নহে পশুবল
ভিত্তি, কংবা, হে কংসারি! নিয়ম ইহার।
বিশ্বরাজ্য প্রীতিরাজ্য রাজত্ব দয়ার।
[illegible] রাজা, রাজত্ব নীতির।

তিনিই আবার পুণ্য ভারত-ভূমিতে, এক ধর্ম্ম—এক জাতি—এক সিংহাসন স্থাপন করিবার উচ্চ আদর্শের মন্ত্রী বাণী ঘোষিত করিতেছেন—তিনিই আবার খণ্ড ভারতে—রাজ্যভেদ, জাতি-ভেদ-প্রধান স্বার্থগন্ধময় ভারতে—প্রেমময়, প্রীতিময়, পবিত্রতাময় "মহাভারত" স্থাপনরূপ মহাব্রত গ্রহণ করিতে সকলকে উপদেশ দিতেছেন।

এক ধর্ম্ম, এক জাতি, এক রাজ্য, এক নীতি,
সকলের এক ভিত্তি- সর্ব্বভূতহিত;
সাধনা নিষ্কাম কর্ম্ম, লক্ষ্য সে পরম ব্রহ্ম
একমেবাদ্বিতীয়ম্; করিব নিশ্চিত,
এই ধর্ম্মরাজ্য "মহাভারত" স্থাপিত।

সমস্ত ভারতবাসী এক মহাজাতি সঙ্ঘে পরিণত হউক—সর্ব্বভূতহিতরূপ এক ভিত্তিতে সমাজই প্রতিষ্ঠাপিত হোক্—ক্ষুদ্রতা, পশুতা, অপসারিত হউক—ব্যাসের জ্ঞানবল ও ভীমার্জ্জুনের বাহুবল সম্মিলিত হোক্—ভারত আবার জগৎ-সভায় মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইবে—কারণ

ধর্ম্মভিত্তি নাহি যার বালিতে নির্ম্মাণ তার
কি সাম্রাজ্য, কি সমাজ; নিজ পাপভারে
নিশ্চয় পড়িবে ভাঙি কাল-পারাবারে।

ইহাই নবীনচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতির পরিণতি—এই আদর্শ তাঁহার চরম লক্ষ্য—ইহার সাধনা তাঁহার উন্নত কবি-কল্পনার শ্রেষ্ঠ দান।

শ্রীহরিপদ ঘোষাল এম, এ।

গল্প নয়।

সত্য ঘটনা—গল্প নয়।

বিখ্যাত পতিবংশোদ্ভব কেদারপতি চট্টোপাধ্যায় ছিল আমাদের ক্লাসের সিনিয়র ছাত্র। পাঁচবার বি-এ পরীক্ষায় ফেল হয়ে ইংরাজী কাব্য-সাহিত্যে তার ষোল আনা রকম দখল জন্মেছিল। কেদুকে আমরা সেই জন্যে আমাদের দলের সর্দার নির্ব্বাচিত করেছিলেম। লজিকের প্রফেসর আমাদের দলের নাম দিয়েছিলেন, "ব্যাক্ বেঞ্চার্স"। তা ছাড়া, তিনি আমাদিগের উদ্দেশে মাঝে মাঝে "গুল্ড ফুল্স্," "এ সেট অব্ মিশ্চিভাস্ ভ্যাগাবণ্ডস্" প্রভৃতি অনারারি উপাধি বর্ষণ করতেন। কেদু একদিন কয়েক ছত্র ইংরেজী কবিতা টাইপ করিয়ে কতকগুলি কাপি প্রোফেসরদের নামে পাঠিয়ে দেয়। তার পর থেকে লজিকের প্রফেসর চুপ হয়ে গিয়েছিলেন।

A professor once—so runs a certain ditty——
Had crossed the River to this famous city,
To get his grub by the arts of Teaching,
And load young minds with rules of correct speaking,
But, for want of tact, vain was all his skill;
He lost his job, his fortunes sank to lower still.
Until at last, pathetic to relate,
"Poor Professor landed at starvation's gate."

এই কবিতার রচনা নিয়ে প্রফেসরদের মধ্যে বেশ একটু গুরুতর রকমের আন্দোলন হয়েছিল। সকলেই বুঝেছিল যে, এটা কেদুর কাজ; তা ও বাষ্টি-কেট্ করবার যো ছিল না, কারণ রচনাটি টাইপে লেখা ও বেনামী। দু'একজন প্রফেসর ছেলেদের গালাগালি করার কথা উত্থাপন ক'রে অধ্যাপকদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বাদানুবাদ আরম্ভ করেন। শেষে একজন প্রফেসর বখন কাগজ-সমেত কবিতাটি টিকটিকি পুলিশে পাঠিয়ে দেবার প্রস্তাব করলেন, তখন বিদ্রূপ

মহাশয় তখন মাঝে প'ড়ে সকলকে থামিয়ে দিলেন। তিনি বল্লেন, একটা দুষ্টু ছেলে না হয় বিদ্রূপ করে একটা কবিতা লিখছে, তাতেই কি একেবারে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল। দেশের মধ্যে যারা মোড়লী ক'রে সস্তায় নাম কেনবার চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করে, তাদেরকে আগে বেঞ্চিতে দাঁড় করালে তবে স্কুল-মহলে ঐ দুষ্টু ছেলেরা ঠাণ্ডা হবে। বাবুরা নিজেদের পকেট থেকে এক নয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করবেন না, কেবল বক্তৃতা ক'রে নিজেদের আওল চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়ে শিক্ষক ও ছাত্রগণকে গুঁড়িয়ে মারতে চান। মাতৃঋণ পরিশোধ না ক'রে যারা নিজেদের কর্ম্মী তৈরি করে তারা—"

পণ্ডিত মহাশয়রা চিরকাল ছাত্রদের যথার্থ বন্ধু। আমাদের পণ্ডিত মশায় এই ভাবে উদ্ধত পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তখনকার মত দুষ্টু ছেলের দলকে টিপ্‌টিপিনি ভয় থেকে বাঁচালেন বটে, কিন্তু ব্যাক্ বেঞ্চারদিগকে তিনি নিজের বাড়ীতে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাদের সামনে কেষ্টকে খুব ভৎর্সনা করলেন। "তুই হতভাগা বাপ ঠাকুরদা'র অবাধ্য, গুরুজনকে অপমান করতে ছাড়িস না, তোর দশা এর পর হবে কি? কলেজের পড়া শেষ ক'রে মোড়লদের দলে ভিড়ে ভাঁড়ামী করতে শিখলি, আর তখন হয়ত একদিন বদরাগী কোনও ছাত্রের হাতে মার খেয়ে মরবি। বুড়ো হয়ে গেলি তবু বি-এ পাশ করতে পারলি না, তোর ভাগ্যে বুঝি বিয়েও বিয়ে হেখেন নি!" কেষ্ট সহজে দ'মে যাবার ছেলে নয়। সে বল্ল, পণ্ডিত মশায়, জানে যা-ই বলুন,—

"Tell me not in mournful numbers,
Wife is but an empty dream,
For the man is dead that bachelors,
And things are just what they seem!'

কেষ্ট সেবারেও বি-এ পরীক্ষায় ফেল হয়েছিল। তবে, পরীক্ষার ফল বেরোবার আগেই 'বিয়ে'র পাশ পেয়েছিল। সে আর পড়লে না। তার শ্বশুরের একটা চাপাখানা ছিল, সেখানে সে ম্যানেজারি কাজে নিযুক্ত হ'ল। আমরা বি-এ পাশ ক'রে বি-এল পড়তে গেলাম।

চার বছর কেটে গেল। শ্রীযুক্ত কেষ্টপতি চট্টোপাধ্যায় ছ'টাকা থেকে পাঁচ টাকা দামের যতগুলি উপাধি বাজারে পাওয়া যায় সেগুলি সোগাড় ক'রে এই ক'বছরের মধ্যে একজন নামজাদা সাহিত্যিক হয়ে উঠেছেন। আমি বি-এল

পাশ করবার পর মুরুব্বি ও আপনার লোকের অভাবে এ আমিও, সে সামান্যতঃদূরের কলুর চোখ-ঢাকা সেই এডিশন্যাল তীর্থের মত হয়ে দাঁড়ালেম। একদিন নিজের উপর শুধু শুধু বিরক্ত হয়ে সাহিত্যাকাশের নবোদিত উপগ্রহ কেদারপতি চাটুয্যের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সে ত আমাকে অনেক দিনের পরে পেয়ে খুব আদর ক'রে তার আপিস ঘরে বসালে। পুরাতন অনেক জিনিষের মত কৌতুক সহিত বাক্যালাপ তখন বেশ সুখিসুখকর হয়েছিল। আমার মনে হ'ল কেদার ছাত্র-জীবনের দোষগুলি ঢেকে দিয়ে খাঁটি স্বদেশভক্ত হয়েছে। সে একটা কি লিখেছিল, আমার হাতে কাগজখানা দিয়ে বল্লে "নিমচাঁদ, দেখেছো আমি কবিতার ভিতর দিয়ে কেমন ফুটে বেরুচ্ছি?" সেই অসমাপ্ত কবিতার নাম "বঙ্গভূমির প্রতি।'

"রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি সর্ব্বনেশে?
সাধিতে মনের সাধ,
ঘটিবে না পরমাদ,—
চৌষট্টি হাজার নাগো বাঁধা আছে বাজকোষে!
যদি গো দৈবের বশে
সচিবত্ব পড়ে খ'সে
অদৃষ্ট-আকাশ হ'তে, বড় খেদ তাহে।
এত বাক্য ক'রে দান,
পাইব না প্রতিদান?
শুখাবে কি বঙ্গদের নীর বাজস্বের মদে?"

আমি একটু হেসে বল্লেম, "বাঃ! মৎকার!"

কেদার। নিমচাঁদ, তুমি এতদিন আমার সঙ্গে দেখা করনি কেন?

আমি। বি-এল পাশ ক'রে আলিপুর-ঘর করছিলাম, এ পর্য্যন্ত প্রাক্‌টিস জমাতে পারলেম না। সম্প্রতি ট্রামের লোকেরা ধর্ম্মঘট করাতে ভবানীপুর থেকে আলিপুর পর্য্যন্ত রাস্তাটা আমার পক্ষে দুর্গম হয়েছে, তাই তোমার আপিসে হেঁটে এসেছি।

কেদার। প্রাক্‌টিস্ জমাতে না পারবার কারণটা কি? দাদা যে কি কোন এপারেশানের দলে মিশে ধর্ম্মঘট ক'রে আদালতে যাওয়া বন্ধ করেছে?

আমি। না না, তা নয়। উকিলের প্র্যাক্টিস্ জমাতে গেলে প্রথমতঃ সাহেবী-পোষাক পরতে হবে। আমি এই স্বদেশীর যুগে নিজেকে কিছুতেই ফ্যাশনেব্‌ল্ করতে পারব না।

কেষ্টা। তবে তোমার তারা ওকালতি করতে দেবে না। হাকিমী পোষাক আমাও তোমাকে ছাড়তে হবে। সোভেন্ কিম্বা টি দিকে পরলে চলবে না, ও সাহেবী পোষাক হবে। কটি বটিক্ লোহ-চাপ প্রভৃতি করতে হয়, তবে ইংরিজি রকম থাকবে। অর্থ ও সম্মান এক সঙ্গে পেতে হলে ভাঁড়ু-পন্থা ধরতে হবে।

আমি। আর এক কাজ করলেই ত হয়। সে দিনের মোকদ্দমার জন্য পুলিশের চর মাজা হাতে করে ছাদের আলসের ধারে দাঁড়িয়ে থাকে না।

কেষ্টা। তা করলে কি? হাকিমের পোষাকেই যদি সাহেবের বর্ণিত উপায় করা যায় তাতে অন্যায়টা কি হল? আর পুলিশের চর সাধু অর্থে রাজভক্তের কর্ত্তব্য পালন করা।

আমি। তুমি বলতে চাও যে, বাঙ্গালী এখন পর্য্যন্ত কোন ছবির যোগ্য হয়ে আছে।

কেষ্টা। মেয়েদের ছবি দেখতে ভালবাসে। অন্তঃপুরে তার নমুনা দেখতে পাবে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্যে তার আদর নাই।

আমি। তা বটে—মেয়েদের প্রাচীন আদর্শ সেড্-হাইট্ নাই। এখনকার উন্নত আদর্শ বর্ণবৈচিত্র্য ও আলোক-ছায়ার আধিক্য বাঙ্গালীকে লভ্য হয়ে রয়েছে। তখনকার দিনের ঠাঁয়ির দল বর্ত্তমান সময়ে ভেজাল খাদ্যের প্রস্তুতকারক হয়েছে।

কেষ্টা। সে যা হ'ক, তুমি যখন ওকালতীতে সুবিধা করতে পারলে না তখন গল্প লিখতে শেখ না কেন? গল্পের কাছে থেকে গেরস্ত যেমন কিছু দুধ পেয়েই থাকে সেই রকম গ্রন্থকার যে একেবারে কিছু লাভ করে না এ কথা বিশ্বাস করা যায় না।

আমি। গল্প কি ক'রে লিখতে হয় তা ত জানি না।

কেষ্টা। আমি পাঁচ মিনিটে তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। কেষ্টর কথা শুনে আমি তার মুখের দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলেম। সে হাইটিং টেম্পলের সেরাজ থেকে একখান আমেরিকান ডিটেক্‌টিভ্ গল্পের বই টেনে বার ক'রে আমাকে বুঝাতে লাগল যে, সেই বইখানার ঘটনাবলী বজায় রেখে পাত্র

পাত্রীদের নাম ধাম বদলাইয়া একেবারে খাঁটি বাঙ্গালা দেশের জিনিষের মত ক'রে নিলে গড্ডলিকা শ্রেণীর পাঠক কিছুতেই বুঝতে পারবে না যে, বাঙ্গালা পোষাক-পরা গল্পটি লেখকের কল্পনার সৃষ্টি নয়। কেঁদু আমাকে গল্পলেখা সম্বন্ধে আরও কয়েক ডোজ্ পরামর্শ দিয়ে বিদায় করলে। তার কথা শুনে আমার কৌতূহল এমন বেশী মাত্রায় বেড়ে উঠল যে, আমি বাড়ী ফেরবার পথে মিসেস হেনরী উডের "ইষ্টলিন্" নামে সুবিখ্যাত পুস্তকখানি কিনলেম। মাস কতক দিন রাত খেটে "ইষ্টলিন" থেকে বেশ একটি মনোরম গল্প নিংড়ালেম। তার পর শ্রীযুত কেদারপতি চট্টোপাধ্যায় সাহিত্য-সুধীর মারফৎ সেই গল্পটি কলিকাতার একখানি সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকায় ছাপানর জন্য সম্পাদকের নিকট পাঠিয়ে দিলেম। তিন চার মাস পরে কেঁদুর মুখে শুনলেম গল্পটি সম্পাদকের পছন্দ হয়েছে, সামনের মাসে ছাপান হবে। আরও তিনমাস কেটে গেল। শেষে শুনলেম আমার গল্প ছাপান হবে না, কারণ ঠিক সেই রকম আর একটি গল্প বেনামা কোনও লেখক পূর্ব্বমাসে"————তে" বাহির করেছে। কেঁদু আমাকে বোধ হয় সান্ত্বনা করবার জন্যে বল্লে,—"নিমচাঁদ, প্লেজিয়ারি অর্থাৎ লিপি-তস্করের ব্যবসা আমি ভাল রকম জানি, কিন্তু লিপি-বাটপাড়ের মতের নমুনা তোমার এই গল্প ছাপানর ব্যাপারে দেখতে পেলাম। আমি যদি কখনো একখানা মাসিক পত্রিকার সম্পাদক হ'তে পারি তা হ'লে লিপি-তস্করতা ও লিপি-বাটপাড়ি "কাইন আর্ট" হিসাবে অনুশীলন ক'রব।

নিরুপায়!

বঙ্গভূমি!

১

তোমার শ্যামল বঙ্গভূমি উপমা যে নাহি গো তাহার,
এমন স্নেহের বন্যাধারা দৃশ্য-মাঝে কোথায় গো আর!
আকাশ হেথা মুক্ত উদার, প্রভাত হাসে অরুণরাগে,
তারার মালা কণ্ঠে পরি সন্ধ্যা হেথা নিত্য জাগে।
শিশির-সিক্ত দূর্ব্বাদলে লিপ্ত যত রত্নমণি,
হীরে হেথা বর্ষাজলে মোতির শত বর্ষিনি।

স্পর্শনে যার মুক্তি জাগে, পবিত্রতায় পুণ্য আঁধার,
আমার শ্যামল বঙ্গভূমি উপমা যে নাই গো তাহার।

২

পল্লীবাটে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী সদা বিরাজ করে,
অন্ন-থালা হস্তে লয়ে, অন্নদা মায় ঘরে ঘরে।
নদীবনী সুধার ধারা চুকুল প্লাবি মন্দগতি,
চড়ায় হেথা মন্দাকিনী, পদ্মা, বেবা সরস্বতী।
আকুল করা তমাল তলে মত্ত ময়ূর হর্ষে নাচে,
বন্যমৃগ গানে পাগল মুগ্ধ মৃগীর স্পর্শ যাচে।
সৌরভেতে পূর্ণ করা মুক্ত অমিয় বায় অনিবার,
আমার শ্যামল বঙ্গভূমি উপমা যে নাই গো তাহার।

৩

ধূসর হেথা ভূধরশ্রেণী শৃঙ্গেতে তার তুষার ক্ষরে,
ও পাশেতে বয় স্রোতস্বিনী উদ্ভাসিত সূর্য্যকরে।
অম্বুরাশি বাঁধন মানে কোনদিন যারা সিন্ধু হেথা,
নেয় না আঁকি দেয় কি গভীর বিরাট মহান্ অসীমতা।
সপ্তবর্ণ রং ফলায়ে ইন্দ্রধনু ফুটে হাসে,
দিগ্‌দিগন্ত পূর্ণ হোথা শিউলী-বকুল-কুন্দ-বাসে।
মঞ্জুরিত চূতাঙ্কুরে মত্ত ভ্রমর গায় অনিবার
আমার শ্যামল বঙ্গভূমি উপমা যে নেই গো তাহার।

৪

সজল হেথা মেঘের কোলে সৌদামিনী বেড়ায় ছুটে,
বিমল সরিৎ তড়াগনীরে সোনার কমল পদ্ম ফুটে।
বটের মূলে নদীর কূলে পথিক হেথা শ্রান্তি হরে,
রাখাল হেথা বাজায় বাঁশি শারদ চাঁদের শুভ্র করে।
সন্ধ্যা হেথা শঙ্খময়ী সন্ধ্যাবতির কলুষহরে,
মগ্ন সদা দিগঙ্গনা প্রসাধনের মহোৎসবে।
বিহগ হেথা দেয় ছড়ায়ে কণ্ঠে তাহার সুধা অপার
আমার শ্যামল বঙ্গভূমি উপমা যে নাই গো তাহার।

শ্রীসুধাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালী।

অনেক দিন হইতেই বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি-নিরূপণ-ব্যপদেশে গবেষণা-নিরত কতিপয় ব্যক্তির উচ্ছৃঙ্খল লেখনীর অকাণ্ড তাণ্ডব পরিলক্ষিত হইতেছে। ইঁহারা গূঢ় বাগ্‌বুদ্ধির প্রলোভনে নিজের সঙ্কীর্ণতা স্বীকার করিয়াও অন্তে বাঙ্গালী জাতির উপরেই অনার্য্য-সাঙ্কর্য্যের আরোপ করিতে প্রযত্নের ত্রুটি করিতেছেন না। যদিও তাঁহাদের যুক্ত্যাভাস, তর্কাভাস পদপদার্থবিৎ প্রমাণাদি-মনীষিবৃন্দের নিতান্তই হাস্যাস্পদ, তথাপি স্বজাতিবিবরণানভিজ্ঞ পদ্য-প্রত্যয়-নেয়-বুদ্ধি আনুষঙ্গিক পুরুষগুলী ইঁহাদের মতের উপর আস্থা-স্থাপনবশতঃ নানা-প্রকার কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া, সমাজের সংস্কার ব্যপদেশে সমাজকে "সত্ত্ব" করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। অতএব এ সময়ে নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া সমাজ-হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই যথাশক্তি বাঙ্গালীর স্বরূপ প্রকটন একান্ত আবশ্যক।

বাঙ্গালীর স্বরূপ বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ বঙ্গদেশ যজ্ঞীয় কি অযজ্ঞীয়, উহা আর্য্যদেশ কি ম্লেচ্ছদেশ, এই বিষয়ের অনুকূল প্রতিকূল প্রমাণাবলীর উপন্যাস করিতে হইবে।

মিতাক্ষরাপ্রভৃতিনিবন্ধে একটি দেবলের বচন ধৃত হইয়াছে, তাহার অর্থ হইতে বুঝা যায় যে, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র ও মগধ এই কয়টি দেশে তীর্থ-স্নানের অভিপ্রায় ব্যতীত গমন করিলে পুনর্ব্বার সংস্কার অর্থাৎ উপনয়ন করিতে হয়।* সুতরাং এই সকল দেশে ব্রাহ্মণাদি বাস করিতে পারেন না; যাঁহারা বাস করিতেছেন, তাঁহারা ত পতিতই হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের আর অভি-শপ্তিত সমাজের সহিত সম্পর্ক কতটুকু? এই আশঙ্কা নিরাস করিতে হইলে দেশবিশেষের দোষগুণবোধক প্রমাণাবলীর প্রদর্শন আবশ্যক এবং তাহাও পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত।

দেবলের মতে কয়টি মাত্র দেশ অগম্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু গৌত-মের বচনে আরও অনেকগুলি দেশ অপবাদশ্রেণীভুক্ত দেখা যায়। তাঁহার মতে

* অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র-মগধেষু চ। তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥

অবন্তি, অঙ্গ, মগধ, সুরাষ্ট্র দক্ষিণাপথ, উপাবৃৎ, সিন্ধু ও সৌবীর, এই সকল দেশ সঙ্কীর্ণ যোনি, অর্থাৎ এই সকল দেশে অধিকসংখ্যক সঙ্করজাতি বাস করে, অথবা উৎপন্ন হয়। আবন্ত্য, কারস্কর, পুণ্ড্র, সৌবীর, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও প্রানূন, এই সকল দেশে গমন করিলে পুনরায় স্তোমযাগ অথবা সর্ব্বপৃষ্ঠা ঋকের দ্বারা হোম করিবে।*

প্রায়শ্চিত্তবিবেকে নিন্দিত দেশে গমনের প্রায়শ্চিত্তবিধান-প্রসঙ্গে বায়ু-পুরাণোক্ত কতকগুলি নিন্দিত দেশের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা,—

"পারস্কর কলিঙ্গেষু ওড্রাক্ষ্রমগরেষু চ।
পীত্বা চাপো ভূমিনরে গত্বা চৈব যুগদ্বয়ম্॥

ইত্যাদ্যভিধায়োক্তং—

আরুহ্য ভৃগুতুঙ্গন্তু গত্বা পুণ্যাং সরস্বতীম্।
যমুনাঞ্চ নদীং পুণ্যাং গঙ্গাং দেবীং মহানদীম্॥
হিমবৎ প্রভবা লঙ্কো মানসাচ্চ্যা ঋষিপূজিতাঃ।
সরস্সিরোমি-সম্ভেদা নদানাং স্বরসাস্তথা॥
এতৈস্তান্ মুচ্যতে পাপৈঃ স্বর্গং চানন্ত্য মশ্নুতে।

পারস্কর, কলিঙ্গ, ওড্র, অক্ষ্র, মগধ ও ভূমিনর এই সকল দেশে জলপান করিলে এবং যুগদ্বয় দেশে গমন করিলে যে পাপ হয়, তৎক্ষালনার্থ পর্ব্বতের উচ্চভাগারোহণ, পবিত্র সরস্বতী নদীতে গমন, যমুনা গঙ্গা মহানদী হিমালয় হইতে উৎপন্ন অন্যান্য ঋষিপূজিত নদী মানসসরোবর নদের এবং সরোবরের সঙ্গম, এই সকল পুণ্যস্থলে স্নান করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হয়, এবং অনন্ত স্বর্গ প্রাপ্ত হয়।

ইহার পরেই প্রায়শ্চিত্তবিবেকে দেবল-বচন পঠিত হইয়াছে, এবং বচন-গুলির তাৎপর্য্য বর্ণিত হইয়াছে। যথা,—

"সিন্ধুসৌবীরসৌবীরাংস্তথা প্রত্যন্তবাসিনঃ।
অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাংশ্চ গত্বা সংস্কার মর্হতি॥

---

* অবন্ত্যোঙ্গ মগধাঃ সুরাষ্ট্রাদক্ষিণাপথাঃ।
উপাবৃৎ সিন্ধু সৌবীরা এতে সঙ্কীর্ণ-যোনয়ঃ॥
আবন্ত্যান্ কারস্করান্ পুণ্ড্রান্ সৌবীরান্ বঙ্গকলিঙ্গান্ প্রানূনা
গত্বা পুনস্তোমেন যজেত সর্ব্বপৃষ্ঠয়াবা। ১৯শ। ১অ। ৩২।

তীর্থযাত্রাব্যতিরেকে প্রতীচ্যে গঙ্গা প্রভৃতি চিরমুক্তিদা নদীবিশেষং প্রাপ্য চিরং তদশক্তৌ পুনরুপনয়নম্। অতিচিরবাসে পুনরুপনয়নং কৃত্বা সর্ব্বপাপক্ষয়ার্থন্তেন চান্দ্রায়ণং কর্ত্তব্যমিতি।*

তীর্থযাত্রা-ব্যতিরেকে যদি সিন্ধু প্রভৃতি দেশে গমন করে, এবং এই সকল দেশে চিরকাল বাস করে, তবে গঙ্গাপ্রভৃতি নদীতে গমন অর্থাৎ প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে; যদি তাহাতে অসমর্থ হয়, তবে পুনর্ব্বার উপনয়ন কর্ত্তব্য। অতিদীর্ঘকাল বাস করিলে পুনর্ব্বার উপনয়নের অনন্তর সর্ব্বপাপক্ষয় নিমিত্ত চান্দ্রায়ণ কর্ত্তব্য।

মহর্ষি-মনুর মতে সরস্বতী ও দৃশদ্বতী এই নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী দেশ ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে অভিহিত। সেই দেশে লোকপরম্পরা-প্রসিদ্ধ যে আচার চলিয়া আসিতেছে, সেই আচারই চতুর্ব্বর্ণের এবং অন্তরাল জাতির পক্ষে সদাচার বলিয়া কথিত হইয়াছে।

কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল ও শূরসেন, এই কয়টি দেশ ব্রহ্মর্ষিদেশ নামে কথিত। এই সকল দেশ ব্রহ্মাবর্ত্তাপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীন।

উক্ত কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি দেশে উৎপন্ন ব্রাহ্মণের নিকট হইতে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জাত মানবগণ স্ব স্ব জাত্যুক্ত আচরণ শিক্ষা করিবে। হিমালয় ও বিন্ধ্য এই পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সরস্বতী নদীর অন্তর্ধান দেশের পূর্ব্বে এবং প্রয়াগের পশ্চিমে যে ভূভাগ অবস্থিত, সেই দেশ মধ্যদেশনামে অভিহিত, অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ও নয় নিকৃষ্টও নয়।

পূর্ব্বসমুদ্র পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী পূর্ব্বোক্ত বিন্ধ্য-হিমালয় পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যভাগে অবস্থিত ভূভাগ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক আর্য্যাবর্ত্ত নামে অভিহিত হইয়াছে।

কৃষ্ণসার নামক মৃগ যে দেশে স্বভাবতঃ বিচরণ করে, সেই দেশ যজ্ঞক্রিয়ার উপযুক্ত, অন্য দেশ ম্লেচ্ছদেশরূপে গণনীয়।

দ্বিজাতিগণ যত্নপূর্ব্বক এই সকল যজ্ঞার্হ দেশ আশ্রয় করিবেন। এই সকল দেশে জীবিকা নির্ব্বাহে অসমর্থ শূদ্র যে কোন দেশে বাস করিতে পারে।

---

* সরস্বতীদৃশদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেব-নির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥
তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্য-ক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥
কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষি-দেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ॥

ভাষ্যকার মেধাতিথি বলেন, আর্য্যাবর্ত্ত এই নামটি সহেতুক, আর্য্যগণ এই দেশে বর্ত্তমান থাকেন, অর্থাৎ বারবার উৎপন্ন হন, ম্লেচ্ছগণ বারবার আক্রমণ করিয়াও এই দেশে চিরকালস্থায়ী হইতে পারে না। * তিনি আরও বলিয়াছেন যে, কৃষ্ণসার-বিচরণযুক্ত দেশের যাগার্হতা কীর্ত্তন অনুবাদমাত্র। এই সকল দেশে প্রায়ই যাগোপকরণ দর্ভপলাশ খদির প্রভৃতি হইয়া থাকে, সঙ্গে সঙ্গে অধিকারী ত্রৈবর্ণিক কৃতবিদ্য সাধুদিগকে এই সকল দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। [এতদতিরিক্ত দেশকে যে ম্লেচ্ছদেশ নামে অভিহিত করা হইয়াছে, সে কথাও অনুবাদমাত্র। যেহেতু এই সকল দেশে প্রায় ম্লেচ্ছজাতিই অবস্থান করে। উক্ত দেশের সমর্থনার্থে হেতু বলা যাইতে পারে না; কারণ ব্রাহ্মণাদির ন্যায় ম্লেচ্ছ জাতিও স্বতঃ প্রসিদ্ধ। অযের দ্বারা এই শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ম্লেচ্ছের দেশ ম্লেচ্ছদেশ। যদি কখনও ম্লেচ্ছগণ ব্রহ্মাবর্ত্তপ্রভৃতি দেশও আক্রমণ করে এবং সেই দেশেই অবস্থান করে, তবে ইহাই ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া গণ্য হইবে। পক্ষান্তরে যদি সদাচারসম্পন্ন কোনও ক্ষত্রিয়াদি রাজা ম্লেচ্ছদিগকে পরাজিত করিয়া, সেই দেশে চাতুর্বর্ণ্যের বাসব্যবস্থা করেন, এবং ম্লেচ্ছদিগকে আর্য্যাবর্ত্তবাসী চণ্ডালের ন্যায় ভিন্ন পল্লীতে স্থাপিত করেন, তবে সেই দেশও যজ্ঞীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে। যেহেতু ভূমি স্বভাবতঃ দুষ্ট নহে, সংসর্গ দোষেই ভূমি দুষ্ট হইয়া থাকে, যেমন অমেধ্য (বিষ্ঠা মূত্রাদির) সংযোগে ভূমি দুষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়, অতএব যজ্ঞীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট দেশ ব্যতিরেকেও

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥
হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যং যৎপ্রাগ্বিনশনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগস্য মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বা দাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ॥
কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ।
স জ্ঞেয়ো যজ্ঞিয়ো দেশঃ ম্লেচ্ছদেশস্ততঃপরঃ॥
এতান্দ্বিজাতয়ো দেশান্ সংশ্রয়েরন্ প্রযত্নতঃ।
শূদ্রস্তু যস্মিন্ কস্মিন্ বা নিবসেদ্বৃত্তি কর্ষিতঃ॥ ২।১—২৪

* আর্য্যাবর্ত্তে তত্র পুনঃপুনরুদ্ভবন্তি আক্রম্যাপি ন চিরং তত্র ম্লেচ্ছা স্থাতারো ভবন্তি। ২।২২

উপকরণ-সংগ্রহ হইলে, ত্রৈবর্ণিকগণ কর্ত্তৃক কৃষ্ণমৃগ-বিচরণ-সম্পর্কিয়া যে যেখানে যজ্ঞানুষ্ঠান সম্ভব হয়, অতএব ইহা অনুবাদমাত্র। ৩

২৪ শ্লোকের টীকায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, "দ্বিজাতিগণ এই সকল দেশ আশ্রয় করিবেন, অত্রত্য দ্বিজাতিগণের দ্বারা সূচিত হইয়াছে যে, ম্লেচ্ছের সম্বন্ধ ব্যতীত স্বভাবতঃ কোনও দেশই ম্লেচ্ছ দেশ নহে। যদি দেশের সম্বন্ধবশতঃই ম্লেচ্ছত্ব হয়, তবে তাহাদের দ্বিজাতিত্ব কি প্রকারে সম্ভব হয়? যদি বল গমনমাত্রে ম্লেচ্ছত্ব হয় না, কিন্তু দেশে বাস করিলেই ম্লেচ্ছত্ব হয়, তাহাই এইস্থলে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, সে কথাও বলিতে পার না। কারণ সংগ্রহের কথাই শুনা যাইতেছে, দেশান্তরে জাত ব্যক্তিকর্ত্তৃক জন্মদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশান্তরের প্রাপ্তিই সংশ্রয় শব্দের অর্থ। সংশ্রিতের সংসর্গ হইতে পারে না, অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেই ব্যক্তি সেই দেশ পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে না যাওয়া সংশ্রয়ণ শব্দের অর্থ নহে, যদি তাহাই অভিপ্রেত হইত, তবে শাস্ত্রকার এইরূপই নির্দ্দেশ করিতেন, "এই সকল দেশ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করিবে না।" অতএব বুঝিতে হইবে যে, দেশের সম্বন্ধে পুরুষ ম্লেচ্ছ হয় না, প্রত্যুত পুরুষের সম্বন্ধেই ম্লেচ্ছদেশত্ব সম্ভব হয়। †

---

* এতেষু দেশেষু যাগাঙ্গানি দর্ভপলাশবদিরাদীনি প্রায়েণ চ সন্তি।

ঋষিকা ব্রাহ্মণশ্চ ত্রৈবর্ণিকা বৈদ্যাশ্চ ভেষেষু দেশেষু দৃশ্যন্তে। অত এতদ্বলবদ্বচনাবগতিরেব ইহ শরণম্। যচ্চোক্তং ম্লেচ্ছদেশত্বতঃ পর ইত্যেষোপি প্রায়িকোঽনুবাদ এব। প্রায়েণ যে যেষু ম্লেচ্ছা ভবন্তি তত্তেন দেশসম্বন্ধেন। ম্লেচ্ছা বক্ষ্যন্তে। স্বতন্ত্রেষাং পরিভাষেত্রাপ্রসিদ্ধেঃ তত্র সর্ব্বত্রযোগঃ শব্দঃ প্রবৃত্তো ম্লেচ্ছানাং দেশ ইতি। তত্র যদি কাশ্চিদ্দেশাবর্ত্তিনোঽপি ম্লেচ্ছা ভবেয়ুঃ, আর্য্যেরন্, তত্রৈবাবস্থানং কুর্যুর্ভবেদেবাসৌ ম্লেচ্ছদেশঃ।

তত্রার্য্যা কশ্চিৎ ক্ষত্রিয়াদিজাতীয়ো রাজা সাম্প্রতিচরণো ম্লেচ্ছান্ বিজয়েত, চাতুর্বর্ণ্যং ম্লেচ্ছেষ্বপ্যাস্তীব চাণ্ডালান্ ব্যবস্থাপয়েৎ, সোপিস্যাদ্ যজ্ঞীয়ঃ। যতোনভূমিঃ স্যাদ্ ভূরি সংসর্গাদিদোষানুবাত্যমেধ্যোপহতেব। অত উক্তদেশ ব্যতিরেকেণাপি সাতি নামকো ম্লেচ্ছদেশো ন ভবতি। ন হ্যপি দেশে দুষ্টব্য এব, তস্মাদনুবাদোঽয়ম্। ২।২৩

† ন চ দ্বিজাতয় ইতি বচনং লিঙ্গং ন ব্যক্তিরেব দেশোঽসতি ম্লেচ্ছ সম্বন্ধে শুদ্ধ এব দেশঃ। ন চাপি তদ্দেশ সম্বন্ধাদ্ ম্লেচ্ছত্বে যথং দ্বিজাতিত্বং। অথোচ্যেত ন যদ্দেশ যাজ্যান্ ম্লেচ্ছন্না, অপিতু নিবাসাৎ সম্বন্ধেন প্রতিষিধ্যতে। উচ্যতে ন, সংশ্রয়োত্র শ্রুয়তে ন চ দেশান্তর ভবত স্তস্যায়ং ম্লেচ্ছদেশসম্বন্ধো ন সংশ্রিতস্যৈব সংশ্রয়ণম্। অন্যথা এবমেবাবশ্য দেভাদ্ দেশান্ত্যঃ। নাস্তত্র নিবসেৎ।.....অতএব ন ভূতপূর্ব্বগতি স্তস্মান্নিত্য মিদং ন দেশসম্বন্ধেন পুরুষ ম্লেচ্ছঃ কিং তর্হি পুরুষসম্বন্ধেন ম্লেচ্ছদেশতা। ২।২৫

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে—হে মুনিগণ! যে দেশে কৃষ্ণমৃগ স্বভাবতঃ বিচরণ করে, সেই দেশ শ্রৌতস্মার্ত্তধর্ম্মের অনুষ্ঠেয়তা অবগত হও। * অপরার্ক বলেন—ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রভৃতি দেশের অসম্ভব হইলে কৃষ্ণ মৃগোপলক্ষিত দেশ যাগাদি বলিয়া বিবেচনীয়। †

পুরাণে ব্রহ্মাবর্ত্তাদি আর্য্যাবর্ত্তান্ত দেশের উত্তরোত্তরাপেক্ষা পূর্ব্ব পূর্ব্ববর্ত্তীর শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে।

বিষ্ণুসংহিতায় আর্য্যাবর্ত্তের অন্য প্রকার লক্ষণ কথিত হইয়াছে। যথা—যে দেশে চাতুর্বর্ণ্য ব্যবস্থা নাই, অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদ নাই, সেই দেশকে ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া জানিবে। তদতিরিক্ত দেশকে আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া জানিবে। অতএব যে দেশে চাতুর্বর্ণ্যব্যবস্থা নাই, কৃষ্ণমৃগও বিচরণ করে না, সেই দেশ ম্লেচ্ছদেশ, পক্ষান্তরে তদতিরিক্ত দেশ ধর্ম্মদেশ বলিয়া গণনীয়। সুতরাং ধর্ম্মাভিলাষী মানবগণ ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রভৃতি দেশচতুষ্টয়ে বাস করিতে না পারিলে, চাতুর্বর্ণ্যব্যবস্থান্বিত কৃষ্ণমৃগবিচরণশালী দেশে বাস করিবেন। তদসম্ভবে কেবল চাতুর্বর্ণ্যব্যবস্থান্বিত দেশে অথবা কেবল কৃষ্ণমৃগচরণযুক্ত দেশে বাস করিবেন। ‡

মনুস্মৃতির উপজীব্যত্বেই অন্যান্য স্মৃতির উৎপত্তি হইয়াছে। কারণ অধিকাংশ স্মৃতিতে প্রায়ই "ভগবান্ মনুরব্রবীৎ, ইত্যাহ ভগবান্ মনুঃ" ইত্যাদিরূপে মনুর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

বৃহস্পতি বলিয়াছেন যে, মনু বেদার্থের উপনিবন্ধন করিয়াছেন; সুতরাং মনুস্মৃতির প্রাধান্য বুঝিতে হইবে, পক্ষান্তরে মনুস্মৃতির বিরুদ্ধবাদী স্মৃতি

---

* যস্মিন্ দেশে মৃগঃ কৃষ্ণ স্তস্মিন্ ধর্ম্মান্নিবোধত। ১।২।

† কৃষ্ণমৃগোপলক্ষিতশ্চ দেশো ব্রহ্মাবর্ত্তাদিদেশাসম্ভবে ধর্ম্মানুষ্ঠানায় মিতিসম্ভবায়।

‡ অতশ্চ পূর্ব্বপূর্ব্ব উত্তরোত্তরতঃ শ্রেষ্ঠঃ। বরাহপুরাণম্।

"ব্রহ্মাবর্ত্তঃ পরোদেশ ঋষিদেশস্তনন্তরঃ।
যথাদেশশ্চতোন্যান আর্য্যাবর্ত্তস্তনন্তরঃ॥
বিষ্ণুশ্চ। 'চাতুর্বর্ণ্যব্যবস্থানং যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে।
তং ম্লেচ্ছদেশং জানীয়াদার্য্যাবর্ত্তস্ততঃপরম্।
ইত্যার্য্যাবর্ত্তস্য লক্ষণান্তরম্।

তত্রশ্চ যত্র চাতুর্বর্ণ্যঃ কৃষ্ণমৃগশ্চ নাস্তি, সম্লেচ্ছ দেশঃ। তদন্যো ধর্ম্মদেশঃ। ততশ্চ ব্রহ্মাবর্ত্তাদি দেশচতুষ্টয়ালাভে যত্র চাতুর্বর্ণ্যব্যবস্থাস্তিষ্ঠতে কৃষ্ণমৃগযুক্তবা দেশে।

কৃষ্ণমৃগশ্চ বিচরতি তত্রধর্ম্মেচ্ছুভিঃ স্থাতব্যম্। তদসম্ভবে চাতুর্বর্ণ্যব্যবস্থান্বিত কৃষ্ণমৃগযুক্তেবা দেশে। অপরার্ক। ৫পৃঃ। ১। খণ্ড।

প্রশস্ত নহে, অর্থাৎ প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য নহে। * ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মনুর গ্রন্থে খাঁটি বেদের কথাই অধিক মাত্রায় বর্ণিত হইয়াছে, এবং অন্যান্য স্মৃতিতে বেদসম্পর্কবিহিত আগন্তুক সমাজরুচিপ্রসূত বিধিনিষেধও স্থান পাইয়াছে, এই সকল সাময়িক বিধিনিষেধ মনুবিরুদ্ধ হইলে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে না, মনুর অবিরোধে ইহাদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইবে। এই আগন্তুক সমাজ-রুচি-বৈচিত্র্যের প্রভাবেই অবন্তি সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে গমন করিলেই কঠোর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেখা যায়, মনু যাজ্ঞবল্ক্য বিষ্ণু প্রভৃতির স্মৃতিতে ইহার কোনও উল্লেখ দেখা যায় না। প্রত্যুত মহাভারতে অবন্তি প্রভৃতি দেশের গম্যত্বই সূচিত হইয়াছে। দেবল-বচনে সৌরাষ্ট্র দেশ অগম্য বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং বৌধায়নের মতেও সুরাষ্ট্র অবন্তি প্রভৃতি দেশ অগম্যশ্রেণীভুক্ত, প্রায়শ্চিত্তবিবেকধৃত বায়ুপুরাণ বচনে মগধদেশের অগম্যত্ব বুঝা যায়। কিন্তু ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির প্রভৃতি যে সময়ে অজ্ঞাতবাসের উপযোগী দেশ খুঁজিতেছিলেন সেই সময়ে তাঁহাদের কর্তৃক যে সকল দেশ রমণীয়তা-সুরক্ষিততা নিবন্ধন বাসের উপযুক্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে যুগন্ধর, সুরাষ্ট্র ও অবন্তির নির্দেশও দেখা যায়। যথা—

"কিন্তু বাসায় রাষ্ট্রাণি কীর্ত্তয়িষ্যামি কানিচিৎ।
রমণীয়ানিওপ্তানি তেষাং কিঞ্চিৎ শৃণোচয়॥
মত্তিবস্তা জনপদা বহ্বন্নাঃ পরিতঃ কুরূন্।
পঞ্চালা শ্চেদিমৎস্যাশ্চ সুরসেনাঃ পটচ্চরাঃ॥
দশার্ণা নবরাষ্ট্রঞ্চ মল্লাঃ শাল্বা যুগন্ধরাঃ।
যুতিরাষ্ট্রং সুবিস্তীর্ণং সুরাষ্ট্রাবন্তয় স্তথা॥
এতেষাং কতমো রাজন্নিবাস স্তব রোচতে।
বৎস্যামোযত্র বাক্যেজ্ঞ! সংবৎসর মিমংবয়ম্।" বিরাট পর্ব্ব।

যে দেশে গমন করিলে এবং বাস করিলে পুনঃ সংস্কারের ব্যবস্থা, সেই দেশ যুধিষ্ঠিরাদির মত ধর্ম্মপ্রাণ দ্বিজাতির বৎসরবাসোপযোগী বলিয়া কীর্ত্তিত হইল কি প্রকারে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যুধিষ্ঠিরাদির সময় পর্য্যন্ত এই সকল দেশ অগম্য বলিয়া বিঘোষিত হয় নাই, পরবর্ত্ত

* বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতেঃ।
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে॥

কালেই লোকসংরক্ষণার্থ উক্ত প্রায়শ্চিত্তাদি বিধানের দ্বারা যুগন্ধরাদি দেশে গমন বিহিত হইয়াছে অথবা যুধিষ্ঠিরাদির পূর্ব্বে এই সকল দেশ অগম্য ছিল। অন্যান্য দেশের মধ্যে অবন্তী দেশের অতীব রমণীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। কবিকুলগুরু কালিদাস মেঘের মুখে অবন্তির রাজধানী বিশালা নগরীকে স্বর্গের খণ্ডরূপে উৎপ্রেক্ষা করিয়াছেন। *

উক্ত কবির বর্ণনাতেই উজ্জয়িনীস্থ মহিলাবৃন্দের অলোকসামান্য রূপবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মেঘকে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, যদি তুমি উজ্জয়িনী রমণীনয়নের সৌদামিনী স্ফুরণচকিতলোচনাপাঙ্গ সদৃশ ক্রীড়ারসের অনুভব করিতে না পার, তবে প্রতারিত হইবে। † অবন্তী-রমণীর সুরত-নৈপুণ্য সংস্কৃতসাহিত্যে সুপরিচিত। ‡ ৫ মৃচ্ছকটিক নাটকের ঘটনাবলীর প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয়, সেকালে অবন্তিপুরীর নবনারী বিলাসের স্রোতে একেবারে গা ঢালিয়া দিয়াছিল। কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণযুবক চারুদত্ত চৌর্য্যবিদ্যালব্ধ ধনের দ্বারা বারবনিতাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বেশ্যাসক্ত চারুদত্ত সমাজে ঘৃণিত বলিয়া বিবেচিত হন নাই, প্রত্যুত তাঁহার বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। কৃতবিদ্য ব্যক্তি ভোগ-লালসায় সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া পরিণামে বেশ্যালয়ের দারোগাতে নৌকরী নির্ব্বাহ করিতেন, এই শ্রেণীর বিট নামধারী যে অবন্তী প্রভৃতি দেশের নিজস্ব নহে, কে তাহা নির্ণয় করিয়া বলিতে পারে? কবি নায়ক চারুদত্তকে দ্বিজসার্থবাহ নামে কীর্ত্তন করিয়াছেন, নায়কের কথাতেও তাহার ব্রাহ্মণত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায়, সেকালে অবন্তির ব্রাহ্মণগণ বণিক্‌বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের সমৃদ্ধির অভাব ছিল না। একদিকে ব্রাহ্মণকর্ত্তব্য অধ্যয়নাধ্যাপনাদির অভাব, অপরদিকে অতুল ঐশ্বর্য্য

---

* প্রাপ্যাবন্তীনুদয়ন কথা কোবিদ-গ্রাম-বৃদ্ধান্-
পূর্ব্বোদ্দিষ্টামনুসর পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাম্।
স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিণাং গাং গতানাম্
শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্॥—মেঘদূত।

† বিদ্যুদ্দাম স্ফুরিত-চকিতৈস্তত্র পৌরাঙ্গনানাম্।
লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতোঽসি॥—মেঘদূত।

‡ চকোর্য্য এব চতুরাঃ চন্দ্রিকা-পান কর্ম্মণি।
বিদগ্ধানাং নিপুণা যুবতয়ো নর্ম্মণি। সাহিত্য দর্পণ।

এই উভয়ের সমাবেশ সমাজটিকে যে সর্ব্বতোভাবে ভোগসম্পট করিয়া তুলিয়াছিল, মৃচ্ছকটিক পাঠে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

মগধ দেশের সমৃদ্ধি সভ্যজগতে সুবিদিত। সমৃদ্ধিসম্পন্ন উচ্ছৃঙ্খলতা প্রায় স্বাভাবিক। মগধের মদ্যপানও অবিদিত নহে। চন্দ্রগুপ্তগুরু কৌটিল্য-সহচর বাৎস্যায়নের কামসূত্রে পাটলীপুত্রের বেশ্যাপ্রসঙ্গ পূর্ণমাত্রায় আলোচিত হইয়াছে। স্মৃতিতে যে সকল দেশ নিন্দিত শ্রেণীভুক্ত দেখা যায়, রামায়ণে সেইগুলি সমৃদ্ধ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই তালিকায় অনিন্দিত মৎস্য দেশ কাশি-কোশলেরও উল্লেখ দেখা যায়। যথা—

"দ্রাবিড়াঃ সিন্ধু সৌবীরাঃ সৌরাষ্ট্রা দক্ষিণাপথাঃ।
বঙ্গাঙ্গমগধামৎস্যাঃ সমৃদ্ধাঃ কাশি কোশলাঃ॥"

ইহাতে মনে হয়, দেবল-বৌধায়ন প্রভৃতির সময়ে যে সকল দেশের অধিবাসী ধনমদে মত্ত হইয়া বিলাসোপকরণের প্রলোভনে পরকাল ভুলিয়া ইহলোক সর্ব্বস্ব হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সকল দেশে বাস করিলে অনর্থপাতের অবশ্যম্ভাবিতা মনে করিয়া সমাজের মঙ্গলকামী ঋষিগণ ধর্ম্মের চাবুকে সামাজিক-দিগকে এই সকল বিলাসবহুল দেশের সম্পর্ক হইতে বাধা দিতে ত্রুটি করেন নাই।

বর্ত্তমান যুগে রাজধানী কলিকাতার প্রলোভনে কতজন যে ইহকাল পরকাল নষ্ট করিতেছে, সে কথা সমর্থনের জন্য প্রমাণোপন্যাস অনাবশ্যক। আজ ধর্ম্মের শাসন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, কাজেই আর কাহাকে কেহ ধর্ম্মের প্রভাবে বাধা দিতে সমর্থ হইতেছে না।

বঙ্গদেশে ভাগ্যক্রমে দেশান্তরাগত ক্ষত্রিয় নরপতিগণের শাসনে এবং কান্যকুব্জাদি পবিত্র দেশাগত ভূসুরনিকরের সমাজ-নেতৃত্বে পরিচালিত হইয়া, ক্রমে শ্রৌতস্মার্ত্তাচারের আদর্শভূমিরূপে অবস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং নিচবণ-বহির্ভূত বঙ্গদেশেও বিবিধ যাগানুষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যায়। স্মৃতিশাস্ত্রের সুদৃঢ় শাসন বঙ্গদেশে অতীব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অমুদ্র-প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণের সত্তা অদ্যাপি সেই যুগের পবিত্রতা বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

ক্রমশঃ

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

তুলসীদাসের স্ত্রী-বিদ্বেষ।

কয়েক মাস হইল, কাশীর সুপ্রসিদ্ধ 'অলকা' পত্রিকায় শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর একখানি চিঠি প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে তিনি একস্থানে বলিয়াছিলেন যে, তুলসীদাস, কবীর আদি কবিগণ স্ত্রীবিদ্বেষী ছিলেন, কিন্তু স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত কি তাহা যথাযথভাবে দেখান নাই। অবশ্য তাহা দেখাইবার তাঁহার বিশেষ কোন আবশ্যকতা ছিল না, যাহা হউক বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে তুলসীদাসের কি অভিমত তাহা 'সাহিত্যে'র পাঠকপাঠিকাগণের গোচর করিব, অদ্যকার সুযোগ এবং সুবিধা পাইলে স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে কবীর আদি কবিগণের কি অভিমত তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

গোস্বামী তুলসীদাস 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' এই পরম উদার মতের পরিপোষক হইয়াও স্ত্রী-বিদ্বেষে জড়িত হইলেন, তাহা বুঝিবার জন্য আমাদিগকে গোস্বামী-জীর জীবনীর একাংশ পুনরায় স্মরণ করিতে হইবে। তুলসীদাসজী অল্পবয়সেই রত্নাবলীনাম্নী একটী কন্যার সহিত বিবাহিত হন. তিনি রত্নাবলীকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন—একবারের জন্যও তাঁহাকে চোখের আড়াল করিতে পারিতেন না। এদিকে রত্নাবলী অনেক দিন পর্য্যন্ত পিতৃগৃহে না গিয়া, পিতৃগৃহে যাইবার জন্য উতলা হইয়া পড়েন এবং পতিকে নিজের মনোভাব জ্ঞাপন করিয়া পিত্রালয়ে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গোস্বামীজী রত্নাবলীর উপর অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন,—এক পলকের জন্যও তাঁহাকে না দেখিলে ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন, অতএব তিনি যে পত্নীর এই অপূর্ব্বপ্রস্তাবিত প্রস্তাবের সহিত একেবারে সহমত হইতে পারিলেন না এবং তাঁহার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিলেন তাহা বলা কাগজ কলমের অপব্যয় করা মাত্র।

স্ত্রী-বিদ্বেষের কারণ।

তাঁহার পত্নী কিন্তু একবার বিফলমনোরথ হইয়াই নিরাশ হইলেন না, তিনি বার বার তুলসীদাসকে পিতৃগৃহে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে থাকেন, কিন্তু বৃথা—সব বৃথা, তুলসীদাসের স্ত্রীপরায়ণতার কাছে তাঁহার সব অনুরোধ অনুনয়-

বিনয় আঁধির নিকট শুষ্কপর্ণের ন্যায় উড়িয়া গেল। অবশেষে তাঁহার স্ত্রী যখন দেখিলেন যে, তুলসীদাসের অনুমতি লইয়া পিতৃগৃহে যাইবার আশা দুরাশা মাত্র—আকাশ-কুসুমের ন্যায় অসম্ভব, তখন তিনি সুবিধানুসারে তুলসীদাসের অজ্ঞাতসারে পিতৃগৃহে পলাইয়া যাইবার জন্য মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন। একদিন তুলসীদাস যখন কোন অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য-ব্যপদেশে গ্রামান্তরে গিয়াছিলেন, রত্নাবলীদেবী সুবিধা বুঝিয়া তুলসীদাসের অজ্ঞাতসারেই পিতৃগৃহে পলায়ন করিলেন।

এদিকে যখন কার্য্য সারিয়া তুলসীদাস ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বাড়ী ফিরিলেন, তখন তিনি গৃহে রত্নাবলীকে অনুপস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন এবং রত্নাবলীর পিতৃগৃহে পলায়ন করাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্ভব এবং সঙ্গত ভাবিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ শ্বশুরালয়ের দিকে ছুটিলেন। রত্নাবলী দেবী সবে মাত্র পিত্রালয়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, এমন সময় তুলসীদাসও শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রত্নাবলী দেবীর সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অতর্কিতে শ্বশুরালয়ে গিয়া পত্নীর সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করা লোক-চক্ষে অত্যন্ত হেয় বিবেচিত হইত, তজ্জন্য রত্নাবলী তুলসীদাসের এই ব্যবহারে অত্যধিক ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তুলসীদাস তাঁহাকে তাঁহার সহিত ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলে তিনি অধিকতর আস্ফালন প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—

"শরম না লাগে তব এলে পিছু পিছু,
ধিক প্রেমে, ধিক তোহে লাজ নাহি কিছু।
মম অস্থিচর্ম্মময় দেহে যত প্রীতি
তত যদি রামে হত, যেত ভব-ভীতি।" (১)

প্রাণাধিকা পত্নীর নিকট এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া এবং তাঁহার মুখে এই তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করিয়া, তুলসীদাসের মনে ঘোর বৈরাগ্যের উদয় হইল এবং তিনি সেই দণ্ডে সংসার হইতে বৈরাগী হইলেন আর সংসারাভিমুখে ফিরিলেন না। তিনি রত্নাবলীদেবীকে 'প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী' ভাবিয়া আসিতেছিলেন, অথচ তাঁহাকর্ত্তৃক এইরূপে প্রত্যাখ্যাত এবং বিড়ম্বিত হইয়া তাঁহার মনে যে স্ত্রীজাতির প্রতি বিতৃষ্ণা—ঘৃণার ভাব উৎপন্ন হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং

(১) ইহা ৺রমেশ [illegible] কৃত অপ্রকাশিত অনুবাদ, তিনি এই অনুবাদটুকু ইহাতে প্রকাশিত করিবার অনুমতি দিয়াছেন বলিয়া আমি কৃতজ্ঞ। লেখক।

তাহা হইয়াছিল যে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? উপরন্তু তুলসীদাস যে সময়ে গ্রন্থাদি রচনা করেন, সে সময়ে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ বৈরাগী, অতএব 'কামিনী-কাঞ্চন বিষবৎ পরিত্যাজ্য' বৈরাগ্যবাদীদিগের এই সিদ্ধান্ত পরিপুষ্ট করিবার জন্য এবং তাহা লোকদিগকে পালন করাইবার জন্য তিনি যে নারীজাতির অযথা নিন্দা করিয়া তাহাদের প্রতি সকলের ঘৃণা উৎপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের আশ্চর্য্যান্বিত হইবার বিষয় কিছুই নাই। ইহা ব্যতীত আমাদের অনুমান ও বিশ্বাস যে, তুলসীদাসের যুগের আবহাওয়াই এমন দুষ্ট ছিল যে, লোকে স্বভাবতঃই স্ত্রী-বিদ্বেষী এবং স্ত্রী-নিন্দুক হইয়া যাইত, কারণ আমরা তুলসীদাসের সমসাময়িক অথবা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বের সকল হিন্দীকবিকেই অল্প বিস্তর স্ত্রীনিন্দা করিতে দেখিতে পাই, বলা বাহুল্য এই আবহাওয়ার দোষগুণ তুলসীদাসের উপরও লক্ষিত হয়।

এই ত গেল তুলসীদাসের স্ত্রীবিদ্বেষের কারণের কথা, এখন দেখা যাউক তুলসীদাসের স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে অভিমত কি এবং তুলসীদাস তাহা কেমন করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। রামচরিতমানস অথবা রামায়ণের একস্থানে তুলসীদাস বলিয়াছেন, 'নারী সহজ জড় অজ্ঞ,'—নারীরা স্বভাবতঃ জড় এবং অজ্ঞ; বলা বাহুল্য তুলসীদাসের এই কথা নারীজাতির উপর অযথা দোষারোপ মাত্র। উপযুক্ত সুযোগ এবং সুবিধা পাইলে নারীরা যে পুরুষদিগের সমকক্ষতা অর্জ্জন করিতে পারেন, এমন কি অনেক বিষয়ে পুরুষদিগকে অতিক্রমও করিতে পারেন, তাহা আজ বিংশ শতাব্দীর সকল চিন্তাশীল লোকেই জানে। অরুন্ধতী, গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি পৌরাণিক বিদুষী রমণীদিগের বিষয় তুলসীদাসের ভালরূপে গোচর থাকিতেও, তিনি নেকা সাজিয়া এমন কথা বলিলেন কেন 'কে তা জানে'? মহাভারতপ্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ কাশীরাম দাসও মহাভারতের একস্থানে তুলসীদাসের এই কথারই প্রকারান্তরে প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, তিনি একজন পুরুষকে দিয়া একজন স্ত্রীকে বলাইতেছেন:—

অবলা স্ত্রীজাতি তুমি না বুঝ কারণ।
* * * *
অবলা স্ত্রীজাতি কিবা বলিব তোমারে।

অর্থাৎ স্ত্রীজাতির কিছু বুদ্ধি নাই, তাঁহারা কিছু বুঝিতে পারেন না—বুদ্ধিটা কেবল পুরুষদের একচেটিয়া তাহাতে স্ত্রীদিগের অধিকার নাই। কেবল ইহাই

নহে, নারীরা ঈশ্বরের গুণগান করিতে পারেন না—পারেন কেবল পুরুষেরা, কাশীরাম দাস একজন স্ত্রীকে দিয়া দেবতার স্তুতি করাইতেছেন :—

চরাচর দেব নাগ তোমার বিভূতি,
কি বর্ণিতে পারি দেব আমি নারীজাতি।
স্ত্রীজাতি অবলা হেন বলে জ্ঞানীজন
তোমার মহিমা কিবা করিব বর্ণন।

বলা বাহুল্য, কাশীরাম দাসের তথাকথিত জ্ঞানীজন কেবল তিনি এবং তাঁহার দলের লোক ছাড়া আর কেহ নহে। যাহা হউক কাশীরাম দাস কেবল এইটুকু আওয়াজ উঠাইয়া থামিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তুলসীদাস এক কাঠি বাড়িয়া শিষ্য অহল্যাকে দিয়া রামচন্দ্রকে বলাইতেছেন,—"নারী অপাবন, তুম জগপাবন" তুমি জগৎপাবন কিন্তু নারীরা একেবারে অপাবন অর্থাৎ তাহারা কোনকালেও মুক্ত হইবেন না। কেবল যে বুদ্ধিমান হওয়াই পুরুষের একচেটিয়া তাহা নহে, মুক্তি লাভ করা—নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হওয়াও তাঁহাদের একচেটিয়া। একথা শুনিয়া কেবল যে যুগপৎ ক্রোধ এবং বিস্ময়-সাগর উদ্বেলিত হয় তাহা নহে, উহা যে বলে তাহার অসামান্য মূর্খতা দেখিয়া ম্লানও উল্লেক হয়। যদি মীরাবেয়া, মীরাবাঈ প্রভৃতি ভক্তাগ্রগণ্যা নারী ঈশ্বরের সাযুজ্য অথবা মুক্তি লাভ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা নিঃসঙ্কোচে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে বুদ্ধ, চৈতন্য, তুলসী, কবীর, রামকৃষ্ণ, ঈশা কাহারও মুক্তি হয় নাই এবং কখনও হইবে না। উপরোক্ত কথা বলাতে আমাদের জগন্মান্য অবতারকল্প মহাত্মাদিগকে অপদস্থ করার অথবা লোকসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার দুরভিসন্ধি মোটেই ছিল না, কিন্তু কেবল আমাদের কথাকে স্পষ্টতর করিয়া দেওয়াই এইকথার অবতারণা করিবার উদ্দেশ্য ছিল।

'স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং, দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ' এই মহাজনের আমলের পুরাতন কথার পৌ ধরিয়া তুলসীদাস একস্থানে বলিতেছেন :—

'সত্য কহহিঁ কবি নারি সুভাউ,
সহজ বিথি অগহ অগাধ দুরাউ।
নিজ প্রতিবিম্ব মুকুর গহি জাঈ,
জানি ন জাঈ নারিগতি ভাঈ।'

'আমি সত্য করিয়া বলিতেছি যে, নারীর চরিত্র সর্ব্বথা অজ্ঞাত, অগম্য, দুস্তর; নিজের চেহারা কেমন তাহা পর্য্যন্ত দর্পণে নিজে দেখিতে পারিলে

জানা যায়, কিন্তু নারীর স্বভাব কোনমতে জানা যায় না। বলা বাহুল্য, ইহা তুলসীদাস কেবল নিজের অনুভবের উপর নির্ভর করিয়া বলিয়াছেন, একজন স্ত্রীর দোষে morning shows the day এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া সমস্ত স্ত্রীজাতিকে লোকচক্ষে হেয় করা যে তুলসীদাসের পক্ষে তুলসীদাসোচিত হয় নাই তাহা না বলিলেও চলে।

ইহার একটু পরেই তুলসীদাস বলিতেছেন,—

'কাহ ন পাবক জরি সকয়,
কাঁ ন সমুদ্র সমাঈ;
কা ন করৈ অবলা প্রবল
কেহি জগ কাল ন খাঈ।'

অগ্নিতে কি পুড়ে না? সমুদ্রে কি আঁটে না? প্রবল অবলা কি করিতে পারে না? জগতে কালকবলে কে পতিত হয় না? এ যেন মনুর সেই 'বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে। পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্' কথারই প্রকারান্তরে প্রতিধ্বনিমাত্র। "স্ত্রী শৈশবে পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং স্বামীর মৃত্যুর পর পুত্রদিগের অধীনে থাকিবে, তাহারা কখনও স্বতন্ত্র হইবে না।" "তাহাদের প্রবৃত্ত হইতে দিও না কারণ তাহারা সেই লায়েক নহে—তাহারা কায়মনোবাক্যে পতির সেবা করিবার জন্যই জন্ম গ্রহণ (২) করিয়াছে এবং তাহারা যদি তাহা করে তবেই ভাল গতি লাভ করিবার আশা আছে নচেৎ একেবারে উমিদ্ নেস্ত' (৩)। তাহারা কখন কি করিয়া বসে তাহার ত ঠিক নাই, অতএব তাহাদের স্বাধীন হইতে দিও না, স্ত্রীলোক ত মানুষ তোমাদের না জানাই উচিত, কিন্তু স্বয়ং বিধাতাও তাহাদের মনের কথা টের পান না, কারণ তাহারা কপটতা, পাপ এবং অবগুণের খনি (৪)।" ইহাই হইল তুলসীদাসের নারী সম্বন্ধে অভিমত, ইহার উপর টীকাটিপ্পনী করা অরণ্যে-রোদন করার ন্যায় বৃথা ভাবিয়া তাহা করিতে বিরত হইলাম।

জনৈক অজ্ঞাতনামা হিন্দীকবি তুলসীদাসকে হিন্দী সাহিত্যাকাশের স্নিগ্ধ এবং শীতল জ্যোৎস্না-বিকীরণকারী চন্দ্রমা-স্বরূপ বলিয়াছেন, তিনি যে এই

(২) পতি দেবতা কর্ম্ম মন বাণী—তুলসীদাস।

(৩) সহজ অপাবনি নারি, পতি সেবত শুভগতি লহহিঁ। তুলসীদাস

(৪) নিজহু না পারি হৃদয় গতি জানি, সকল কপট অঘ অবগুণ খানি। ঐ

রূপকটী (৫) অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বাহির করিয়াছিলেন, তাহা আজ আমরা

(৫) সুর সুর তুলসী শশী, উড়ুগণ কেশোদাস।
অবকে কবি খদ্যোত হয়, জঁহতঁহ করত প্রকাশ॥

অনেকদিন পরে হাড়ে হাড়ে বুঝিতে পারিতেছি। হয়ত তিনি তুলসীচন্দ্রের স্ত্রী বিদ্বেষ অঙ্কিত কলঙ্কের কথা জ্ঞাত ছিলেন, কিন্তু মহাকবির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যরূপে কোন কথা বলিতে সাহসী না হইয়া রূপকের বেড়াজালের ভিতর দিয়া তাহা বলিয়াছিলেন। 'বুঝহ সাধুযে জান তাহার সন্ধান'।

প্রেম এবং কপটতা।

(তুলসীদাস)

প্রীতির এমনি রীতি তাহা,
স্থায়ী তাবৎ হয়;
যাবৎ তাতে কপটতার
লেশটুকু না রয়।
দুধ-জলের মিলন সুধু
সেই অবধি টীকে,
যাবৎ তা'তে অম্ল-কপট
ফাঁক পেয়ে না ঢোকে।

শ্রীমন্মথনাথ গুপ্ত।

ঋতুপতি।

(১)

ঋতুপতি ফিরে এসেছে আবার
বিজয়ী বীরের প্রায়;
উৎসাহ-ভরা বিরাট বক্ষ,
ভাবের আবেগ তায়।

কর্ম্মকুশল উন্নত দেহ,
দীপ্তি নয়নে ভাসে ;
বিজয়গর্ব্বে গর্ব্বিত মন,
মুখে মৃদু মৃদু হাসে।
কুসুমের ধনু, কুসুমের শর,
কুসুম-ভূষণ গায় :
নব কিশলয় বিজয়-পতাকা,
উড়িছে মলয় বায়।
আবাহন তা'রে করিছে বিশ্ব,
দৃশ্য মধুর অতি ;
নবীন রঙ্গে আজি এ বঙ্গে,
এসেছেন ঋতুপতি।

(২)

উষার হাসিতে, চাঁদের কিরণে,
নূতন আলোক ফোটে ;
নীলিমার কোলে তারায় তারায়,
নব কল্পনা ছোটে।
রম্য প্রভাত, সৌম্য সন্ধ্যা,
দিবস উজল সাজে ;
ঝিল্লী-মুখর নাচে শর্ব্বরী,
চরণে নূপুর বাজে।
বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাটছন্দ,
উঠেছে মধুর তান ;
চঞ্চল তাহে প্রকৃতি-বক্ষ
আবেগ-মগ্ন প্রাণ !
ঊর্দ্ধে, নিম্নে, পার্শ্বে কেবল
দৃশ্য মধুর অতি ;
নবীন রঙ্গে আজি এ বঙ্গে,
এসেছেন ঋতুপতি।

(৩)

নূতন জীবন এসেছে ভাসিয়া,
উঠেছে নূতন রবি ;
স্পন্দিত বুকে উর্জ্জস্বতম,
নব চেতনার ছবি।
নবীন তন্ত্রে, নবীন মন্ত্রে,
করিতে দীক্ষা দান ;
রুদ্ধ কণ্ঠ খুলেছে পাপিয়া,
কোকিল ধ'রেছে গান।
শীতের জড়তা করিতে চূর্ণ,
স্পন্দন-ভরা সুরে,
কি জানি কেমন কুহক-মাখান,
কা'র বাঁশী বাজে দূরে !
গন্ধ-মুখর হ'য়েছে বিশ্ব,
দৃশ্য মধুর অতি ;
নবীন রঙ্গে আজি এ বঙ্গে
এসেছেন ঋতুপতি !

(৪)

স্বপ্নের মাঝে জেগেছে কামনা,
জেগেছে আত্মপ্রীতি ;
কত কাহিনীতে সঞ্জিত আজি,
হ'য়েছে সুপ্ত স্মৃতি !
সুপ্ত হৃদয়ের ঝঙ্কার যেন,
মলয় পবনে ভাসে ;
শিহরি ওঠে মুক্ত-আলি,
মুক্ত-কানন হাসে :
পূর্ণ মর্ম্ম উঠিয়াছে
পূর্ণ গন্ধে ভরি' ;

মধুর লোভায় যথা মধুপ,
ফেরে গুঞ্জন করি'।
ঘুম-গানসে চেয়ে আছি একা,
দৃশ্য মধুর অতি;
নবীন মনে আজি এ বঙ্গে
এসেছেন ঋতুপতি!

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জাতীয় শিক্ষার ভূমিকা।

যদিও প্রাচীনকে আনিয়া নবীনের স্থানে দাঁড় করান যায় না, তবুও প্রাচীনের সমাধির উপরই যে নবীনের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ব্যক্তিগত জীবনে দেখা যায় যে, নবীন যুবক শত শিক্ষায় শিক্ষিত হইলেও প্রাচীন বৃদ্ধের অভিজ্ঞতার নিকট তাঁহার অভিজ্ঞতা অতি কম, বোল আনার এক আনা বলিলেও চলে। কালের হিসাবেও তাহা। নবীন নবীনই বটে, প্রাচীন প্রাচীনই বটে; অভিজ্ঞতায় প্রাচীনই বড়, নবীন ছোট। স্বীকার করি নবীনও প্রাচীন হইবে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সে ছোটই রহিয়াছে। এক্ষণে আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নতিলাভ করিয়াছি বলিয়া আস্ফালন করি বটে, কিন্তু প্রাচীনের অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যায় তাহা অতি তুচ্ছ। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান যে অভিজ্ঞতা রাখিয়া গিয়াছে বর্ত্তমান বিজ্ঞান সে অভিজ্ঞতার কাছেও যাইতে পারে না। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান সকল স্থলেই মর্ম্মের দোহাই দিয়া নিজেকে নিজে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান বিজ্ঞান বা সংস্কৃত বিজ্ঞান সেই আবরণ খুলিয়া তাহার (প্রাচীনের) মর্ম্ম বুঝিতে এখনও সমর্থ হয় নাই। সে যে

"খুলিয়া কিমির গাঁঠ নিলজে রতন"।

যে মন্ত্রের সন্ধান পাইয়াছে বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র, রাসায়নিক প্রফুল্লচন্দ্র,

আধ্যাত্মিক ভারাকিশোর প্রভৃতি। বৈজ্ঞানিক কবির "আলোকে" তাহা মূর্ত হইয়া ফুটিয়াছে।

উপনিষদ বলিয়া গিয়াছেন, "সর্বভূতাত্মাত্মা"। উপনিষদ পড়িয়া বিজ্ঞানাচার্য জগদীশ দেখাইলেন যে, উদ্ভিদেরও স্নায়বিক শক্তি বা অনুভূতিশক্তি আছে। আচার্য যদি "পুরাণ"কে শুধু আজগুবী গল্প বলিয়া না ঠেলিয়া সাধ্যমত ব্যাখ্যা করিতেন, তবে রাবণের মুণ্ডপর্বতপ্রণেরও পুনরুদ্ধার সাধন করিতে সমর্থ হইতেন। যে যুক্তি সব বিষয়েই খাটে। দর্শনে বল, বিজ্ঞানে বল, সাহিত্যে বল আর রাজনীতিতে বল বা ব্রিটিশ-নীতিতে বল, সব বিষয়েই সে যুক্তি খাটে। রাজনীতির কথাই আজ বলিতে চাই। কত কিণ্ডারগার্টেন আর কত অন্যান্য প্রণালীই না আবিষ্কৃত হইয়াছে বা হইতেছে, আরও বা কত হইবে! কিন্তু কৈ, তাহাদের কোনটিই ত অস্তিত্বের নিকট পৌঁছাইবার পূর্বেই কলম্বুসের ন্যায় বিলীন হইয়া যাইতেছে—কেন না সে যে নবীন। অনভিজ্ঞতাতেই তার জন্ম, অনভিজ্ঞতা তার মৃত্যু। তাই দেখি যে, যে সকল শিক্ষা প্রণালীই আমাদের নিকট মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া আসিতেছে, তাহা বহুরূপী সামব প্রাণীর অঙ্গীভূত হয়ে পরিবর্তনের ন্যায় দেখা দিয়াই রূপান্তরিত হইতেছে, কাজেই তাহা আর জাতীয় শিক্ষা দিতে পারিতেছে না। কিন্তু প্রাচীন তাহার অভিজ্ঞতার মণিকোঠায় যাহা রাখিয়া গিয়াছে নবীন তাহা পরখার শিক্ষা করিতে পারে। মানুষ যেমন অভ্যাসের দাস তেমনি অনুকরণের দাসও বটে, অনুকরণ না করিতে শিখিবে কেমন করিয়া হইতে? বৃদ্ধের নিকট, পিতামাতার নিকট, বালক শিক্ষার জন্য যেমনি প্রাচীন সকলের নিকট বর্তমানকাল বালকতুল্য। কিন্তু প্রাচীনকে অনুকরণ করে, তবে তাহাকে গ্রাস করিয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় নিজে পুষ্টি সঞ্চয় করিতে পারে নতুবা নিজের অপরিণতবুদ্ধি নিয়ে অন্তঃসারশূন্য হইয়া মরে। তাইত প্রাচীনকে ছাড়িয়া নূতন আদর্শ গড়িতে চাই। প্রাচীনের শিক্ষা, দীক্ষা, রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি কোন নীতিই ত ভাল লাগিতেছে না। এখনকার বিধি হইয়াছে "কৃতম কিছু করো ভাই, নয় কিছু কর।" কিন্তু ইহাই ত আমাদের অস্তিত্বের বিরোধক। কোন কিছু করিতে গেলেই কল্পনা যেকার কিছু করনা হইতেছে তাহা বাতিলের খাতায়। এ জন্য নূতন কিছু করিতে গেলেই দেখি যে, বাস্তবিকতার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া রহিয়াছে। কাজেই আমরা নবীনকে পুরাতনকে বিসর্জন দিয়া শুধু "নূতন" কিছু পাই। পরন্তু নবীনে পুরাতনে

চাই-ভাই। কাজেই আমরা ভাঙি, আবার গড়ি। তাহাই "ভাঙা-গড়াই" নাম সার হইয়া, কিন্তু গড়ার মত গড়া আর হইয়া উঠিল না। নৃতত্ত্বের 'ঘুণ' প্রাচীনকে উৎখাতিত করিতে গিয়া দেখিল যে, আমরা নারীকে বাদ দিয়া শুধু 'বাবাকে' লইয়াই বসিয়া আছি। শিক্ষানীতির প্রাচীন শিক্ষার বিষয় ছিল তিনটি। যথা :—(১) দেহের শিক্ষা (২) মনের শিক্ষা (৩) হৃদয়ের শিক্ষা (৪) আত্মার শিক্ষা। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমরা প্রাচীনকে বাদ দিয়া নূতনকে গড়িতে চাই। কাজেই প্রাচীনের অধ্যাত্ম দর্শন-বিজ্ঞান, নীতিধর্ম্ম প্রভৃতিকে বাদ দিয়া, এক কথায় মনুষ্যত্বের আদর্শ বা সাধ্যসাধনী যাহা কিছু ছিল, তাহা বিসর্জ্জন দিয়া সম্মুখে নূতন জড়বিজ্ঞানকে আদর্শ করিলাম। ঐ বিজ্ঞান অস্তিত্বজ্ঞানশূন্য, ইন্দ্রিয়জ্ঞানপ্রসূ, ইন্দ্রিয়জ্ঞান যথার্থ সত্যকে দেখিতে পায় না, এবং তাহাকে অপরজ্ঞান বা অপরা বিদ্যা বলে। বিদ্যা বলিতে শুধু জড়বিদ্যা বুঝায় না, পরাবিদ্যাও বুঝায়। পরাবিদ্যাটিকেই আমাদের মূল উদ্দেশ্য কিন্তু অন্ধকারের জ্ঞান না থাকিলে যেমন আলোকের জ্ঞান এবং টক না থাকিলে মিষ্ট দ্রব্যের যথার্থ স্বাদ উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ অবিদ্যা জ্ঞান না থাকিলে বিদ্যা জ্ঞানের যথার্থ মাহাত্ম্য বুঝা যায় না। সুতরাং বিদ্যা বা পরা বিদ্যা লাভের জন্য আমাদের ততটা ঔৎসুক্য বৃদ্ধি হইতে পারে না, তাই অপরা-বিদ্যারও দরকার আছে বটে। বিশেষতঃ সামাজিক বা সাংসারিক জীবের অপর জ্ঞান না থাকিলে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাই অসম্ভব। কিন্তু তাই বলিয়া শুধু নাস্তিকতা জ্ঞান তথা জড়বিজ্ঞানের অনুশীলন করিলেই চলিবে না। শরীর মন আত্মা লইয়াই মানুষ। যাহাতে এই তিনের সমবায়ে উন্নতি হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শরীরের উপর মন, মনের উপর আত্মা। সুতরাং অধ্যাত্ম উন্নতির জন্যই শরীর চাই, মন চাই। আত্মাই হইতেছে মানুষের প্রধান সম্পত্তি। যে শিক্ষায় অধ্যাত্ম শিক্ষার ব্যবস্থা নাই, সে শিক্ষা শিক্ষা-নামের যোগ্য নহে। আধুনিক শিক্ষায় যেমন অধ্যাত্মজ্ঞানের আলোচনা নাই, তেমনি হৃদয়ের শিক্ষারও ব্যবস্থা নাই। আছে মাত্র মনের শিক্ষা ও শরীরের শিক্ষার বন্দোবস্ত। তাহাও সম্পূর্ণভাবে নহে, বর্জ্জের কথা বাদ দিলে বাঙ্গালীর কথাই নাই। জন্মবিজয়ী বিজয়সিংহ ও যশোহর-যশঃ প্রতাপাদিত্যের উত্তরাধিকারীই ত অলসপ্রকৃতি ভীরু স্ত্রৈণ বলিয়া পরিচিত। কেন? বর্ত্তমানের সাধারণ শিক্ষার ত্রুটি যথেষ্ট আছে, তবে কি ব্যবস্থাটীর এ কলঙ্ক মোচন হইবে না? আমরা বাঙ্গালী পাশ্চাত্য শিক্ষায়

আত্মবিস্মৃত! কিন্তু কৈ কয়টী গোরব ওর শারীরিক বলে বলশালী হইয়াছেন? বীরের কথা বাদই দিলাম, কিন্তু বাঙ্গালার সাধারণ স্বাস্থ্যই বা কিরূপ? বিশেষতঃ শিক্ষিত বাঙ্গালার ত অকালেই বার্দ্ধক্য দেখা দেয়; অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতাদি নানা রোগে বাঙ্গালী যেমন জীর্ণ শীর্ণ তেমন আর কোন জাতিকে দেখা যায় কি? পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালীরা স্ফীতোদর; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, পাশ্চাত্যেরা কি শারীরিক বলে বাঙ্গালীর ন্যায় হীন, দুর্ব্বল, বা নানা রোগের আকর? তাই বলি, এক্ষণে শারীরিক শিক্ষারও প্রসার বা প্রকৃষ্ট বন্দোবস্ত হয় নাই অথচ মানসিক শিক্ষায় ও "বুদ্ধিতে বাঙ্গালী" খ্যাতির দাবী আর কতদিন করিতে পারিবে, বলিতে পারি না। সেদিন সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের তালিকায় দৈর্ঘ্যিকায় বাঙ্গালীর নাম অবিকতর নীচেই বটে! যেমন শারীরিক বলে, তেমনি মানসিক বলেও পশ্চাৎপদ, কেন এমন হইল? তাহারা ত "সব জান্তা!" শাস্ত্রী মহোদয়ের ভাষায় ইহার ইহাই উত্তর যে, "বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি।" তাই ধর্ম্মপোষ বঙ্গিলী এখন আর কথায় কথায় ধর্ম্মের দোহাই দিতে চায় না, কিন্তু যুক্তির দোহাই দেয়; যুক্তি ছাড়া সবই অবিশ্বাস্য। যুক্তিই যে পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানের শক্তিশেল। কিন্তু তাহারা জানে না যে, আর্য্যঋষিদের অধ্যাত্মবিজ্ঞানের তীক্ষ্ণবাণ যতদূর যাইতে পারে বা গিয়াছিল, পাশ্চাত্য জড়বাদের যুক্তিশেল ততদূর যাইতে পারে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জড়বিজ্ঞান যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান বা ইন্দ্রিয়-জ্ঞান; কিন্তু অধ্যাত্ম বিজ্ঞান অতীন্দ্রিয় জ্ঞান। চর্ম্মচক্ষুর দৃষ্টি কি তাহার সহিত তুলনীয়? তাই অন্ধ প্রাচীন-পক্ষ-পাতীরা ধর্ম্মের দোহাই-ই অন্ধভাবে মানিয়া আসিতেছেন। আর এজন্যই দেখা যায় যে, ৫০ বৎসর পূর্ব্বেও দেশে স্বাস্থ্যবান, বলবান লোকের অভাব ছিল না। আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা ছিল ধর্ম্মমূলক। আর আমাদের ধর্ম্ম আবার স্বাস্থ্যবিজ্ঞানমূলক তাই কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস বলিয়া গিয়াছেন—

"শরীরমাদ্যম্ খলু ধর্ম্মসাধনম্।"

বেদই তাহার প্রমাণ। কেন না আয়ুর্ব্বেদ বেদেরই অঙ্গ। যেমন বেদে অবিদ্যা বা অপরা জ্ঞানের কথা আছে, সেইরূপ পরাজ্ঞান বা মহাবিদ্যারও কথা আছে। কিন্তু পাশ্চাত্যভাবে বিভোর হিন্দুর চক্ষে এখনে আর প্রাচীন সবই ধর্ম্ম ভাল লাগে না, তাই হিন্দুর অবনতি। ধর্ম্ম ও সংযমেই হিন্দুর হিন্দুত্ব এবং ইহাই মানবের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। কিন্তু সংযমের বাঁধ এখন সমাজে

ধাত্রি! অথচ সংযমই সুখের মূল একথা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? তাই হিন্দুর চতুরাশ্রমের প্রথম এবং প্রধান আশ্রম ছিল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। এ বিধান ছিল চতুর্বর্গলাভের প্রধান পথ, ধর্ম্মপ্রাণ জাতির ধর্ম্মোন্নতি বা স্বাস্থ্যোন্নতি শুধু ধর্ম্মপালনে। ধর্ম্ম কি? ভক্তিভাজন ৺চন্দ্রনাথ বসুর ভাষায় ইহার উত্তর এই "ধর্ম্মচর্য্যাই প্রকৃত ধর্ম্ম, কেবল কতকগুলি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিলেই ধর্ম্ম লাভ হয় না।" তাই আর্য্যশাস্ত্রকারগণ ধর্ম্মসংযমের জন্য নিত্যকর্ম্মাদি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এগুলির প্রতি আমরা এক্ষণে শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়া আসিতেছি। কান্তকবি রজনীকান্তের ভাষায় বলা যায় যে, "ধর্ম্মহীনতাই হয়েছে আমাদের ধর্ম্ম।" এই নীতি-অনুষ্ঠানের প্রতি অনাদর অবহেলা দেখাইয়াই আমরা ধর্ম্ম, সংযম, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সব বিষয়েই অবনতির পথে নিপতিত হইয়াছি। আমরা বিধিনিধি হারাইয়া দিন দিনই স্বেচ্ছাচারী ও অসংযমী হইতেছি। তাই শারীরিক মানসিক, কোন বলেরই গর্ব্ব করিবার কিছু আর আমাদের নাই। থাকিবেই বা কিরূপে? যেখানে ধর্ম্মের বেড়া নাই, নীতির বেড়া নাই, সেখানে মানুষের বৈশিষ্ট দেখাইবার কি আছে? আমাদের বিদ্যালয় এক্ষণে আর বিদ্যামন্দির নহে, বিদ্যালয় হইয়াছে শুধু অবিদ্যালয়। কেন না বিদ্যালয়ে শুধু অবিদ্যা বা অপরা জ্ঞানেরই (ভূগোল, ইতিহাস, ভূবিজ্ঞান ইত্যাদি) আলোচনা হয়, হিন্দুনীতিরই বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়, কিন্তু হিন্দুর অধ্যাত্ম বিদ্যার আলোচনা মোটেই নাই। তাই এখনকার শিক্ষানীতি বলে 'বিদ্যা দদাতি অবিনয়।" হৃদয়ের শিক্ষা ও আত্মার শিক্ষার অব্যবস্থা-কুব্যবস্থার ফলে এমন ফল ফলিবেই ত। শারীরিক স্বাস্থ্যের দিক দিয়াই দেখা যাউক না কেন? আমাদের স্কুল-কলেজের ছেলেরা আজকাল ফুটবল ক্রিকেটের কতই না উপাসনা করিতেছে, পাশ্চাত্যের অনুকরণে দুখারের জায়গায় পাঁচবার খাইতেছে, স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কতই না আলোচনা করিতেছে, কিন্তু স্বাস্থ্যবিষয়ে ত দিন দিনই রসাতলে যাইতেছে? অপর পক্ষে ধর্ম্মনিষ্ঠ নিরামিষাশী, নিত্যসায়ী, সন্ধ্যাপ্রাণায়মাদিতে নিত্যরত হিন্দুগণ সুগোল, হৃষ্টপুষ্ট ও শ্রীধর। কারণ তাহাদের মনোবল অধিক, তাহারা অধিকতর সংযমী। আত্মোন্নতি সাধনের ইচ্ছা থাকিলে সে পথই ধরিতে হইবে। মানুষ হইতে ইচ্ছা থাকিলে মনুষ্যত্ব লাভের দরকার, ধর্ম্ম সঞ্চয়ের দরকার। বঙ্কিম বলিয়াছেন, "যাহা থাকিলে মানুষ মানুষ নামে অভিহিত তাহাই তাহার ধর্ম্ম।" কি থাকিলে মানুষ মানুষ নামে অভিহিত? শরীর মন আত্মা ও হৃদয় লইয়াই মানুষ, একথা

পূর্ব্বেও বলিয়াছি। সুতরাং এই চারটীর সামঞ্জস্যগত উন্নতিবিধানই মানবধর্ম্ম। ইহা হিন্দু ও গ্রীক সভ্যতা-নীতির গোড়ার কথা। আবার হিন্দুর মতে ধর্ম্ম ও শিক্ষা পরস্পর পৃথক বস্তু নহে, বরং এক জিনিষ। সে শিক্ষার ত্রিবিধ পন্থা। যথা—শাস্ত্রোপদেশ, গুরু-উপদেশ ও লৌকিকতা। এই তিন প্রকারে শিক্ষা-সাঙ্গ হইয়া থাকে। কাজেই ধর্ম্মশাস্ত্র ও প্রাচীন-নীতির অনুসরণ করিয়া চলাই আমাদের প্রকৃত ধর্ম্ম বা প্রকৃত শিক্ষা। সংযমই সে শিক্ষার ভিত্তি। আর অসংযমই অভাব অনাটনের ও হাহাকারের শতমুখী উৎস। তাই-বলি এক্ষণে কোন্ পথ ধরিবে? স্বরাজের ভিত্তি সংযমের উপর নির্ভর করে। আর "মানুষের সম্মুখে স্বর্গ ও নরক উভয়ই বিদ্যমান।" স্বর্গের পথ সংযম, নরকের পথ অসংযম।

"নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্ব লইয়াই গীতার ভিত্তি আরম্ভ।" গীতা বলিয়াছেন "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ম ভয়াবহ"। ইহারই বা মানে কি? স্বধর্ম্ম বলিতে আত্মধর্ম্ম বা আত্মজ্ঞানই বুঝাইয়া থাকে। আত্মাই যখন মানবের প্রধান সম্পত্তি, তখন আত্মার শিক্ষাই আগে চাই। "জাতীয় শিক্ষা" বলিয়া, দেশে আজ একটা রব উঠিয়াছে। কিন্তু জাতীয় শিক্ষা ও জাতির কথা বলিবার আগে ব্যষ্টির কথা বলিতে হয় না কেন? ব্যষ্টি বা ব্যক্তির সমষ্টিই ত জাতি? আর ব্যক্তির আত্মোন্নতির জন্য শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার ব্যবস্থা চাই। সে শিক্ষাই পূর্ণাঙ্গ-শিক্ষা। অধিকন্তু আমাদের চলিতে হইবে ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ভাবিয়া, প্রাচীন ও নবীনের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া। কাজেই পাশ্চাত্যের কর্ম্মবাদের এবং আমাদের অধ্যাত্মবাদের সংমিশ্রণে শিক্ষানীতির "তিলোত্তমা সম্ভব" আদর্শ ধরিয়া আমাদিগকে চলিতে হইবে। আলোক ও আঁধারের সংমিশ্রণ যেমন সুন্দর ও মধুর, প্রাচীনতা ও নবীনতার সংমিশ্রণও তেমনি সুন্দর ও মধুর এবং উভয়ের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ ও অবশ্যম্ভাবী। উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, গীতাবাদই আমাদের শিক্ষানীতির মূল আদর্শ। প্রাচীন ও নবীনের এমন অদ্বৈত আদর্শ আর আছে কি? গীতাকার "কৃষ্ণ সর্ব্বত্র, বৃন্দাবনে, মথুরাতে অভিব্যক্তিতে উজ্জ্বল। তিনি মানুষী শক্তি দ্বারা কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন, কিন্তু তাহার চরিত্র অমানুষ।" (কৃষ্ণচরিত)।

গীতার বর্ণসৃষ্টির মূলেই গণতন্ত্রের তথা সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার সমন্বয়বাদ আছে। প্রাচ্য কথায় আছে—"আচারে ভালমানুষ আর বিদ্যেয় জাত"; আর গীতারও নীতি "কর্ম্ম এবং ধর্ম্ম" এবং "গুণ-কর্ম্মগত বর্ণ"।

সম্বোধন।

[ভারত-হিন্দু সভার অধিবেশনে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রি-লিখিত।]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহাতে বোধ হইবে যে, জাতিভেদ-প্রথা ভারতবর্ষের সকল রোগের নিদান না হইয়া উহা বহুতর রোগের অমোঘ ঔষধ। এ জাতিভেদ-প্রথা যাঁহারা উঠাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের কার্য্যের প্রতিরোধ করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য এবং সেই কর্ত্তব্য সাধনের উপায় অবলম্বনের জন্য আজ এই মহাসভার আহ্বান। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মুষ্টিভিক্ষা দেওয়া সকল ভারতবাসী গৃহস্থ আপনার নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু এখন তাহা উঠিয়াছে উহাতে আলস্যের আশ্রয় দেওয়া হয়। অতএব ওটা একেবারে লুপ্ত হয় সকলেই খাটিয়া খাও, যাহারা পারে না তাহাদের জন্য অনাথআশ্রম, ফুটাশ্রম হাঁসপাতাল প্রভৃতি স্থাপিত হউক। এ কথায় আমরা বাধ দিতে পারি না, কারণ, যেখানে একটা প্রতিষ্ঠান করিতে গেলেই দেখিতে পাওয়া যায় প্রতিষ্ঠাতার অধিকাংশ ব্যয়েই তাহার অর্দ্ধেক ব্যয় হইয়া যায়, প্রতিষ্ঠানের আসল কার্য্য কখনও হয় কখনও হয় না। এইজন্য যাহাকে কিছু দিতে হয়, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেওয়াই ভাল পরের হাতে তুলিয়া দিয়া তাহার ভরসায় নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকা ভাল নয়। কারণ আমরা যেন নিঃস্বার্থ পরোপকারের জন্য দিলাম, কিন্তু যাঁহারা প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধান করিবেন তাঁহাদের ত বাঁচা চাই, খাওয়া চাই। তাঁহাদের ত দাতাদের মত নিঃস্বার্থ হইলে চলে না। তাই বলি অনেক সময় মুষ্টিভিক্ষাই ভাল। তার জন্য প্রতিষ্ঠানের আশ্রয় লওয়া কিছু নয়। এ বিষয়েও মহাসভার মতামত গ্রহণ করা উচিত।

সংস্কৃত লেখাপড়া এতদিন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের হাতেই ছিল। তাঁহারা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দিতেন, সংস্কৃত সাহিত্য শিক্ষা দিতেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সাহায্যে ধর্ম্মশাস্ত্রও শিক্ষা দিতেন, মোক্ষশাস্ত্রও শিক্ষা দিতেন। তাঁহাদের সম্প্রদায় ছিল, প্রাচীন শৈলী ছিল, একটা ধারাবাহিক রীতি ছিল। সেই

অনুসারেই তাঁহারা শিক্ষা দিতেন। এখন স্কুল, কালেজ, ইউনিভারসিটির কল্যাণে ভাষা ও সাহিত্য ব্রাহ্মণেতর নানা বর্ণের হাতে পড়িয়া গিয়াছে। সে সম্প্রদায়-সিদ্ধ মত, সে শৈলী ও ধারা উঠিয়া গিয়াছে। ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে উঠিয়া যাউক তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু ধর্মশাস্ত্র ও মোক্ষশাস্ত্র ব্রাহ্মণের হস্তচ্যুত হইতে দেখিলে আমাদের সত্য-সত্যই ধর্মলোপের একটা মহা আতঙ্ক উপস্থিত হয়। এই যে দিন ইউনিভারসিটি হিন্দুর নামে, হিন্দুর টাকায় স্থাপিত, হিন্দুর গৌরবের কেন্দ্র বলিয়া পরিচিত ইউনিভারসিটি কোর্ট স্থির হইয়া গিয়াছে যে, ব্রাহ্মণেতর বর্ণও ধর্মশাস্ত্র ও মোক্ষশাস্ত্র শিক্ষা দিতে পারিবে। যখন ইউনিভারসিটি হয় তখন স্থির ছিল যে, যাহারা দক্ষিণা লইবার অধিকারী নহে, তাহারা ধর্মশাস্ত্র বা Theology পড়াইতে পারিবে না। অল্প দিনের মধ্যেই ইউনিভারসিটির এইটুকু মন পরিবর্তনে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া ইউনিভারসিটির সহিত সমস্ত সম্পর্ক ও সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু এই ঘোর অহিন্দু কার্য্যের যেরূপ তীব্র সমালোচনা ও ঘোরতর প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক ছিল তাহার কিছুই হয় নাই। যদি ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন বর্ণ ধর্মশাস্ত্র পড়াইতে আরম্ভ করিল, যদি সে যাগ-যজ্ঞেরও বিধি-বিধান দিতে আরম্ভ করিল, আর ব্রাহ্মণ ন্যূন হইয়া গেল, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বা হিন্দুধর্ম্ম কোথায় রহিল? হিন্দু-নামে একটা অহিন্দুর ব্যাপার আসিয়া উপস্থিত হইল। হিন্দুধর্ম্মের মূল সূত্রই ছাড়িয়া দেওয়া হইল, সে শিক্ষা আর হিন্দুশিক্ষা রহিল না তাহাকে আর যাহা ইচ্ছা তাহাই বল, কিন্তু হিন্দু বলিবার কোন অধিকার রহিল না। এই যে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি দারুণ আঘাত, ইহারও প্রতিবিধানের জন্য মহাসভা যত্নবান হইবেন।

পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়-রত্ন টোল-পণ্ডিতদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য, তাঁহাদের পসার, বাড়াইবার জন্য, লাট সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটরীকে এক পত্র লেখেন। সেই পত্রের মর্ম্মানুসারে 'মহামহোপাধ্যায়' এই নূতন উপাধির সৃষ্টি হয়। প্রথম কয়েক বৎসর সত্য-সত্যই টোল-পণ্ডিতদিগকে উপাধি দেওয়া হইয়াছিল। পরে উহা সংস্কৃত এম-এ দের দেওয়া হইতে লাগিল। টোল-পণ্ডিতেরা উহাতে ক্ষুব্ধ হইলেন কিন্তু এখন দাঁড়াইয়াছে সংস্কৃতে পণ্ডিত হইলেই তাঁহাকে দেওয়া হয় তাহাতে জাতিরও বিচার নাই, পাণ্ডিত্যেরও বিশেষ বিচার হয় বলিয়া মনে হয় না। উড়িষ্যার একজন ক্ষত্রিয়কে ঐ পদ দেওয়া হইয়াছিল, রাজপুতনার কয়েকজন চারণকে ঐ উপাধি দেওয়া হইয়াছিল, দুইজন শাকদ্বীপীকে ঐ উপাধি দেওয়া হইয়াছিল, কয়েকজন

বৈদ্যকে ঐ উপাধি দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মী মাত্রেরই মনে বিশেষ ক্ষোভের উদয় হইয়াছে। যাহাতে এরূপ ব্যাপার আর না ঘটে তাহার জন্য দু চারবার বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু ফলও হইয়াছিল, কিন্তু মোট ব্যাপার ঠিক যেমন ছিল তেমনি আছে। সকল জাতির লোককেই ঐ উপাধি দেওয়া হইতেছে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের এই ক্ষোভের প্রতিবিধান এই মহাসভা হইতে হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

টোলে এবং সংস্কৃত কালেজে সংস্কৃত শিক্ষা ও সংস্কৃত পরীক্ষার যে প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাও আমাদের প্রাচীন রীতির বা প্রাচীন পদ্ধতির অনুযায়ী নহে। কিন্তু এত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ের বর্ণনা করিয়া আমি আর আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে চাহি না। যদি ভগবানের ইচ্ছায় মহাসভা স্থায়িত্ব লাভ করে, তবে সভাই সকল সন্ধান লইয়া সকল বিষয়ের শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে পারিবেন। সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ যে একজন বর্ণাশ্রমধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ হইবেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই হইতে পারে না। কিন্তু অনেক স্থলে তাহা না হওয়ায় ব্রাহ্মণসমাজের মহাক্ষোভের কারণ হইয়াছে। খৃষ্টানী শিক্ষা ও ব্যবসায় লইয়াই এ যাবৎ হিন্দু-সমাজ। কতদিক হইতে যে এরূপ ব্যবধান ও ব্যবহারের বিরোধ ঘটিতেছে তাহা বলা যায় না। ইংরেজী চিকিৎসা, ইংরেজী ঔষধ, ইংরেজী পদ্ধতি চিকিৎসা ইত্যাদি ইংরেজী ব্যবস্থা অনেক সময় আমাদের আচার ব্যবহারের বিরোধ ঘটাইয়া থাকে। সাহেব ডাক্তারও তাঁহাদের প্রণালীর বিপরীত রোগীর ধর্ম্মমত, কর্ম্মবিশ্বাস ও আচারের সম্পূর্ণ বিরোধী ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

স্বাস্থ্যবিভাগ হইতেও আমাদের আচারব্যবহারের উপর দারুণ আঘাত করা হইতেছে। স্বাস্থ্যবিভাগ পাঠশালায় পড়ার জন্য স্বাস্থ্যবিজ্ঞান নামে যে বই শিখাইয়া লইতেছেন। তাহাতে সর্ব্বত্রই আমেরিকাবাসীদের কেমন করিয়া কলেরা, প্লেগ, বসন্ত প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে, গোবর দেওয়ার ব্যবস্থা এবং কোথাও নাই। তাহা এখানে বইয়ে গোবর দিতে নিষেধ পর্য্যন্ত করা হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের বলেন, গোবরের কথা থাকিলে বই পাশ হয় না। গোবর যে দুর্গন্ধনাশক এবং বিষাক্তপদার্থ-নাশক সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু পাশ্চাত্যের ভূমি-সিক্ত গোলা উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। তাহার ফলে কলেরা ও প্লেগ্‌ সিমেন্ট্‌ করা পটাশের ব্যবস্থা হইয়াছে। এইরূপ সকলবিষয়ে ইংরেজ জাতির ধর্ম্ম সংস্কারের ও কর্ম্ম-বিশ্বাসের প্রতিকূলে কার্য্য হইতেছে। [illegible] না হইতে দেওয়া আমাদের উচিত ছিল। অনেক পূর্ব্বেই আমাদের [illegible]

করের প্রতিবাদ ও প্রতিষ্ঠান করা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা তাহা করি নাই। রাষ্ট্র বিদেশী, তাহারা অনেক সময় না বুঝিয়া আমাদেরই হিত হইবে মনে করিয়া আমাদেরই ধর্ম্মবিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ত' ভাল, প্রতিবাদ করিলে বিচার করেন, ভাল হইবে কি মন্দ হইবে দেখিয়া শুনিয়া বিচার করেন। কিন্তু আমাদের ঘরের শত্রুই আমাদের বিষম বিরোধী। তাঁহারা বলেন, আমরা যে দুর্ব্বল, পরাধীন ও বিজিত হইয়াছি, তাহা কেবল আমাদের আচার-ব্যবহারের দোষে, ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে, বিধি-ব্যবস্থার দোষে হইয়াছে। সুতরাং যা কিছু আমাদের আছে তাহারা সব উল্টাইয়া দিতে চান, একেবারে আমাদিগকে সাহেব করিয়া দিতে চান। ভয় এ মামলা তাঁহাদেরই কাছে অধিক; তাঁহারা যে সংস্কার করিতে গিয়া কলাগাছই সমাজ ভাঙ্গিতেছেন, সমাজে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা আনিতেছেন, উহার বন্ধন শিথিল করিয়া দিতেছেন। কিন্তু আমাদের আর চুপ করিয়া থাকা উচিত নয়। গভর্ণমেণ্ট এখন অনেক কাজ আমাদের হাতে ছাড়িয়া দিতেছেন। আমাদেরই মতামতের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভা বসাইয়া লইতেছেন। এবং ব্যবস্থাপক সভা হইতে অনেক বিভাগে মন্ত্রী নিযুক্ত করিতেছেন। আমাদের এখন উচিত, আমাদের একমতাবলম্বী লোক বাছিয়া ব্যবস্থাপক সভায় পাঠান ও মন্ত্রীত্বে নিযুক্ত করা। তাহা যদি আমরা না করি, আমরা যদি এখন চুপ করিয়া বসিয়া থাকি, আমাদের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ব্যবস্থাপক সভায় যাইয়া আমাদের প্রতিনিধি বলিয়া আপনাদিগকে ঘোষণা করিয়া আমাদের আচার ব্যবহার ও সমাজ-রীতির বিপরীত ব্যবস্থা করিতে থাকেন, তখন আমাদের হায় হায় করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকিবে না, গভর্ণমেণ্টের কাছে প্রতিবাদ করিবার মুখও থাকিবে না। তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া বলিবেন, তোমাদেরই প্রতিনিধিরা এই কাজ করিয়াছেন, আমরা কি করিব? সুতরাং প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনে আমাদের খুব সাবধান ও সতর্ক হওয়া উচিত এবং সেইরূপ হইতে হইলে আমাদেরও সকলের একমত হইয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য। আমাদের প্রতিনিধিরাও অনেক সময় আমাদের বিরুদ্ধেই মত দেন। অনেক সময় আমাদের কার্য্যের সময় নিলিপ্ত ভাবে বসিয়া থাকেন অথবা কৌশল করিয়া সভায় অনুপস্থিত হইয়া থাকেন। এরূপ প্রতিনিধি যে আমাদের উপযুক্ত প্রতিনিধি নহেন, সেটা আমাদের বিশেষ করিয়া জানিয়া রাখা উচিত। বারান্তরে তিনি যেন আমাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইতে না পারেন।

এই সকল কারণেই আমরা এই মহাসভা আহ্বান করিয়াছি। এ সভার উদ্দেশ্য—বর্ণাশ্রম ধর্ম্মরক্ষা। কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মোটা মোটা কথাগুলি একশত বৎসরের ইংরেজী শিক্ষায় ইংরেজকে গুরু কথায় ইউরোপীয় সাহিত্য, ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাবে শিক্ষিত সমাজ ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগকে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মূল নিয়মগুলি স্মরণ করাইয়া দেওয়া বিশেষ দরকার হইয়াছে। যাঁহারা ইংরেজী শিক্ষা লন নাই বা পান নাই, তাঁহারা অনেকটা ঠিকই আছেন। সুতরাং শিক্ষিতবর্গকে আবার বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মূলসূত্র শিখাইতে হইবে এবং অশিক্ষিত সমাজ যাহাতে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম হইতে অণুমাত্র বিশেষভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন তাহারও চেষ্টা করা হইবে। কার্য্য অতি গুরুতর কিন্তু এ কার্য্য হইতে বিরত হইলে চলিবে না—একার্য্যে উদাসীন হইলে চলিবে না, এ কার্য্যে অমনোযোগ করিলে চলিবে না, সর্ব্বদা ভক্তি সহকারে নম্রতা ও সহৃদয়তার সহিত অবহিতচিত্তে ইহার উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে, ইহার শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে, যাহাতে ইহা সতেজ, সবল ও ফলপ্রসূ হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের সকলকে একমনে একপ্রাণে লাগিতে হইবে, কিছুমাত্র অনবধান হইলেই বিশৃঙ্খলা হইবার সম্ভাবনা, তাই সর্ব্বতোভাবে করিয়া আমাদের এ কার্য্যে লাগিতে হইবে। একের চেষ্টা বিফল হইতে পারে, দুইয়ের চেষ্টা বিফল হইতে পারে, দশের চেষ্টা বিফল হইতে পারে, কিন্তু সকলে সমবেত চেষ্টা করিলে বিফল হইবার সম্ভাবনা অল্প। সেখানেও যদি বিফল হই একবার বিফল হইব, দুইবার বিফল হইব, দশবার বিফল হইব। কিন্তু লাগিয়া থাকিলে আমাদের মনস্কামনা নিশ্চয় পূর্ণ হইবে। আমাদের উদ্দেশ্য শুদ্ধ আত্মরক্ষা, কাহারও সহিত ঝগড়া করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যে সকল আচার-ব্যবহার নীতি-নীতি, বিধি-ব্যবস্থা আমাদের এককালে জগতের শ্রেষ্ঠ পদ প্রদান করিয়াছিল,—আমরা শুদ্ধ সেই সকল আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, বিধি-ব্যবস্থা রক্ষা করিয়া চলিব। তাহার বিরুদ্ধবাদীদিগের প্রতিবাদ করিব ও তাঁহাদের আপনার মতে আনিতে চেষ্টা করিব। আমরা আত্মরক্ষা চাই, পরের ক্ষতি চাই না। আমরা লোপ হইতে চাই না, অস্তিত্বমাত্র বজায় রাখিতে চাই। আইস, আমরা সকলে মিলিয়া লাগি, ভগবান আমাদের মঙ্গল করুন

সংস্কৃত-বাঙ্গালা।

সংস্কৃতই বাঙ্গালা, সংস্কৃতের প্রত্যেক শব্দই—প্রত্যেক ধাতুই বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত হইতে পারে। অগ্নি, মহাস, লিঙ্গ, অব্যয়, প্রত্যয়, ধাতু ও অর্থ সবই একরূপ। তবে শব্দরূপ, ধাতুরূপ, ক্রিয়ারূপ ও ছন্দাদি বিভিন্ন বলিয়া বাক্য ও পদ্যরীতি স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। মন প্রায় এক; বুদ্ধি ও কবিতার ন্যায় সংস্কৃত ও বাঙ্গালা এক বৃক্ষের যমজরূপ। একের অস্তানে অন্যের নিতান্ত অবশ্যম্ভাবী, তাই উভয়ের সংযোগ ও সহায়তায় উভয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইয়াছিল। অভিধান ও ব্যাকরণ উভয় ভাষাকে একসূত্রে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিল।

আজিকালিকার উদীয়মান শিক্ষিত আধুনিক কবি-সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই মনে করেন সংস্কৃত ভাষা অতি জটিল অতি কঠিন অতি দুর্বোধ, ইহা শিক্ষা বা অধ্যয়ন ভাল নাহে, ইহা বর্জ্জন করিয়া বাঙ্গালা লিখিলেই ভাল হইবে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বাঙ্গালা ভাষাকে সংস্কৃত শব্দ ও ব্যাকরণ হইতে ক্রমশঃ দূরে লইয়া যাইতেছেন। অনেকে নিজের মনঃকল্পিত অশ্রুতপূর্ব্ব নূতন শব্দ ব্যবহার করিতেছেন। অনেকে গ্রাম্য ও বৈদেশিক অপশব্দ ব্যবহার করিয়া সংস্কৃতের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছেন, অনেকেই ক্রিয়া কর্ত্তা কর্ম্ম বিলোপ রাখিয়া আপন মনে কবিতা বা প্রবন্ধ লিখিয়া যাইতেছেন, অনেকে ব্যাকরণ বা অভিধানের সাহায্য সম্মার্জ্জনী মার্জ্জনা করিয়া বাহাদুরী লইতেছেন। তাঁহারা একবারও ভাবেন না, ভাষা মুষ্টিমেয় লোকের বুঝিবার জন্য নয়—সমস্ত ভাষা তাঁহাদের নিজের নয়; বাঙ্গালার সাড়ে সাত কোটি ও বাহিরের আরও দুই কোটি বাঙ্গালীর জন্য সমস্ত ভাষার সৃষ্টি। কিছুদিন পূর্ব্বেই বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি পরিবারে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ব্যবহৃত হইত; অপশব্দ-কলুষিত গ্রাম্য ভাষা নিতান্ত ইতর লোকের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। ভাষা দ্বারাই ভদ্র অভদ্র, জ্ঞানী মূর্খ, বোধ প্রতিপন্ন হইত। এখন আর তাহা নাই। রাজাধাস্ত বিচার রীতির ন্যায় ভাষার বিচারও উঠিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বের "পিতা পুত্র" স্থলে এখন "বাপ বেটা" "বালক বালিকা" স্থলে "ছেলে-পুলে" "গাভী বৎস" স্থলে "গাই বাছুর" ইত্যাদি হত বলিয়া সবেরই মহাপরিবর্ত্তন

ঘটিয়াছে। ইহা ছাড়া আরও কত শ্লেচ্ছ-প্রসূত, খন্ড ঘনঃকল্পিত কত অপশব্দ, কত সঙ্কীর্ণ গ্রাম্যশব্দ সাহিত্যে ব্যবহৃত হইতেছে তাহার ত ইয়ত্তা নাই। সেগুলি "প্রকৃতিবোধে" থাকে না; ব্যাকরণের বন্ধনে পড়ে না; আমাদের মত বাঙ্গালী পাঠকের বোধগম্যও হয় না। এক অফিসার "পঞ্চিশ টাকা মূল্যের "সার" চুরি গিয়াছে" লিখিয়াছিলেন; ইংরেজী রিপোর্টে ছিল—"Ox," একজন উকীল "বিক্রীত সম্পত্তি" লিখিয়া আরজী দেন তাহা "বিক্রান্ত সম্পত্তি।" একজন হাকিম "বাড়ী" স্থলে বারি লিখিয়াছিলেন, একজন মাষ্টার "স্বরস্বতী" লিখিয়া তর্ক করিয়াছিলেন, তিনি বলেন স্বর যাহাতে স্থিত সেই "স্রোতস্বতী" ইহা ব্যতীত অল্পশিক্ষিত লোকে ভাষাকে কত প্রকার অশুদ্ধ ও অপশব্দ দ্বারা বিকৃত করিতেছে তাহা ভাবিলে মনে নিদারুণ আঘাত লাগে। 'স্বময়' স্থলে নিজস্ব "স্বড়গ স্থলে স্বর্গ, "প্রীতি" স্থলে "পৃতি" লিখিতে কেহই দ্বিধা বোধ করে না। এইরূপে বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত-জাত শব্দ হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িতেছে। আধুনিক শিক্ষিতসমাজ ইহা যেন মনে রাখেন জলাশয় যেরূপ তটবদ্ধ, তদ্রূপ ভাষাও তটরূপ অভিধান ও ব্যাকরণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তট নাড়িয়া গেলে জলরাশি যেরূপ চতুর্দ্দিকে যথেচ্ছ সরিয়া যায়, গভীরতা ও জলাশয় বিশুষ্ক হয়, তদ্রূপ ব্যাকরণ ও অভিধানের বন্ধন ছাড়িয়া দিলে ভাষাও যথেচ্ছগামিনী হইয়া আপনা আপনি বিনষ্ট হইয়া পড়ে। অভিধান ও ব্যাকরণহীন কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাষা যে অকালে বিনষ্ট হইয়াছে তাহারও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ওদিকে ফরাসী, জৈর্মণ প্রভৃতি সুশিক্ষিত পণ্ডিতমণ্ডলী সংস্কৃত ভাষাকে চির-অব্যবহার্য্য অপ্রচলিত দুরূহ ও জটিল শব্দ দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া বাঙ্গালীর অপাঠ্য করিয়া তুলিতেছেন। "খল" (দিবস) প্রভৃতি যে সব জটিল ও অব্যবহার্য্য শব্দ ব্যাকরণের ব্যবহার করেন নাই, সেই সব দুরূহতম অচল শব্দই তাঁহারা চালাইতে গৌরবান্বিত হইতেছেন। একদা "৩০শে শ্রাবণ" লিখিতে কয়েকজন পণ্ডিত বহু অনুসন্ধানের পর "ফুল্লিরস্য ত্রিংশদ্ খলে" লিখিয়াছিলেন। তাই মহাত্মা পূজনীয় পণ্ডিতমণ্ডলীকে সবিনয় নিবেদন করিতেছি, তাঁহারাও যেন চিরপ্রচলিত সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় ব্যবহৃত সুমধুর সরল শব্দ প্রয়োগ করিয়া লোকাদি রচনা করেন এবং ভাগবত, ভট্টাচার্য্য ও শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় সরল সংস্কৃত নূতন নূতন নীতি গর্ভপূর্ণ কাব্য প্রণয়ন করিয়া প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর সংস্কৃত পাঠের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন—সংস্কৃত দুর্যোধন এই দুর্নীতি দূর করুন।

ন স্থূলা ন কৃশা বাপি সর্ব্বে সর্ব্বমনোরমা।

শুক্রনীতিসারে ৪র্থ অঃ।

কৃত কৌতুকসর্ব্বস্বা বেদিমূলমুপাগতা।
মম কন্যা মুনিশ্রেষ্ঠ দীপ্তাবহ্নেরিবার্চ্চিষঃ॥ বাঃ রাঃ আদিকাণ্ড

ময়াহতে সংযতি কুম্ভকর্ণে
মহাবলে মুষ্টি বিশীর্ণদেহে।
বিমোচিতে বানর পার্থিবেচ
ভবন্তু হৃষ্টাঃ প্লবগাঃ সমগ্রাঃ॥ বাঃ রাঃ লঙ্কাকাণ্ড

চিত্রকূটে তথাসীতা বিন্ধ্যে বিন্ধ্যাধিবাসিনী।
কবরীরে মহালক্ষ্মী রুদ্রাদেবী বিনায়কে॥
আরোগ্যা বৈদ্যনাথেতু মহাকালেমহেশ্বরী।
অভয়েত্বম্বা তীর্থেষুনিতথা বিন্ধ্যপর্ব্বতে॥
মাণ্ডবে মাণ্ডবী নাম স্বাহা মাহেশ্বরীপুরে।
ছগলাণ্ডে প্রচণ্ডাতু চণ্ডিকাম্বর কণ্টকে॥ দেবীভাঃ সপ্তম খণ্ড;

নলিনী-দল-গত-জলমতি-তরলং
তদ্বদ্ জীবনমতিশয়চপলং।
ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতি রেথা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥ শঙ্করাচার্য্য

স্মর সমরোচিত বিরচিত বেশা।
গলিত কুসুম ভরবিগলিত কেশা॥
বিচলদলকলসিতানন চন্দ্রা।
তদধর পানরস কৃততন্দ্রা॥
চঞ্চল কুণ্ডল ললিত কপোলা।
মুখরিত রসন জঘন গতি লোলা॥
দয়িতবিলোকিত লজ্জিত হসিতা।
বহুবিধ কূজিত রতিরসরসিতা॥

শ্রীগীতগোবিন্দম্।

টলষ্টয়ের কথা।

"When He saw the multitudes, He was moved with compassion for them, because they were distressed and scattered, as sheep not having a shepherd." Matt. IX 36

একই সময় সর্ব্বজাতির মধ্যেই একই ব্যাপার ঘটিয়া আসিতেছে। যে সকল লোক কৃষি, শিকার বা গো-মেষাদি পশুপালন-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া নিজ নিজ পরিবার পালন করিয়া থাকে, তাহারা তাহাদের নিকেতের মধ্যে কোন পৃথক দল বা অপর কোন জাতি দ্বারা পরিশ্রম-লব্ধ দ্রব্যাদি হইতে বঞ্চিত হইয়া আসিতেছে। পৃথিবীর ঐ দল বা ভিন্ন জাতি বলপূর্ব্বক শান্তিপ্রিয় অধিবাসীদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে, পরে তাহাদিগকে দাস করিয়া পরিশ্রম-লব্ধ অর্থ আদায় করিতে থাকে। পূর্ব্বে এই রূপ ঘটিত এবং বর্ত্তমানে আফ্রিকা এবং এসিয়ায় ইহা ঘটিতেছে। এই শ্রমিকদের নৈতিক চরিত্র তাহাদের নেতাদের অপেক্ষা অনেক বেশী থাকিলেও তাহারা নেতাদের পদপ্রান্তে মাথা নত না করিয়া যেন থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ পক্ষে মানবজাতির মধ্যে এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, যে সম্প্রদায় প্রকৃতির সঙ্গে সমূল যুদ্ধ করিয়া, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া নিজ নিজ বৃদ্ধ পিতামাতা এবং পুত্র-পরিবারের অন্নের সংস্থান করিয়া থাকে, তাহারা অন্যের সঙ্গে কলহ-বিবাদ একেবারেই পছন্দ করে না; অত্যাচারীর নিষ্ঠুর দুর্ব্যবহার আবাল্য শির নত করিয়া বরং সহ্য করিতে বাধ্য হয়, তথাপি বড় যত্নের, বড় শান্তির আশ্রয়-স্বরূপ লাঙ্গল ছাড়িতে প্রস্তুত হয় না। ক্রমে ক্রমে তাহারা বিনা বাক্যব্যয়ে অত্যাচারীর কবলে পড়িয়া নানাপ্রকার কঠোর যন্ত্রণা ও পীড়ন সহ্য করিয়াই যে ক্ষান্ত থাকে তাহা নয়, পরন্তু তাহাদের অস্বাভাবিক অসঙ্গত দাবী পূরণ করাটাকেই শেষে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে। যাহারা সমাজের প্রধান ও প্রথম অঙ্গ, যাহারা সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী এবং সর্ব্বোপরি যাহারা নৈতিক চরিত্রে আদর্শস্বরূপ, তাহারা প্রত্যেক জাতির মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী অবিচারের ও অত্যাচারের তীক্ষ্ণ অসির মুখে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ করিতেছে কিন্তু ক্ষেত্রকর্ষণ, শস্য উৎপাদন ইত্যাদি কার্য্য হইতে ক্ষান্ত হয় নাই।

ফরাসির হাতে বেহুইনদের আত্মসমর্পণ দেখিলেই আমরা এই সত্য সহজে লাভ করি যে, যাহারা দুষ্টপ্রকৃতি, অলস, এবং অর্থলোভী, তাহারা পৃথিবীর সকল দেশে সকল সময় শান্ত অধিবাসীদিগকে আক্রমণ করিত এবং তাহাদিগকে হত্যা করিয়া বা ভয় দেখাইয়া তাহাদের পরিশ্রমলব্ধ দ্রব্যাদি দ্বারা লাভবান্ হইত, পরিশ্রমী নিরীহ ব্যক্তিবর্গ প্রথমতঃ যুদ্ধবিদ্রোহাদি যেমন পছন্দ করিত না, তেমনি অত্যাচারকে বাধা দিতে হইলে তাহাদের নিজেদের এবং প্রতিবেশীর ভরণপোষণের ব্যাঘাত হয় বলিয়া অত্যাচারীকে প্রতিরোধ করার চেয়ে আত্মসমর্পণ করাই ভাল মনে করিত।—সাধুদের প্রতি দুষ্টের এই অত্যাচারের উপরই সমগ্র মানব-সমাজের আধুনিক সমস্যার ভিত্তি স্থাপিত।

(২)

বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই নিষ্ঠুরতার সহিত শাসক এবং শাসিতদের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এই দুষ্ট সম্বন্ধ দিন দিন পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া চলিতেছে। ক্ষমতাশালী যতই নির্ভীকভাবে তাহার ক্ষমতা চালনা করিতেছে, ততই তাহা নিষ্ঠুর ও বিকৃত মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে এবং দুর্ব্বলের প্রতিও অবিচারের মাত্রা বাড়িয়া যাইতেছে। অন্যদিকে ক্ষমতার অপব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বলের অন্তরে এক অভিনব বিদ্রোহের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছে। তাহাদের অন্তস্তল হইতে কে যেন চীৎকার করিয়া বলিতেছে—এই নিষ্ঠুর অত্যাচারের কাছে মাথা নোয়ান পাপ, তাকে বাধা দেওয়াই প্রকৃত মনুষ্যত্ব।

অন্যদিকে ক্ষমতাশালী দিন দিন চরিত্রহীন হইতে লাগিল। প্রথমতঃ তাহাদের নৈতিক চরিত্রবল মোটেই থাকিত না। হাতে অসীম ক্ষমতা লাভ করিয়া তাহা লালসা চরিতার্থ করিতেই ব্যয় করিত এবং সাধারণ মানবের পক্ষে যে লালসা তৃপ্তির পথে ছোট বড় নানাবিধ বাধা আসিত, ক্ষমতাশালী কেবল যে তাহা বিনা বাধায় চরিতার্থ করিতে পারিত তাহা নহে, বরং পারিষদ্-বর্গদ্বারা শতমুখে তাহার প্রশংসা করা হইত। ফলে অগ্নি ঘৃতাহুতি পাইলে যেরূপ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে তেমনি তাহাদের লালসার মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহাই শেষে নিরো, চার্লস্, হেনরী, লুই, জন, পিটার, ক্যাথারিণ, ম্যারাটের শাসন বিষাক্ত করিয়াছিল।

এইখানেই শেষ নয়। যদি শাসনকর্ত্তারা নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যভিচারে পূর্ণাহুতি দিয়াই শান্ত থাকিত তবু একটা কথা ছিল। তাহাদের কলুষিত

জীবনের একটা কিছু অবলম্বন থাকা চাই। অন্যান্য বাসনা কালক্রমে পরিতৃপ্ত হইত, কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষার কিছুতেই যেন নিবৃত্তি হইত না। সৈন্য-গঠন, অর্থ-সংগ্রহ, নরহত্যার সঙ্গে সঙ্গে খ্যাতি অর্জ্জন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকিত, ফলে অত্যাচারের মাত্রা এতদূর বাড়িয়া যাইত যে, শাসিত আর কোন মতেই শাসকের নিষ্ঠুর ক্ষমতার গণ্ডীর মধ্যে আপনাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিত না। একটা কিছু পরিবর্ত্তনের জন্য সে যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিত।

অধিকারগত ক্ষমতা দুই প্রকারে ধ্বংস হইয়া যায়। অত্যাচারের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন কর্ত্তৃপক্ষের নৈতিক চরিত্র দিন দিন কলুষিত হইতে থাকে, অন্যদিকে তেমনি প্রতি আঘাতে প্রজার মনুষ্যত্ব সজাগ প্রহরীর মত সাড়া দিয়া উঠে। অতএব কালক্রমে এমন এক মুহূর্ত্ত আসিবে এবং আসিবেই আসিবে, যখন শাসক এবং শাসিতদের সম্বন্ধে পরিবর্ত্তন ঘটিবে। শাসনকর্ত্তাদের অত্যাচারের মাত্রানুযায়ী ঐ মুহূর্ত্ত কোন জাতির পক্ষে দুদিন আগে আসে, আবার কোন জাতির পক্ষে দুদিন পরে আসে। পাশ্চাত্য জাতির পক্ষে অনেক পূর্ব্বে রোম সাম্রাজ্য ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে ঐ দিন আসিয়াছিল। তুরস্ক, পারস্য, চীন প্রভৃতি প্রাচ্য জাতির পক্ষে সে মুহূর্ত্ত এখনও আসে নাই। অন্যান্য পাশ্চাত্য জাতির ন্যায় বর্ত্তমান শাসনের নানাবিধ দোষ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া শক্তির আঘাতেই উহাকে উল্টাইয়া ফেলিয়া নূতন শাসন প্রতিষ্ঠা করিবে, রুশিয়াবাসীর অন্তরে অন্তরে আজ এই একই কথা বাজিতেছে।

রুশিয়ার প্রায় সমগ্র নরনারী এই শেষোক্ত উপায়কেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিতেছে। তাহারা বর্ত্তমান ক্ষমতাকে যুদ্ধে ধ্বংস করিয়া সেই ক্ষমতা সমগ্র দেশবাসীর মধ্যে সমানভাগে ভাগ করিয়া লইতে চায়। কিন্তু এই কি শ্রেষ্ঠ পন্থা, এই কি সত্য মত? যদি সত্য ও শ্রেষ্ঠ হইবে, তবে যাহারা পূর্ব্বে এই পথ দিয়া অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যেও বিশৃঙ্খলতা, অত্যাচার ও তাহার প্রতিবাদ দেখিতে পাওয়া যায় কেন? জাতির মধ্যে যে নেতারা অবিচার অত্যাচারের মূল উৎপাটন করিয়া নূতন শাসন প্রতিষ্ঠা করেন, তাহারাই আবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া বিচারকের গদিতে বসিয়া নূতন অত্যাচারের প্রবর্ত্তন করেন। ফলে ক্রমে আবার তাহার ধ্বংস হইয়া যায়, আবার নূতন আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। এই ভাবে ফ্রান্সে ৮০ বৎসরে ১১ বার শাসন পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। শক্তির অপব্যবহার দেখিয়া লোকে তাহা সীমাবদ্ধ করিয়া শাসনপ্রণালী দেশবাসীর মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করিয়া লইতে চায়। এই

ভাবে ফ্রান্স, আমেরিকা ও সুইজারলণ্ডে সাধারণতন্ত্র গঠিত হইয়াছে, কিন্তু তাহারাও কি সম্পূর্ণভাবে নির্দ্দোষ হইতে পারিয়াছে ?

"But the only effect of all these measures was that citizens of these states, participating more and more in power, and being more and more diverted from serious occupations, grew more and more depraved. The calamities from which the people suffered remained however, exactly the same under Constitutional, Monarchical or Republic Government, with or without Referendum.....Therefore, among all nations, however they are ruled, whether by the most despotic or most democratic Government, the chief fundamental calamities from which the people suffer, remain the same.—The same ever-increasing budgets, the same animosity towards their neighbours, necessitating military preparation of armies, the same taxes the same state and private monopolies, the same depriving of the right to use the land (which is given to private owners), the same enslaving of subject races, the same constatnt threatening of war and the same wars destroying the lives of men and undermining their morality."

(৩)

যুদ্ধ-বিদ্রোহাদিজনিত কষ্ট ও পাপের ভয় করিয়া পাশ্চাত্য জাতি বিন্ শক্তির মূলে মাথা নত করিত ; কিন্তু যখন সেই শক্তি বহন করা ক্রমে অসহ্য হইয়া পড়িত তখন তাহার প্রতিবাদ না করিয়া আর থাকিতে পারিত না। প্রথমে অল্পসংখ্যক লোক অগ্রসর হইত এবং তাহাদের সদুদ্দেশ্য এবং সফলতা দর্শন করিয়া ক্রমেই দলপুষ্টি হইত। পূর্ব্ব শক্তি ধ্বংসের পর নূতন যে শাসন প্রতিষ্ঠা করা হইত, তাহার ভিত্তিতে উৎকোচ, তোষামোদ, গর্ব্ব প্রভৃতি দোষ প্রকাশ পাইত থাকিয়া যাইত। পার্লামেণ্টের কোন সদস্যই এই প্রলোভন হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। প্রত্যেক ডেপুটিই অসম্ভব রকমের প্রতিজ্ঞা দ্বারা লোককে বোকা বানাইয়া তাহার সমতার প্রতিষ্ঠা করেন এবং অবশেষে সদস্য হইয়া তাঁহার পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞার সম্পূর্ণ বিপরীত আইন গঠন করেন। সেনেটর এবং প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনের মূলেও ঠিক ঐ একই রকম গলদ আছে। যুক্ত প্রদেশে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনের সময় পদপ্রার্থীর লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হইয়া যায় এবং সাধারণের উৎকোচে বশীভূত অথবা প্রতিজ্ঞায় মুগ্ধ হইয়া

ভোট দিতে থাকেন এবং কিছুদিন যাইতে না যাইতেই তাহারা ফল ভোগ করিতে আরম্ভ করেন। কাজেকাজেই দেশে প্রকৃত শান্তিস্থাপনের আশা সুদূর-পরাহত হইয়া উঠে।

"That peace, which to the ancient who saluted each other with the words "Peace be unto you" seemed the greatest blessings, has now quite disappeared from among the western people; and not only has it disappeared, but by aid of science, men try to assure themselves that not in peace, but in the strife of all against all man's highest destiny.

And really, among the western nations, the necessary industrial, commercial and military strife is continually waged a strife of state against state, class against class, Labour against Capital, party against party, man against man."

এইখানেই দুরবস্থার শেষ নয়, জাতি যতই ক্ষয়তাশালী হইতে থাকে, ততই সে কৃষিকর্ম, পশুপালন প্রভৃতি ছাড়িয়া দেয় এবং ভুলিয়া যায়। অবশেষে এই সকল কার্য্যে ইচ্ছা বা অভ্যাস না থাকায় পাশ্চাত্য জাতি নিজ নিজ জীবিকা উপার্জ্জনের ভার অন্যান্য দেশের উপর ছাড়িয়া দিতেছে। তাহারা দুই প্রকারে সাধন করিয়া থাকে, প্রথমতঃ প্রবঞ্চনা দ্বারা অর্থাৎ মদ, আফিম অস্ত্র শস্ত্র ইত্যাদি অনাবশ্যক অথবা দূষিত দ্রব্যাদির পরিবর্ত্তে খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করা এবং দ্বিতীয়তঃ উদ্যমের দ্বারা অর্থাৎ সুযোগ এবং সুবিধা মত দুর্ব্বলদিগকে লুণ্ঠন করিয়া। জার্ম্মানী, অষ্ট্রিয়া, ইটালী, ফরাসী, মার্কিণ প্রভৃতির এই অবস্থা। ঐই সকল দেশের অধিকাংশ জনসাধারণের প্রধান এবং প্রথম কার্য্য গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করা এবং শিল্প ও বাণিজ্য দ্বারা প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করা। যতো ইহাতে দেশে ধনী লোকদের বিলাসিতার পূর্ণবিকাশ হইতেছে এবং দেশের অথবা ভিন্ন দেশের শান্তিপ্রিয় নিরীহ হতভাগ্য কৃষকগণকে অর্থ এবং শক্তির প্রভাবে নিষ্ঠুর ভাবে পরাধীনতার দৃঢ় পাশে বদ্ধ করা হইতেছে। শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার বিলাসিতার মনমুগ্ধকর সুন্দর অট্টালিকা, ললনাদের নয়নতৃপ্তিকর বসন-ভূষণ, কল-কারখানা, খেলনা-পুতুল, মোটরগাড়ী, মদ, বন্দুক, রাইফেল ইত্যাদি প্রস্তুত এবং বিভিন্ন দেশে সরবরাহ করা হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে দেশ হইতে কৃষি একেবারে লোপ পাইতেছে। কাজেকাজেই অধিবাসিগণ ভিন্ন দেশের উপর

নির্ভরশীল না হইয়া পারে না। আজ যদি ভারতবর্ষ, রুষিয়া এবং আফ্রিকা হইতে কৃষিজাত দ্রব্যাদির বিভিন্ন দেশে রপ্তানী বন্ধ করিয়া দেওয়া যায় তবে ইংলণ্ডের দেশেরই লক্ষ লক্ষ নর-নারীকে ঘরের কোণে বসিয়া মৃত্যুর দিন গণিতে হইবে।

"England supports from its own land less than a fifth of its population, and Germany less than half, as is the case with France and with other countries and the condition of these nations becomes year by year more dependant on the food supplied from abroad." Acquiring market এবং Colonial policy প্রভৃতি কৌশল দ্বারা আজও তাহারা জীবিত আছে। কিন্তু ইহাও শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে। অনাবশ্যক এবং ক্ষতিকর জিনিস কৌশল দ্বারা বিক্রয় এবং দূরবর্ত্তী ভিন্ন দেশবাসিগণকে পরাধীন করিয়া রাখা, বেশী দিন কিছুতেই চলিবে না, কারণ অত্যাচারীর নিষ্ঠুর, নির্ম্মম প্রতিঘাতে তাহাদের অসহায়তা ঘুচিয়া যাইতেছে। সময় ও সুযোগ পাইলেই শক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া আপন আপন সত্তা পরিস্ফুট করিতে চায়। এই পরাধীন মানুষগুলি যে মুহূর্ত্তে ঠিক নিজের পায়ে দাঁড়া হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে, সেই মুহূর্ত্তেই জেতার শক্তি আপনাপনি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

শক্তির এই অপব্যবহার, অবিচার এবং অত্যাচার দেখিয়াও তাহা মানব, নীরবে সহ্য করে কেন? কেন সে এই নিষ্ঠুর শক্তির কবল হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে চায় না? শক্তিকে না মানিয়া লইলেই ত সে মুক্ত হইতে পারে। কেন সে এমন কাজ করে যাহাতে তাহার দৈহিক ও মানসিক অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটায়, অর্থাৎ কেন সে এই অসত্য শক্তির মূলে মাথা নত রাখে অথবা একটা অসত্যকে ধ্বংশ করিয়া ঠিক তেমনি আর একটা পীড়াদায়ক নূতন অসত্য শক্তি গঠন করে? কেন এমন হয়? মানব শক্তির দোষ বেশ মর্ম্মে মর্ম্মেই অনুভব করিতে পারে এবং এই দুঃখ ও দৈন্য হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে স্বাধীনতা ব্যতীত যে আর উপায় নাই—তাহাও সে বুঝিয়া লয়। কিন্তু এটা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই উপদ্রবের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে এবং স্বাধীনতা লাভ করিতে সে বিদ্রোহ, শাসনকর্ত্তা ও শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্তন, অন্যান্য দেশের সঙ্গে নূতন বন্দোবস্ত প্রভৃতি সকল সাধারণ এবং অসাধারণ উপায়ই অবলম্বন করে; কিন্তু "The refusal not to submit to power"—

কোন শক্তিকেই না মানিয়া চলা—এই অতিসহজ এবং অবশ্যম্ভাবী দুঃখ ও দুর্দ্দশা-মোচনের প্রকৃষ্ট উপায়টি লক্ষ্যই করে না।

উপদ্রবই উপদ্রব সৃষ্টি করে, কোন উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, সেই উপদ্রবকে কোন মতেই সাহায্য করা উচিত নয়। অল্পসংখ্যক লোকই অসংখ্য লোককে দাস করিতে পারে, যদি সেই দাসশ্রেণী হইতে কেহ কেহ গিয়া আবার সেই মুষ্টিমেয়কে সাহায্য করে। যদি কোন জাতির বা সম্প্রদায়ের কেহ ব্যক্তিগত লাভের জন্য দুই শক্তিকে সহায়তা না করে অথবা ঐ জাতি বা সম্প্রদায় ঠিক ঐ প্রকারেই দুই শক্তি দ্বারা দুই শক্তির প্রতিরোধ করিতে না যায়, তবে যে আক্রমণকারী যত প্রবলই হউক না কেন, তাহাকে পরাধীনতা পাশে বন্ধন করিতে পারে না, তাহারা লুণ্ঠিত হইতে পারে, স্থানান্তরে গমনাগমন-ক্ষমতা রহিত হইতে পারে, হতাহত হইতে পারে কিন্তু কোন ক্রমেই পরাধীন হয় না।

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র দত্ত।

রবীন্দ্র-সাধনার পরিণতি।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অসংখ্য সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। কেহ তাঁহাকে মহত্ত্বের গৌরবাসনে বসাইয়া বিজয়মাল্যে বিভূষিত করিয়াছেন, কেহ বা তাঁহার রচনার দোষোদ্ঘাটন করিয়া নিন্দাবাদে তাঁহার প্রতিভা খর্ব্ব করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কালের নিকটে রবীন্দ্র-প্রতিভার বৈশিষ্ট নিরূপিত হইবে।

কবির জীবনের ক্রম-বিকাশের সঙ্গে কাব্য- সাধনার যে ধারাটী প্রবাহিত হইয়াছে, এই প্রবন্ধে আমরা তাহারই অনুসরণ করিব।

কবির "জীবনস্মৃতি"তে তাঁহার শৈশব ও বাল্যজীবন প্রকৃতির সহিত কিরূপ যোগসূত্রে আবদ্ধ ছিল তাহার বিশিষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। বিশ্বপ্রকৃতির সহিত তাঁহার যেন আজিকার সম্বন্ধ নহে, যেন বহুযুগ ধরিয়া কবিহৃদয় তাহার অণুপরমাণুর সহিত একযোগে হইয়া আছে। জীবন-প্রভাতেই কবির ঈশ

সূক্ষ্ম অনুভূতি ও ভাবপ্রবণতা তাঁহার ভাবী জীবনের গভীর সিদ্ধির আভাস দিয়াছে।

সৃষ্টির মূলে যে আনন্দ বিরাজমান, তাহা তদীয় কোমল মানসে অপূর্ব ভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল—তিনি প্রেম-নয়নে নিখিল সৌন্দর্যরাশি উপভোগ করিতে লাগিলেন। শৈশবে গৃহের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াও বাতায়নের মধ্য দিয়া সেই "বৃহৎ বট বৃক্ষটী" তিনি নিত্য নিত্য নবভাবে অবলোকন করিতেন। প্রকৃতির মাঝে প্রাণের যে এক অব্যাহত স্ফূর্তির বিকাশ তাহা তাঁহার হৃদয় আনন্দরসে পরিপ্লুত করিত। আজিও তাঁহার "লিপিকায়" সেই কথা অপরূপ রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে যা "নিজের মধ্যে মানুষের প্রাণ নানা ভাবনায় খোলা হয়ে গেচে। তাই প্রাণের বিশুদ্ধ রূপটা দেখতে হলে চাইতে হয় ঐ ঘাসের দিকে, ঐ গাছের দিকে।

এই প্রাণের আস্বাদনে আপনার কি আনন্দ, নিজের মধ্যে পাতায় পাতায়, ফুলে ফুলে, ফলে ফলে, কত যত্নে সে কত ছবি এঁকেচে, কত রংই লাগিয়েছে, কত গন্ধ, কত বর্ণ! তাই ঐ বটের দিকে তাকিয়ে নীরবে বলছিলেম, 'ওগো বনস্পতি, জন্মমাত্রেই পৃথিবীতে প্রথম যে আনন্দধ্বনি করে' উঠেছিল, সেই ধ্বনি তোমার পাখায় পাখায়। সেই আদি যুগের সবুজ হাসিটি তোমার পাতায় পাতায় ঝলমল্ করচে। আমার মধ্যে সেই প্রথম প্রাণ আজ চঞ্চল হ'ল। ভাবনার বেড়ার মধ্যে যে বন্দী হয়ে বসেছিল, তুমি তাকে ডাক দিয়ে বলেচ, ওরে আয় না রে আলোর মধ্যে, হাওয়ার মধ্যে; আয় আমারি মত নিয়ে আয় তোর রূপের তুলি, রংয়ের বাটি রসের পিয়ালা।"

কবি পরিণত বয়সে যে কথা শুনিতে পাইলেন, শৈশবে "বট বৃক্ষটী" নীরবে তাঁহার প্রাণে এইরূপ কতক ইঙ্গিত করিয়াছিল।

রাহিবের বিশ্বপ্রকৃতির মুক্তদৃশ্য ও তাঁহার গণ্ডীস্থিত আবদ্ধ জীবন এতদুভয়ের তুলনা করিয়া মহাবিজনের জন্য তাঁহার হৃদয় আকুলিয়া উঠিত। কবি লিখিয়াছেন এই বন্ধনই তাঁহার মুক্তির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু যৌবন ও কৈশোরের সন্ধিস্থলে কবি-প্রকৃতির সহিত তাঁহার বাল্যজীবনের যে একটী মধুর সম্বন্ধ ছিল তাহা হারাইলেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি "যখন আমার বয়স আঠার, আমার কবিতা তখন কিছু গাঢ় হইতে থাকে। সৌন্দর্য্যের মায়াময় ছবিগুলি আমার চিত্তকে মোহিত করিতে লাগিল। আমার

কবিতা কিছু ভিন্নপথে চালিত হইল। মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু ও আমার পূজনীয় পিতৃদেব তখন আমার প্রতি প্রকৃত সুহৃদের কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মোহন স্পর্শে আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম। যৌবনে প্রকৃতির সহিত এই যে বিরহ সংঘটিত হইয়াছে, তাহার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। আমাদের পূর্ব্বের সম্বন্ধ আবার ফিরিয়া আসিল। বিশ্বপ্রকৃতিকে আপনার মাঝে আবার ফিরিয়া পাইলাম, শুধু যে ফিরিয়া পাইলাম তাহা নহে, মোহের ছিন্নভেদের ব্যবধানের ভিতর দিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ নূতন ভাবে পাইলাম।"

তাই কবি মোহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ওরে দাঁড়াও সরিয়া
ম্লান করিও না আর ও কর পরশে!"

মোহ-অবসানে তিনি প্রেমের পবিত্র মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন।—তাঁর কৈশোর-লিখিত—শত সহস্র কবিতা "ঝরিয়া গেলেও" ব্যর্থ হয় নাই।

রূপমোহের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যেই তাঁহার চিরযৌবনসম্পন্ন মানসী প্রতিমার প্রেমময়ী মূর্ত্তিটী শতদলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। মেঘমুক্ত চিদাকাশে বসি এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তির ভুবনমোহন রূপলাবণ্য উপভোগ করিতে করিতে চিরযৌবনের গোপন ইঙ্গিত অনুভব করিলেন। জীবনকে নানা ভাবে উপভোগ করিয়া তিনি চিরনবীনের শাশ্বত মূর্ত্তিটি আপনার মাঝে বিকশিত দেখিলেন। জীবনকে নানা ভাবে নব নব রসানুভূতির মাঝে আনিয়া তিনি আপনাকে বিচিত্রভাবে পূর্ণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার 'কড়ি ও কোমল' পড়িয়া শ্রীযুক্ত আশুতোষ ধ্রুবী মহাশয় তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, "জীবনের প্রতি প্রবল আসক্তিই তোমার কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।" পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ ইহার সঙ্গতি উপলব্ধি করিয়াছেন।

অন্তরাত্মার বিচিত্র রসানুভূতির প্রাণে যে এক অতীন্দ্রিয় আনন্দময়ী প্রতিমা ফুটিয়া উঠিতে থাকে, তাহাই কবির মানসী প্রতিমা। প্রতিভাচ্ছটায় যাঁহারা কাব্যশোভা অলৌকিক প্রভায় উদ্ভাসিত করিয়া সাহিত্য জগতে বরেণ্য স্থান প্রাপ্ত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সাধনার মূলে দেখিতে পাই—ঐ রহস্যময়ীর অনুসন্ধান। যুগ যুগ ধরিয়া সাধনার ধারা বহিয়া চলিয়াছে, তথাপি কবি মানসীর সমগ্র রূপের দর্শন পাইলেন না; তাই কাব্যশেষেও আসল কথাটী অপূর্ণ রহিয়া যায়। এই যে অতৃপ্তি, এই যে করুণ-নীতিধারা ইহাই কবিদের শ্রেষ্ঠ দান।

ব্যাস-বাল্মিকী যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন যুগধর্ম্মে বিপুল রসসম্ভার রবীন্দ্রনাথে অপূর্ব্বভাবে উৎসারিত হইয়াছে। তাই পূর্ব্বতন কাব্যাদর্শের উপর রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব আপনাকে বিচিত্র ভাবে প্রকাশ করিয়াছে।

কবিবর কবিতার মধ্যেই "মানসী"র আত্মপরিচয় পাইয়া তাহাকে স্বীয় জীবন-সঙ্গিনীর তুল্য বলিয়া প্রচার করিলেন। বৈষ্ণব ও বাল্যের অতীত স্মৃতি ধীরে ধীরে মানসে জাগিতে লাগিল :—

"মনে আছে কবে কোন্ ফুল্ল যূথী বনে
কহ বাল্যকালে দেখা হ'ত দুইজনে
আধ চেনা শোনা!
* * * *
তার পরে একদিন, কি জানি সে কবে,
জীবনের বনে যৌবন-বসন্ত যবে
প্রথম মলয় বায়ু ফেলেছে নিশ্বাস
মুকুলিয়া উঠিতেছে শত নব আশ।
সহসা চকিত হায় আপন সঙ্গীতে
চমকিয়া হেরিলাম খেলাক্ষেত্র হ'তে
কখন অন্তর লক্ষ্মী এসেছ অন্তরে
আপনার অন্তঃপুরে সৌরভের ভরে
বসি আছ মহিমীর মত।"

"মানস-সুন্দরী" কবিতায় প্রতীয়মান হয়, রবীন্দ্রনাথ রহস্যময়ীকে খেলা একান্ত করিয়া আপনার মাঝে ধরিয়া রাখিতে পারিয়াছেন। পূর্ব্বতন যুগের কবিগণ সেরূপ পাবেন নাই, তাঁহারা দূর হইতে কবিতার কল্পনা করিয়া ভক্তিভরে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেন। তাই বাণী তাঁহাদের নিকট পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করিবার সুযোগ পান নাই।

রবীন্দ্রনাথ হৃদয়ের অন্তরতম দেশে বাণীর প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার অনির্ব্বচনীয় প্রতিভাচ্ছটায় সমগ্র মানস উদ্ভাসিত করিয়াছেন। ভাবের বিচিত্রভবন হৃদয়ে তিনি কোন্ কল্পলোকে ভাসমান হইয়া অনিন্দ্যসুন্দরীর অতীন্দ্রিয় রূপের চিত্র আঁকিয়াছেন।

"মানসীরূপিণী ওগো, বাসনাবাসিনী
আলোকবসনা ওগো, নীরবভাষিণী,

পরজন্মে তুমি কিগো মূর্ত্তিমতী হ'য়ে
জন্মিবে মানব-গৃহে নারীরূপ ল'য়ে
অনিন্দ্যসুন্দরী ?"

ভাবময়ী বিচিত্র সাজে কবি-মানস উদ্বেলিত করিতেছেন,—অঞ্চলখানি "সন্ধ্যার কনকবর্ণে" রাঙ্গিয়া, মেখলাটী "উষার গলিত স্বর্ণে" উজ্জ্বল করিয়া লসিত যৌবনখানি "তলতল ছলছল পূর্ণ তটিনীর জলে" বিস্তার পূর্ব্বক বসন্ত পবনের "সুগন্ধ নিঃশ্বাসে" "চঞ্চল-বাসনা-ব্যথা" প্রকাশ করিতেছেন। উষা, সন্ধ্যা ও রজনী সমাগমে তিনি বিচিত্ররূপে আসিয়া কখন অজ্ঞাতে তাঁহার আলিঙ্গন করিয়া যান। কৌতূহলী কবি এই ভাবময়ীর উদ্দেশে বলিতেছেন—

"* * * তুমি
মূর্ত্তিতে দিবে কি ধরা ? এই মর্ত্তভূমি
পরশ করিবে কাহা চরণের তলে ?
অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শূন্যে জলে স্থলে
সর্ব্ব ঠাঁই হ'তে, সর্ব্বময়ী আপনারে
করিয়ে হরণ—ধরণীর একধারে
ধরিবে কি একখানি মধুর মূরতি ?"

ভাব-জগতের এই অপূর্ব্ব চিত্রখানির তুলনা নাই। ইহা একজীবনের সাধন-ফল নহে। যুগে যুগে কবি এই মানসী শিল্প-সাধনায় ব্যাপৃত আছেন। তাই বলিতেছেন, যদি পরজন্মে মানসী মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হন, তবে উভয়ের পরিচয় ঘটিতে বিলম্ব হইবে না। পরজন্মেই তাঁহার মানসে উদিত হইল পূর্ব্ব-জন্মে তিনি মাটীতে ধরা দিয়া সৌন্দর্য্যে কুসুমি,' প্রণয়ে বিকশি' তাঁহার জীবন-কুঞ্জ অপূর্ব্বশোভসম্পন্ন করিয়াছিলেন। ইহজন্মে সে বন্ধন টুটিয়া বিশ্বময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

"রূপ গন্ধ হয়ে গেছে, গন্ধ বাষ্প তার
পূর্ণ করি ফেলিয়াছে আজি চারিধার।
গৃহের বনিতা ছিলে—টুটিয়া আলয়
বিশ্বের কবিতারূপে হয়েছ উদয়।"

মানসীর সাথেই কবির অন্তর চিত্র বিজড়িত—কবির সমগ্র প্রকাশ কেবল তাঁহার মাঝেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সেই অতীন্দ্রিয় প্রতিমাখানি কোন্ এক রহস্যালোকে আবৃতা; তাই কবির সত্য পরিচয় সুদুর্লভ।

"নূতন করিয়া লহ আরবার চির পুরাতন মোরে,
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায় নবীন জীবন ডোরে।"

কবি বুঝিয়াছেন মোহের অভিনয়ে সত্যের সন্ধান মিলে না—

"তোমারে আবরিয়া ধূলাতে ঢাকে হিয়া,
মরণ আনে রাশি রাশি।"

ভোগাগ্নির তীব্র দাহনে প্রেমের স্বরূপ ফুটিয়া উঠিল। মানসীর স্নিগ্ধকান্তি কবি-মানস শীতল করিল। সাধনার বিচিত্র সুরগুলি এক সুরে ঝঙ্কৃত হইয়া অনন্তের দিকে পূর্ণ সার্থকতা লাভের জন্য বহিয়া চলিল।

এইখানেই কবি-জীবনের পরমসিদ্ধি। বাহ্য মানসীর অনুধ্যান ও তাঁহাকে লাভ করাই কবি-জীবনের চরম প্রাপ্তি নহে, কবি ও কবিতা-সুন্দরী শত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া একযোগে যখন এক বৃহত্তর ভাব-জগতে পূর্ণ সার্থকতা লাভের জন্য অগ্রসর হয়, তখনই কবি-প্রতিভার পূর্ণ পরিণতি। "খেয়া", "নৈবেদ্য" ও "গীতাঞ্জলি"তে রবীন্দ্র-প্রতিভার অপূর্ব্ব পরিণতি পরিলক্ষিত হয়। সঙ্গীতের মুক্তধারা অবিরত প্রবাহিত হইয়া তাঁহাকে "ভূমানন্দের" বিশাল উৎসে নিমজ্জিত রাখিয়াছে।

এই পরিণতির মূলে রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধ-ক্ষমতা। শৈশবে তিনি এই নিখিল বিশ্ব এক অপূর্ব্ব নয়নে দেখিয়া লইয়া হৃদয়টী তাহার সহিত মিলাইয়া লইয়াছেন। তাই শত বন্ধনের মাঝে থাকিয়াও তিনি "মুক্তির স্বাদ" লাভ করিয়াছেন। শৈশবে কঠোর বন্ধনের মাঝে থাকিয়াও তিনি মুক্ত প্রকৃতির সহিত অনায়াসে মানস-মিলন লাভ করিতেন, যৌবনে সংসারের সহস্র বন্ধন মাঝে মুক্তির প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিলেন। আবার পরিণতি বয়সে সংসার, সমাজ ও জগতের বদ্ধ ধারাগুলির ভিতর দিয়া তাঁহার "মুক্ত ধারা" প্রবাহিত হইয়া বিশ্বমানবের চির-মুক্তির পথ নির্দ্দেশ করিতেছে।

'গীতাঞ্জলি'র উচ্চস্তরের কবিতাগুলি অভিনিবেশসহকারে পাঠ করিয়া দেখিলে তাহাদের মধ্যে মুক্তিবাদ ও আধ্যাত্মিকতার অপূর্ব্ব বিকাশ লক্ষিত হয়। এই মুক্তিবাদের মূলে আনন্দানুভূতি বর্ত্তমান। আনন্দের ভিতর দিয়াই তিনি চির-সুন্দরের অনন্ত বিভূতির পরিচয় পাইয়াছেন। তাঁহার অধ্যাত্মবাদে সান্ত-অনন্তের মধুর সম্বন্ধ বিচিত্র সঙ্গীতাকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিশ্বমুখী কবি-প্রতিভা নব নব অভিসারে "সুদূরের" বিচিত্র বিভূতি উপভোগ

প্রয়াসে ধাবিতা হইয়াছে। তাই অজিতবাবু এক কথায় বলিয়াছেন, "রবীন্দ্র কাব্য বিশ্ব-অভিসার-যাত্রার ভ্রমণের ইতিহাস।"

কবিবরের আধ্যাত্মিক কবিতাগুলি অনেকের কাছে অত্যন্ত mystic বা অস্পষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কেহ কেহ 'গীতাঞ্জলি'র কয়েকটী কবিতা কবিতা-নামের অযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে "সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর"—কবিতাটী একটী জটিল দার্শনিক তত্ত্ব, ইহাতে কোন কাব্যরস নাই।

যে একাগ্র সাধনার ক্রমবিকাশ-ফলে সাধক-অধ্যাত্ম-জগতের উচ্চতম স্তরে আসিয়া এক অব্যক্ত আনন্দের সুরে হৃদয়-বীণাটী ঝঙ্কৃত করিতে থাকেন তাহা অসাধকের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা অনেক সময় কঠিন হইয়া পড়ে। ভূমার বৈচিত্র্য দার্শনিকত্বে পূর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক; কবি-বীণায় অপূর্ব্ব সুর সংযোগ ফলে উপনিষদের জটিল তত্ত্বগুলি নবভাবে অনুরণিত হইয়া যে অপূর্ব্ব সঙ্গীতাকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাই কাব্য-জগতে এক নূতন সৃষ্টি।

ভূমার বিভূতি-মুগ্ধ কবি-হৃদয় সৃষ্টির মাঝে আনন্দময়ের বিচিত্র প্রকাশ কোন এক রহস্যালোক দর্শন করিয়াছেন—

"কত বর্ণে কত গন্ধে,
কত গানে কত ছন্দে,
অরূপ তোমার রূপের লীলায়
জাগে হৃদয়পুর।
আমার মধ্যে-তোমার শোভা
এমন সুমধুর।"

জীবনের চরম সার্থকতা যে সেই অনন্ত ধারায় সঙ্গম-স্থানে ফুটিয়া উঠে তাহা মানস-নেত্রে সুপরিস্ফুট হইল—

"তোমায় আমায় মিলন হলে
সকলি যায় খুলে।
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে
উঠে তখন দুলে!"

দর্শন-শাস্ত্রের এক গভীর তত্ত্ব এই কবিতায় নিহিত থাকিলেও ইহা কবিবরের একটী ভাষায় অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময় হইয়া কবিতার সম্পদ রক্ষা করিয়াছে।

"সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর"

এই সুর' কথাটী কত ভাবেরই উদ্বোধক—ইহার পরিবর্ত্তে অন্য কথা বসাইলে কবিতাটীর মাধুর্য্য থাকে না। "সুরে"র মধ্য দিয়াই কবি আজীবন অরূপের সাধনা করিয়া আসিতেছেন—বীণাখানি সহসা যেদিন বিশ্বের বিচিত্র-সুরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল—কবি তখন মুগ্ধ-হৃদয়ে চাহিলেন—

"তুমি কেমন করে' গান করহে গুণী
আমি অবাক্ হয়ে শুনি কেবল শুনি।"

ধ্যাননেত্রে দেখিলেন—গারা নিখিল সেই 'ওঁকে'র অপূর্ব্ব সুরে ঝঙ্কৃত হইতেছে :—

"সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে,
সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে,
পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে
বহিয়া যায় সুরের সুরধনী।"

উপনিষদে যাহা 'ওঙ্কার', যাহা নিত্যকাল ধরিয়া অনাদি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঝঙ্কৃত হইয়া আকাশের বিশাল-গর্ভে মিশিতেছে; প্রণবে সৃষ্টিতে অপূর্ব্ব জেগে স্ফুরিত হইয়া অনন্ত সৃষ্টি প্রাণরসে সঞ্জীবিত করিতেছে, সেই "ওঙ্কার" কবির বীণায় অপূর্ব্ব সুরের আকারে ধরা দিয়াছে। জ্ঞানমার্গের নীরস তত্ত্ব কবি-হৃদয়ে কেমন মধুর ভাবে প্রতিভাত হইয়াছে। এই মধুর সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই কবি অসীমকে আপনার মাঝে পাইতে চান—

"হে দূর হইতে দূর হে নিকটতম
যেথায় নিকটে তুমি, সেথা তুমি মম!"

সীমার গণ্ডী ছাড়িয়া কল্পনা অনন্তে যতই ধাবিত হউক না কেন, অক্লেশের সন্ধান মিলে না।

প্রাণের প্রবলতম আকর্ষণে সাধক "অসীম"কে আপনার মাঝে আনিয়া—প্রাণ ভরিয়া তাঁহার অপার বিভূতি উপভোগ করিতে থাকেন; তাই কবি বলিতেছেন—

"কাছে তুমি কর্ম্ম-ভট আশা-তটিনীর
দূরে তুমি শান্ত সিন্ধু অনন্ত গভীর।"

রবীন্দ্রনাথ নিকটের সাধক—সান্তের মাঝে অনন্তের লীলা কবি নিজের জীবনে উপলব্ধি করিয়া যখ লখ সঙ্গীতে ভাবের বিচিত্র রূপ ফুটাইয়া তুলিতেছেন—

"আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি,
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি,
শুনিয়া লইতে চাই আপনার গান!"

ভাব হইতে রূপে ও রূপ হইতে ভাবে অবিরাম রূপান্তরিত হইয়া অনন্ত পুরুষ আপনাকে নব নব ভাবে উপভোগ করিতেছেন। রূপ রস শব্দ স্পর্শময় অপূর্ব সৃষ্টির বিরাট দৃশ্য—তিনি দ্রষ্টা হইয়া উপভোগ করিতে চান।

'আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী!
তারি সাথে প্রভু মিলিয়া তোমার প্রীতি
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল নীতি,
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়ে দান!'

সাধন-মার্গের এক অপূর্ব তত্ত্ব রবীন্দ্র-সাধনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভক্ত ভগবানের কাছে আপনাকে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়াই কৃতার্থ হয়; আর এ স্থলে দ্রষ্টা হয়, তাঁহার ভক্তের কাছেই আপনাকে প্রকাশ করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। নব নব রূপ-পরিগ্রহে জীবন যতই সফলতার দিকে অগ্রসর হইতেছে, ততই নানা আনন্দের অনুভূতি সাধক-হৃদয় চমৎকৃত করিতেছে। সাধন-বলে আমার যতই মুক্তত্ব হইতেছে, অনন্ত পুরুষ আপনাকে তাঁহার মাঝে চরিতার্থ করিবার জন্য ততই আকুল হইতেছেন। কবি তাই ভাববিহ্বলহৃদয়ে নিবেদন করিতেছেন—

"যে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কি অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।"

কবি আদি-জীবনে কোন বাণী লইয়া সৃষ্টি-স্রোতে ভাসিয়া আসিলেন, আবার বিচিত্র তমসভঙ্গে জীবনে জীবনে কোন্ বাণী সাধিতে সাধিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন—এখন একে একে স্মরণপথে আসিতে লাগিল।—

"কবে আমি বাহির হলেম—তোমার গান গেয়ে,
সে ত আজকে নয়, সে আজকে নয়।
ভুলে গেছি কবে থেকে, আসচি তোমায় চেয়ে,
সে ত আজকে নয়, সে আজকে নয়।"

সান্ত হৃদয়ের মাঝে অনন্তকে অপূর্ব্বভাবে লাভ করিয়া কবির প্রতীতি হইতেছে—এই ত তাঁহার চিরযুগের ঈপ্সিত ধন!

"কতই নামে ডেকেছি যে,
কতই ছবি এঁকেছি যে,
কোন আনন্দে চলেছি, তার
ঠিকানা না পেয়ে।"

যুগে যুগে কবি তাঁহারই সন্ধানে ফিরিয়াছেন! কত তালে বীণা ঝঙ্কৃত করিয়া সুদূরের উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছেন! কিন্তু তিনি যে অন্তরের ধন, তাই যারে পাবে কবি তাঁহাকে পাইয়াও হারাইয়াছেন। এই অন্তর্দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ অনুভূতি কবির ইহজীবনের বিশিষ্ট সঞ্চয়।

উপনিষদের অন্তরে প্রবেশ করিয়া তিনি তাহার মূল সুরটী হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন; তাই পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষ্যের মধ্যে যে আনন্দ সুদুর্লভ, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গীতিভঙ্গিতে তাহা লাভ করা সম্ভবপর হইয়াছে।

কবি-সাধনার গঙ্গোত্রী-ধারা মহাভাগীরথীদেশে প্রবাহিত হইয়া শুধু যে আত্মসার্থকতা লাভ করিতেছে তাহা নহে, ফলতঃ স্রোতস্বিনীর ন্যায় জাতিকে নব নব রসে সঞ্জীবিত করিতেছে।

রবীন্দ্র-যুগে বাঙ্গলা সাহিত্য—বিশ্বসাহিত্যের গৌরবাসনে স্থান লাভ করিয়াছে। 'বাঙ্গালীর শক্তিভক্তি প্রেমসাধনা' বিদেশীরও হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছে।

প্রবন্ধ, উপন্যাস ও কাব্যের ভিতর দিয়া কবিবরের অপূর্ব্ব স্বদেশপ্রেম ও ভারতের আদর্শ প্রস্ফুটিত হওয়া, সংসার, সমাজ ও মানব-হৃদয়ের সংক্ষুব্ধ ধারা-স্রোতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

জগৎকে নৈয়ায়িকের ন্যায় তিনি মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই।—

"চেয়ে তোর মিথ্যা মায়া মরীচিকাপানে,
ভাল বাসিয়াছি আমি ধূলি-মাটি তোরে।
জন্মেছি যে মর্ত্ত্য কোলে ঘৃণা করি তারে
ছুটিব না স্বর্গ আর মুক্তি খুঁজিবারে।"

পল্লীর দুঃসহ দারিদ্র্যব্যথায় ব্যথিত হইয়া এক দিন তিনি সকলের দ্বারে দ্বারে ফিরিয়াছিলেন। কিন্তু তখন অনেকেই তাঁহার আহ্বানে কর্ণপাত করে নাই; তাই ক্ষোভের সহিত গাহিয়াছিলেন,—

"তোর ডাক যদি কেউ না শোনে
একলা চলরে।"

বারে বারে আঘাত করিয়াও যখন দুয়ার খুলিল না, তখন তিনি "শান্তি-নিকেতন"-গঠন-প্রয়াসী হইলেন। তাঁহার সাধনা ব্যর্থ হয় নাই। তাঁহার একান্ত অধ্যবসায়ের ফলে সেই 'শান্তিনিকেতন' এখন 'বিশ্বভারতী'তে পরিণত হইয়াছে।

দেশ তাঁহার নিকট কত প্রিয়—তাহা "গোরা"র মুখে অপূর্ব্ব ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। দেশবাসীর সমক্ষে তিনি ভারতের পরম আদর্শ দেখাইয়া জনগণকে স্বীয় মহত্ত্ব ও শক্তি সঞ্চয়ের জন্য ইঙ্গিত করিয়াছেন। প্রাণকে জাগ্রত করিয়া তাহার মাঝে দেশকে একান্ত সত্য করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে জাতীয় মহত্ত্ব লাভ হয় না।

পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছেন দেশের অপেক্ষাও প্রিয়তর বস্তু আছে, তাহা বিশ্বমানবের মিলন। স্বার্থের বিভিন্ন গণ্ডীতে জাতীয় মিলন প্রতিনিয়ত হইতেছে, তাই বিশ্বব্যাপী অশান্তি। সকল জাতিকে এক প্রেমের বন্ধনে আনিয়া মানবে মানবে প্রাণের যে অকৃত্রিম যোগসূত্র বিদ্যমান আছে, তাহা ও সত্যের আলোকে তাহা সুপরিপুষ্ট করিতে তিনি প্রাণপণ সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, ইহা কবির অপূর্ব্ব সাধনা পরিণতির অবশ্যম্ভাবী ফল।—যে সাধনার ক্রম-বিকাশ-ফলে তিনি মনের সহস্র আবরণ উন্মুক্ত করিয়া—'সত্যশিবসুন্দরের' আনন্দময় ভাবটী হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। তাহারই অনুপ্রেরণায় বিশ্বমানবের মহামিলন-সাধনে তিনি ব্যাকুল হইয়াছেন।—ফলতঃ তাঁহার সাধনা তাঁহাকে বিশ্বচরাচর বিস্মৃত করাইয়া, নির্জ্জন অন্তর গৃহে, জীবন-দেবতার ধ্যানে তন্ময় করে নাই, নিখিল সৃষ্টির অনন্ত প্রকাশে সত্য পুরুষ যেখানে আপনাকে বিচিত্রভাবে বিকশিত করিয়াছেন,—সেই অনন্ত জীবনের মিলনক্ষেত্রে সে তাঁহাকে বিরাট আনন্দ-যজ্ঞে আহ্বান করিয়াছে।

"বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
নয় ক বনে নয় বিজনে
নয় ক আমার আপন মনে,

সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়,
সেথায় আপন আমারো!"

শ্রীশিবকৃষ্ণ দত্ত।

বারোয়ারী।

(গল্প)

১

"রবীন বাড়ীতে আছ?—রবীন—রবীন" বলিয়া বৃদ্ধ কালী পণ্ডিত উঠান-সেষ মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রবীন্দ্র কি একটা কাজে নিযুক্ত ছিল, তাড়াতাড়ি আসিয়া প্রণাম করিয়া নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কি বলছেন পণ্ডিত মশাই?"

পণ্ডিত মহাশয় কোনরূপ আশীর্ব্বাদ বা স্নেহ-সম্বোধনের পরিবর্ত্তে উত্তেজস্বরে বলিলেন—"এর একটা কিছু বিহিত কর বাবা, নইলে আমি থানা-পুলিশ করব। তোমরা থাকতে এমন সব অন্যায়ের বিচার হবে না?"

পণ্ডিত মহাশয় আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু কথার মাঝখানে রবীন্দ্রনাথ বাধা দিয়া বলিল—

"কথাটা কি আমায় বলুন, বুঝতে দিন্।"

"চুরি-চুরি, বাক্স ভেঙ্গে চুরি।"

"কার পণ্ডিত মশাই?"

"আমার আর কার! এমন পোড়া অদৃষ্ট আর কার বল!"

"কে চুরি করলে, কি চুরি গেছে?"

"আমার বাক্সে একটী পদক ছিল। আমার গুণধর পুত্র যাদুকে কাল সেটা বাক্স ভেঙ্গে নিয়ে পালিয়েছে। হারামজাদা পাজি নচ্ছার!"

রবীন্দ্র একটু বিস্মিতভাবে বলিল—"কি বলছেন পণ্ডিত মশাই, মাণিক চুরি করবে কেন?"

পণ্ডিত মহাশয় মুখে একটা অস্বাভাবিক শব্দ করিয়া ও কপালে করাঘাত

করিয়া কহিলেন—"আর কর্‌ব কেন ? জুয়া জুয়া, ওতে আমার সর্ব্বনাশ করেছে রে বাবা—আমার সর্ব্বনাশ করেছে।"

রবীন্দ্রনাথ আরও অধিক বিস্মিতভাবে কহিল—"যাঁ্যা বলেন কি ? সে কি পদকটা জুয়ার আড্ডায় দিয়ে এসেছে ?"

পণ্ডিত মহাশয় প্রায় ক্রন্দনের সুরে বলিতে লাগিলেন—"হাঁ বাবা তাই। সেটাকে বিক্রী ক'রে সেই টাকা কাল রাত্রে বারোয়ারীর জুয়াখেলায় দিয়ে এসেছে! হায় হায়, আমার কি সর্ব্বনাশই করেছে! সোণার গহনার মধ্যে গিন্নির ঐ টুকু মাত্র সম্বল ছিল, তাও হতভাগা কাল জলাঞ্জলি দিয়ে এসেছে—হঃ!"

এইবার রবীন্দ্রনাথ পূজনীয় পণ্ডিত মহাশয়ের মুখের উপর নিদারুণ ভাবে কড়া জবাব দিল—"বেশ হ'য়েছে, ঠিকই হ'য়েছে! আপনাদের তো এই রকম শাস্তি হওয়াই উচিত।"

পণ্ডিত মহাশয় একটা প্রতীকারের আশা করিয়া রবীন্দ্রের নিকট আসিয়াছিলেন; কিন্তু এ কি তাহার কথার উত্তর। প্রথমে কতকটা থতমত খাইয়া ও পুনরায় অন্তরে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন—"যথেষ্ট হ'য়েছে, তোমার কাছে যেমন বড় মুখ ক'রে এসেছিলেম, তার উপযুক্ত উত্তর হ'য়েছে! তুমি আমার কি দোষটা দেখলে বাপু ?"

"তখন আপনারাই না বারোয়ারী করতে মত দিয়েছিলেন ? যাতে বারোয়ারী না হয়, সে জন্য আমি আপনাদের দোরে দোরে ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু আপনারা তাকে ভিক্ষুকের কাকুতি মনে করে আমায় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এখন দেখুন, জিনিষটা কি ভয়ঙ্কর বিষাক্ত! আজ আপনি যেমন একটা সংবাদ এনেছেন, এমন আরও দুঃখ-কাতরতা আমার নিকট পৌঁছিবে। শুনবেন সে সব কাহিনী—হাফ সেখ একটা গরু বন্ধক দিয়ে ঐ জুয়ার খরচ সংগ্রহ করেছে, তার স্ত্রী ত সেদিন আমার কাছে এসে কেঁদে পড়েছিল। নবীন গয়লা প্রলোভনে পড়ে খেলতে গিয়ে পাঁচ টাকা হেরে আসে। সেই টাকা তোলবার আশায় পুনরায় যায় ও আরও কিছু নষ্ট করে। ক্রমেই বোঁক চেপে যায়। শেষে তার দুর্দ্দশা কি হ'য়েছে জানেন ? দেড় বিঘা জমি বন্ধক দিতে হ'য়েছে! কত আর বলব বলুন! আপনাদের বারোয়ারীর কর্ম্মকর্ত্তাদের কীর্ত্তি শুনবেন ? গরীব স্ত্রীলোকেরা রাত্রে মেলা দেখতে আসে আর তারা জুয়ার পয়সার সহায়তার ক'রে নেশায় জ্ঞানশূন্য হ'য়ে হিংস্র জন্তুর মত ওৎ পেতে তাদের উপর লাফিয়ে প'ড়ে তাদের সতী-ধর্ম্মের উপর আঘাত ক'রে!

ওঃ আর বলতে পারি না!"—রবীন্দ্রের চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল—"কি করব বলুন! সব শুনেছি, চেষ্টাও অনেক করেছি; কিন্তু কোন ফল হয়নি। তাই এখন অস্ত্রহীন সৈনিকের মত নিষ্ফল আক্রোশে ফুলে মরছি।"

"এখন কি আর কোন প্রতিকার করা যায় না?"

"না—কিছু না। আপনাদের কাছে ক্রন্দন করেছি, উপরওয়ালাদের খোসামোদ ক'রেছি, কিন্তু কি জানি কিসের দুহকে সবাই বধির হ'য়ে গেছেন। না জানি, এর আরও কি শোচনীয় পরিণাম হবে! আপনারা কি করেছেন বলুন দেখি?" তার পর যেন আপন মনেই বলিতে লাগিল—"এই অভিশপ্ত জাতি আবার জাগবে! এরা এখনও নিজেদের অবস্থা বুঝতে পারেনি, আর এরা কি না নিজের পায়ে দাঁড়াবে!"

পণ্ডিত মহাশয় অনেকক্ষণ বিষণ্ণমুখে ও অধোদৃষ্টিতে থাকিয়া অত্যন্ত একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"তবে কি আর কোন উপায় নেই?"

রবীন্দ্রনাথ একইভাবে উত্তর দিল—"আমার বাবা অসম্ভব; তবে আপনাদের প্রতিষ্ঠান—আপনারা চেষ্টা করলেই বিহিত হ'তে পারে।"

পণ্ডিত মহাশয় ধীরে ধীরে বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন।

২

পণ্ডিত মহাশয় চলিয়া যাইবার পরই রবীন্দ্রের মন রোষে, ক্ষোভে ও বিষাদে ভরিয়া উঠিল; সে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল যে, আর একবার বারোয়ারীর কর্তৃপক্ষের নিকট যাইয়া এই সমস্ত বিবরণ তাহাদের গোচর করিয়া সেবা বন্ধ করিতে সে অনুরোধ করিবে কি না। কিন্তু তাহাদের পূর্ব্ব আচার-ব্যবহারের বিষয় স্মরণ হইতেই এক দারুণ বিতৃষ্ণা ও ঘৃণায় তাহার মন বিমুখ হইয়া পড়িল। না, না, সে সমস্ত অপদার্থ ও হীনচেতা লোকের নিকট যাইয়া আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ করা উচিত নয়। ইহাতেও সে মনকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না, কি যেন একটা অভিমানের ব্যথা মনের কোন্ এক নিভৃতকোণে বাজিতে লাগিল।

কিছুতেই তাহার হাত হইতে সে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিল না। আমার আত্মসম্ভ্রমের উপর আঘাতটাই এত বেশী হ'ল! তার চেয়ে আরও কত বেশী যে এই দারিদ্র গ্রামবাসীদের সহ্য করতে হ'চ্ছে! এখন হ'তে সুরু করে আরও যে কত সহ্য করতে হবে তারও নিশ্চয় নেই।

দিকে লক্ষ্য রাখতে গিয়ে তাদের জন্য একবার শেষ চেষ্টা না করলে আমার যদু-হাত বজায় থাকে কৈ?

মনের ঐরূপ দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিতে করিতে সন্ধ্যার সময় যখন ও নিতান্ত রবীন্দ্রনাথ যে মেলায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল তাহা সে অনুমান করিতে পারে নাই। চারিদিকে আলো ও জন-কোলাহলে সহসা তাহার চঞ্চল হইয়া গেল। ক্ষণেক দাঁড়াইয়া কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইয়া, মেলার প্রধান উদ্যোগী হরলালের নিকট যাইয়া বলিল—"আপনার সঙ্গে একটু প্রয়োজন আছে।"

তখন হরলালের বাবো সুরার প্রতিক্রিয়া চলিতেছে। তাহার উপর প্রথম হইতেই রবীন্দ্র বাধাপ্রদানকারী বলিয়া মেলার সমর্থনকারীরা কেহই তাহার উপর সন্তুষ্ট ছিল না। সেজন্য কথাটা যেন শুনিতে পায় নাই এই ভাবে হরলাল পার্শ্বোপবিষ্ট সাঙ্গোপাঙ্গদের সহিত কুৎসিত আলাপে প্রবৃত্ত রহিল।

নিদারুণ ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেও তাহা জোর করিয়া দমন করিয়া রবীন্দ্রনাথ পুনরায় কহিল—"আমার একটা কথা আছে, যদি অনুগ্রহ করে শোনেন।"

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে তড়িঘড়ি হরলাল জিজ্ঞাসা করিল—"কি কথা, তাড়াতাড়ি বলে ফেল।"

"আমার কথাটা শুনে বিবেচনা করবার আছে, কথাগুলো তাই মনোযোগ দিয়ে শোনা দরকার।"

"শীঘ্র বলুন কেন না বাবা অত ভণিতার দরকার কি!"

এই কথাগুলা বলিবার ভঙ্গিতে রবীন্দ্রের মন পুনরায় বিমুখ হইয়া উঠিল কিন্তু তবুও সে প্রাণপণ বলে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া একরূপ জোর করিয়া কথাগুলা গলা হইতে বাহির করিয়া দিল—"মেলাটায় লোকের বড় অসুবিধা হচ্ছে, তাই এটা বন্ধ করুন এই আমার অনুরোধ।"

"আবার জ্বালাতে এসেছ, যাতে ভূতটা এখনও নামে নি? বেশ তো লোকে পুতুলনাচ দেখছে, যাত্রা শুনছে, গ্যামটা দেখছে। অসুবিধা আবার কোথায় দেখলে?"

"আপনি যা বলছেন তা সত্য; কিন্তু এই জুয়াখেলায় যে লোকের সর্ব্বনাশ হচ্ছে তা কি দেখতে পাচ্ছেন না? কেউ জমি বন্ধক দিয়ে, কেউ গয়না বিক্রী করে, কেউ বা চুরি করে এই জুয়ার খরচ যোগাচ্ছে। ঝোঁকের বশে নিজেদের কি সর্ব্বনাশ করছে, বুঝতে পারছে না। তাই বলি মেলাটা বন্ধ করে দিন।"

"তুমি তো বললে বন্ধ করে দিন, কিন্তু তা হ'লে বারোয়ারী চলে কি করে বাপধন! আর লোকে মরিয়া হয়েই বা খেলতে আসে কেন?"

"বিনা মেহনতে বোমগারের প্রলোভনে এই বিপদ-জালে জড়িয়ে মরে। এর পরিণাম চিন্তা করবার শক্তি তখন তাদের থাকে না।"

"তবে আর আমরা করব কি?"

"বারোয়ারী হ'লেই বা লাভ কি, আর না হ'লেই বা ক্ষতি কি?"

"লাভালাভ বোঝবার মত আমার যথেষ্ট সময় নেই। তোমার থাকে তো থাক, একটা সভা করে, সব লোককে জড় করে তাদের বুঝিয়ে দাও গে। আমাদের এখানে কোন আদর হবে না, সরে পড়।"

"তার ওপর দেখুন—এই ছেলে ভাজা কুপথ্য খেয়ে চাবিদিকে কলেরার সাংঘাতিক প্রকোপ—"

রবীন্দ্র আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহাকে বাধা দিয়া তেজস্বী করিয়া বলিল—"যাও না বাবা, তুমি বক্তৃতা দিয়ে লোককে এই সব কথা বুঝাও গে।"

"আপনারা বুঝেও যদি না বুঝেন, তা'হলে নির্বোধ মূর্খ ছাড়া কি বুঝবে কি বলুন?"

"তবে পুলিশ ডাকগে, এখানে আর আলিও না।"

"সেকেলেই যে জেগে ঘুমুচ্ছে মশাই, ডাকে সাড়া দেবে কে?"

অবশেষে একটা গর্ব্বের উল্লাসে হো হো করিয়া হাসিয়া তাচ্ছিল্য ও ঔদ্ধত্যের সহিত কহিল—"তবে তার কি। তোমার যা ইচ্ছা করগে, আমরা খেলা বন্ধ করব না।"

"অনিষ্ট সৃষ্টি করে আপনাদের এত আনন্দ?"

সে সময় সুন্দরীর বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠস্বর ও-নূপুর-গুঞ্জনের পরিবর্ত্তে এক অর্ব্বাচীন যুবকের স্বদেশ-হিতৈষণার নীরস বক্তৃতার ও মুখের উপর স্পষ্ট কথায় হরলাল মেজাজ ঠিক রাখিতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"নিকালো ছিঁয়াসে।"

উপবিষ্ট বন্ধুবর্গও ঐরূপ ভাবে চীৎকার করিতে লাগিল, রবীন্দ্রও উদ্দীপ্ত হইয়া কহিল—"ক্ষমতা থাকে বের করে দিন।"

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে যেমন জোর করিয়া জ্বলিয়া উঠে, এই কথাতে হরলালও সেইরূপ জ্বলিয়া উঠিয়া চীৎকার শব্দে কহিল—"তবে রে বারাময়াদা এত

বড় আস্পর্দ্ধা!" এই বলিয়াই টলিতে টলিতে উঠিয়া একটা বোতল লইয়া রবীন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িল। সৌভাগ্যবশতঃ তাহা কাহাকেও আঘাত করিল না।

এইরূপ ঔদ্ধত্যের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হইলে আরও একটা কুৎসিত ব্যাপারের অবতারণা করিতে হয় ভাবিয়া রবীন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি যেখান হইতে পালাইয়া আসিল।

৩

এতদিন বাবোয়ারীর খেয়ালে হউক বা পদার্থ-বিশেষের নেশাতেই হউক হরলাল সংসারের কোন দিকে লক্ষ্য করে নাই। সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তা বলিয়া ভূষণ দস্তিদারের নিকট হইতে যাহা কিছু উৎকোচস্বরূপ পাইত তাহাতেই বৈষ্ণবী সংসার খরচ চালাইয়া দিত।

মেলা শেষ হইবার কয়েকদিন পরে আহারে বসিয়া স্ত্রীর দিকে লক্ষ্য করিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—"মোহিনী, তোমার গহনা কি হ'ল?"

মোহিনী সহসা চমকিয়া সঙ্কুচিতভাবে উত্তর দিল—"তুলে রেখেছি, পরিনি ত আর কখনি তাই পরিনি।"

"কৈ কখনও তো এমন দেখিনি?"

"কখন দেখনি—কখনও দেখবে না এমন কিছু কথা আছে কি?" সেদিন সেইখানেই এ আন্দোলন চাপা পড়িয়া গেল।

সেই চারিদিন গত হইবার পর উপর্য্যুপরি আরও কয়েকবার সেই একই প্রশ্ন করিয়া ও একই রূপ উত্তর পাইয়া হরলালের মনে এক অজানা সন্দেহ জাগিয়া উঠিল।

পরদিন একান্ত স্থির করিয়া মোহিনীকে ধরিয়া বসিল যে, গহনা দেখাইতে হইবে; কারণ কি জানি কি একটা সন্দেহ উত্তরোত্তর তাহাকে চাপিয়া ধরিতেছে।

মোহিনীর মুখ শুকাইয়া গেল, সহসা কোন উত্তর জোগাইল না। হরলাল তাহা লক্ষ্য করিয়া আরও অধিক পীড়াপীড়ি করায় মোহিনী সভয়ে ও শুষ্ককণ্ঠে জবাব দিল যে, তাহা বন্ধক দিয়া কেলিয়াছে।

---

১ ইহারা মেলা ডাকিয়া লয় অর্থাৎ বারোয়ারী কণ্ডে মোটামুটি কিছু দিয়া ফুলঝেলার বসাইয়া বেশ লাভ করে।

কিছুক্ষণের জন্য হরলাল আত্মহারা হইয়া কোন কথাই খুঁজিয়া পাইল না। পরে কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া ক্রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কেন বন্ধক দিলে?"

কণ্ঠস্বরে মোহিনীর বুকের রক্ত জল হইয়া গেল, সে কোন উত্তর দিতে পারিল না, শুধু নিশ্চল মূর্ত্তির মত স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

উত্তরের প্রতীক্ষায় কিছুক্ষণ বৃথা স্তব্ধ থাকিয়া হরলাল শ্বশুরের চৌদ্দ পুরুষ তুলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—"শীঘ্র বল্ কেন বন্ধক দিয়েছিস্?"

জ্যা-মুক্ত ধনুর মত মোহিনী সহসা দাঁড়াইয়া উঠিয়া চাপা গলায় রুঢ়ভাবে বলিল—"গালি দিও না ব'লছি।"

হরলাল গলার সুর আরও এক পর্দ্দা চড়াইয়া বলিল—"টাকা কি করলি বল্?"

মোহিনী ক্রোধে সমস্ত মুখটা কালো করিয়া কর্কশকণ্ঠে জবাব দিল—"ভজুয়া কাঁদরে আমি জুয়া খেলছি।"

পাপীর সম্মুখে পরিণামের ছায়া-চিত্র ধরিলে সে যেমন চমকিয়া উঠে, হরলালও সেইরূপ ভাব করিল—"কি!"

নিষ্ফল ক্রোধে মোহিনীর হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল, তাহার উপর স্বামীর এই নিদারুণ ব্যবহারে সে একবারে কঠিন হইয়া উত্তর করিল—"তোমার শুভপ্রতিষ্ঠানে পূর্ণাহুতি করেছি।" এই বলিয়া মোহিনী চলিয়া গেল।

হরলাল বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া ব্যর্থ ক্রোধে ফুলিতে লাগিল।

শ্রীপঞ্চানন দত্ত।

শিখজাতি গঠনের কথা।

বর্ত্তমান ভারত-ইতিহাসে যাঁহারা অসামান্য প্রতিভা-বলে জাতিসংগঠক ও সাম্রাজ্যস্থাপক নামে যথার্থ অভিহিত হইতে পারেন,—তাঁহাদের মধ্যে মারাঠা জাতিসংগঠক শিবাজী, সাম্রাজ্যস্থাপক রণজিৎ সিংহ ও অদ্ভুতকর্ম্মী হায়দর আলীর নাম উল্লেখযোগ্য।

শিবাজী পার্ব্বত্য মাওলী জাতির সহায়তায় স্বাধীন জাতি সংগঠন করিয়া একটী সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু রণজিতের প্রতিভা অন্যরূপ। তিনি ধূলি-মুষ্টি তুলিয়া তাহা স্বর্ণমুষ্টিতে পরিণত করেন নাই,—তিনি স্বর্ণমুষ্টি একত্র করিয়া যে অমূল্য হার রচনা করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা হয় না। তাঁহার গৃহবিচ্ছেদ-পাপে এই সুন্দর স্বর্ণ-হার বিনষ্ট হইল। একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, মহারাজ রণজিৎ সিংহ যে মহাপরাক্রান্ত খালসা শক্তি সংগঠন করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, যদি তৎপরবর্ত্তীকালে কেহ তাহার স্থলবর্ত্তী হইতে পারিত, যদি মহাতেজস্বী কুমার নাও নেহাল আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত না হইত, তবে এশিয়ার মানচিত্র আজ হয়ত অন্যরূপ দেখিতে পাইতাম। রণজিৎ পরাক্রান্ত খালসাবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি যে সৈন্য লইয়া রাজ্যক্ষেত্রে উপনীত হন, তাহাদের কেহই দুর্ব্বল বা কাপুরুষ ছিল না,—সকলেই তাঁহার মত পরাক্রান্ত খালসা বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। অথচ এমন শক্তিশালী কেহ ছিল না যে, এই পরাক্রান্ত জাতিকে সংগঠিত করিয়া এক মহাজাতি সংগঠন করিতে পারেন। মহারাজ রণজিৎ স্বীয় প্রতিভাবলে, তাহাই সম্পন্ন করিয়াছিলেন, সেইজন্যই তাঁহার কৃতিত্ব ও গৌরব।

পঞ্জাবের শিখ জাতি সংগঠনের প্রকৃত উদ্বোধক সেই দুই মহাপুরুষ—নানক ও গোবিন্দ, পঞ্জাবের এই নরযুগের অবতারণা করিয়া যান। গুরু নানক শ্রীকৃষ্ণ সত্য ও স্বাধীনতার বাণী ঘোষণা করতঃ নিষ্ঠাধর্ম্ম, লোকাচার, কুসংস্কার ইত্যাদির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি যে মহান্ আদর্শ প্রচার করিয়া যান, গুরুগোবিন্দ তাহাই কার্য্যে প্রতিফলিত পূর্ব্বক ধর্ম্মের বাণী সফল করিয়াছিলেন, এবং তৎদ্বারাই নানক প্রচারিত ধর্ম্ম পূর্ণাঙ্গতা বিকশিত হইয়া উঠে।

গুরু নানক একেশ্বরবাদ, জ্ঞানোদ্ভাসিত বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব ও আদর্শ মানব সমাজ ও মনুষ্যত্ব-গঠনের ভাব প্রদান করিয়া যান। তিনি প্রথমতঃ মিথ্যাধর্ম্ম কুসংস্কার ও লোকাচারের দ্বারা আচ্ছন্ন ভারতবাসিত করিয়া যাহা—আত্মার প্রকৃত ধর্ম্ম-বিকাশে বাধা দিতেছিল—তাহার বিরুদ্ধে অটলভাবে দাঁড়াইয়া এবং সত্যের যুক্ত ঘোষণা করেন। তিনি জানিতেন, এই মিথ্যাধর্ম্ম ও কুরীতির অবসান না হইলে মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও স্বাধীন আত্মার মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতে পারিবে না। নানা মিথ্যাধর্ম্মবাদী মনুষ্যজাতি এবং সমাজের ঘোর অমঙ্গল সাধিত হইতেছে এবং মিথ্যা ধর্ম্ম-আবরণে আবদ্ধ থাকিয়া মানুষ যে পারস্পরের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ হইয়া পুণ্যভ্রমে প্রত্যহ নানা পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছে তাহা অবলোকন করিয়া তিনি এক বিশুদ্ধ-ধর্ম্ম, মঙ্গল ও স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন।

তাঁহার ঈশ্বর হিন্দুরও নহে, মুসলমানেরও নহে, তিনি সকলের ও এক; তিনি নিরাকার, সর্ব্ব সংরক্ষক, কালাতীত; কেবলমাত্র প্রেম দ্বারাই সেই ঈশ্বরকে লাভ করা যায়।

হিন্দু এবং মুসলমান সকলেই তাঁহার বাণীর যথার্থিতা উপলব্ধি করিতে লাগিল। নানক সমস্ত সাম্প্রদায়িক বেড়া ভাঙ্গিয়া ধর্ম্মকে এক মহান্ উদার বিস্তৃত মঙ্গলের ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান করিলেন, সেখানে জাতিবর্ণ-সম্প্রদায়ের কোন ভেদ বা বিদ্বেষ রহিল না। তিনি প্রচার করিলেন, ধর্ম্মে যেমন উচ্চ-নীচ নাই, জাতিবর্ণ নাই, মনুষ্য স্বীয় স্বত্ব স্বাধীনতায়ও তদ্রূপ,—সকলেই সমান। তিনি ধর্ম্মের সঙ্গে সাম্য স্বাধীনতা ও মৈত্রীকে সম্মিলিত করিলেন।

১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে ৭২ বৎসর বয়সে নানক লোকান্তরিত হইবার পূর্ব্বে তিনি উপযুক্ত শিষ্যের হস্তে এই সত্যধর্ম্ম প্রচারের ভার দিয়া গেলেন। তদীয় পরবর্ত্তী দুইজন গুরু নানা স্থানে বিচরণ দ্বারা নানকের প্রচারিত ধর্ম্মমত সকল চতুর্দ্দিকে পরিব্যক্ত করিতে লাগিলেন।

এই দুইজন গুরু প্রচারকার্য্য সম্পূর্ণ করিলেন, তাঁহাদের একনিষ্ঠ প্রচারের দ্বারা প্রত্যহ সহস্র সহস্র লোক এই বিশুদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল এবং সত্যধর্ম্মের যথার্থতা উপলব্ধি করিয়া সাগ্রহে তাহা অবলম্বন করিল।

তৃতীয় গুরুর সময় হইতে এই বিশুদ্ধধর্ম্মবাদী শিষ্য বা শিখসম্প্রদায় অন্য মিথ্যাধর্ম্ম ও কুসংস্কারবাদিগণ হইতে একটু পৃথক্ ও স্বতন্ত্র ভাব ধারণ করিল।

তাহারা তৎকাল-প্রচলিত কুরীতি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কাজেই অন্য সম্প্রদায় হইতে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র হইতে হইয়াছিল। কিন্তু এই সত্যধর্ম্ম গ্রহণ-ও প্রতিপালনে তাহার বাধা বা ধর্ম্মের কোন বৈষম্য ছিল না। উদার ও বিস্তৃত ক্ষেত্রে উক্ত ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল। চতুর্থ গুরু এই সত্যধর্ম্মাবলম্বীদের সাধন-পথ বিস্তৃত করিবার চেষ্টা করিলেন এবং ধর্ম্ম-সঙ্গিনী ও ধর্ম্মশিক্ষার সংস্থাপন উদ্দেশ্যে অমৃতসরে হরিমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিলেন। পঞ্চম গুরু চতুর্থ গুরুর পন্থানুসরণ করিয়া সত্যধর্ম্মবাদীদের ভক্তি ও ধর্ম্মসাধন-পথ পরিষ্কৃত সম্পূর্ণ করিতে যত্নবান্ হইলেন, অধিকন্তু তিনি জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ছিলেন। কাজেই তিনি মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি বা সত্যবাণী-প্রচারক পূর্ব্ব-গুরুগণের বাণী এবং হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজের মহাপুরুষগণের উৎকৃষ্ট বাণীসমূহ একত্র লিপিবদ্ধ করিয়া সত্যধর্ম্মবাদীদের জন্য বিরাট "আদি গ্রন্থ" রচনা করিলেন। তিনি শিষ্যবর্গকে এই উপদেশ দিলেন,—

"অতি সুন্দর কুলীন চতুর মুখীভিয়ানী (জ্ঞানী) ধনবন্ত।
মিরতক কহীঐ নানকা, জিহ প্রীতি নহী ভগবন্ত॥"

মুখভানী (বক্তা) যতই সুন্দর কুলীন, ধনী কিম্বা নিপুণ হউক না কেন মৃত, যদি তাহার অন্তরে ঈশ্বর ভক্তি বর্ত্তমান না থাকে—নানক ইহা বলিতেছেন।

"বৈরী মিত্র হোএ সমান।
সরব মহি পূরণ ভগবান॥
পুভা কী মান সুখ পাইআ।
গুরি পূরৈ হরিনামু দ্রিড়াইআ॥"

—যে সমস্ত ত্রিলোকের মধ্যে ঈশ্বর আছেন অনুভব করেন, মিত্র এবং বৈরী তাহার নিকট সমান। প্রকৃত সুখ একমাত্র ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ দ্বারা পাওয়া যায়। ঈশ্বরের প্রাপ্তি-বিষয়ে প্রকৃত গুরুই পথপ্রদর্শক।

এই সময় সহস্র সহস্র লোক সাগ্রহে সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। সত্য ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্বের প্রভূত প্রচার আরম্ভ হইল; কিন্তু ইহাতে বাধা হইলেন দিল্লীর বাদশাহ জাহাঙ্গীর। পূর্ব্বের দুইজন বাদশাহ এই সত্যধর্ম্মের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, এমন কি বাদশাহ হুমায়ুন প্রথম গুরুর শিষ্যত্বে দীক্ষিত ছিলেন। কিন্তু বাদশাহ জাহাঙ্গীর এই শিখধর্ম্মের প্রভূত বিস্তার দেখিয়া গুরুর প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষপরায়ণ হইলেন এবং সেই বিদ্বেষ চরিতার্থ করিবার জন্য ও এই নবীন ধর্ম্মসম্প্রদায়কে বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে গুরুকে আনিয়া কারাগারে

বন্ধ করিলেন। মুসলমান বাদশাহের অত্যাচারে এই ধর্ম্মপ্রাণ গুরুর জীবনান্ত হইল।

তিনি মৃত্যু-সময়ে তৎপরবর্ত্তী গুরুকে ধর্ম্মপ্রচারের সঙ্গে ধর্ম্ম-সমাজ সংরক্ষণেরও আদেশ দিয়া যান।

১৬০০ খৃষ্টাব্দে হইতে শিখধর্ম্মের এই নূতন যুগ পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। এত দিন ইহা সময়ের প্রতীক্ষায় ছিল, এখন এই নূতন মত আসিয়া শিখধর্ম্ম উজ্জ্বল করিল।

পরবর্ত্তী গুরু ধর্ম্মের এই নূতন সম্প্রসারণে কিঞ্চিৎমাত্র ভীত হইলেন না। তিনি নূতনের সহিত যোগস্থাপন করিয়া নানক-মতের প্রকৃত সারটুকু গ্রহণ করিলেন। এতদিন নানক-প্রচারিত ধর্ম্মের কেবলমাত্র প্রেমভাবের অংশেরই চর্চ্চা হইয়া আসিতেছিল, এখন সেই প্রেমের সঙ্গে স্বাধীনকর্ম্ম ও ধর্ম্মসংরক্ষণের ভাব আসিয়া যুক্ত হইল। এই সময় হইতে শিখধর্ম্মের অন্তঃকরণে ভক্তির সঙ্গে ধর্ম্ম-প্রতিপালন ও রক্ষার জন্য শক্তি-চেষ্টা জাগ্রত হওয়ায় প্রেম এবং কর্ম্ম একত্র সম্মিলিত হইল।

দিল্লীর সম্রাটগণ এই নবধর্ম্মাবলম্বীদিগকে নির্ম্মূলিত ও বিনষ্ট করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিল। সেই অত্যাচারে শিখের গ্রাম-নগর ভস্মীভূত ও জনশূন্য হইল। শিখগণ জঙ্গলে বনে জঙ্গলে আশ্রয় করিল, তাহাতেও নিস্তার ছিল না, মুসলমান সৈন্যগণ বনে-জঙ্গলে যাইয়া শিখ শিকারে প্রবৃত্ত হইল।

এই নির্য্যাতন ও অত্যাচারে প্রকৃত স্বধর্ম্মের উজ্জ্বলতা কিছুমাত্র মলিন হইল না। যতই তাহারা নিষ্পেষিত হইতে লাগিল ততই তাহাদের তেজস্বীতা, শক্তি-সাহস বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অত্যাচারী রাজা তাহাদের এই তেজস্বীতা, সাহস, পরাক্রম ও আত্মত্যাগ দেখিয়া ভীত ও বিচলিত হইল এবং মনে করিল ক্রমাগত অত্যাচার ও বিনাশদ্বারা এই ধর্ম্মসম্প্রদায়কে নিশ্চয়ই বিলুপ্ত করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু যতই এই জাতি নির্য্যাতিত হইতে লাগিল, ততই তাহাদের শক্তি-সাহস দৃঢ়তা ও সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম গুরু পর্য্যন্ত শিখেরা এই ভাবেই কাটাইল। এই সময়ের শিখ-ইতিহাস কত যে শিখ আত্মত্যাগীর দৃষ্টান্তে উজ্জ্বল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

নবম গুরু তেগ বাহাদুর দিল্লীতে যাইয়া মুসলমান-অত্যাচারে স্বেচ্ছায় আত্ম-প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। তিনি যে অদ্ভুত ধর্ম্মনিষ্ঠা, নিষ্কাম লোকসেবা, আত্মত্যাগ,

দৃঢ়তা ও সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা সমস্ত শিখজাতির আদর্শ হইয়া রহিল। সকল জাতির ইতিহাসেই দু'একজন আত্মত্যাগী বীরের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু শিখ-ইতিহাসে এই প্রকার আত্মত্যাগীর নামের সংখ্যা অসংখ্য।

গুরু তেগ বাহাদুরের পর এই সমস্ত আত্মত্যাগীর সমাধিভূমিতে একটা বীর জাতি গড়িয়া তুলিবার জন্য গুরুগোবিন্দ অবতীর্ণ হইলেন।

গুরুনানক যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন সেই ধর্ম্ম কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত (For active display of Religion) তিনি জ্ঞানকর্ম্মভক্তি একত্রে বদ্ধ করেন এবং প্রচলিত লোকাচারের বেড়া ভাঙ্গিয়া সত্যকে উদার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

নানক ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী থাকিয়াও এতদিন শিখসমাজে জাতিভেদ প্রভৃতি এতকালের প্রচলিত কুসংস্কার বিদ্যমান ছিল। গুরুগোবিন্দ জাতিভেদ, বর্ণবিভাগ ও প্রচলিত সমুদয় কুসংস্কার দূর করাইয়া স্থানে আনার বাণী ঘোষণা করিলেন। উপরোক্ত কয়েক জন গুরু ব্যতীত অন্য কয়েকজন এই হিন্দুসমাজের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া স্ব স্ব মতানুযায়ী নানক-মতের ব্যাখ্যা করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিষ্যদলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা নানক-প্রচারিত সত্যধর্ম্মের কতকটা অবনতি ঘটিয়াছিল। তিনি প্রচার করিলেন—যাঁহারা নানক-বাণীর যথার্থ মর্ম্ম উপলব্ধি না করিয়া স্ব স্ব মতানুযায়ী ধর্ম্ম চালাইতেছেন কিম্বা কুরীতি ও কুসংস্কারের বশবর্ত্তী থাকিয়া সত্যধর্ম্মের যথার্থ ভাব অনুসরণ করিতেছেন না, তাঁহারা কেহই প্রকৃত শিখ নহেন। গুরুগোবিন্দ চতুর্দ্দিকের ঘোর কুসংস্কার ও অপবিত্রতা হইতে ধর্ম্মকে মুক্ত করিয়া সত্যকর্ম্মের ভিত্তির উপর সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। এই বিশুদ্ধমত যাহারা নিঃসঙ্কোচে বিনা দ্বিধায় গ্রহণে অভিলাষী হইল। গুরুগোবিন্দ তাহাদিগকে নানক-বাণীর যথার্থ মর্ম্মগ্রহণ ও সত্যানুসরণের উপদেশ দিয়াছিলেন। গ্রন্থসাহেব সমগ্রের বারংবার পাঠ দ্বারা গুণগ্রাহকের মত চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া ঐ বাণীর উপদেশ-অনুযায়ী কর্ম্ম করা ও তৎপ্রতিপালনে সমুদয় শক্তি নিয়োগ করাই তিনি প্রকৃত ধর্ম্মপন্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

গুরুগোবিন্দ ঈশ্বর-প্রেম, কর্ম্ম ও ভক্তিজ্ঞান সকলই এক সূত্রে গ্রথিত করিলেন। তিনি ধর্ম্মের সঙ্গে সাংসারিকতা সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার ভিত্তিও স্থাপন করিলেন।

প্রকৃত পক্ষে গুরুগোবিন্দই ভারতবর্ষের এই ধর্ম্মজাতীয়তার জনক ও প্রথম

২ রতা করিম সোঈ রাঁজক রহীম উঈ দুসরে ন ভেদ
সোঈ ভূল ভ্রম মন বো।
একহী কা সেব সভ হাকো গুরুদেব একহী সরূপ সবৈ
এক জাতি জান বো॥
দেহরা মসীত সোঈ পূজা ঔ নমাজ উঈ মানুখ সবৈ
এক পৈ অনেক কো প্রভাবহৈ।
বেদ কা কতেব ব্রহ্ম গন্ধ্রব তুরক হিন্দু ন সাবে ন যাবে দেবত কো
ভেদ কো ন ভাব হৈ।
একৈ নৈন একৈ কান একৈ দেহ একৈ বান থাক বায় আতম
ও আবকো বনাব হৈ।
অলাহ অভেখ সোঈ পুরাণ ঔ কুরান উঈ এক কো সরূপ
সবৈ একহী বনাব হৈ॥

জাকউ ছুট গয়ো ভ্রম উরকা।
তিহ আগৈ হিন্দু কিআ তুরকা॥

—কেহ মস্তক মুণ্ড। করে, কেহ বলে আমি সন্ন্যাসী, কেহ বলে আমি যতি, কেহ বলে যোগী, কেহ ব্রহ্মচারী, কেহ হিন্দু, কেহ মুসলমান, কেহ হাফিজ কেহ ইমাম, কেহ সাফী কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সকলকেই এক বলিয়া জান। কর্ত্তা বা রক্ষাকর্ত্তা, রহিম (করুণাময়) করিম (মহিমান্বিত) সকলেই এক। এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই। হে মনুষ্য, সেই অদ্বিতীয়ের ভজনা কর। সেই অদ্বিতীয়ই সকলের প্রেম ও ভালবাসায় জিনিষ। তিনি সকলের উপরে এবং সেই পরমাত্মা সকলের মধ্যে কাজ করিতেছেন। মসিজিদ এবং মন্দির সবই এক। পূজা এবং সমাজ তাহাও এক। সমস্ত মনুষ্যই এক হইতে উৎপন্ন। বিভিন্ন রং কেবলমাত্র বিভিন্ন পর্দ্দা দ্বারা সৃষ্টি হয়। দেব, আদেব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, তুর্ক, হিন্দু প্রভৃতি নাম বিভিন্ন দেশে বাসের দ্বারা লক্ষিত হয়। সমস্ত মিলিয়া পঞ্চতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন। আল্লা ও নিরাকার, পুরাণ ও কোরাণ সবই এক।

যে সমস্ত অপবিত্রতা শাস্ত্র হইতে মুক্ত হইয়াছে তাহার কাছে কি হিন্দু কি তুর্ক সকলি সমান।

গুরুগোবিন্দ সেনকালপাত্রভেদে ধর্ম্মসংরক্ষণের নিমিত্ত পার্ব্বত্য হিন্দুরাজা ও মোগল বাদশাহ উভয়ের সহিতই যুদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কাছে কখনো হিন্দু-মুসলমান কোন ভেদ ছিল না।

একেশ্বরবাদ, বিশ্বমানবে মৈত্রীভাব, বেদের প্রতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস, ঈশ্বরপ্রেম এবং মনুষ্যত্বের সেবায় আত্মনিয়োগই তিনি ধর্ম্মনামে অভিহিত করিয়াছেন।

একবার মোগল যুদ্ধে একদল শিখ মুসলমান শিখ উভয়কেই সমভাবে জল বিতরণ করিয়াছিল, তজ্জন্য অপর একদল শিখ আসিয়া গুরুর নিকট অভিযোগ করিল। গুরু তৎক্ষণাৎ উক্ত জলবাহক শিখকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—ভাই, তুমিই প্রকৃত শিখ। শেষ-গুরু ধর্ম্মের-সেবা এবং অধর্ম্ম বিনাশের জন্য জীবনব্যাপী সংগ্রামকে মনুষ্যত্বের সেবা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।

গুরুগোবিন্দ বলিতেন—শত্রু মিত্র আমার কেহই নাই, প্রকৃতধর্ম্মের প্রচার ও রক্ষা এবং অধর্ম্মের বিনাশ আমার জীবনব্যাপী কর্ত্তব্য।

মনুষ্যত্বের সেবায় যে ভীরু ও কাপুরুষ তাহাকে তিনি ধর্ম্মহীন ও অ-মানুষ বলিয়াছেন।

"পলমে মরণ অনুসরণ জীবন দি ছোড় আশ।
হো সগলহি রেণুকা তো ঘাও হামারে পাশ॥"

যে ঈশ্বর ও মনুষ্যত্বের সেবায় আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পরাঙ্মুখ সে কখনই ঈশ্বর লাভ করিতে পারে না। ধর্ম্ম মনন অপেক্ষা কর্ম্মে অধিক প্রতিষ্ঠিত তাহা তিনি প্রচার করিলেন। যে মৃত্যুভয়ে অধীর সে কখনই ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে পারে না।

নানক-প্রচারিত সত্যধর্ম্মের পূর্ণতা সাধন করিয়া ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে গুরুগোবিন্দ দাক্ষিণাত্যে প্রাণত্যাগ করেন; কিন্তু তিনি দশগুরু ও সহস্র আত্মত্যাগীর তপস্যার ফল রাখিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর খালসাবীরগণ বান্দার নেতৃত্বে অসীম পরাক্রমে অধর্ম্ম-বিনাশে প্রবৃত্ত হইল। গুরুসকাশে সত্য এবং স্বাধীনতার ভাব পূর্ণ জাগ্রৎ হইয়াছিল বলিয়া তাহারা অধর্ম্ম ও জুলুমপূর্ণ অত্যাচারী রাজার শাসন-ক্ষমতা অগ্রাহ্য করিল। তাহারা ধর্ম্মগুরুকেই "সাচ্চা পাদশা" ও মোগল বাদশাহকে "ঝুটা পাদশা" নামে অভিহিত করিতে লাগিল। ধর্ম্ম, ও স্বাধীনতায় মানুষ যে সমান তাহাই তাহারা প্রচারে প্রবৃত্ত হইল।

খালসাবীরগণ "ডেগ, ডেগ, ফতেহ" এই আদর্শ গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মের প্রচার, ক্রমোন্নতি ও নিরোধাত্ম,—এই মূল মন্ত্রই তাঁহাদের সংসার-ক্ষেত্রে উন্নতি ও পুষ্টির প্রধান কারণ হইল।

বান্দার মৃত্যুর পর দিল্লীর বাদশাগণ খালসানিধনব্রত পূর্ণবেগে [illegible] করিতে লাগিলেন। মোগল সৈনিকগণ গ্রামে গ্রামে বনে জঙ্গলে যাইয়া শিখ শিকারে প্রবৃত্ত হইল। তৎকালে প্রতি খালসা-শিখের মাথা লাহোর দরবারে ৫০৲ টাকা মূল্যে ক্রীত হইত।

কিন্তু এই নবীন ধর্ম্মবীরগণের বিনাশের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। সমস্ত দল তাহারা অল্প কয়েকজন মিলিয়া পরাক্রান্ত মোগল সৈন্যবাহিনীকে পরাভূত করিয়া চলিয়া যাইত।

গ্রাম নগর ছাড়িয়া খালসা শিখগণ দুর্ভেদ্য বনে জঙ্গলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইয়া বাস করিত। সময় সময় তাহারা বিদ্যুদ্বেগে ঘোড়া ছুটাইয়া অমৃত সরের হরি-মন্দির (Golden Temple) দর্শনে আসিত; এই ভাবে তাহারা সময় সময় উষ্কার মত লোকালয়ে আসিয়া দেখা দিত। তাহাদের অনেকে মৃত ও নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইত, কিন্তু একজনও জীবন-রক্ষার প্রলোভনে ধর্ম্ম ত্যাগে সম্মত হয় নাই। যে দৃঢ়তা, সাহস ও ধর্ম্মবল গুরুগোবিন্দ তাহাদের অন্তঃকরণে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার একটীও নিষ্ফল হয় নাই। সকলেই তাহারা গুরুর মত ধর্ম্মে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিল। তাহারা গুরু ভেগ বাহাদুরের এই অমর প্রার্থনা বিস্মৃত হয় নাই :—

"হে পরমেশ্বর! আমি যেন কর্ত্তব্য-পালনে কখনও পশ্চাৎপদ না হই। এই শক্তি দাও যেন মনুষ্যত্ব ও পৌরুষ অর্জ্জন করিতে বিন্দুমাত্র ভীত না হই। যদি ধর্ম্মকার্য্য-সম্পাদনে মৃত্যুও সন্নিকট হয়, তখন যেন বীরের মত প্রাণ ত্যাগ করিতে পারি।"

যখন নাদির শাহ মোগল রাজশক্তি নির্ম্মূল করিয়া নৃশংস অত্যাচারে দিল্লী ও পঞ্জাবের পথ-ঘাট শোণিত-প্লুত করিয়া, দিল্লীর রাজভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া এবং বিশ্ববিশ্রুত 'তক্ত তাউস' লুণ্ঠে উড়াইয়া চলিল, তখন খালসা-শিখগণ প্রকাশ্যভাবে পঞ্জাবে আসিয়া নাদির শাহকে আক্রমণ করিল।

নাদির আত্মগর্ব্বে স্ফীত হইয়া ভাবিতেছিলেন, কি আশ্চর্য্য হিন্দুস্থান স্ত্রীলোকের দেশ, পুরুষ এখানে একটীও নাই।

এইজন্যই তিনি দিল্লীবাসীকে কাবুলদেশীয় স্ত্রীলোকের পাজামা পরিধানের অনুমতি দিয়া আসিয়াছিলেন।

নাদির যখন স্বীয় সৈন্যবর্গের অপরিসীম শক্তি ও হিন্দুস্থানবাসীর অপরিসীম দুর্ব্বলতা তুলনা করিয়া আত্মগর্ব্বে স্ফীত, তখন ক্ষুদ্র একদল খালসা সৈন্যের সিংহ-

পরাক্রমে দিগ্বিজয়ী, নাদিরের বিপুল সৈন্যবাহিনী ও সঙ্গে সঙ্গে নাদিরের প্রভূত যুদ্ধাস্ত্র ও ধনরত্ন লুণ্ঠিত হইল। নাদির বিস্মিত ও ক্রোধকম্পান্বিত হইয়া বলিলেন,—"একি! ইহারা কোথা হইতে আসিল? কোন দেশে ইহাদের বাস?"

পারিষদবর্গ বলিল,—"শাহান শাহ্ ইহাদের বাড়ী ঘোড়ার জিনের উপর। সত্বর দেশে ফিরিয়া চলুন, নতুবা কি বিপদ উপস্থিত হয় বলা যায় না।"

নাদির শাহের স্বদেশ-প্রত্যাগমনের পরই দলে দলে খালসা আসিয়া সমস্ত পঞ্জাব অধিকার করিয়া লইল। নাদির শাহ পঞ্জাব শাসনের জন্য যে প্রতিনিধি রাখিয়া গিয়াছিলেন, সে ক্রমে পরাজিত হইয়া পঞ্জাব পরিত্যাগ করিল।

তখন যে কোন খালসা সর্দার একটু প্রতিপত্তিশালী হইয়াছে সেই স্বাধীনতায় তাহার চতুষ্পার্শ্বের আরও কয়েকজন খালসা একত্র করিয়া পঞ্জাবে রাজ্য-বিস্তারে প্রবৃত্ত হইল। এই প্রকারে সমস্ত পঞ্জাবে ১২টী মিসিল বা Sikh Commonwealthএর সৃষ্টি হইল। একে একে পঞ্জাবের ছোট বড় সমস্ত মুসলমান রাজশক্তি এই পরাক্রান্ত জাতির হস্তে পঞ্জাবের শাসনক্ষমতা অর্পণ করিতে বাধ্য হইল। মিসিলও বহু খালসা একত্র দল বাঁধিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেহই কাহারও অধীনতা স্বীকার করিত না। এই রাজ্যবিস্তারে প্রত্যেক খালসা সৈন্যেরই সমান স্বার্থ ও স্বাধীনতা বিদ্যমান ছিল।

এই শিখ মিসিলের হস্ত হইতে পঞ্জাব অধিকার করিবার জন্য আহম্মদ শাহ্ আবদালী বিপুল সেনাদল লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। তাহার আগমনের সময় শিখমিসিলগণ সম্মিলিত হইয়া একটু পশ্চাৎপদ থাকিয়া খণ্ড-যুদ্ধে আত্মরক্ষা করিত এবং আহম্মদ শাহ্ আবদালী দেশে প্রত্যাগমন করিলেই পুনরায় সম্প্রসারিত ভাব ধারণ করিয়া সমস্ত পঞ্জাবে আধিপত্য বিস্তার করিত। এই প্রকারে ছয় বার পঞ্জাব অধিকারে ব্যর্থমনোরথ হইয়া আহম্মদ শাহ দেশে ফিরিলেন।

যখন পঞ্জাবে আফগান ও শিখ উভয়েই আধিপত্য-বিস্তারের চেষ্টা করিতেছিল, তখন অত্যাচার-অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা ও যুদ্ধ বিগ্রহের অবধি ছিল না, কাজেই এই সময়কে পঞ্জাবের লোকেরা "নাদির শাহী" ও "শিখা শাহী" রাজত্বকাল বলে।

যখন মুসলমান রাজশক্তি পঞ্জাব হইতে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইল, তখন বিভিন্ন মিসিলই স্ব স্ব আধিপত্য-বিস্তারের জন্য আত্মকলহে প্রবৃত্ত হইল। কখনও

এক মিস্‌ল অন্য মিস্‌লের সহায়তায় তৃতীয় মিস্‌লের রাজ্যগ্রাস করিতে চেষ্টা করিত। এই প্রকারে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের অবধি ছিল না। কিন্তু কোন বৈদেশিক শক্তি অগ্রসর হইলে সমুদয় মিস্‌লই একত্র সম্মিলিত হইয়া শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিত। সময় সময় মিস্‌লগণের পরস্পরের দ্বন্দ্ব নির্ব্বাচিত বালসা প্রতিনিধিগণ দ্বারা আপোষে মীমাংসিত হইত।

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে পারস্যের নবীন ভূপতি শাহ জমান যখন লুপ্ত মুসলমান প্রভুতা স্থাপন করিবার জন্য পঞ্জাবে আগমন করিলেন, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, বালসাগণকে বিরক্ত করিয়া পঞ্জাবে মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপন করা সম্পূর্ণ অবস্তুর; তজ্জন্য তিনি প্রথমেই কয়েকটী শিখ মিস্‌লকে স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন এবং তাহার ফলে অচিরেই তিনি কয়েকজন শিখ সর্দ্দারের সহায়তা লাভ করিলেন। যদিও তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে শাহ জমানের সহায়তার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল না, তবু পরোক্ষভাবে অন্য শিখমিস্‌লের সহিত যুদ্ধে যোগ না দিয়া শিখশক্তিকে দুর্ব্বল করিল।

সে বৎসর শাহ জমান পঞ্জাবের কিয়দংশ দখল করিলেন, বটে কিন্তু তাঁহার স্বদেশ-প্রত্যাগমনের সঙ্গে সঙ্গে অন্য মিস্‌ল আসিয়া তাহা অধিকার করিয়া লইল।

সেই সময় রণজিৎ সিং তরুণবয়স্ক; অতি অল্প বয়সেই তিনি প্রসিদ্ধ বীর ও অশ্বারোহী বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। রণজিতের বৃদ্ধ পিতামহ সামান্য কৃষক ছিলেন। তিনি লাঙ্গল ছাড়িয়া তাঁহার চতুষ্পার্শ্ব কয়েকজন কৃষককে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং ক্রমে ক্রমে আধিপত্য বিস্তার দ্বারা তাঁহার পুত্র একটী মিস্‌লের অধিপতি হন।

বারংবার পঞ্জাব-জয়ে ব্যর্থকাম হইয়া ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের শাহ জমান যখন চতুর্থবার পঞ্জাব-জয়ে অগ্রসর হন, তখন তিনি যুবক রণজিতের অসামান্য প্রতিভা ও তেজবীর্য্য-দর্শনে বিস্মিত হন। শাহ জমান পঞ্জাব-জয়ে প্রবৃত্ত হইয়া হঠাৎ সংবাদ পাইলেন, পারস্যে নূতন বিদ্রোহের সূত্রপাত হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ তিনি স্বীয় সৈন্যবলসহ স্বদেশ-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেই সময় ঝিলাম নদীতে প্রবল বন্যা উপস্থিত হইয়াছিল, কাজেই তিনি ভারী কামান সকল রহিয়া স্বদেশে লইয়া যাওয়া অসম্ভব মনে করিয়া রণজিৎকে চিঠি লিখিয়া গেলেন,

পৌঁছাইয়া দেন, তবে তিনি রণজিৎকে লাহোর শাসনের ক্ষমতা প্রদান করিতে পারেন।

রণজিৎ সিংহ শুকর চকিয়ান মিশিলের সর্দার ছিলেন এবং অন্যান্য মিশিলের তুলনায় তাঁহার মিশিল কতকটা হীনবল ছিল, কাজেই তিনি শাহ জমানের অভিনন্দন বা ফারমান পত্র সাগ্রহে গ্রহণ করিলেন।

প্রভূত পরিশ্রম সহকারে রণজিৎ সত্বর শাহ জমানের কামানগুলি পারস্যে প্রেরণ করিয়া লাহোরের শাসনকর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইলেন। সেই সময় লাহোর কয়েকজন শাসনকর্ত্তার অধীন ছিল; তাহাদের অত্যাচারে লাহোরবাসী অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়াছিল। কাজেই তাহারা রণজিৎকে লাহোর অধিকারের নিমিত্ত সাগ্রহে আহ্বান করিল। স্বীয় সৈন্যবল লইয়া রণজিৎ বারোদ্বারীতে (বর্ত্তমান Punjab Public Library) আসিয়া সৈন্য সমাবেশ করিলেন, এই স্থান হইতে তিনি সৈন্যদল লইয়া নগরীর দক্ষিণভাগ আক্রমণ করিলেন। শত্রুরা পরাভূত হইয়া অতি অল্পকাল মধ্যেই নগরী তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিল। তিনি নগরী অধিকার করিয়া নগরীর প্রাচীরসকল সুদৃঢ় ও নগরীর চতুর্দ্দিকস্থ পরিখাগুলির সংস্কার সাধন করিলেন।

লাহোরের আধিপত্য লাভের পর হইতে অন্যান্য শিখ মিশিলগণ রণজিতের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হইল এবং তাঁহার শক্তি বিনষ্ট করিবার জন্য সকলে কৃতসঙ্কল্প হইল। রণজিতের শক্তি তখনও নিতান্ত ক্ষুদ্র, কয়েক শত অশ্বারোহী খালসা সৈন্যমাত্র তাঁহার সহায়,—তাহারাও প্রকৃত শিক্ষিত সৈন্য নহে। রাজকোষে এক কপর্দ্দকও সঞ্চিত ছিল না।

রণজিৎ প্রভূত পরাক্রমে ক্রমে ক্রমে লাহোরের চতুর্দ্দিকস্থ স্থানগুলি হস্তগত করিলেন। তখনও রণজিতের এমন শক্তি জন্মে নাই যে, তিনি দুই বা ততোধিক মিশিলের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারেন, তবু তিনি চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধে লিপ্ত রহিলেন। একবার যুদ্ধজয়ে সফল-মনোরথ না হইয়াও তিনি হতাশ হইতেন না; বারম্বার যুদ্ধে লিপ্ত থাকিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সফল করিতেন। এই সময় তিনি অবিশ্রান্ত ঘোড়ার জিনের উপরই কাল কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহার অদ্ভুত পরাক্রম ও যুদ্ধকৌশলে তিনি অধিকাংশ যুদ্ধেই জয়ী হইয়াছেন। এই যুবক রণজিৎ কয়েক বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ মিশিলগুলি স্বীয় অধীনতায় আনয়নে সমর্থ হইলেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহ মহারাজ উপাধি গ্রহণ করেন।

মধ্যবর্ত্তী সমুদয় স্থানের সর্দ্দার রাজা মহারাজগণকে স্বীয় বশ্যতায় আনয়ন করিলেন। তাঁহার এই সমস্ত বিষয় একান্ত আশ্চর্য্য। তাঁহার দৃঢ়তা, সাহস, তেজ ও অদ্ভুতরণনৈপুণ্যে পর্ব্বতস্থ শক্তিও চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অতি ক্ষুদ্র সর্দ্দার পদবী হইতে তিনি কয়েক বৎসরে মহারাজা উপাধি গ্রহণ করিলেন। সেই সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ২৯ বৎসর মাত্র। পঞ্জাবের অধিকাংশ বিজয় তিনি এই ২৯ বৎসরে সম্পন্ন করেন। এই সময় তিনি ভারতে পাঁচ হইয়া ভূলিয়ান খ্রিষ্টিয়ান অধিকারের সঙ্কল্প করিলেন। ইহাতে শতদ্রু পরপার স্থ ফিরোজপুর, নাভা, ফিন্দ প্রভৃতি সিখসর্দ্দারগণ রণজিতের আগমনে ভীত হইয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থী হইল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তৎকালে Non-interference Policy অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের এ বিষয়ে সম্মত হইতে পারিলেন না; কিন্তু ইহার অল্পকাল পরেই যখন, শুনিতে পাইলেন যে, ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ভারত আক্রমণে প্রবৃত্ত, তখন তাঁহাদের Policy সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল এবং সিন্ধু পাঞ্জাব আফগানিস্থান ও পারস্য অধিপতিদিগের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইতে আগ্রহান্বিত হইলেন। তাঁহার গবর্ণমেণ্ট পেশোয়া হইতে দূতবাস দূর করিয়া ও রণজিতের সহিত সন্ধিপত্রে ব্যর্থ হইয়া এক অভিনব সখ্যসূত্রে আবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে একদল সৈন্য পঞ্জাব অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। রণজিৎ তখন পাঞ্জাবের উত্তর সীমান্ত রাজ্য লইয়া ব্যস্ত ছিল, ইংরেজের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া নিতান্ত বিপজ্জনক মনে করিয়া তিনি ইংরেজদের সন্ধিপত্রানুযায়ী তিনি আর শতদ্রুর পরপারবর্ত্তী রাজ্যজয়ে অগ্রসর হইলেন না, এই অঙ্গীকারে ইংরেজদের সহিত সখ্যসূত্রে বদ্ধ হইলেন।

রণজিৎ আজীবন এই সন্ধি বিশ্বস্ততার সহিত প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ১৮০৯ হইতে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দ—এই ১৭ বৎসর অবিশ্রান্ত যুদ্ধে লিপ্ত থাকিয়া মহারাজ রণজিৎ মুলতান ও কাশ্মীর দুইটী পরাক্রান্ত মুসলমান-রাজ্য ও কিলামের পরপারবর্ত্তী সমস্ত স্থান ও কাবুল সীমানার পেশবার জায়ফদ প্রভৃতি স্থানগুলি অধিকার করিলেন।

প্রবল বন্যা ও স্রোতের জন্য আটকনদী প্রসিদ্ধ। লোকেরা এই নদী অতিক্রম করা সাধ্যাতীত বলিয়া জানিত। এ পর্য্যন্ত কোন দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ আটকনদী অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। মহারাজ রণজিৎ আটকনদী পার হইয়া পরবর্ত্তী রাজ্য-জয়ে সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার সাহসী দিগ্বিজয়ী সৈন্যেরাও

অটক নদীর প্রবল বন্যা দেখিয়া অতিশয় ভীত হইলেন। তখন মহারাজ রণজিৎ সিংহ সর্ব্বাগ্রে স্বীয় অশ্বপৃষ্ঠে চড়িয়া নির্ভয়ে ঐ নদী পার হইয়া গেলেন। তাঁহার দেখাদেখি অন্যান্য সৈন্যও নির্ভয়ে পার হইয়া গেল; কিন্তু বহু-সংখ্যক প্রবল বন্যায় ভাসিয়া [illegible]

রণজিৎ তখন বলিলেন,—

[illegible]

[illegible] তাঁহার [illegible] ভূমিতে [illegible] ছবিসিংহ নামক [illegible] ছবিসিংহের [illegible] যোদ্ধা।

ইহাদিগের [illegible] কৌশলে [illegible] কাবুলী [illegible] ছবিসিংহের [illegible] উৎসবে [illegible] আমাদের দেশের [illegible] জিনিষ [illegible]

রণজিৎ [illegible] বলিয়া [illegible] তাঁহার [illegible] বিচার-বুদ্ধি, যুদ্ধনৈপুণ্য, সৈন্যনির্ব্বাচন ও শিক্ষাপ্রণালী এবং সমস্ত কার্য্যে অসীম সাহস ও তীব্রতা—তাঁহাকে সমস্ত [illegible] শিখের এই উচ্চ পদবীতে স্থান দিয়াছিল। রণজিৎ সর্ব্বদাই নিজকে পালসা সেবক বলিয়া পরিচয় দিতেন। তাঁহার দরবারে সর্ব্বদা আদিগ্রন্থ পঠিত হইত